আবুল হুসেন রচনাবলী

ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রধান সংগঠক ও অন্যতম প্রধান চিন্তক ছিলেন মনীষী আবুল হুসেন। তাঁর কিছু লেখা তাঁর প্রথম পুত্র ওয়ালিদ হুসেনের অর্থে এবং কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'আবুল হুসেনের রচনাবলী' নামে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬০-এর দশকের অন্তে। অধিকাংশ লেখাই অন্তর্ভুক্ত হয়নি তাতে। আবুল কাসেম ফজলুল হক দুষ্প্রাপ্য বাংলা ও ইংরেজি লেখাগুলোর অধিকাংশই সংগ্রহ করার দুরূহ কাজ সম্পাদন করেছেন। তাঁর সম্পাদনায় এবার বাংলা একাডেমী দুই খণ্ডে প্রকাশ করছে 'আবুল হুসেন রচনাবলী', এবং দুই খণ্ডেই সংযোজিত থাকছে দুষ্প্রাপ্য লেখাগুলোও। আবুল কাসেম ফজলুল হক ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন, উনিশ শতকের বাংলার নবচেতনা, ইউরোপের রেনেসাঁস আর মার্কসীয় ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত দেশের অন্যতম প্রধান ভাবুক। ১৯৫৬ সালে তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় স্কুল ম্যাগাজিনে। তখন তিনি প্রবন্ধের পাশাপাশি ছোটগল্প ও কবিতাও লিখতেন। লেখার উপজীব্য ছিল সৌন্দর্য, প্রেম, প্রকৃতি ও মর্তপ্রীতি। ছাত্রজীবনে এবং পরেও কিছুকাল সক্রিয় ছিলেন প্রগতিশীল রাজনীতিতে। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পেশা নিয়ে নিবিষ্ট আছেন লেখায়। শিশু সওগাত, সন্দেশ, শুকতারা আর শরৎচন্দ্র, জসীমউদ্‌দীন, নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ, বেগম রোকেয়া, বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, মোহাম্মদ লুত্‌ফর রহমান, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রমুখের জগত অতিক্রম করে মাঝে মাঝেই তিনি অগ্রসর হয়েছেন বার্ট্রন্ড রাসেল, আল্ডুস পক্সলি, টমাস হার্ডি, লিও টলস্টয়, শেকস্‌পীয়র, স্টুয়ার্ট মিল, অগাস্ট কোঁৎ,

[বাকি অংশ শেষ ফ্লাপে]

ডারউন, সেন্সার, জুলিয়ান হাক্সলি, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-মাও, ফ্রয়েড, পাভলভ ও এরিখ ফ্রমের জগতে। তাঁর লেখা পড়লে বোঝা যায় নিজের বাঙালি-সত্তাকে তিনি সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন অতীতের ও দেশ-বিদেশের জ্ঞান আত্মস্থ করে। ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সার্থক উত্তরসাধকদের একজন তিনি। তাঁর জীবনজগত দৃষ্টিতে আছে বিশ্বাসের বন্ধনকে অতিক্রম করে সামনে চলার অনন্ত স্পৃহা এবং সেই স্পৃহার মর্মে বলিষ্ঠ সজীব মূল্যবোধ ও নৈতিক চেতনা। বিশ্বাসের অবলম্বন এবং বিশ্বাসকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলা--দু'য়ের প্রয়োজনই তিনি স্বীকার করেন। বাংলাদেশে এবং গোটা পৃথিবীতে উন্নততর জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র এবং জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকবাদের ভিত্তিতে নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিষ্ঠ থেকে তিনি লিখে চলছেন। তাঁরই সম্পাদনায় আবুল হুসেন রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ডও অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হবে।

গসা
৪

আবুল হুসেন রচনাবলী
প্রথম খণ্ড

আবুল হুসেন রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

আবুল কাসেম ফজলুল হক
সম্পাদিত

বাংলা একাডেমী ঢাকা

আবুল হুসেন রচনাবলী প্রথম খণ্ড
প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৪১০/ মে ২০০৩

বাএ ৪৩৮৪
[২০০২–২০০৩ গসফো : সংকলন ৭]
মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০

পাণ্ডুলিপি
সংকলন উপবিভাগ

প্রকাশক
মুহম্মদ সিরাজ উদ্দীন
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
মোঃ হামিদুর রহমান
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
মোহাম্মদ মোহসীন

মূল্য
একশত পঞ্চাশ টাকা

ABOUL HUSSAINER RACHANABALI : PRATHAM KHANDA [Works of Abul Hussion, Volume : I], Edited by Abul Quasem Fazul Huq, Published by Muhammad Seraj Uddin, Director (Incharge), Research Compilation and Folklore Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First Published : May 2003. Price : Taka 150.00 only.

ISBN 984-07-4392-9

সংকলন ও সম্পাদনা প্রসঙ্গে

এক

আবুল হুসেন রচনাবলী সম্পাদনার দায়িত্ব আমাকে গ্রহণ করতে না হলেই আমি আনন্দিত হতাম। আমার এই উপলব্ধির কারণ দুটো :

এক॥ এই রচনাবলী অনেক আগে প্রকাশ করা উচিত ছিল। যে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মূল সংগঠক ও অন্যতম প্রধান ভাবুক ছিলেন আবুল হুসেন, সেই আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী কেউ, কিংবা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেউ এ কাজ করলে ভালো হতো। এ প্রসঙ্গে অনেকেই সকলের আগে কবি আবদুল কাদিরের নাম স্মরণ করবেন। আমি নিজে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আগ্রহবশে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে বাংলা একাডেমীর একাধিক বার্ষিক সাধারণ সভায় কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় আবুল হুসেন রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দিয়ে একাডেমী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলাম। এ ব্যাপারে পরে আবদুল কাদিরের আগ্রহও আমি লক্ষ্য করেছিলাম। তবে এ বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলে সব সময়েই তিনি উত্তর দিতেন : "আমি ত কয়েকজন লেখকের রচনাবলী বের করে দিয়ে লেখকদের প্রতি সমাজের ঋণ শোধ করার চেষ্টা করেছি। এখন বয়স হয়েছে। আর পারি না। প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-কানুনের জটিলতা বড় ভয়ানক। সাধ্যে কুলায় না। এখন তোমরা কর।"

এর আগে ১৯৬৮ সালের শেষে আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় এবং আবুল হুসেনের পুত্র ওয়ালিদ হুসেনের অর্থে, দুই খণ্ডে পরিকল্পিত *আবুল হুসেন রচনাবলী*র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে ভূমিকার শেষাংশে সম্পাদক উল্লেখ করেছিলেন : "আবুল হুসেন আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। আমি আমার শারীরিক অসুস্থতা ও অনবসর সত্ত্বেও এই রচনাগুলি সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে তাঁর সেই স্নেহের ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধের চেষ্টা করলাম। আত্মা যদি অমর হয় তবে তাঁর বিদেহী আত্মার আনন্দদীপ্ত আশীর্বাদ আমার দুঃখতপ্ত শিরে বর্ষিত হবে, এইটুকুই আকিঞ্চন।" আমি জানি, অর্থের অভাবেই তাঁরা রচনাবলীর পরিকল্পিত দ্বিতীয় খণ্ড নিয়ে আর চিন্তা করেননি।

অনেকেরই জানা আছে, আবদুল কাদির ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম উদ্ভাবক, কর্মী ও ভাবুক ছিলেন। ১৯৬০-এর দশকে তিনিই উদ্যোগী হয়ে বাংলা ভাষার আধুনিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের রচনাবলী সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে, সেগুলোকে প্রথমে ঢাকার কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে এবং বোর্ড বিলুপ্ত হওয়ার পর বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করে আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় স্বাধীন বাংলাদেশে আবুল হুসেনের সমগ্র রচনাবলীর আরও পূর্ণ ও পুনর্বিন্যস্ত উজ্জ্বল নতুন প্রকাশ আমরা দেখতে চেয়েছিলাম। বাংলা ভাষার লেখকদের

চিন্তাধারার কার্যকারিতা আমরা আমাদের জাতীয় জীবনে আশা করেছিলাম। আমাদের মনে ধারণা জেগেছিল যে, বাংলাদেশের উন্নতি বাংলা ভাষার লেখকদের চিন্তাধারাকে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনধারায় কাজে লাগিয়ে এগোনোর উপর সর্বাংশে না হলেও বহুলাংশে নির্ভর করে। শীলভদ্র-দীপঙ্করের কাল থেকে একাল পর্যন্ত আমাদের জাতির চিন্তকদের চিন্তাধারাকে আমাদের কাছে সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় মনে হয়েছিল। আমরা দেখেছিলাম, তাঁরা নিজেদেরকে শামুকের মতো, ঝিনুকের মতো নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে রাখতেন না—বাইরের জগত থেকে গ্রহণ করতেন এবং নিজেদেরকে বাইরে প্রসারিত করতেন। রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতির তাগিদে তখন আমরা আমাদের ভাষার মহান চিন্তকদের চিন্তাধারাকে অমূল্য সম্পদ মনে করেছিলাম!

দুই॥ অতীতের কোনো গুরুত্বপূর্ণ লেখকের রচনাবলী সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণের প্রশ্ন উঠলেই আমার মনে হয়, এ কাজের জন্য আমি মোটেই যোগ্য নই। প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা অতিক্রম করার সামর্থ্যও আমার নগণ্য। মহৎ লেখকদের রচনাবলী সম্পাদনার সমস্যা নিয়ে নানা প্রশ্ন আমার মনে জাগে এবং আমি দ্বিধা-সংশয়ের মধ্যে পড়ি। কাজটাকে আমার কাছে অত্যন্ত জটিল ও কঠিন মনে হয়। যে-লেখক রচনাবলী নামক তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার ধনকে মহাকালের সোনার তরীতে তুলে দেওয়ার চেষ্টায় প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন, তাঁর সেই সাধনার ধন আমার দুর্বল হাতে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে—এই ধারণার পীড়নে আমি পিষ্ট হই। মনে হয় আমার যে, কালের প্রচণ্ড সব প্রতিরোধের মুখে আমি প্রয়োজনীয় টীকা-ভাষ্য যোগে একজন মহৎপ্রাণ লেখকের রচনাবলীকে আমাদের জাতির জীবনে সার্থক ও সফল করতে এবং অক্ষয় করে রাখতে পারব না। বাংলা ভাষার লেখকদেরকে আমি ছোট করে দেখতে পারি না। তবে বাস্তবে বাংলাদেশে বাংলা ভাষার লেখকদের রচনাবলীর যে অবস্থা দেখি, তাতে ব্যথিত হই এবং কোনো লেখকের রচনাবলী সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণের সাহস আমি অর্জন করতে পারি না।

তবু আবুল হুসেনের রচনাবলী সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণে আমি নিজেই উদ্যোগী হয়ে এগিয়েছিলাম। বাংলা একাডেমী থেকে বাংলা ভাষার বিশ শতকের অনেক লেখকের রচনাবলী প্রকাশিত হওয়ার পরেও আবুল হুসেনের রচনাবলী প্রকাশিত হচ্ছে না দেখে আমি এর কারণ সন্ধান করি। তাতে আমার মনে হয়েছিল, এই লেখকের রচনাবলী সংগ্রহ ও সম্পাদনা করার দুরূহ কাজ করতে আসলে কেউই সক্রিয় হবেন না,—কবি আবদুল কাদির যেটুকু করে গিয়েছেন, মোটামুটি তার ম্লায়মান পুনরাবৃত্তি দিয়েই এর পরিসমাপ্তি ঘটবে। ব্যাপারটা আমার কাছে কষ্টকর ঠেকেছিল। আমি জেনেছিলাম যে, আবুল হুসেন পশ্চাৎবর্তী অবক্ষয়ক্লিষ্ট সমাজে জন্মগ্রহণ করে এই সমাজের উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। আমি এও জেনেছিলাম যে, "আবুল হুসেনের জীবনে ছিল গগণস্পর্শী মনীষার অধিকারী হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা।" ঢাকার মুসলিম সাহিত্য-সমাজ, বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও আবুল হুসেনের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে আমার উচ্চ ধারণা ছিল এবং আছে। আমার মনে হতো এবং এখনও মনে হয় যে, এই ভূভাগের জনসমষ্টি যখনই দুঃসময় অতিক্রম করতে চাইবে—উন্নততর নতুন ভবিষ্যত সৃষ্টির অভিলাষে আন্তরিকভাবে বিবেক ও যুক্তি অবলম্বন করে এগুতে চাইবে তখনই অপরিহার্য নানা কিছুর সঙ্গে অবশ্যই

এসবেরও শরণ নেবে। আমি প্রবলভাবে অনুভব করেছিলাম, *আবুল হুসেন রচনাবলী* প্রকাশ করা কর্তব্য। এজন্যই নিজের অসামর্থ্যের উপলব্ধি নিয়েও আমি এই রচনাবলী সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণে এগিয়েছিলাম।

এই দায়িত্ব আমি গ্রহণ করতে চেয়েছিলাম বছর আটেক আগে। তখন আমার হাতে আবুল হুসেনের যে রচনাগুলো ছিল, পরে সেগুলোর সঙ্গে আর মাত্র দুটি কি তিনটি লেখা যোগ করতে পেরেছি। এরই মধ্যে এতটা সময় পার হয়ে গেল! আবুল হুসেন, তাঁর রচনাবলী, ঢাকার মুসলিম সাহিত্য-সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ইত্যাদি সম্পর্কে আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে যা কিছু আমি সঞ্চয় করেছিলাম, এই সময়ের মধ্যে তার অনেকাংশই মুছে গিয়েছে। আর বাস্তবে এরই মধ্যে দেখছি বাংলা ভাষার চিন্তা, বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষাও হয়ে পড়েছে ক্ষীয়মান, গুরুত্বহারা, নিষ্প্রভ ও দুর্বল। স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, জাতীয় সংস্কৃতির চেতনা, এবং জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদ—সেই সঙ্গে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র—ইত্যাদি সম্পর্কে সমাজের উচ্চ ও উচ্চমধ্য স্তরে দেখা দিয়েছে নিদারুণ অনীহা, ঔদাসীন্য ও হালছাড়া ভাব, আর সাধারণ মানুষও হয়ে পড়েছে নিস্তেজ। এসবের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে অধুনাপ্রচারিত বিশ্বায়নের চিন্তাধারা, কর্মসূচি ও কার্যক্রম। আত্মপরিচয়, আত্মশক্তি, স্বকীয়তা এবং নিজেদের গ্রহণসামর্থ্য ও প্রয়োজন বিবেচনা না করে অন্ধভাবে বহিরারোপিত বিশ্বায়নের কর্মসূচি ও কর্মনীতিতে আত্মহারা হওয়ার মহোৎসব লক্ষ্য করা যাচ্ছে অধিকাংশ গরিব দেশে। আর শিল্পোন্নত দেশগুলো নিরঙ্কুশ আধিপত্যবাদী, কর্তৃত্ববাদী কর্মনীতি ও কর্মসূচি নিয়ে এগুচ্ছে—সকল দেশের সরকার আজ একজোট, কিন্তু বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষ হয়ে পড়েছে অসহায়—অন্যদের উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্র!

আবুল হুসেনের কর্মকালের প্রকৃতি থেকে এখনকার কালের প্রকৃতি গুণগতভাবে ভিন্ন। উনিশ শতকের বাংলার নবচেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ আর বিশ শতকে তার ধারাবাহিকতা ও গণজাগরণ, বিশ শতকের সত্তরের দশক শেষ হতে না হতেই, অবসিত হয়েছে। এদেশে সাধনা ও সংগ্রাম নামক ব্যাপারগুলো এখন হয়ে পড়েছে নিতান্তই অতীতের ব্যাপার। পরিবর্তন-উন্মুখ জনগণ হয়ে পড়েছে পরিবর্তন-বিমুখ। বিশ্বব্যাপী জনজীবনে শীতের অস্বাস্থ্যকর উত্তুরে হাওয়া প্রবাহিত হতে আরম্ভ করার বছর দশেক আগেই বাংলাদেশে আরম্ভ হয়েছে এর প্রবাহ। চলমান প্রক্রিয়ায় বাংলা ভাষার জ্ঞানভাণ্ডার ও চিন্তা নিয়ে আশান্বিত হওয়ার কোনো কারণ আমি খুঁজে পাই না। তবে বর্তমান বাস্তবতায়ও এই প্রক্রিয়ার মৌলিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কল্যাণকর নতুন ভবিষ্যত সৃষ্টির সম্ভাবনা আমি অনুভব করি। পৃথিবীর দেশে দেশে প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারের শর্তাবলী তৈরি, মানুষের মানবিকীকরণ তথা মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ, আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখা, গ্রহিষ্ণুতা ও সহিষ্ণুতা ইত্যাদির অনুকূলে বিকাশশীল উন্নততর নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও নিবিড় আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সাধনা ও সংগ্রামের মধ্যেই সেই সম্ভাবনা খুঁজে পাই। নিরাশা এবং সম্ভাবনারূপ নতুন আশার এই সম্পূর্ণ ভিন্ন বাস্তবতার মধ্যে আজ প্রকাশিত হলো নতুনভাবে পরিকল্পিত *আবুল হুসেন রচনাবলীর* এই প্রথম খণ্ড।

দুই

আবুল হুসেনের সকল লেখা আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। তবে যেসব লেখা সংগ্রহ করতে পেরেছি, আবদুল কাদির সংগৃহীত পূর্বোক্ত লেখাগুলোর সঙ্গে এগুলো সংযোজিত হওয়ার ফলে আগের তুলনায় আবুল হুসেনের চিন্তাধারার অনেক বিস্তৃত ও গভীর পরিচয় লাভ এখন অবশ্যই সম্ভব হবে। দরকার কৌতূহল, সন্ধিৎসা, জিজ্ঞাসা, অন্বেষা ও কর্মতৎপরতা। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় বাংলা ভাষার উপযোগিতা আবার যদি গুরুত্ব লাভ করে এবং আমাদের আত্মশক্তিতে ও সম্ভাবনায় আবার যদি আমাদের আস্থা জাগে, তাহলে আবুল হুসেনের যেসব লেখা আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি, সেগুলোও হয়ত সংগৃহীত হবে। একের কাজ নয়, অনেকের চেষ্টা দরকার। কেবল আবুল হুসেনের রচনাবলীর প্রতি নয়, বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকদের সকলের রচনাবলীর প্রতিই পরিপূর্ণ মনোযোগ প্রদান দরকার। বাইরের জগত থেকে গ্রহণ করতে হবে স্বস্থ থেকে—নিজেদের সত্তাকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করার জন্য ; আত্মসত্তা বিসর্জন দিয়ে—নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে তা সম্ভব নয়। আমাদের আত্মসত্তার মর্মবস্তু অনেকটাই নিহিত আছে আমাদের ভাষার মহান লেখকদের রচনাবলীতে।

বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী *আবুল হুসেন রচনাবলী* দুই খণ্ডে সমাপ্ত হবে। এই দুই খণ্ডের জন্য আবদুল কাদির সম্পাদিত পূর্বোক্ত রচনাবলীর প্রায় সকল লেখাই ওই রচনাবলী থেকে গ্রহণ করেছি। ওই রচনাবলীর কয়েকটি লেখা তা থেকে না নিয়ে মূল উৎস থেকে নিয়েছি। ঘটনাক্রমে সেগুলো আমাদের হাতে এসেছে বলেই এটা করা সম্ভবপর হয়েছে।

বর্তমান খণ্ডে সংকলিত লেখাগুলোর উৎস সম্পর্কে কিছু অপরিহার্য তথ্য এখানে উল্লেখ করছি।

বাংলার বলশী প্রকাশিত হয় ২ আগস্ট ১৯২৫ (বাংলা ১৩৩২) সালে। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+৭১, ক্রাউন ১/৮ সাইজ। প্রকাশক : মুহম্মদ ফজলুল করিম মল্লিক, ৯৩ ফুলবাড়িয়া রোড, ঢাকা। মুদ্রাকর : আবুদর রাজ্জাক, ইসলামিয়া প্রেস, সাত রওজা, ঢাকা। মূল্য : আট আনা। আবদুল কাদির উল্লেখ করেছেন, গ্রন্থিত প্রবন্ধগুলো *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকায়* [বাংলার বলশী শ্রাবণ ১৩২৮ সংখ্যায় ; কৃষকের আর্তনাদ (চাষা ও জমি, জমি ও গরু, জমি ও সার, চাষার ঋণ ও কোঅপারেটিভ ক্রেডিট—এই চারটি উপশিরোনাম সমেত) মাঘ ১৩২৮ সংখ্যায় ; কৃষকের দুর্দশা (কল ও চরকা—এই একটি উপশিরোনাম সমেত) কার্তিক ১৩২৯ সংখ্যায় ; এবং কৃষিবিপ্লবের সূচনা কার্তিক ১৩২৮ সংখ্যায়] প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে গ্রন্থের পাঠ গ্রহণ করেছি। কৃষক সম্পর্কে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* প্রকাশিত অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা, *বঙ্গদর্শনে* প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা (*সাম্য* গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত) এবং *বাংলার বলশী* গ্রন্থের অনতিপরে প্রকাশিত প্রথম চৌধুরীর *রায়তের কথা* (১৯২৬) প্রভৃতির বক্তব্যের সঙ্গে তুলনা করে আবুল হুসেনের তরুণ বয়সের এই গ্রন্থের বক্তব্যের মূল্য বিচার করলে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বোঝা যাবে। প্রথম চৌধুরীর চিন্তা মূলত জমিদারদের সমস্যা নিয়ে, আর অন্য দুজনের চিন্তা মূলত জমিদারি ব্যবস্থার নির্মম শোষণ-পীড়ন ও নির্জিত কৃষকদের সমস্যা নিয়ে। আবুল হুসেনের চিন্তা সম্পূর্ণই কৃষকদের মুক্তি ও কৃষির উন্নতি নিয়ে।

বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা–সমস্যা প্রকাশিত হয় ২৯ ডিসেম্বর ১৯২৮ সালে। প্রকাশক : সৈয়দ ইমামুল হোসেন, মডার্ন লাইব্রেরি, ৭৪ নবাবপুর রোড, ঢাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+৬৮, ক্রাউন ১/৮ সাইজ। মূল্য : চার আনা। আধুনিক বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে বাঙালি মুসলমানের শিক্ষাসমস্যা নিয়ে এত বিস্তৃত, গভীর ও বাস্তবায়নমুখী চিন্তা এর আগে কোনো চিন্তক করেননি। আবদুল কাদির পূর্বোক্ত রচনাবলীর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন, আবুল হুসেন মুসলিম সাহিত্য–সমাজের ১৯২৭ সালের বার্ষিক সম্মেলনে এবং ১৯২৮ সালের এক সাধারণ অধিবেশনে 'বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা–সমস্যা' শিরোনামে দুটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন এবং এগুলোকে দুটি স্বতন্ত্র পুস্তিকারূপে প্রকাশ করেছিলেন। এই পুস্তিকা দুটি পাওয়া যায়নি। সম্ভবত আবদুল কাদিরও পুস্তিকা দুটি সংগ্রহ করতে পারেননি। মুসলিম সাহিত্য–সমাজের বার্ষিক মুখপত্র *শিখা* (প্রথম বর্ষ, ১৩৩৩) থেকে 'বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা–সমস্যা' শীর্ষক যে লেখাটি তিনি তাঁর সম্পাদিত রচনাবলীতে সংকলন করেছেন, সেটিকে মুসলিম সাহিত্য–সমাজের ১৯২৭ সালের বার্ষিক সম্মেলনে আবুল হুসেন কর্তৃক পঠিত বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। সৈয়দ ইমামুল হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থটির প্রথমাংশে এটি অন্তর্ভুক্ত আছে। (শুরু থেকে "আজ আমাদের সকল শুভ চেষ্টা আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে মুক্ত করতে নিয়োজিত হোক।" পর্যন্ত)। সৈয়দ ইমামুল হোসেন প্রকাশিত গ্রন্থে উক্ত প্রবন্ধ দুটিকে একটি প্রবন্ধে রূপ দেওয়া হয়েছে। আমরা এই গ্রন্থের পাঠ গ্রহণ করেছি। গ্রন্থে দেখা যায়, প্রথমোক্ত প্রবন্ধের শেষ দুটি অনুচ্ছেদে সামান্য পরিবর্তন আছে। তবে এই পরিবর্তন মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মুসলিম কালচার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ৩১ ডিসেম্বর ১৯২৮ সালে। প্রকাশক : সৈয়দ ইমামুল হোসেন, মডার্ন লাইব্রেরি, ৭৪ নবাবপুর রোড, ঢাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+৮৫, ক্রাউন ১/৮ সাইজ। মূল্য : দশ আনা। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রখ্যাত ইংরেজ–মুসলমান মুহম্মদ মার্মাডিউক পিক্‌থল্‌ প্রদত্ত আটটি বক্তৃতার নির্বাচিত অংশের ভাবানুবাদ এই গ্রন্থ। বক্তৃতাগুলো হায়দ্রাবাদের *Islamic Culture* নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় Islamic Culture শিরোনামে ছাপা হয়েছিল। মাসিক *সওগাত* পত্রিকায় ১৩৩৪ সালের পর পর সাতটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে 'মুসলিম কালচার' শিরোনামে আবুল হুসেন অনূদিত লেখাটি প্রকাশিত হয়। পরে সেগুলো নিয়ে প্রকাশিত হয় *মুসলিম কালচার*। এই গ্রন্থ সম্পর্কে নানা সূত্র থেকে এ তথ্যগুলো পাওয়া গিয়েছে ; কিন্তু গ্রন্থটি পাওয়া যায়নি। বর্তমান গ্রন্থে *মুসলিম কালচার* সংগৃহীত হয়েছে *সওগাত* থেকে। এতে মুদ্রিত লেখার সঙ্গে *সওগাত*–এর সংখ্যাগুলো নির্দেশিত আছে।

'নারীর অধিকার' শীর্ষক প্রবন্ধটি সংগ্রহ করেছি চট্টগ্রামের মাসিক *সাধনা* (ভাদ্র ১৩২৮) থেকে। সাধনার পরবর্তী সংখ্যাগুলো পাওয়া যায়নি বলে প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করা যায়নি। জানা যায়, পরে আরও দুটি সংখ্যায় (আশ্বিন ১৩২৮, পৌষ ১৩২৮) ধারাবাহিকভাবে এর অবশিষ্টাংশ প্রকাশিত হয়। যদি কেউ অনুগ্রহপূর্বক এই প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশের সন্ধান দিতে পারেন তবে রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা তা সংযোজন করব। আশা করি, দ্বিতীয় খণ্ড আগামী অর্থ–ব্যসরের মধ্যে প্রকাশিত হবে।

The Gandhi-Irwin Truce and the Muslims এবং Saracenic Commerce and Industry শীর্ষক দুটো লেখার উৎস সম্পর্কিত তথ্য এ গ্রন্থে মুদ্রিত লেখা দুটোর সঙ্গে দেওয়া আছে।

The Problem of Rivers in Bengal গ্রন্থটিতে লেখকের নামের সঙ্গে লেখকের পরিচয়ও যুক্ত আছে : Abul Hussain, M.A., B.L., Lecturer in Economics Politics and Commerce, University of Dacca. গ্রন্থটির প্রকাশক : The Author, 86 Agamasih Lane, Ramna, Dacca, [All rights reserved]. প্রাপ্তিস্থান : The Islamia Library, 22 Patuatooly, Dacca. মুদ্রাকর : Abdur Razzak, Islamia Press, Satrauza, Dacca. পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৬+১১২, ক্রাউন ১/৮ সাইজ। মূল্য : এক টাকা। গ্রন্থটিতে প্রকাশের তারিখ উল্লেখ নেই। Preface-এ উল্লেখ আছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদের ১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পঠিত প্রবন্ধের সম্প্রসারিত রূপ এই গ্রন্থ। গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্টরূপে সংযোজিত দুটি লেখার সঙ্গে, লেখা-দুটির পত্রিকায় প্রকাশের দুটি তারিখ মুদ্রিত আছে : নভেম্বর ১২, ১৯২৪, এবং জানুয়ারি ৩, ১৯২৫। এগুলো থেকে ধারণা করা যায়, গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯২৫ সালের তেসরা জানুয়ারির অনতিপরে হবে। লেখা প্রকাশে আবুল হুসেনের যে দ্রুততা লক্ষ্য করা যায় তাতে ধারণা করা যায়, গ্রন্থটি ১৯২৫ সালেই জানুয়ারি কি ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলাদেশে নদী, বন্যা ও পানিসম্পদ নিয়ে চিন্তা, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের অন্ত নেই। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা ও সম্ভাবনার প্রকৃতিও বদলেছে। এ বিষয়ে আবুল হুসেনের চিন্তার উপযোগিতা ও মূল্য বিচার করা প্রয়োজন।

এ-গ্রন্থের অবশিষ্ট লেখাগুলো আবদুল কাদির সম্পাদিত পূর্বোক্ত রচনাবলী থেকে গ্রহণ করেছি। তাতে প্রতিটি লেখার শেষে উৎসের উল্লেখ আছে। সেই উৎসই এ গ্রন্থে গৃহীত প্রতিটি প্রবন্ধের শেষে উল্লেখ করেছি।

আবদুল কাদির সম্পাদিত *আবুল হুসেন রচনাবলী*র (প্রথম খণ্ড) প্রথম প্রকাশ ১৫ অক্টোবর ১৯৬৮। প্রকাশক : সিতারা ওয়ালিদ হোসেন, ৭৪৬ সাত মসজিদ রোড, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা। পরিবেশক : নওরোজ কিতাবিস্তান, ৪৬ বাংলাবাজার, ঢাকা। মুদ্রাকর : তাজুল ইসলাম, বর্ণমিছিল, ৪২/এ কাজী আবদুর রউফ রোড, ঢাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৪+৪২৮, ডিমাই ১/৮ সাইজ। মূল্য : বারো টাকা। এই গ্রন্থ (প্রথম প্রকাশ) থেকেই বর্তমান পরিকল্পনার প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য আবুল হুসেনের লেখাগুলো গ্রহণ করেছি। এর ভূমিকায় আবদুল কাদির উল্লেখ করেছেন :

> আবুল হুসেনের মৃত্যুর পর তাঁর মুদ্রিত লেখাগুলোর কাটিং এবং অপ্রকাশিত লেখাগুলোর পাণ্ডুলিপি একত্র করে ঢাকায় অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের হাতে দেওয়া হয় ; কিন্তু স্বজনেরা সমাজের গোঁড়াদের ভয়ে সেগুলি গ্রন্থবদ্ধ করতে ইতস্তত করেন। পরে সেই লেখাগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতায়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে কলকাতায় অকস্মাৎ আবার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দেখা দিলে দুর্বৃত্তেরা ১৫ শ্যামাচরণ স্ট্রীটে অবস্থিত মডার্ন লাইব্রেরির কক্ষেও অগ্নিসংযোগ করে ; সেই সর্বনাশা আগুনে আবুল হুসেনের লেখাগুলির মহামূল্য বাণ্ডিলটিও ভস্মসাৎ হয়ে যায়।
>
> সেই দুর্ঘটনার পর আবুল হুসেনের রচনাবলী লোকসমাজে প্রচারের আশা তাঁর সহকর্মী বন্ধু এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরা প্রায় পরিত্যাগ করেন। কিন্তু গত বৎসর তাঁর পুত্র এবং আমার অনুজপ্রতিম ওয়ালিদ হোসেন

নাছোড়বান্দা হয়ে এব্যাপারে আমার সহায়তা কামনা করে। তারই অর্থানুকূল্যে 'আবুল হুসেন রচনাবলী'-র এই খণ্ড আত্মপ্রকাশ করল। আমি আমার সাধ্যানুসারে সন্ধান করে তাঁর যতগুলি লেখা সংগ্রহ করতে পেরেছি তা এখানে সংগ্রথিত হয়েছে।

এতে কোনো ইংরেজি লেখা সংকলিত হয়নি। নামপত্রে গ্রন্থের নামের নিচে উল্লেখ করা হয়েছে : "মরহুম আবুল হুসেন এম.এ., এম.এল. সাহেবের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী"। গ্রন্থটির দ্বিতীয় প্রকাশে ভেতরের সব কিছু অপরিবর্তিত রাখা হলেও নামপত্রের এ কথাগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটির শেষে পঞ্চাশ পৃষ্ঠাব্যাপী পরিশিষ্টে আবুল হুসেন, মুসলিম সাহিত্য-সমাজ, বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও আনুষঙ্গিক কিছু বিষয়ে আবদুল কাদিরের পূর্বপ্রকাশিত কয়েকটি লেখা এবং মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন ও আবুল ফজলের একটি করে পূর্বপ্রকাশিত লেখা সংযোজন করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকাশে এই পরিশিষ্ট অপরিবর্তিত রাখা হয়। গ্রন্থটিতে দ্বিতীয় খণ্ডের সম্ভাব্য রচনাবলীর দুই পৃষ্ঠাব্যাপী একটি তালিকা দেওয়া ছিল। দ্বিতীয় প্রকাশে তা বাদ দেওয়া হয়। আবুল হুসেনের লেখার দুষ্প্রাপ্যতা এবং লেখা সংগ্রহের সমস্যা সম্পর্কে অনেক কথা ভূমিকায় আবদুল কাদির উল্লেখ করেছেন।

কবি আবদুল কাদির, ওয়ালিদ হোসেন, বর্ণমিছিলের তাজুল ইসলাম ও নওরোজ কিতাবিস্তানের আবুদল কাদিরের আলোচনা-বৈঠকে ঘটনাক্রমে উপস্থিত হয়ে আমি জেনেছিলাম যে, প্রকাশের পর সাত বছর পার হলেও গ্রন্থটির নগণ্যসংখ্যক কপিই বিক্রি হয়েছিল। মুদ্রিত সাড়ে বারোশো কপির মধ্যে এক হাজার কপিই অবাঁধাই অবস্থায় বাঁধাইকারের গুদামে ছিল। সে অবস্থায়, ওয়ালিদ হোসেনের আগ্রহে তাজুল ইসলাম গুদামজাত অবাঁধাই কপিগুলো স্বল্প মূল্যে কিনে নেন। তারপর এতে কেবল নামপত্র বাতিল করে নতুন নামপত্র দেওয়া হয়। নতুন নামপত্রের উল্টোপিঠে প্রথম প্রকাশ ...-এর স্থলে লেখা হয়—দ্বিতীয় প্রকাশ : জুন ১৯৭৬ ; প্রকাশক : তাজুল ইসলাম, বর্ণমিছিল, ৬৫ প্যারীদাস রোড, ঢাকা। মুদ্রাকরের স্থলে আগের নাম ঠিকানাই বহাল থাকে ; মূল্য : বারো টাকার স্থলে পঁচিশ টাকা করা হয়। প্রথম প্রকাশে কাপড়ের নিরাভরণ বোর্ড বাঁধাই ছিল। সে স্থলে কাগজে কাইয়ুম চৌধুরী অঙ্কিত গাঢ় নীল রঙের অনাকর্ষণীয় প্রচ্ছদ দিয়ে বোর্ড বাঁধাই করা হয় এবং জ্যাকেট দেওয়া হয়। বলাই বাহুল্য, গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ও দ্বিতীয় প্রকাশ আসলে একবারের মুদ্রণে সম্পন্ন একই প্রকাশ, কেবল নামপত্র ভিন্ন। বইয়ের জ্ঞানমূল্য কিংবা শিল্পমূল্য আর পণ্যমূল্য কখনও সমানুপাতিক হয় না!

শিখা প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত আবদুল কাদির সম্পাদিত পূর্বোক্ত *আবুল হুসেন রচনাবলীর* (প্রথম শিখা সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০১) আর একটি প্রকাশের সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত দ্বিতীয় প্রকাশের হুবহু পুনর্মুদ্রণ এটা। তবে এতে 'প্রথম খণ্ড' কথাটিও বাদ দেওয়া হয়। নতুন কোনো ভূমিকা বা প্রকাশকের মন্তব্যও এতে দেওয়া হয়নি। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৪০৪, ডিমাই ১/৮ সাইজ, মূল্য : চারশো টাকা। 'প্রথম শিখা সংস্করণ' মোটামুটি দৃষ্টিশোভন হলেও মুদ্রণত্রুটির জন্য পীড়াদায়ক। মুদ্রণত্রুটির কারণে অনেক বই ব্যর্থ হয়ে যায়।

আবুল হুসেন : নির্বাচিত প্রবন্ধ নামে মোরশেদ শফিউল হাসানের সম্পাদনায় আরও একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এটির প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭-য়ে। প্রকাশক : মওলা ব্রাদার্স,

৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৮৭, ডিমাই ১/৮ সাইজ। মূল্য : একশো বিশ টাকা। এতে সংকলিত হয়েছে আবদুল কাদির সম্পাদিত পূর্বোক্ত *আবুল হুসেন রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড) থেকে নির্বাচিত উনিশটি প্রবন্ধ। এতে 'প্রবেশক' শিরোনামে সম্পাদকের লিখিত ভূমিকাটি তথ্যপূর্ণ ও সুলিখিত। এ থেকে ঢাকার মুসলিম সাহিত্য-সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন এবং বিশেষ করে আবুল হুসেনের জীবন, চিন্তাধারা ও কর্ম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় জানা যায়। পরিশিষ্টে সংযোজন করা হয়েছে আবদুল কাদির রচিত 'শাস্ত্রবাহকের হুমকি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ, এবং আবুল হুসেনের 'জীবনতথ্য' ও 'রচনাপঞ্জি'। 'শাস্ত্রবাহকের হুমকি'ও আবদুল কাদির সম্পাদিত পূর্বোক্ত রচনাবলীর পরিশিষ্ট থেকে নেওয়া হয়েছে।

তিন

পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমান খণ্ডে আরও কয়েকটি ইংরেজি লেখা দিতে চেয়েছিলাম। যেমন Muhammad Shahidullah সম্পাদিত *Peace* পত্রিকা থেকে Political Ideal of Islam, The Library of Alhamra, The Growth of the Helots of Bengal, The Religion of the Helots of Bengal ইত্যাদি। কিন্তু এসবের কোনো পাঠযোগ্য কপি না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত এগুলো দেওয়া সম্ভব হলো না।

বিভিন্ন সূত্র থেকে আবুল হুসেনের যেসব লেখার নাম পাচ্ছি কিন্তু যেগুলো সংগ্রহ করতে পারিনি সেগুলো হলো :

ক. প্রবন্ধ : পাথেয় সিরিজ : ১. ধর্মশাস্ত্র পাঠ, ২. পূর্বদর্শিতা, ৩. অনন্ত বাসনা, ৪. বৃথা আশা ও গর্ব, ৫. আত্মগরিমা, ৬. অতি-পরিচয়, ৭. বাজে কথা বর্জন, ৮. শান্তি, ৯. দুঃখ, ১০. প্রলোভন, ১১. দ্রুতবিচার, ১২. বদান্যতা, ১৩. নীরব নিস্তব্ধতা, ১৪. পরদোষ উপেক্ষা, ১৫. অবসরপ্রাপ্ত জীবন, ১৬. ভক্ত পুরুষগণের আদর্শ, ১৭. ধার্মিকের আদর্শ।

খ. পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ : ১. শতকরা পঁয়তাল্লিশ (*সাপ্তাহিক মোহাম্মদী*), ২. 'শতকরা পঁয়তাল্লিশে'র জের (*অভিযান*, আশ্বিন ১৩৩৩), ৩. সুদ বা 'রেবা' ও ধনজ (জাগরণ, শ্রাবণ ১৩৩৫), ৪. জাতীয় কল্যাণে মাতৃভাষা, ৫. শিক্ষার মাপকাঠি, ৬. ইসলামের দাবী, ৭. তরুণের তপস্যা (*তরুণপত্র*, বৈশাখ ১৩৩২), ৮. তরুণ আনসার, ৯. আইনজ্ঞ আমীর আলী (বার্ষিক *প্রতিকা*, ১৩৩৮), ১০. সবজান্তা (*জাগরণ*, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫), ১১. কৈফিয়ৎ (*জাগরণ*, শ্রাবণ ১৩৩৫), ১২. ইসলাম-সার (আমীর আলীর The Spirit of Islam গ্রন্থের অংশ বিশেষের অনুবাদ), ১৩. সারথীর পাঁজী (সম্পাদকীয়, আবুল হুসেন লিখিত, *জাগরণ*, ভাদ্র ১৩৩৩), ১৪. বাঙ্গালী মুসলমানের ভবিষ্যৎ (*জাগরণ*, জৈষ্ঠ্য ১৩৫৫), ১৫. আইনজ্ঞ আমীর আলী, ১৬. মহাত্মা আমীর আলী মরহুম, (*জাগরণ*, কার্তিক ১৩৩৫), বাংলার নদী-সমস্যা।

গ. পুস্তিকা : ১. খোঁয়াড় ও খেয়ার আইন (প্রকাশক : আবদুল করিম, ৩০ রোকনপুর, ঢাকা। প্রথম সংস্করণ : ১ মে ১৯৩২, বাংলা ১৩৩৯। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৪৪, মূল্য : ছয় আনা। ২. মনুষ্যত্ব (নীতি ও চরিত্র বিষয়ক আলোচনা), পৃ. ১২, মূল্য : এক আনা।

ঘ. ছোটগল্প : ১. সফল শ্রম, ২. ঝগড়াটে ঝণ্টুর মা, ৩. নাদ্‌বৌ, ৪. পেটের দায়।

ঙ. নাটক : মিলন মঙ্গল (পঞ্চাঙ্ক নাটক)

চ. ইংরেজি রচনা : 1. The Blunder of 1793 (*Peace*, March 1926), 2. Saracenic Historiography, 3. Hindu-Moslem Problem (*অমৃত বাজার পত্রিকা*, ১৯২৭), 4. Salient Features of Bengal Tenancy Amendment Bill—1925, 5. *The Helots of Bengal* (গ্রন্থ, ঢাকা ১৯২৬), ৬. *The Musalman* এবং *The Muslim Standard* পত্রিকায় প্রকাশিত ইবনে মুসা ছদ্মনামে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে লিখিত রচনাসমূহ।

ছ. পাঠ্যপুস্তক : ১. সুকোমল পাঠ (১ম-৪র্থ ভাগ), ২. নব সাহিত্য-শিক্ষা (১ম-৪র্থ ভাগ), ৩. মুসলিম সাহিত্য-শিক্ষা (১ম-৪র্থ ভাগ), ৪. বাংলা রচনা ও অনুবাদ শিক্ষা, ৫. সরল নিম্ন গণিত (১ম ও ২য় ভাগ), ৬. সরল স্বাস্থ্য-শিক্ষা, ৭. ভৌগোলিক পাঠ, ৮. Translation.

আবুল হুসেনের অগ্রন্থিত লেখার তালিকা প্রণয়ন দুরূহ কাজ। এইসব লেখার এবং এগুলোর বাইরে আরও লেখা থাকলে সেগুলোর সন্ধান কেউ দিলে দেশবাসীর পক্ষ থেকে সেগুলো আমরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এই রচনাবলীর পরবর্তী খণ্ডের জন্য সংগ্রহ গ্রহণ করব।

চার

আবুল হুসেনের জন্ম ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি (বাংলা ১৩০৩ সালের ২৩ পৌষ) বুধবার যশোর জেলায় পানিসারা গ্রামে মাতুলালয়ে। তাঁর পিত্রালয় যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার কাউরিয়া গ্রামে। তাঁর পিতা মুহম্মদ মুসা তাঁর এলাকায় খ্যাতিমান আলেম ছিলেন। তাঁর প্রণীত 'নামাজ শিক্ষা' পুস্তকটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। আবুল হুসেনের মায়ের নাম আসিরুন নেসা খাতুন। আবুল হুসেনের পিতামহ মুহম্মদ হাশিম ছিলেন একজন বিবেকবান, যুক্তিপরায়ণ, জ্ঞানানুরাগী, কুসংস্কারবিরোধী যশস্বী পুরুষ। পিতামহের সমাজসংস্কার-প্রবণতা এবং পিতা ও পিতামহের জ্ঞানানুরাগ ও চরিত্রবল আবুল হুসেনের জীবনে প্রবলতর হয়েছিল।

আবুল হুসেন কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি প্রথমে ঝিকরগাছা এম. ই. স্কুলে ও পরে যশোর জিলা স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন, এবং শেষোক্ত স্কুল থেকে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে সরকারি বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং উক্ত কলেজ থেকে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে আই. এ. এবং ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বি.এ. পাশ করেন। উভয় পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম বিভাগ ও সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম. এ. পাশ করেন। স্কুলে, কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি রচনা-প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার লাভ করেছেন। কলকাতায় অধ্যয়নকালে তিনি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে সভা-সমিতিতে পাঠ করেছেন এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন।

যশোর জিলা স্কুলে আবুল হুসেনের প্রিয় শিক্ষক ছিলেন কাজী আনোয়ারুল কাদীর। কাজী আনোয়ারুল কাদীর ছিলেন সন্ধিৎসু, বিচারপ্রবণ ও সৃষ্টিশীল মনের অধিকারী,

প্রভাবশালী শিক্ষক। সমাজসংস্কার বিষয়ক চিন্তামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। তাঁর রচিত *আমাদের দুঃখ* গ্রন্থটিতে তৎকালীন বাঙালি মুসলমান সমাজের কয়েকটি গুরুতর সমস্যা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। কাজী আনোয়ারুল কাদীরের চিন্তা ও সমাজসংস্কার-প্রবণতা আবুল হুসেনের চিন্তাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করেছিল। পরবর্তীকালে ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে কাজী আনোয়ারুল কাদীর আবুল হুসেনের সহযাত্রী ও সহকর্মী ছিলেন।

এম. এ. পরীক্ষা দিয়েই আবুল হুসেন কলকাতার হেয়ার স্কুলে সহকারী শিক্ষকের পদে যোগদান করেন। মাসিক বেতন ৫০ টাকা। গোটা সংসারের দায়িত্ব তখনই তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। তখন সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য তাঁকে কয়েকটি টিউশনি করতে হয়েছে। ব্যবহারজীবীর স্বাধীন পেশা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি ল' কলেজে ভর্তি হয়ে আইন অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে সাতক্ষিরার সুলতানপুর নিবাসী শেখ বশিরউদ্দিনের কন্যা মোসাম্মাৎ মৌলুদা খাতুনের সঙ্গে আবুল হুসেনের বিয়ে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরেই তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগে সহকারী লেকচারার পদে যোগদান করেন। মাসিক বেতন ১২৫ টাকা। এই বিভাগে তিনি ছয় বছর অধ্যাপনা করেন। লেকচারার পদে উন্নীত হওয়ার পর তাঁর বেতন বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭৫ টাকায় পৌঁছেছিল। তখন তিনি মুসলিম হলের (বর্তমান সলিমুল্লাহ হল) হাউজ টিউটরের দায়িত্বও পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত থাকাকালে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি বি.এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

আবুল হুসেনের লেখা 'শতকরা পঁয়তাল্লিশ' শীর্ষক প্রবন্ধ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলে সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত কবি গোলাম মোস্তফার বক্তব্যের সবিনয় প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার চাকুরি ত্যাগ করে ঢাকা জজকোর্টে আইন ব্যবসায়ের অনিশ্চিত পেশায় যোগদান করেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় বারের চেষ্টায় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এল. (মাস্টার অব ল') ডিগ্রী লাভ করেন। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা হাইকোর্ট বারে যোগদান করেন। হাইকোর্ট বারে যোগদান করার পর তিনি কঠোর পরিশ্রম করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য The History of Development of Muslim Law in British India বিষয়ে Tagore Law Lecture প্রণয়ন করেছিলেন।

আবুল হুসেনের ঢাকা ত্যাগের পর *শিখার* প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় এবং মুসলিম সাহিত্য-সমাজের কর্মধারা নিষ্প্রভ হয়ে পড়তে থাকে। আরও আগেই আবুল হুসেন মুসলিম সাহিত্য-সমাজের সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেছিলেন। কবি আবদুল কাদির উল্লেখ করেছেন : "তখনও আবুল হুসেনেরই তত্ত্বাবধানে ও অর্থানুকূল্যে 'শিখা' প্রকাশিত হয়।" তিনি আরও উল্লেখ করেছেন : "সাহিত্য-সমাজে প্রথম থেকেই নরমপন্থী লেখকরাও স্থান পেয়েছিলেন। ... আবুল হুসেনের কর্ণধারত্ব ত্যাগের পর সাহিত্য-সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রে প্রধানত গ্রহণ করে নরমপন্থা ... ।"

কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে আবুল হুসেন জীবনযাপন করেছেন। বিরাট সংসারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ', 'আল মামুন ক্লাব', অ্যান্টি-পর্দা লীগ প্রভৃতি সংগঠনের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন—বিভিন্ন কর্মসূচিতে নিয়মিত অর্থসংস্থানও করেছেন। মাসিক 'তরুণপত্র', মাসিক 'অভিযান', মাসিক

'জাগরণ', বার্ষিক 'শিখা' প্রভৃতি পত্রিকার অর্থসংস্থান, সম্পাদনা, ও মুদ্রণ ইত্যাদি নানাবিধ কাজে তিনি যুক্ত থেকেছেন, এবং আগ্রহের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। মুসলিম সাহিত্য-সমাজ ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মূল সংগঠক ছিলেন তিনি। এই ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি লেখায় নিবিষ্ট থেকেছেন। স্কুলের অনেকগুলো পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেছেন। এইসব কাজে যে শ্রম তিনি দিয়েছেন, তা সকলকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছে। মনে হয়, মোমবাতি দুদিক দিয়ে জ্বালানোর মতো করে তিনি তাঁর জীবনীশক্তি ব্যয় করেছেন। ক্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে থাকে।

তিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ হন। অনেক চিকিৎসার পর তাঁর পাকস্থলীর অন্ত্রে দুরারোগ্য ক্যান্সার ধরা পড়ে। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর শনিবার সকাল সাড়ে সাতটায় মাত্র ৪১ বৎসর ৯ মাস বয়সে তিনি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। ওইদিন কলকাতা পার্ক সার্কাস ময়দানে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা থেকে ট্রেনে তাঁর লাশ এনে রাত আড়াইটায় যশোর জেলার পানিসারা গ্রামে তাঁর পিতার কবরের পাশে কবর দেওয়া হয়।

ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে, সেই সঙ্গে আবুল হুসেন সম্পর্কে, ১৯২০-এর দশক থেকে আজ পর্যন্ত অনেক লেখা হয়েছে, এবং নিঃসংশয়ে আশা করা যায়, ভবিষ্যতেও অনেক লেখা হবে। এই সময়ের মধ্যে অনেক ভাবুক ও কর্মী অনুপ্রাণিত হয়েছেন আবুল হুসেন ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের চিন্তা ও কর্মের দ্বারা। অপরদিকে, রক্ষণশীলেরা আজও বিরূপ মনোভাবের পরিচয় দেন তাঁদের চিন্তা ও কর্মের মুখোমুখী হয়ে। বহু গবেষক ও ভাবুক দুষ্প্রাপ্য তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাঁদের সম্পর্কে,—নানাভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মূল্যবিচার করেছেন তাঁদের চিন্তা ও কর্মের। তবু আরও অনুসন্ধান ও চিন্তার প্রয়োজন থেকে যায়, এবং নতুন অনুসন্ধান ও নতুন করে চিন্তা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ অবস্থায়, সংক্ষিপ্ত পরিসরে আবুল হুসেনের চিন্তা ও কর্মের পরিচয় তুলে ধরা সম্ভবপর নয়।

আবুল হুসেনের 'শতকরা পঁয়তাল্লিশ', 'নিষেধের বিড়ম্বনা', 'আদেশের নিগ্রহ' প্রভৃতি লেখা নিয়ে তুমুল বিতর্ক ও বাদ-প্রতিবাদ হয়েছে,—শেষোক্ত লেখা দুটোর জন্য দুইবার ঢাকার নবাবদের কর্তৃত্বাধীন তৎকালীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় তাঁর বিচার হয়েছে। নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছেন তিনি এবং তাঁর সহযোগী সাধক ও কর্মীরা। এইসব ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজ এগিয়েছে। বর্তমানে আবার উল্টো হাওয়ার প্রবাহ চলছে। এ অবস্থায় এগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। বিস্তৃত পরিসরে স্বতন্ত্র আলোচনার সুযোগ অবারিত আছে এবং সে ধরনের আলোচনাই কাম্য।

পাঁচ

দুই খণ্ডে পরিকল্পিত এই রচনাবলীর জন্য *বাংলার বলশী*, *বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা*, *The Gandhi-Irwin Truce and the Muslims*, *The Problem of Rivers in Bengal*, *The History of Development of Muslim Law in British India* শীর্ষক গ্রন্থগুলো এবং Saracenic Commerce and Industry ও আরও কোনো কোনো লেখা কলকাতার কোনো কোনো গ্রন্থাগার ও কারও কারও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ফটোকপি করে

এনে দিয়েছেন ডক্টর ইসরাইল খান। আবুল হুসেনের দুষ্প্রাপ্য লেখার প্রতি আমার অনুরাগ দেখে আমার জন্য এই দুরূহ কাজ তিনি করেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর ভূঁইয়া ইকবাল, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরী এবং সরকারি কলেজে অধ্যাপনারত জনাব মোরশেদ শফিউল হাসান পুরাতন সাময়িকপত্র থেকে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য লেখা আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। লেখা সংগ্রহের কাজে আরও যাঁদের পরামর্শ ও চেষ্টা দ্বারা আমি উপকৃত হয়েছি তাঁরা হলেন, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনারত জনাব গোলাম মোস্তফা। পাণ্ডুলিপি তৈরিতে আমাকে সাহায্য করেছেন বাংলাদেশ কম্পিউটর কাউন্সিলের সচিব সৈয়দ জিয়াউল হক।

বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক মনসুর মুসার সহায়তা ও আগ্রহ এই রচনাবলী প্রকাশে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা অতিক্রম করে পাণ্ডুলিপি প্রেসে পাঠানো এবং মুদ্রণ তত্ত্বাবধানের দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করেছেন বাংলা একাডেমীর সংকলন উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব নূরুল ইসলাম।

পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের কাজে ডক্টর ইসরাইল খান এবং মুদ্রণ ও প্রকাশের কাজে জনাব নূরুল ইসলামের ভূমিকা ছাড়া আমার পক্ষে কস্মিনকালেও এই রচনাবলী প্রকাশ করা সম্ভবপর হত না। এতে আমার ভূমিকার চেয়ে এই দুজনের ভূমিকা বড়। এঁরা দুজনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ছাত্র ছিলেন। *আবুল হুসেন রচনাবলী*-সূত্রে 'আজকের দিনেও' তাঁদের গভীর জ্ঞানানুরাগ, দেশপ্রেম ও কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

এই রচনাবলী সম্পাদনায় যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু ঘটে থাকে তাহলে আমার অসামর্থ্যের কারণেই তা ঘটেছে। আধুনিক যুগের কালজয়ী লেখকদের রচনাবলী সম্পাদনার সমস্যা সম্পর্কে কোনো আলোচনা এদেশে নেই। রচনাবলীর প্রকাশকে সার্থক করে তুলতে হলে এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ও আলোচনা-সমালোচনা দরকার।

আমাদের জাতীয় জীবনে আবুল হুসেনের চিন্তাধারা ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রভাব আরও কার্যকর, আরও শুভকর হোক—এইটুকুই আকিঞ্চন। বাংলাদেশ ও বাঙালির জয় হোক।

আবুল কাসেম ফজলুল হক

সূ চি প ত্র

সস্ত্রীক আবুল হুসেন

জন্ম : ৬ই জানুয়ারি ১৮৯৭ ❑ মৃত্যু : ১৫ই অক্টোবর ১৯৩৮

বাংলার বলশী

সূচিপত্র

গ্রন্থাভাষ

এ কথা যথার্থ যে বাংলার উন্নতি সম্পর্কে নানা আলোচনা-সমালোচনা, আলাপ-আন্দোলন ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সর্বত্রই এক অভূতপূর্ব জাতীয় চেতনার সূচনা করিতেছে। রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক আন্দোলনেই বিশেষ ব্যগ্রতা নেতৃবর্গ ও শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে। দুর্ভিক্ষের পীড়া নিবারণে, ম্যালেরিয়া কালাজ্বরের প্রতিকার-কল্পে, শিশু মঙ্গলের অনুষ্ঠান-উদ্যোগে, মাদকতা দূরীকরণের প্রচেষ্টায়, নারী-নিগ্রহের বিলোপ সাধনে, স্বরাজ প্রতিষ্ঠার বিরাট ব্যাপারে অনেকে লিপ্ত, চিন্তিত, কর্মে তৎপর। কিন্তু দেশের যাহারা প্রাণ, যাহাদের শিক্ষাদীক্ষা ও দুরবস্থার প্রতিকার অভাবেই দেশে নানা প্রকারের দুর্দশা সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে তাহাদের সম্বন্ধে কেহই কোন কথা বলিতেছে না।

একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিন্তাশীল কৃতী অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় মৌলবী আবুল হুসেন সাহেব তাঁহার ছাত্রাবস্থায় লিখিত ও 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত কয়েকটা প্রবন্ধ আমাকে পাঠের জন্য প্রদান করেন। আমি প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছি এবং এগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের প্রয়োজন বোধ করিয়াছি। মৌলবী সাহেবের বিবেচনায় ছাত্রাবস্থায় লিখিত প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের অযোগ্য হইলেও আমি তাহা প্রায় এক প্রকার কাড়িয়া লইয়া 'বাংলার বলশী' নাম দিয়া এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম।

আমার বিবেচনায় লেখকের ভাষা ও লিপিকৌশলের (style) পরিবর্তন অপ্রয়োজন, বরং যথাযথ ভাবেই রাখা সঙ্গত। এ জন্য, লেখকের ভাষায় ও প্রকাশধারায় বর্তমানে পরিবর্তন ঘটিলেও আমি পূর্ববৎ রাখিয়া দিলাম। আমার গভীর ও দৃঢ় বিশ্বাস যাহারা 'বাংলার বলশী' পাঠ করিবেন তাঁহারাই আমার মত আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন ; বিশেষত যাঁহারা দেশ ও জাতির সেবা-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন ও করিতে বাসনা রাখেন অথবা দেশের প্রকৃত অবস্থা চিন্তা করিতে আগ্রহ করেন তাঁহারা ইহা পাঠে নিশ্চয়ই 'পথ' খুঁজিয়া পাইবেন—যে পথে দেশহিত সাধনার তপস্যা সার্থক হয়।

পল্লীসংস্কার, পল্লীগঠন, গ্রামহিতসাধন ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেকে চিন্তা করেন, এবং অনুষ্ঠানিক ব্যাপারেও অনেকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে লিপ্ত বা সংশ্লিষ্ট। আমি তাঁহাদের সর্বাগ্রে 'বাংলার বলশী' পাঠের অনুরোধ করিতেছি।

কৃষক ও কৃষির যাবতীয় সমস্যা, সমবায় মণ্ডলীর ও যৌথ ঋণদান সমিতির বিশদ আলোচনা এই পুস্তকে বিবৃত করা হইয়াছে। আশা করি ইহাতে চিন্তাশীলের চিন্তা পুষ্ট ও নিশ্চিন্তের চিন্তার অভ্যাস নিয়মিত ও উন্নত প্রণালীতে শৃঙ্খলিত এবং ব্যাপক হইবে।

ন্যায়ধর্মের মধ্যে গলদ নাই এবং ন্যায়ধর্ম রক্ষায় সচেষ্ট হইলে সকলেই সক্ষম হইতে পারেন এবং ন্যায়ধর্মের ভিত্তির উপরই জাতির প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও শক্তি সম্পন্ন হয়—এই সত্যকে লেখক অন্তরের সহিত যেভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং দেশের উন্নতিকল্পে যেভাবে চিন্তা করিয়াছেন তাহা এই প্রবন্ধগুলির প্রতি ছত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। 'বাংলার বলশী' আসন্নপ্রায় কৃষি-বিপ্লবের সূচনার প্রারম্ভেই সাবধানতার অগ্রদূত রূপে প্রকাশিত হইল। 'বলশী' শব্দটী বলশেভিক শব্দের অপভ্রংশ।

আমরা বিশেষ ভাবে বাংলার জমিদার-বর্গকে 'বাংলার বলশী' পাঠে সবিনয় নিবেদন করিতেছি। বিভিন্ন কর্মের ও বিভিন্ন কর্ম সাধনার স্বেচ্ছাসেবকগণও এই পুস্তক পাঠে পরম উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই।

পরিশেষে নিবেদন, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার আগ্রহ দেখিলে আমাদের শ্রম ও ব্যয় সার্থক হইবে। আশা করি লাইব্রেরি সমূহের কর্তৃপক্ষ একখানি করিয়া 'বাংলার বলশী' লাইব্রেরিতে রাখিবেন।

মুহম্মদ ফযলুল করীম মল্লিক

বাংলার বলশী

বৎসরের সকল ঋতুতেই বাড়ি যাই, কিন্তু মাঠের মধ্যে চাষাদের কাজকর্ম দেখে আমার একটুও মনে হয় না যে, তারা উন্নতির দিকে যাচ্ছে। সেই একঘেয়ে জীবন তারা টেনে চলেছে, শুধু প্রাণী বলেই এবং বাঁচবার জন্য তাদের খোদা নিয়ম করে দিয়েছেন বলেই। তা বলে তাদের বাঁচতে হচ্ছে কেন এবং কি করে বাঁচতে হয় তা তারা জানে না। দুনিয়ার বুকে পা দিয়েই তারা বৈচিত্র্যবিহীন নিরানন্দ পল্লীর জঙ্গল দিয়ে ঘেরা ও খড় দিয়ে ছাওয়া কুঁড়ের মধ্যে যা দেখে তাই তাদের শেষ দিন পর্যন্ত দেখতে হয় ; তার চেয়ে এতটুকু বেশি দেখবার উপায় তাদের নেই। সেটা যেন তাদের অদৃষ্টেরই লেখা। সেই সরল অথচ অসুন্দর অবস্থার মধ্যে গুটিকতক অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তাদের এ দুনিয়া থেকে 'তলপি তোল রে ভাই' গাওয়ার সময় পৌঁছে যায়। অভাবের মধ্যে তাদের আহার ও অতি সামান্য আচ্ছাদন, শুধু কেবল লজ্জা নিবারণ করবার জন্য। এইজন্য তারা দিনরাত খাটছে, প্রাণপাত করে দিচ্ছে—বৎসরের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত—শুধু খাটুনিতেই জীবন নিযুক্ত করে রেখেছে। এ ছাড়া প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ের অত্যাচারের হাতও তারা এড়িয়ে চলতে পারে না। ওদিকে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতে যেমন বাংলার চাষা অহর্নিশ চিন্তাকুল মনে দিনযাপন করছে, তেমনি ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ সহ্য করতে গিয়ে তাকে দুনিয়ার সকল সুখে জলাঞ্জলি দিতে হচ্ছে। পুত্রকন্যা পরিবৃত হয়ে তার চিন্তারাশি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে একেবারে মাটির ওপর বসে যাচ্ছে।

ছেলেমেয়েগুলিও একটু সেয়ানা হতে না হতে ঐ পিতামাতার একঘেয়ে জীবনের সকল যন্ত্রণা ও পরিতাপের অংশিদার হয়ে বসছে। তারা শিখতে পেল না, কি করে দুনিয়ার জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হয়। তারা জানল না, দুনিয়ায় চলতে হলে কি কি কৌশল, কি কি বিদ্যা শেখবার দরকার। সে নৌকা চালাতে না শিখেই মাঝ নদীর মহাতুফানে নৌকা ছেড়ে দিল। পরিণামটা যে এর কি হচ্ছে তা দেশের অন্তর যারা দেখতে চেষ্টা কচ্ছেন, তাঁরাই বুঝতে পাচ্ছেন।

দুনিয়ার প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিরন্তর যুদ্ধ চলছে—মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির এই ঘোর যুদ্ধ ক্রমশ বিপুল হয়ে উঠছে ; কিন্তু, এই যুদ্ধে টিকে থাকবার মত শক্তি আমাদের চাষাদের কোথায়? আমার মনে হয়, তারা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে ; শক্তি সঞ্চয় ত দূরের কথা, তারা এই যুদ্ধে ক্রমাগত পরাজয় লাভ করছে। প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সংগ্রামটা একরূপ অনিবার্য ধরে নেওয়া যেতে পারে। তারা রোগে ভুগছে—জন্মলাভ করতে না করতে মৃত্যুর কবলে পড়ছে—উপযুক্ত আহার-অভাবে অস্থিকঙ্কালসার হচ্ছে। অভাবের তাড়না নিবারণ করবার

মত উৎপাদন তারা করতে পারছে না। মানুষের জীবনের কর্তব্যগুলি কি, তা তারা জানতেই পাচ্ছে না, তার পর ত কর্তব্য পালন—সে বহু দূরের কথা। মাতাপিতার কর্তব্য, পুত্রকন্যাকে সংসারের নানাবিধ জ্বালাযন্ত্রণা কষ্ট-দুঃখ সহ্য করতে শক্তিমান করে তোলা। কিন্তু বাংলার চাষা মাতাপিতা তাকে অকালেই কর্মক্ষেত্রের সঙ্গী করে তোলে। ইহাতে তাদের অপরিপক্ক মন ও শিশু-শরীর অচিরে ভেঙ্গে পড়ে। কেহ বা ধরাশায়ী হয়ে মৃত্যু আলিঙ্গন করতে বাধ্য হয়, কেহ বা চিররুগ্ন হয়ে যাবজ্জীবন প্রকৃতির কর দিতে দিতেই ভবলীলা সাঙ্গ করে। এই রুগ্ন চাষার অস্তিত্বকে আজ বাংলার পল্লীপ্রকৃতি নীরবে উপহাস করে বেড়ে উঠছে। এই ভগ্নস্বাস্থ্য চাষাপল্লীর সকল সৌন্দর্যই প্রকৃতি নিজের সামগ্রী করে তুলেছে, তা আর তাদের উপভোগ করবার মত নাই। সে কেবল কবিরাই দেখছে।

বাংলার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা প্রকৃতিকে ভোগ করবার মত কেহ আর বাংলার পল্লীতে নাই। সেখানে যারা আছে তাদের অদৃষ্টে প্রকৃতির রমনীয়তা অলীক বলেই যেন লেখা হয়েছে। তারা প্রকৃতির কোলে বসে রয়েছে, অথচ তাদের উপভোগ করবার অবস্থা নাই। প্রকৃতি তাদের ওপর সারাটী বৎসর ধরে অত্যাচার অনাচার করে চলেছে, ওরা তা নীরবেই সহ্য করে। পরাজিতের মত নীরবেই চলে যাচ্ছে ; তা কেউ দেখতেও পাচ্ছে না। তাদের সেই অসহায় বেদনাপূর্ণ পরিণামের জন্য এক বিন্দু অশ্রু ফেলবারও কেউ নাই।

কিন্তু কেন এ অবস্থা? প্রকৃতি আজ কেন চাষার উপর এত দৌরাত্ম্য ও অনাবশ্যক আধিপত্য জারি করে তাকে সংসারক্ষেত্র হতে হটিয়ে দিচ্ছে? তার কারণ দু-একটা বলবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রকৃতি যে কেবল একা দোষী, তা নয়। প্রকৃতি ত তার অফুরন্ত শক্তির বিকাশকে কখনও ক্ষুণ্ণ করতে চায় না—কেবল মানুষই তার স্ফূর্তিকে ধরে বেঁধে পিছনে হটিয়ে দিতে চায়। তাকে খর্ব করে নিজের প্রভুত্ব ও শক্তিমত্তাকে চরম করে তুলতে চায়! মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সেই আদিমকাল থেকে যুদ্ধ করে আসছে। তার সঙ্গে কোনদিনও আপোস হতে আজও কেউ দেখেনি। ইতিহাসের বুকে এটা খুব পুনরাবৃত্তি করে লেখা আছে। আবার কত না যুদ্ধের কথা মানুষের স্মৃতিরাজ্য হতে বহুপূর্বে বিলুপ্ত হয়ে গেছে! মোট কথা, এই যে যুদ্ধটী লেগেই আছে তাহা আর অস্বীকার করার জো নাই। প্রকৃতি যদি একা মানুষকে লোপ করবার জন্য লেগে যেত তাহলে বাংলার অবস্থার জন্য দুঃখ করবার আবশ্যক দেখতাম না। প্রকৃতি মানুষকে লোপ করবার ইচ্ছা করে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে সে মানুষকে বাঁচাবার জন্য প্রয়াস পাচ্ছে। কিন্তু মানুষ যখন প্রকৃতিকে বন্ধন করতে প্রয়াস পায় তখনই উভয়ের মধ্যে বিরাট যুদ্ধ উপস্থিত হয়ে পড়ে। মানুষ যদি প্রকৃতির সঙ্গে মেলামেশা করে থাকতে পারত তাহলে বোধ হয় এই অনাবশ্যক যুদ্ধের আবশ্যক হত না—তাহলে মানুষের কোন দুঃখ হত না। মানুষ যতই প্রকৃতিকে শত্রু মনে করে তার বিরুদ্ধে যেতে চেষ্টা করছে—যতই তাকে জয় করবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করছে ততই সে নিজের কৌশলের দুর্বলতা অনুভব করছে ও ততই তার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ, অসুখী, অসন্তুষ্ট, উদ্বিগ্ন, ম্রিয়মান ও অযোগ্য দেখতে পাচ্ছে। প্রকৃতি আপন মনে তার নিজের স্বচ্ছন্দগতিতে সেই খোদার চরম পরম

বিকাশ সার্থক করে চলে যাচ্ছে। মানুষ নিজে কর্মের ভুক্তভোগী হয়ে সমাজ ও সংসারকে আলোড়িত করে তুলছে। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে এর দৃষ্টান্তের অভাব হবে না। মানবের এই অশান্তির নিবৃতির জন্য কত কত থিওরির আবির্ভাব হয়ে যাচ্ছে তারই বা ইয়ত্তা করা যায় কত। কেহ বা প্রকৃতির সঙ্গে একটা রফা করতে চাচ্ছে, পুনরায় আদিম যুগের শান্ত সরল জীবনের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠছে ও প্রকৃতির নীরব সুন্দর নিবিড় রসসম্পদের মধ্যে মনের চরম তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা মিটাবার চেষ্টা পাচ্ছে। সকলেই এই প্রকৃতি ও মানবের মহাযুদ্ধকে এক বাক্যে অপসন্দ কচ্ছে।

কিন্তু এ যুদ্ধ থামবার নয়। মানুষের জয়ের তৃষ্ণা প্রকৃতির সহজ বর্ধনশীলতার সঙ্গে ক্রমাগত বেড়ে যাবে ; কবে যে তার নিরাকরণ হবে তা বিশ্বভুবনময় সেই 'মালিকি ইয়াওমিদ্দিন' জানেন। কেহবা এই প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করতেই মানুষের পরম পুরুষকার প্রকাশ পাবে বলে মানুষকে এক তিলার্ধ বসে থাকতে দিতে চাচ্ছে না। বসে থেকে চোখ বুঁজে সেই পূর্ণের চিন্তা করবার ভান করাতে ভারতবর্ষের লোক পশ্চিমের নিকট অনেক বকুনি খাচ্ছে। পশ্চিম তাকে নিশ্চেষ্ট, অকর্মণ্য, অলস বলে জ্ঞানবতার আসনে বসে কত না মুরবিয়ানা কচ্ছে। পশ্চিম আজ প্রকৃতির পরাজয় করতে যেয়ে যেন সকল জ্ঞানের অধিকারী হয়ে বসেছে এমনি ভাব। এখন কে সত্য কথা বলছে তা পাঠকের 'তবিয়ত'ই ঠিক করে নেবে।

প্রকৃতির ঘাড়ে দোষ ফেলে আমি নিষ্কৃতিলাভ করতে চাচ্ছি না। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে মানুষের—এই বলতে গিয়ে বোধ হয় কতকগুলি অবান্তর কথা বলা হয়ে গেল—তাই পাঠকের ধৈর্যের নিকট ক্ষমা চাচ্ছি।

প্রকৃতি আপন গতিতে আপনার নিয়মের মধ্যে চলতে গিয়ে যদি মানুষের উপর অত্যাচার করে বসে সেজন্য মানুষ তাকে দোষ দিতে না গিয়ে যদি নিজে সেটাকে শোধরাতে যায় তবে সকল গোল চুকে যায়। এখানে মানুষের যে শক্তি বিশ্বকর্তা দিয়েছেন তারই আবশ্যক হয়ে পড়বে। মানুষ সে শক্তির অপচয় না করতে পারে কিন্তু যদি সেটাকে না ব্যবহার করে তবে সে নিশ্চয়ই দোষী। তবে সকল মানুষের শক্তি সমান নয় এবং শক্তি চালনার কর্তব্য সকলের সমান নয়। এজন্য সমাজের মধ্যে যার শক্তি আছে সে তাহা ব্যবহার করে না বলেই, দুর্বল কোন কাজই করতে পারে না। এটা প্রায়ই দেখা যায় যে, শক্তিমান নিজের শক্তিকে পরিচালনা না করে দুর্বলের উপর শুল্ক আদায় করতে একটুও দ্বিধা, লজ্জা, বা লজ্জাহীনতার গ্লানি অনুভব করে না। শক্তি দুর্বলতার উপর কর চাপিয়ে দিচ্ছে, ইহা সমাজের প্রতি স্তরে স্তরে দেখতে পাওয়া যাবে এবং চিরদিন ইহা চলে আসছে।

বাংলার চাষা সমাজে এই মানব-প্রকৃতির নীতির কঠোর প্রাবল্য কিছু কম নয়। দুর্বল চাষার উপর নানা শক্তির চাপ পড়ে যাচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে, ততই চাষার স্কন্ধে বিবিধ চাপের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। প্রকৃতি ওদিকে তার ক্ষীণ শক্তিকে বেশি করে টানছে, এদিকে মানুষ তার দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে। সে দুর্বল, তাই সে অজ্ঞ। সে অজ্ঞ, তাই সমাজের স্তরে তার নাম সবার নিম্নে পড়ে রয়েছে। সে উপরে উঠতে পাচ্ছে না। তাকে চাষা বলে সবাই নিচে ফেলে রেখেছে কিন্তু চোখ রাঙিয়ে তারই কাছ থেকে আবার তাদের উচ্চ স্তরের মশলা আদায়

কচ্ছে। তারা ভারবাহী জন্তুর মত তাদের হুকুম তামিল করে যাচ্ছে ও চিনির বলদের মত উৎপাদন করে চলেছে কিন্তু ভোগ করতে পাচ্ছে না। ইউরোপে ধনী শক্তিশালী শ্রমীর ওপর চেপে বসেছে। শ্রমী উৎপাদন করে যাচ্ছে—ধনী তা উপভোগ কচ্ছে—কেহ বা শুধু অভোগ্য অর্থ কেহবা ভোগ্য দ্রব্য। বাংলার পল্লীতে চাষা আর ইউরোপের কলে শ্রমীর একই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে গেছে। এখানে চাষা সমাজকে মাথায় করে রেখেছে, সেখানে শ্রমীর সমাজকে ঠেকিয়ে রেখেছে। ধনী জমিদার এখানে চাষার উপর আধিপত্যের নিদারুণতা দিনদিন নিবিড় করে তুলছে, সেখানে ধনী কলের মালিক শ্রমীকে আষ্টেপৃষ্ঠে কলের সঙ্গে গেঁথে রেখেছে। শ্রমী সে শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। বাংলার চাষা জমির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে রয়েছে। সেখানে কল তবু বৎসর বৎসর মেরামত হচ্ছে এখানে সেটুকুও হচ্ছে না। জমিদার চাষাকে খাটাচ্ছে কিন্তু কৈ তার যে জমি তা মেরামত করতে দেখছি না। জমি আর কত পারে? জমির ওপর পড়ে চাষা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাটছে—সারা বৎসরের খাটুনির ফল সংগ্রহ করে ঘরে তুলতে না তুলতে জমিদারের পেয়াদা বা সেপাহির হাঁক এসে তার জানের রক্ত পানি করে দিচ্ছে। এ হাঁক তার এড়াবার জো নাই। সে লিখে দিয়েছে 'হাজা শুকা অজন্মা কোন কিছুরই আপত্তি গ্রাহ্য হইবেক না।' এ কথার খেলাপ সে করবে কি করে? সে যে একেবারে বাঁধা। ঐ বলছে 'চল কাছারি—আর পেয়াদার রোজ দাও'—তার পরাণ একেবারে কেঁপে উঠেছে। ঘরে এক পয়সা নেই, 'রোজ' কোথা থেকে দেবে?' তবু হাঁক দিচ্ছে 'চল কাছারি?' সে যে বড় ভয়ানক জায়গা! "বেটা কবে দিবি বল—এখনই দিতে হবে—নজর দে—না হয় ত বন্ধ করে রাখব। তামাদি এসে গেল যে।' এ কথার জবাব কে দেবে? চাষা ত ডরে কাঁপছে। আইনের বিরুদ্ধে চাষা গোমস্তা নায়েবের আঁধার কুঠুরিতে আটক থাকছে। তার হয়ে দু কথা বলছে কে? সে বাড়ি যেয়ে থালা ঘটি যা থাকে তাই বেচে নায়েবের ঘরে নিয়ে উপস্থিত কচ্ছে। যেয়ে দেখে সুদ, হিসাবানা, কিস্তি খেলাপি কতকগুলির মবলগ বেঁধে নায়েব পেয়াদার হাতে দিচ্ছে। পেয়াদার কড়াকড়ি কি! সে ত মনে হয় যমের বাড়ির কেউ হবে।

এবার বাড়ি এসে স্ত্রীর দুএক খানি গহনা যা থাকে তাই বন্ধক রাখতে হিরুপালের বাড়ি যায়। একেবারে চিরদিনের তরে হিরুপালের সিন্দুকে সে গহনা বন্ধ হয়ে থাকে।

জমিদার কর্তব্যহীন হয়ে জমির কোন উন্নতি কচ্ছে না। প্রকৃতি নিজেও গতি থামাচ্ছে না। চাষা আর কত পারবে? সে খাটছে কিন্তু জন্মাচ্ছে কম—জমির শক্তি চিরদিন ত সমান থাকতে পারে না। কাজেই জমি দিচ্ছে কম। চাষা কম পায়, কিন্তু দিতে হয় সেই পূর্বেকার হিসাবে। জমিদার এ বিবেচনাটুকুও করেন না। প্রতি বৎসর এইরূপে চাষা কম খেতে পায়। এ ছাড়া এই জমির ফসলের উপরই তার সকল অভাবের নিবৃত্তি নির্ভর করে। ফসল দিয়ে তার আচ্ছাদন আনতে হয় বিদেশ থেকে। বিদেশের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে অনেক সময় তার আচ্ছাদন প্রভৃতি সামান্য দু-একটা অভাব নিবারণ করবার উপকরণ অতি দুর্মূল্য দিয়ে জোগাতে হয়। এর জন্য তার তৈরি ফসলের অনেক বিদেশে চলে যায়। আহারের জন্য থাকে তার যৎকিঞ্চিৎ। এই সামান্য আহারে তার পরিপুষ্টি হবে কি করে? তার শরীরে শক্তি হবে

কোথা থেকে? আর এই দুর্বল শরীরে শক্তি কোথায় রোগের হাত থেকে বাঁচতে? বাংলার চাষা মরছে চিকিৎসার অভাবে যত, তার দশ বিশ গুণ মরছে শক্তিহীনতার কারণে। তাই কৃষির উন্নতি চাই বেশি ফসল উৎপাদন করবার জন্য—চাষার শেখা চাই জীবন যাপন করবার কৌশল—তার শেখা চাই আচ্ছাদন তৈরির কায়দা। তার নিজের অভাব নিজে নিবারণ করবার জন্য তাকে স্বাবলম্বী হতে হবে। সে বিদেশে তার তৈরি ফসল পাঠিয়ে দিয়ে বিলাস-সামগ্রীর আমদানী করতে পারবে না। তবে সে বেশি খেতে পাবে—বেশি খেতে পেলে সে রোগমুক্ত হবে—সে বাঁচবে।

এ কর্তব্য এখন কে পালন করবে? চাষার উদর পূর্তির ভার কাদের উপর? চাষার স্কন্ধে বসে আছে যারা তাদের? তারা চাষাকে আর উপেক্ষা করতে পারবে না। তারা অনুৎপাদক হয়ে চাষার উপর নির্ভর করতে পারবে না। চাষারা উৎপাদন করছে কিন্তু তারাই ভোগ করছে শুধু চাষার উপর চোখ রাঙিয়ে। তারা যে প্রকৃত দোষী, তাতে তাদের হুঁশ নাই। তারা চাষাকে তার সমুদয় অধিকার হতে বঞ্চিত করে তাকে খাটুনির প্রাণীতে পরিণত করে তুলেছে। এর জন্য কি অনুতাপ করতে হবে না? এখনও চাষা তার নিজের অধিকার কি শিখতে পেলে না। তাকে শুধু ভোট দেওয়া শিখালে সকল কর্তব্য সম্পাদন শেষ হবে না। ঐ ভোটের পিছনে তার একটা আত্মশক্তি—একটা বিরাট মানুষ ঐ বর্বর চাষা শরীরটার মধ্যে সুপ্ত আছে সেকথা তাকে জানিয়ে দিতে হবে। শুধু কোট প্যান্ট পরে ভোট আদায় করে বেড়ালে তাদের অধিকার দেওয়া হবে না। এ ভুল পশ্চিমের Democracy পড়েও বুঝতে পারেনি। আমরা আবার সে ভুল না করে বসি। আমরা অনেকে ভোটের মোহে মুগ্ধ হয়ে Democracyর আগমনী গেয়ে আত্মহারা হয়ে উঠেছি, কিন্তু তাতে আমাদের মস্ত ভুল হবে। এ ভুল সংশোধনের ভার জমিদার-তালুকদারের উপর ন্যস্ত !

হে জমিদার ! তুমি কি বুঝবে সে কর্তব্য? তুমি পশ্চিমের Democracy কে হুবহু এনে বসিয়ে দিও না। তুমি মানুষ হিসেবে চাষার সঙ্গে বসে-যেতে পারবে কি? তুমি তার সঙ্গে বসে মাটির বুকের গরম সহ্য করতে পারবে কি? তুমি তোমার বিপুলশক্তি বিলাস-দেবতাকে বিদায় দিয়ে সিমলার পাহাড় কি দার্জিলিং এর বাস হতে নেমে আসবে কি? তুমি চাষার ভগ্নকুটিরের মগ্ন আতিথ্যকে গ্রহণ করতে রাজি হতে পারবে কি? তুমি ম্লান চাষার মলিন মুখের কষ্টের হাসিকে সহজ সরল করতে পারবে কি? তুমি চাষার বুকে সাহস দিয়ে তার তিরস্কার শুনে, আপনার কর্তব্যহীনতা স্মরণ করে অনুশোচনা করতে জান কি? তুমি চাষার ক্লেশে নিজ ক্লেশ বোধ করতে পার কি? যদি এসবের কোনটীর শক্তি তোমার না থাকে তবে আর Democracy র কথা তুমি বল না—ভোটের জন্য টাকা ব্যয় করে তোমার প্রজা বাংলার চাষাকে আর বিব্রত করো না। তুমি, তাহলে বুঝলাম, বাংলার চাষাকে বলশী করে তুলবার জোগাড় করেছ। এখন যতই তুমি তোমার পুরাতন গতিতে চলবে ততই সে দিন নিকট করে তুলবে, যে দিন বাংলার বুকে বলশীর বিপ্লব নিদারুণ হয়ে প্রতি পল্লী অশান্তির কলরোলে মুখরিত করে তুলবে। বাংলার চাষা মানুষ। তাদের অন্তরমানুষ আর সুপ্ত হয়ে থাকতে চাচ্ছে না। চাষার শরীর গেছে, কিন্তু তাই বলে তার অন্তরমানুষটী একেবারে শ্বাসরুদ্ধ

হয়ে পড়েনি। তাদের অধিকার তারা ভোগ করতে চায়। তারা সকল দেনার জন্য দায়ী হবে কিন্তু পাওনা তার অদৃষ্টে থাকবে না, একথা তারা মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে চায়। তারা মানুষ হয়ে সমান অধিকার পেতে চায়। তারা বুকের রক্ত দিয়ে উৎপাদন করে সকলকে খাওয়াচ্ছে কিন্তু নিজে অনশনে অর্ধাশনে ঋণ–জর্জরিত হয়ে উদ্বিগ্ন রজনী পোহাচ্ছে। এ অসমান অবস্থা আর কত দিন? জমিদার ও চাষা এই দুই শ্রেণীর সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা বাংলার বলশীদের সর্ব প্রধান নীতি হবে ! এই নীতিবলে পূর্ণ কল্যাণের যুগ সৃষ্টি করবার জন্য উন্নত হয়ে প্রবল উৎসাহে, বিপুল তেজে ও চিরসঞ্চিত অধীরতার স্রোতে বাংলার বলশীরা তাদের ক্ষোভ, নির্যাতন ও অসহায়তার নিষ্ঠুর অভিনয় করবে। এর জন্য কে দায়ী হবে তা ভবিষ্যত সমাজের নেতৃবর্গ নির্দ্ধারণ করবেন।

কৃষকের আর্তনাদ

শহর বা শহরতলিতে বাস করে যাঁরা আপনাদিগকে নন্দনকাননের অধিবাসী ঠাউরে বসেছেন তাঁদের কথা আমি বলছি না। তাঁরা বাপ-পিতামহের বাস্তুভিটা পল্লীর বুকে উলঙ্গ ফেলে প্রকৃতির কোল ছেড়ে দিয়ে একেবারে হাত পা ধুয়ে শহরের হৃৎপিণ্ডে বাসা বেঁধে দিব্যি সুখে আছেন। তাঁরা গৈ-গাঁয়ের কথা শুনলে চোখ মুখ নাক রগড়ে দশবার 'বিচ্ছিরি' কথাটার উল্লেখ না করে চুপ থাকতে চান না। লেখাপড়া শিখে কেরানির খাতায় নাম লিখে ঐ যেন, গৈ-গাঁয়ের আবহাওয়াকে অস্বাস্থ্যকর বলে পরিত্রাণ পাওয়ার লোভে শহরে বাসা ভাড়া নিয়ে দিন আনেন দিন খান তাতে তাঁরা পরম সুখী মনে করেন! চাকরির টাকার লোভে শহরের মরা মাছের ঝোল ও কাঁকর-ভরা চাল নাকে-মুখে গুঁজে তাঁরা বাবু হয়ে কাছারি যেতে শিখেছেন। তাঁরা আর গৈ-গাঁর কথা শুনতে পারেন না। এইরূপে লেখাপড়া আমাদের পল্লীগ্রাম শূন্য করে ফেলল।

প্রকৃতির অত্যাচারের হাত হতে রক্ষা পেতে হলে জ্ঞানার্জন সর্বপ্রথম প্রয়োজন। পল্লীর অধিবাসী প্রকৃতির সঙ্গে আজন্ম যুদ্ধ করে চলেছে। তাদের মধ্যে লেখাপড়া শিখে জ্ঞানবলে বলীয়ান হয়ে প্রকৃতিকে হটিয়ে দেওয়ার জন্য কেহই সেখানে থাকছে না। লেখা-পড়া যাঁরা শিখছেন কাপুরুষের মত ভীত হয়ে পল্লীর বক্ষ উজাড় করে অজ্ঞ চাষাকে ফেলে তাঁরা শহরের বুকে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে যাচ্ছেন। প্রকৃতিও অজ্ঞ চাষাদের ওপর আরও নিদারুণ হয়ে উঠছে।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ পাশকরা ছাত্রদিগকে ডেকে শেষ উপদেশ দিয়ে দেন, "বাপু-সকল বাড়ি যাও, যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যেয়ে পুরাতনকে নূতন করে তোল, নির্জীবকে জীবন্ত করতে লেগে যাও—তোমার শিক্ষা তোমার কঠোর জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা পল্লীর নিঃসঙ্গ অজ্ঞতাকে সরিয়ে দিয়ে চাষার বুকে জ্ঞানের আলোক দাও—সে বাঁচতে শিখবে, তোমাদের আদর্শ দেখে তারা মানুষ হতে শিখবে—তোমরা তোমাদের জ্ঞানকে এর চেয়ে অধিকতর উৎকৃষ্ট রূপে ব্যবহার করতে পারবে না—'রাব্বুল আলামিনের' জ্ঞান আহরণ করে যদি সেটাকে শুধু ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি, শরীর-সেবা ও ভোগের জন্য ব্যয় করে যাও তাহলে তোমাদের মনুষ্যজীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে।" এই উপদেশ মত কার্য করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট যুবকগণ স্ব স্ব পল্লীতে ফিরে গিয়ে পল্লীর বুকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। পল্লীতে এখন দেখা যায় শহরের মটর গাড়ি-বেড়াবার পার্ক, চিকিৎসার হাসপাতাল, স্কুল কলেজ, শিল্পাগার, কৃষিশালা, পশুশালা প্রভৃতি পল্লীর নিবিড় প্রকৃতির স্পর্ধাকে উপহাস করে দিনের সঙ্গে বেড়ে উঠছে। তারা লেখাপড়া শেখার উদ্দেশ্যকে চরম করে সাধনার সামগ্রী করে তুলেছে ও তার সাফল্যও লাভ করছে।

আর ভারতের লেখাপড়া-শেখা নরনারী দাসখত লেখবার জন্য সতত উদ্বিগ্ন। তাঁরা বাড়ি ফিরে একটু জুতা খুলে বেড়ালে নিজেকে কত হীন মনে করেন! ভয় করেন পাছে তাঁদের ভদ্র নাম ঘুচে যায়! পায়ে তাদের কাঁটা বিঁধে, কাদা জল লাগে—সর্দি হয়—গেঞ্জি না পরে অনাবৃত শরীরে বের হলে তাঁদের যেন ঘাড় কাটা যায়, অভদ্র হয়ে যাওয়ার এমনি তাদের ভয়। হাতে একটা কাজ করা ত দূরের কথা! দু-এক মাইল পায়ে হাঁটা তাঁরা না-পছন্দ করেন। তাঁরা শহরে এসে গাড়ি-ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছেন—জুতা খুলতে হয় না—শরীর সর্বদা ঢাকা থাকে। বেশ ফুল-বাবুটী হয়ে বসেছেন। বাপ-দাদার ভিটায় বন-জঙ্গল শিয়াল-কুকুরের আড্ডা হয়ে উঠেছে। সেখানে ঘুঘু চরে যায়, তা দেখে কত গেঁগাঁর চাষা বুড়ি দুর্লক্ষণ গ'ণে হা-হুতাশ করতে করতে দেশছাড়া কেরানি বাবুদের বাপ পিতামহের নাম করে কত না দুঃখ করেন। তা বুড়িদের ও দুঃখ শুনবে কে? সে আক্ষেপ ওই গাঁয়ের লতা-পাতা-বনে মিশে যায়। তাই বলছি—ঐ লেখা-পড়া শেখা বাবুর জাত পল্লী ছেড়েছে—আর মূর্খ চাষা নিঃসঙ্গ জীবন টেনে চলেছে। প্রকৃতির সঙ্গে যুঝতে যুঝতে এদের যে জীবন তার কথাই বলবার জন্য আমি এই কাহিনী খুলে বসেছি।

শহরের বাবুদের কথা বলে কাজ নাই, সে আমি আগেই বলে রেখেছি। তাঁরা চাষা বললে নোংরা বর্বর কদাকার বিশ্রী কুৎসিত এক রকম জীবের ধারণা করে বসেন। আমি চাষা বলতে সে কথা বুঝতে চাই না এবং বুঝাতেও চাই না। তারা মূর্খ; সে তাদের অদৃষ্টের দোষ। তারা চাষ করে, তাই তারা চাষা। যারা মদ বেচে সমাজের অকথ্য অনিষ্ট করে চলেছে, তারা ভদ্রলোক বাবু—যারা চাষার গর্দান ভেঙ্গে ফাঁকি দিয়ে চতুরতার বাহাদুরি নিয়ে দু-পয়সা জমিয়ে লালঘর তৈরি করে তারা বহু মানাস্পদ হয়ে টিকে থাকছে—তারা অসহায় মূর্খ নির্বোধ চাষার রক্ত শোষণ করে নিয়ে ভদ্রলোক হয়ে উঠেছে—আর আজ চাষা নিজের সকল শক্তি ব্যয় করে সারা সমাজটীর খাদ্য তৈরি করে দিয়ে মানব দেহ ও মনকে বাঁচিয়ে রাখে। সে 'চাষা' হয়ে ঐ বাবুদের তিরস্কার, অবজ্ঞা, ঘৃণা, নির্যাতন সহ্য করে যায়। এ অন্যায়ের প্রতিবিধান কবে হবে? যে দিন চাষার ছেলে লেখাপড়া শিখে শহরে যাবে না—ফিরে এসে হাল ধরে মাটির শক্তিকে প্রখর করে তুলবে সে দিন ভদ্র বাবুদের অনুশোচনার দিন আসবে। সে দিন মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের দিন এসে যাবে। সে দিন বড়মিয়া সেজে বাবুর দুর্বোধ্য কঠোর-নিষ্ঠুর উপদেশ চাষার বুকে বজ্র হানতে থাকবে। সে তা বুঝতে পারবে, সে মূর্খ হয়ে আর থাকবে না, সে আর বাকহীন চলিত বলদের মত ঘুরতে চাইবে না—সেদিন মহর বিশ্বাস, আর চারু বাবুর নিরবচ্ছিন্ন অধিকারের দিন ফুরিয়ে যাবে—তাদের রক্ত শোষণ বৃত্তি অতি নির্দয় ভাবে হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে দিতে লেগে যাবে। আসিবে কি সে দিন যেদিন চাষার ছেলে গ্রাজুয়েট হয়ে অন্তরের সহিত চাষা নাম বরণ করে সমাজের খাতায় তাদের নাম 'সবার উপরে' বড় করে লেখার প্রয়াস পাবে, তার চাষা নামের ওপর শ্রদ্ধা জন্মাবার জন্য চাষার মহৎ জীবনকে মহীয়ান, গরীয়ান করে তুলবে—তাদের প্রাচীন গৌরবকে উদ্ধার করবে? জানবে কি না তারা যে, সমাজের সকল অভাব পূরণের ভার খোদা তাদের ওপর ন্যস্ত করে দিয়েছেন? জানে না কি তারা—তিনচতুর্থাংশ মনুষ্যজীবনের আহার সংস্থানের

বিরাট দায়িত্ব তাদের ওপর পড়েছে? বুঝবে কি তারা—এত কাজের হয়েও সমাজে কেন সকলে তাদিগকে পায়ে ঠেলে রাখে? এতটুকু কি বুঝতে তারা জানবে না, কেন সবাই তাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিচ্ছে? চাষার ছেলে আজ লেখপড়া শিখে সোনার জমি ফেলে রেখে আয়েশের জন্য লালায়িত হয়ে হীন কুশ্রী বিরামহীন কেরানি জীবনের শত ধিক্কারকে বরণ করে নিচ্ছে। কেন? আমাদের শিক্ষা এই দিচ্ছে।

এই কি শেষ? না, এ শিক্ষার কুফল যে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর স্তরে স্তরে কতদূর প্রবেশ করেছে তা দেখলে শরীর শিউরে ওঠে ঐ চাষার ছেলে যখন পিতামাতার কুটির ছেড়ে শহরে উঠে সভ্য হয়ে বসে তখন পিতার পরিচয়টা পর্যন্ত দিতে সঙ্কুচিত—কুণ্ঠিত হয়ে মুষকে পড়ে। নিজেকে কতই হীন মনে করে। হা চাষাপুত্র! তুমি এত বড় মহৎ বৃত্তি পরায়ণ মানুষের সন্তান হয়ে নিজের পরিচয় দিতে ঘৃণা বোধ কর! ধিক তোমার জীবন, শিক্ষা ও জ্ঞানকে! তুমি চাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জীবন ও বৃত্তিকে বাঁচিয়ে তোলবার চেষ্টা না করে—তুমি কল্যাণের দাতা হয়ে পৃথিবীর বুকে মনুষ্য-জীবনের পরম সার্থকতা, যাবতীয় সুযোগকে দুহাতে সরিয়ে দিয়ে মোহময় ভদ্রতার কৃত্রিমতা ও নিরর্থক জীবনের প্রভূত অনাবশ্যকতাকে যদি বুক পেতে বরণ করে লও তাহলে তুমি যথার্থই কৃপার পাত্র। তুমি বুঝছ না তোমার মূল্য, জানতে পাচ্ছ না তোমার প্রয়োজনীয়তা,—চিনতে পাচ্ছ না তোমার স্থান। তাই তুমি খাতার বুকে কলম লাগিয়ে বিরাট মানবাত্মাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলবার জন্য ব্রতী হয়ে গিয়েছ। কবে তুমি কলম ছেড়ে হাল ধরে শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রের ধারে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির অফুরন্ত আনন্দকে বুক ভরে ভোগ করতে পারবে? কবে তুমি তোমার চাষাবৃত্তির অসাধারণ অনুপম সার্থকতা বুঝবে? কবে তুমি নীরস নথিখাতা ছেড়ে শহরের জটিল, কপট, নিষ্ঠুর, সঙ্কীর্ণ, অভাবক্ষুব্ধ, ক্লান্ত একঘেয়ে চিন্তাম্লান জীবনকে ছেড়ে পল্লীর নগ্ন-সরলতা, সৌভাগ্যদীপ্ত অফুরন্ত আয়োজনকে ভালবাসতে পারবে? যত দিন শহরের বহিশ্রীর ওপর তোমার বিতৃষ্ণা না জন্মাবে ততদিন আমার এ প্রশ্নের কোন মূল্যই হবে না! যাক, যে কথা বলছি, ঐ যে চাষা একা পড়ে আঁধারে মরে-বেঁচে ধুকধুক করছে তার অবস্থাটা একবার দেখা যাক।

চাষা ও জমি

যারা মাঠ পাড়ি দিয়ে গৈ-গাঁয়ে চলা-ফেরা করে তারা মাঠের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট চলবার পথ পায় না। প্রতি বৎসর নূতন নূতন পথের সৃষ্টি হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে সকল পথ লাঙ্গলের হাতে একে একে বিদায় গ্রহণ করে। তখন পথিকেরা নূতন পথ আবিষ্কার করে বসে। এই পথ আবিষ্কার করতে গিয়ে পথিককে ক্ষেত ওয়ালাদের সঙ্গে কত বিবাদ করতে হয়। এই বিবাদ যে একটু গুরুতর রকমের হয়ে ওঠে এবং সময় বিশেষে যে অত্যন্ত বিপজ্জনকও হয় তা গৈগাঁয়ের বাসিন্দারা বৎসর বৎসর দেখতে পায়। ক্ষেতওয়ালা ক্ষেতের চতুর্দিকে কাঁটা দিয়ে পথিকের পথ রোধ করে আর পথিক পথ না পেয়ে কাঁটা সরিয়ে আর না হয় কাঁটা ডিঙ্গিয়ে ক্ষেতের বুক চিরে মাঠ পাড়ি দিয়ে চলে যায়। ক্ষেত ওয়ালার জমি করে এত মায়া বেড়ে গেছে—জমির মূল্য তার কাছে এত বেশি দাঁড়িয়েছে যে, একখানি পা রাখবার মত একটুখানি সঙ্কীর্ণ পথ ছেড়ে দিতে তার এত ব্যথা লাগে। ঐ বিঘৎ পরিমাণ পথ রুদ্ধ করতে গিয়ে সে কি ভীষণ পরিশ্রমই না করে ! সে সারা মাঠের কাঁটাগাছের কাঁটা কেটে কেটে সারা ক্ষেতের বুকে ছড়িয়ে রাখে। ক্ষেতের মাঝে ঘাসের আল আর দেখা যায় না। এই আল বাঁচাতে গিয়ে কত চাষার মাথা গেছে, আর কতজন শ্রীঘরের আতিথ্য ভোগ করেছে তার ইয়ত্তা কে করে? বঙ্গের প্রত্যেক জিলা-ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে তার হিসাব করা আছে। ছোটবেলা গরু আল ধরে খাওয়াতে গিয়ে এক হাত হতে দুহাত তিন হাত পর্যন্ত চওড়া আল কাঁচাসবুজ লম্বা লকলকে ঘাসে ভরা দেখতে পেয়েছি—ঘণ্টাখানিকের মধ্যে গরুর পেট উঁচু হয়ে ভরে উঠত। কিন্তু সে আল ধরে খাওয়ানো আর এখন নাই। আলই নাই যখন, তখন আর গরু খাওয়ান হবে কোথা থেকে। এখন আল অভাবে জমির চিহ্ন রাখা শক্ত হয়ে উঠেছে। এজন্য চাষারা মাঠে প্রায়ই দাঙ্গা করে ফেলছে। পূর্বে আলের বুক দিয়ে যাতায়াতের পথ থাকত কিন্তু এক্ষণ আর সে আলের চিহ্নমাত্র নাই—ক্ষেতের হৃৎপিণ্ড চেপে শস্যবনের মাঝ দিয়ে গতিবিধি সঙ্গত করে নিতে হচ্ছে—এর জন্য কত জন যে গালাগালিও খাচ্ছে তা মাঠ-ফেরা লোক মাত্রেরই জানা আছে !

এটা মনে করবেন না একটা সামান্য কথা! যতই সামান্য হোক এর দ্বারা আমি আপনাদের একটা পাশ্চাত্যের অর্থবিজ্ঞানের তথ্য প্রয়োগ করবার সুযোগ করে দিতে পারব। চাষারা জমির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। জমি তার পরিশ্রমানুপাতে ফসল দিতে পারে না। সে যে পরিশ্রম করে দশ বৎসর পূর্বে যে ফসল পেয়েছিল আজ সে সেই পরিমাণ বা ততোধিক পরিশ্রম করেও তার অর্ধেক ফসল ঘরে উঠাতে পারে না। তার জমি কমেওনি বাড়েনি। তাই তার নিকট মাটির কণা সোনা হয়ে উঠেছে। সে এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দিতে পারে না—তার

প্রাণ আঁতকে ওঠে। তার খাবার শস্য কোথা থেকে হবে, এই তার ভয়। সে আগে কত জমি অকাজে 'বাঁচড়া' করে ফেলে রেখে দিয়েছে—আজ সে এক ইঞ্চি জমিও বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। সে তার ঘরের দুয়ারে এনে লাঙ্গল থামায়। তাকে এইরূপে সারাদেশ চষে বেড়াতে হয়। গরুরও একবিন্দু দাঁড়াবার স্থান নাই। চাষার কি গরুর উপর নজর নাই? সে কি গরুর যত্ন করতে জানে না? কিন্তু করে কি করে? আত্মরক্ষার্থে তার জমি ফেলে রাখবার জো নাই। সে সব চষে খুঁড়েও তার অন্ন সংস্থান করতে পারে না। 'ফেলান জমি' (fallow land) ফুরিয়ে উঠেছে। তাই জমির মূল্য দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। 'ফেলান' জমি' পূর্বে বিনা খাজানায় পড়ে থাকত শুধু গরু ছাগল ভেড়ার জন্য ; কিন্তু সে ফেলান জমিরও মূল্য হয়েছে—আর চষা জমিরও মূল্য আটদশ গুণ বেড়ে গেছে। রিকার্ডোর থিওরি (Ricardo's Rent Theory) পল্লী–মাঠের অবস্থা, চাষার দুর্দশা ও গরুর আহারের দুষ্প্রাপ্যতা হতে সত্য বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। রিকার্ডোর চতুর্থ শ্রেণীর অকেজো জমি আর আমাদের ফেলান জমি এক। জমির সাপ্লাই যদি বেশি হয় তাহলে ফেলান জমির দিকে কেহই যায় না। সকলেই উৎকৃষ্ট ও অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জমি গ্রহণ করে। তার মূল্যও তখন কম থাকে। পরে যখন জমির শক্তি কমতে লাগে আর ফসল কম হয়ে চাষার খাটুনির পেট ভরতি করতে পারে না, তখন চাষা জমি বাড়াবার চেষ্টা করে। আমাদের দেশে জমি উর্বর করবার ও জমির নষ্টশক্তি উদ্ধার করবার জন্য কোন উপায়ই চাষার হাতে নাই ; কাজেই তারা অল্প জমিতে বেশি উৎপন্ন করতে পারে না। অল্প জমি হতে তারা ক্ষতিপূরণ করে যথোপযুক্ত শস্য উৎপাদন করতে সমর্থ হয় না। তাই তারা ছুটে যায়—দু–পাঁচ বিঘা জমি বৃদ্ধি করে আবশ্যকীয় শস্য সংগ্রহ করবার জন্য, এবং নিরন্তর ব্যস্ত হয়ে বেড়ায় শুধু জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করে তুলবার জন্য। তাই সে জমির প্রশস্ত আল ভেঙ্গে ক্ষেতের সামিল করে জমির পরিমাণ কিঞ্চিৎ বাড়িয়ে তুলতে গিয়ে সমূহ অঘটন ঘটিয়ে বসে। তাই সে বাগান কেটে সাফ করে শস্য তৈরি করছে—গরু চরাবার ক্ষেতকে চষে ফেলে ফসলের ক্ষেতে পরিণত করছে। এতেও কি বোঝা যাচ্ছে না জমির উৎপাদিকা শক্তির ক্রমহ্রাসসাধন পূর্ণবেগে প্রকটিত হতে আরম্ভ হয়েছে?

যাকে পশ্চিমের কৃষিবিদগণ বলেন 'Diminishing Productivity' সেই নীতি ও রিকার্ডোর খাজনানীতি এক সূত্রে গ্রথিত। বঙ্গ পল্লীতে এই দুটি যমজনীতি চাষার ক্ষেত ও চাষার অবস্থা সপ্রমাণ করে দিচ্ছে। জমির উপর চাষার এমনি দম জমে উঠেছে যে তার স্বাস্থ্যের জন্য, তার সহজ সুন্দর চলাফেরার সুযোগ করবার জন্য মাঠের পাশ দিয়ে যদি জিলাবোর্ড একটা রাস্তা নির্মাণার্থে সাধারণের জমির উপর থেকে মাটি কাটে, অমনি অল্পকাল মধ্যে চাষারা স্ব স্ব জমির খাদ বুজিয়ে দিয়ে বীজ ছড়িয়ে যায়—বর্ষা কালে আর রাস্তার খোঁজ পাওয়া যায় না। জমি নিয়ে চাষা এমনি নির্মম মমতায় দিশেহারা হয়ে উঠেছে। এর পরিণাম–জ্ঞান তার নাই—এর সংশোধনের গোড়া কোথায় তাও তাকে কেউ বলে দেয় না। দেশের নেতারা শুধু কমিটি করেই পেট মোটা করে হাওয়া খেয়ে শহরের আলোকে চকচকিয়ে বেড়ান। এই নিষ্ঠুর জমিতৃষ্ণা নিবারণ করার ভার যাদের উপর, তাঁরাও ঐ অলিমপিয়ায় বসে মজা লুটছেন। তাঁরা যদি জমির ক্রমহ্রাসধর্মকে নির্মূল করে ঘন চাষের (intensive

cultivation) ব্যবস্থা করতেন তাহলে জমির উপর অতৃপ্ত ব্যাপ্তি–আকাঙ্ক্ষা চাষার অনেকটা মিটে যেত। সে খেতে পেত আর তার কৃশ গরু মাঠ পেয়ে চরে ফিরে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। সেও রুদ্ধশ্বাস হয়ে না খেতে পেয়ে জীবন্মৃত হয়ে মনিবের দুঃখে দুঃখিত হয়ে সমভাবে কৃশাঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। আমি বলতে চাই এখন, চাষার ক্ষেত diminishing productivityর সঙ্গে বিষম বিরোধ করে চলছে। উৎপন্নের ক্রমহ্রাস প্রাপ্তি এই নিটুট সত্যটা বৎসর বৎসর চাষার বুক ভেঙ্গে দিচ্ছে শস্যের অল্পতা দিন দিন নিদারুণ হয়ে চাষাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে চাচ্ছে—এই অল্প শস্যের জন্যও তাকে চিরস্থায়ী করের উপর বিবিধ বাড়তি cess and abwab দিয়ে জমিদারকে তুষ্ট রাখতে হচ্ছে—তা না হলে তার উপর 'উচ্ছেদের' (Ejectment) নোটিশ জারি হয়ে বসে। আদালতের পেয়াদা বাড়ির উপর এসে চেপে বসে। অবশেষে তাকে ভিটে ছেড়ে খাটুনি বেচে দিন গুজরান করতে হয়। আর যদি জমিদার তার প্রাপ্যটা আদায় করতে পারে তখন মহাজন এসে তাকে চেপে ধরে সুদ আসলের জন্য। অল্প ফসলের জন্য খাজনা দিতে গেলে চাষাকে হয় আগে শস্য বেচে পরে মহাজনের লাঞ্ছনা খেয়ে টাকা কর্জ করে তাই দিয়ে আহার কিনতে হয়, নাহয় আগেই কর্জ করে জমিদারকে বিদায় করতে হয়। চাষা আর স্ফূর্তি করবার জন্য, বেহুদা খরচের জন্য কর্জ করতে কমই যাচ্ছে। তার জমির চাষ করতে হচ্ছে অতিরিক্ত খরচ করে। সে খরচ সে জোগাবে কোথা হতে? তার সকল অর্থই ব্যয় হয়ে যাচ্ছে ঐ লাঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে। সে পাঁচ হাতের গামছা ছাড়া একখানা লম্বা কাপড়ও পরতে পাচ্ছে না—শীতের সময় আগুনের কুণ্ড করেই রাত পোহাচ্ছে আর রোদের গরমে দিন কাটাচ্ছে—দুখানা কাপড় এক সঙ্গে সে পরতে পাচ্ছে না। তার মূল্য কোথা হতে সে জোগাবে? জমির ফসলের উপর তার আবশ্যক–বিলাস (Necessary Luxury) সমস্ত নির্ভর করছে। তারপর এই ফসলের বৃদ্ধি কল্পে জমির শক্তিকে বাড়াবার জন্য সে যে কর্জ কচ্ছে সে তা পরিশোধ করতে পারে না। বৎসরের মধ্যে নৃশংস মনুষ্যকীট মহাজন দশগুণ দেনার দায়ে বেচারার 'যা কিছু সব' বিক্রি করে তাকে নিজের বাড়ি বেতন ভোগী করে রাখে। তারা ঋণের ফাঁদ বেশ তৈরি করেছে। টাকা দেওয়ার সময় তার দুএক বিঘা জমি যা থাকে সেই মূক মাটিকে জামিন (Surety) করে দুষ্ট মহাজন মহাখুশীতে খত লিখছে।

নররক্তপিপাসু যত পারে ততই দুরূহ শর্তে বর্ণনা খতম করে তবে ছাড়ছে; আর চাষাকে না বুঝিয়ে না শুনিয়ে খতের উপসংহার করছে এই বলে 'অত্র খত দাতাকে পাঠ করিয়ে শুনাইলাম।' হা হতভাগা চাষা, নিরেট মূর্খ তুমি! তাই তোমার অজ্ঞতার সুযোগ কত ভদ্র লোক নিয়ে নিজের পাপাচারের পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে! তুমি পড়তে জান না—তুমি শুনতেও চাও না—তুমি তোমার হিতৈষী বাবুর কথায় মেতে উঠ—কাজেই 'বাবু' তোমার সর্বনাশটা করতে একবারও কুণ্ঠা বোধ করে না। এই চাষার উপর জুলুম ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে বাবুর মহল শহরের বাজারে সর গরম করে তুলছে; আর চাষার পল্লী 'আল্লা' 'আল্লা' করে কাক, কোকিল, শালিক ও ঘুঘুর চেঁচামেচিতে আকুল হয়ে উঠছে।

জমি ও গরু

বর্তমান ভারতে কৃষির অবনতি ঘটেছে গরুর অভাবে। কৃশ বলদের দ্বারা চাষ ভাল হয় না—অনেক স্থলে বলদের পরিবর্তে গাভী লাঙ্গল টানতে লেগেছে। সে তার দুধ দেওয়া কাজ হতে অবসর, অব্যাহতি পেয়েছে—তাকে এখন দুঃসহ লাঙ্গলে কাঁধ লাগাতে হয়েছে। ওদিকে দুধের অভাবে চাষার জান শুকিয়ে উঠেছে—তার শিশু কেঁদে কেঁদে কাঠ হয়ে চিরদিনের জন্য শান্ত হয়ে থাকছে। গরুর দুর্বলতার জন্য কৃশ চাষা এক বিঘা জমির চাষ করতে বেলা আড়াই প্রহর করে ফেলছে। দশ বৎসর, বিশ বৎসর আগে সে অতি অল্প সময়েই, ঐ পরিমাণ জমির চাষ সম্পন্ন করতে পারত। কামারের বার্ধক্য উপস্থিত হলে যেমন লোহা তার নিকট অত্যন্ত কঠিন মালুম হয়, সেইরূপ চাষার দুর্বল রুগ্ন অভুক্ত অর্ধভুক্ত শরীরের নিকট জমি ভয়ঙ্কর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোজাতি স্ত্রীপুরুষ মিলে এখন শুধু চাষার খোরাক সংগ্রহ করতে লেগেছে। নিজেদের আহারের জমি চষে ফেলে চাষার তথা শহরের বাবু সমাজের সকল ক্ষুধার নিবৃত্তি তাদের করতে হচ্ছে। ওপারে যেমন শ্রমী নরনারী ঘর ছেড়ে কলে ঢুকে পড়ে তাদের অতিপিপাসু মালিকের লাভতৃষ্ণা বাড়িয়ে দিচ্ছে কিন্তু নিজেরা খেতে পাচ্ছে না, এপারে তেমনি গরু স্ত্রীপুরুষ চাষার সাথে মিলে ভদ্রলোকের বাবুগিরি ও বিলাস সামগ্রী সংগ্রহ করে তার নীচাশয়তা ও অমানুষিকতার স্পর্ধা বাড়িয়ে দিচ্ছে। তবু তথাকথিত ভদ্রবাবুরা আসমানে চোখ তুলে ও কপালে চশমা ঠেকিয়ে চাষার উপর রাগ জারি করে কি আস্পর্ধার সঙ্গে! 'ব্যাটা চাষা কোথাকার!'—এই হচ্ছে চকচকে ধবধবে ভদ্রবাবুদের মিষ্ট সম্বোধন! পথনষ্ট করে চোখ রাঙ্গাবার ব্যাপার আর কি! চাষা রোদে পুড়ে ক্ষেত খুঁড়ে খেটেখেটে সারা হয়ে গুছিয়ে আনবে আর বকুনি শুনবে বাবু মিয়াদের,—কি অপরাধই যে তার তা কে বলে? মানুষ বলে তাকে স্বীকার করতে তাদের যেন সকল অন্তরটি কুণ্ঠিত হয়ে ওঠে।

এমনি অভাগা এই বাবু সমাজটা! বেঁচে থাক আমার চাষা! গরুর অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় কৃষির অধঃপতন হচ্ছে। চিকিৎসা অভাবে পল্লীগ্রামে গরু ওলাওঠা প্রভৃতি সংক্রামক রোগে এত স্বাভাবিক মৃত্যুর কবলে পড়ে যায়, তাতে যে কত গরু দিন দিন কমে যাচ্ছে—যথেষ্ট কাঁচা ঘাসের অভাবে কত গরু যে কৃশ হতে কৃশতর হয়ে পড়ছে—সে সম্বন্ধে একটী লোকের মুখে একটী কথাও শুনা যায় না। কত বড় বড় লোক কত কমিটির মেম্বর হয়ে গভর্নমেন্টের মাথায় যাবতীয় দোষ দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ কচ্ছেন ও নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন শেষ হল বলে বিবেচনা করে প্রচুর দেশ সেবার আত্ম প্রসাদে ভরপূর হয়ে ঘরে উঠছেন। তাঁরা প্রজার পক্ষ সমর্থন করতে যান কিন্তু কমিটির প্রস্তাব করেই তাঁদের সব কাজ শেষ হয়ে যায়। মনে করেন কমিটি নিযুক্ত হয়ে গভর্নমেন্ট তাঁদের কথায় বৈকুণ্ঠ গড়ে তুলবেন। হা

অদৃষ্ট ! তাঁরা যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করতে একবারও প্রয়াস পান না। এই যে গভর্নমেন্ট প্রতি মহকুমায় পশু-চিকিৎসক নিযুক্ত করেছেন, তাঁরা শুধু বেতন ভোগ করছেন আর গোটাকতক শহরের ছেঁকড়া গাড়ির ঘোড়া দেখতে গিয়ে বেচারি কোচয়ানকে ফাইন করে বসছেন। এই ত তাঁদের কর্ম। আর একটু অনুগ্রহ যদি করেন তবে ডেপুটি নাহয় মুনসেফ-বাবু কি জমিদারের গাই গরুটার চিকিৎসা করতে বের হন। পল্লীর সহস্র সহস্র দুর্ভাগা গরু যে হাতুড়ের চিকিৎসার উপর নির্ভর করে ভীষণ মহামারি পাড়ি দিতে থাকে তার চিকিৎসা কে করছে। গো চিকিৎসক বাবু শহরের চার দেওয়ালের বাইরে যেতে চান না—ও যে পাড়াগাঁ, পায়ে কাদা লাগে, জুতা খুলতে হয়। মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার বাবু পল্লীর বুকে স্বাস্থ্য টিকবেনা বলে ঐ শহরের রাস্তার ধারে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে টেবিলের ওপর পা লম্বা করে বসে থাকেন। পল্লীর চাষা প্রকৃতির হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে বসে আছে তাতে তারা দলে দলে মরছে; গ্রাম কি গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে,—ভিটা বাস্তু জঙ্গলে কাঁটায় ভরে উঠে গাঢ় আঁধারের আবাসভূমি হয়ে পড়েছে। কজন ডাক্তার তাদের রক্ষা করছে? তারা কৃশ দুর্বল হচ্ছে কেন? প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে তার প্রতিকার করতে উঠেপড়ে লেগে যাও, তবে প্রকৃত কল্যাণের পথ প্রশস্ত হবে। যদি একবার শহর ছেড়ে পল্লীর হাওয়ায় গা খুলে চাষার কুঁড়ের ভিতর ঢুকে তার বহুদিনের জমানো অন্ধকার বুক দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সেই নিবিড় আঁধারের আত্মার মধ্যে চাষার সমূহ বিপত্তির কারণ অনুসন্ধান করতে পার, তবে তুমি চাষার প্রতিনিধি হতে পারবে। তবে তার হিতৈষী হয়ে তার মঙ্গলের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গের চাষা সমাজের জন্য জগতের সমক্ষে মানব সমাজের মধ্যে একটা চমৎকার মনোরম স্থান তৈরি করে দিতে পারবে। তবে তার দুঃখের কালিমা অন্তরের নির্যাতন নীলিমাকে একেবারে ঘুচিয়ে দিতে পারবে।

আমি আমার যাবতীয় অভিজ্ঞতা দিয়ে যত বারই কৃশ বলদ ও রুগ্ন চাষাকে দুপুরবেলা ক্ষেতের বুকে লাঙ্গল চষতে দেখেছি ততবারই আমার নিকট ঐ একটা কারণ প্রত্যক্ষ শরীর পরিগ্রহ করে মূর্তিমান হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সেটা ঐ জমির 'diminishing productivity' প্রাপ্তি অর্থাৎ মানুষ যেমন শৈশব হতে নানাবিধ অবস্থার মধ্য দিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়, প্রস্তর যেমন পর্বত হতে গড়িয়ে আসতে সুগোল মসৃণ হয়ে যায়—মৃত্তিকারও তেমনি একটা উৎপাদিকা শক্তির সীমা আছে! মাটি জগতের সর্ব বস্তুরই মত,—একেবারে অক্ষয় হয়ে আসে নি। তার ভিতরকার সকল শক্তি প্রতি বৎসর ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে আসছে। যতটা ব্যয় হয়ে যায়, তত পরিমাণ খাদ্য মাটিকে দেওয়া হয় না। যৎকিঞ্চিৎ সার কি করতে পারে? আমরা দিন রাতের মধ্যে কতবার খাচ্ছি, যদি একটি বার না খাই অমনি কত দুর্বল হয়ে পড়ি। তদ্রূপ বাংলার মাটি, ভারতের মাটি, শুধু খেটেই চলেছে কিন্তু খেতে পাচ্ছে অতি সামান্য। তার ফল ধীরে ধীরে বেশ বিপুল হয়েই দেখা দিয়েছে। এই উৎপাদিকা শক্তির ক্রম-হ্রাস প্রাপ্তি ঘটায় চাষা অধিক পরিমাণে জমি সংগ্রহ করতে লেগেছে। সে বন কাটছে—'ফেলান' জমি উঠছে—সে আল ভাঙছে—পথ মারছে—রাস্তা সরিয়ে নিচ্ছে—গরু বাঁধবার বাঁচড়া কেটে ফেলছে। সে খাদ্যের জন্য ছটফট করছে। তবু সে যথোপযুক্ত খাদ্য সংগ্রহ করতে না পেরে

ঋণে আবদ্ধ হচ্ছে। পল্লীবাসী কে না দেখেছে চাষারা কত ধানের গোলা বিক্রি করে ফেলছে—কত নষ্ট করে ফেলছে। যারা পুরাতন গোলা কিনছে তারা চাষার রক্তের ব্যবসায়দার। চাষা চষে চষে পূর্বেকার মত ফল পাচ্ছে না বলে গোলা বেচে বাঁচবার চেষ্টা করছে। এই করতে গিয়ে গরুর চরবার স্থান গরুর আহারের জমি চাষা নিজের আহারের ক্ষেত করে তুলছে। কত মাঠ ছোট বেলা শূন্য পড়ে থাকতে দেখেছি। পূর্বে যে মাঠ গরু ছাগলের দল বুকে করে দিগন্ত ব্যেপে পড়ে ধূ ধূ করত–অসংখ্য গাভী, বলদের দল ঘুরে ঘুরে চরে চরে মাঠের কাঁচা ঘাস খেয়ে ম্লান রবির নগ্ন রঙিনতায় রাঙানো সান্ধ্যগগনকে পিছনে ফেলে বাড়ি ফিরত—সেইসব মাঠ আজ চাষার ফসলের ক্ষেতে শ্যামল হয়ে খেলছে। সে কাঁচা ঘাসের সবুজের খেলা আর এখন দেখা যায় না। গরু খেতে না পেলে কি না খেয়ে সবল সুস্থ হবে? না খেতে পেলে রোগের হাত হতে মুক্তি পাবে কি করে? চাষাও যেমন ঋণের দায়ে ব্যগ্র হয়ে মহাজনের কালপাশ ছিন্ন করতে গিয়ে অর্ধভুক্ত থেকে রোগের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে অকালে ইহলোকের মায়া কাটাচ্ছে, তেমনি গরু তার সাধের ক্ষেতকে নিঃসঙ্গ ফেলে রেখেও অর্ধাশনে স্বাধীন ভাবে চরতে ফিরতে না পেরে সারাদিন খেটে খেটে কৃশাঙ্গ হয়ে পড়ছে আর এক একবার ইনফ্লুয়েঞ্জার মত মড়ক এসে চাষার গোয়াল ঘর শূন্য করে দিয়ে যাচ্ছে। চাষাকে গরু পুষতে হচ্ছে , কিন্তু তাকে খাওয়াতে পারছে না। নিজেও খেতে পাচ্ছে না, গরুও খেতে পাচ্ছে না। গরু যা পায় তাতে তার যথেষ্ট হয় না। আর বৎসরে সকল সময় সমান ভাবে খেতে পায় না। চাষা যেমন মাঘ ফাল্গুন মাস হতে মহাজনের বাড়ি ধরনা দিতে আরম্ভ করে ও কর্জ করে খেতে আরম্ভ করে তেমনি গরুও শীতকাল হতে আষাঢ় মাস পর্যন্ত গৃহস্থের শুষ্ক খড় বিচালির উপর নির্ভর করে থাকে। যে চাষার খড় বিচালি থাকে না ও অর্থাভাবে কিনতে পারে না সে ঐ অনশনক্লিষ্ট গাভী কি বলদকে লাঙ্গলের সঙ্গে যুতে দিয়ে রৌদ্র তপ্ত কঠিন মাটির বুকে চাষ করে বাড়ি ফিরে পরিশ্রমের সমানুপাতে খেতে পায়না। তবে তারা বাঁচবে কি করে? আমার যতদূর বিশ্বাস মাটি খেতে পাচ্ছে না বলে চাষাও ক্ষীণ হচ্ছে ও গরুও প্রকৃতির নির্যাতন হতে রক্ষা পাচ্ছে না।

এমত অবস্থায় জমির উন্নতি সাধনের ভার যাদের উপর বহুদিন থেকে দেওয়া আছে সেই কর্তব্যবিমুখ নিষ্ঠুর জমিদারকে যদি কোনক্রমে তার কর্তব্য সম্পাদনে নিযুক্ত করা যায় তাহলে জমির উন্নতি হবে—মাটির উর্বরতা বেড়ে যাবে, চাষা অল্প চাষে বেশি উৎপন্ন করতে পারবে ; তখন প্রত্যেক মাঠের মধ্যে এক একখণ্ড জমি গরু চরাবার জন্য পৃথক করে রাখতে পারবে, গরুর যত্ন হবে, গরু খেতে পাবে বেশি। গাভী তখন পুনরায় তার প্রাচীন দুধ দেওয়া কাজে লেগে যাবে—সে কাঁচা কাঁচা সবুজ সবুজ ঘাস খাবে আর ভাঁড় ভাঁড় দুধ দেবে, চাষা খেয়ে শান্ত সন্তুষ্ট হবে--ছেলে খেয়ে মরণের হাত এড়াবে। আপন স্ফূর্তিতে পুনরুজ্জীবিত হয়ে সোৎসাহে নবনব কৃষি-যন্ত্রের ব্যবহার করে দশ বিশ গুণ বেশি শস্য উৎপাদন করে হ্রাসনীতি diminishing productivity কে পরাজিত করে বর্ধন নীতি increasing productivity-কে জয়যুক্ত করে তুলবে। 'ধনধান্য পুষ্প ভরা' হয়ে উঠবে আবার এই বাংলার পল্লী। চাষা খেতে পেয়ে শক্তিমান হয়ে রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে। হঠাৎ তাকে আর অকালে কাল কবলিত হতে হবে না।

জমি ও সার

জমির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে যাওয়ায় চাষার খোরাক কমে গেছে তা আমরা দেখলাম। এই শক্তিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য চাষা বৎসর বৎসর প্রাণপণ চেষ্টাও করতে ছাড়ে না। সে গাড়ি ভরতি করে গোবরের পচা সার জমিতে ছড়িয়ে দিয়েই সার দেওয়া (manuring) ব্যাপারটা শেষ করে। কিন্তু গোবরে যে কতটুকু সার হতে পারে তা সে জানেই না। ছোট বেলা বাপ চাচাদের সার দিতে দেখেছে, সেই সংস্কার ও অভ্যাস মত ঐ গোবরের সার ছাড়া আর কোন পদার্থের যে সার হতে পারে এ কথা যে ভাবতেও পারে না। জমিতে শস্যের কি কি খাদ্য থাকে ও চাষার সাধারণ শস্যের পক্ষে কোন খাদ্য শ্রেষ্ঠ তা বুঝবার শক্তি আমাদের চাষার নাই। কাজেই বৎসর বৎসর শস্যে কোন কোন খাদ্য জমির ভিতর হতে নষ্ট হয় বা কমে যায় তা সে না বুঝে গোবরের সার ছড়িয়ে যায়। এই সংস্কারগত অভ্যাসটী জন্মাবধি পেয়ে বসেছে বলে সে গাড়ি ভরে সার বয়ে ছড়িয়ে দিয়ে আসে। এটা যে শুধু অভ্যাসের ফল তা সুস্পষ্টতর রূপে বোঝা যায় যখন তাকে প্রতি বৎসর একই পরিমাণ সার জমিতে দিতে দেখি। চাষার পিতামহ যে ভুঁইতে যে পরিমাণ রাশি রাশি সার দিয়েছে সেও সেই প্রকরণে সেই পরিমাণেই সার দেয়। দাদা যে প্রকরণে সার জন্মাত সেও সেইভাবে সার রক্ষা করে। দাদাও যত্ন করে কখনও সার করেনি সেও তা করে না। গোয়াল হতে ইচ্ছামত যেখানে সেখানে গোবর ছড়িয়ে ফেলে। প্রায়ই চাষার বাসঘরের পাশে কোন গর্তের মধ্যে এই গোবর জমতে থাকে। নানারূপে ঐ গোবর নষ্ট হয়ে যায়। নানা অযত্নে ও অত্যাচারে সে গোবর চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, রৌদ্রতাপে শুকিয়ে যায়। তা হতে দুই ফল হয়। প্রথম ফল এই যে, গোবরের যে সারটুকু জমির বীজ ধারণের শক্তিকে প্রখর করতে পারে ততটুকু নষ্ট হয়ে বাতাসে রৌদ্রে মিশে যায় এবং বর্ষার সময়ে ভেসে নদী খাল দিয়ে বেরিয়ে যায়। চাষা এই নিঃসার শুষ্ক গোবর সার বলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করবার জন্য কষ্ট করে জমিতে দেয়। চাষা অজ্ঞ। সার দেওয়া আবশ্যক ; সেটুকু সে বোঝে ; কিন্তু ঐ অবস্থায় গোবর রাখলে যে সমস্ত সার নষ্ট হয়ে যায়, তার ফলপ্রসবিনী শক্তি অনেক হ্রাস হয়ে যায়, সে তা বুঝে না; এবং এই গোবর ছাড়া দেশে পচা বাঁশপাতা, কলার বাসনার ছাই প্রভৃতি সার তৈরি করার যে নানাবিধ মশলা পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে সে অজ্ঞ। গভর্নমেন্টের কৃষি বিভাগ শতাধিক বৎসরের মধ্যে এখনও তাকে সে জ্ঞান দিতে পারেনি। কৃষি বিভাগে বড় বড় কর্মচারী শহরে শহরে ঘুরেই বড় বড় মোটা বেতন নিয়ে দিব্যি মজা করেন কিন্তু সার তৈরির জন্য কি কি দ্রব্য পল্লীগ্রামে প্রচুর পরিমাণে চাষার হাতের মধ্যে আছে, সে সম্বন্ধে এ যাবত কেহই অনুসন্ধান করেন নাই। মূর্খ চাষাকে আর বলব কি? সে বোঝে না বলে প্রথার দাস হয়ে কাজ করে মনের ইচ্ছাকে শান্ত করছে।

এই ত গেল প্রথম ফল যে, অযত্ন-রক্ষিত ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গোবরের সার জমির ক্ষুধা মিটিয়ে তার বৎসরের ক্ষয়কে পূরণ করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, চাষার বাসগৃহের পার্শ্বে ঐ গোবর প্রভৃতি আবর্জনা নানা রূপ রোগের বীজানুর জন্মভূমি হয়ে বসে, তাতে চাষার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। এই উভয় ফলই চাষার সর্বশক্তিকে নিষ্পেষণ করে দিচ্ছে। জমি খেতে পাচ্ছে না, চাষা রোগে ভুগছে। এ কুফলের হাত হতে সে নিষ্কৃতি পাবে না, যতদিন সে না বুঝবে, গোবর কি করে রাখলে সারময় হবে অথচ অস্বাস্থ্যের কারণ হবে না। ঘরের বহু দূরে যত্ন করে এমন ভাবে গোবর ও নানা আবর্জনা রাখতে হবে যাতে করে তার মধ্যে হতে রৌদ্র বাতাস ও বৃষ্টিতে আসল আবশ্যকীয় সারটা নষ্ট না করে দিতে পারে। আর গোবর ছাড়া পল্লী প্রকৃতির অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে যে সার আছে তা কিরূপে সংগ্রহ করা যায় অতি সহজে ও অল্পব্যয়ে সেটা কৃষি বিভাগের পণ্ডিত মহাশয়দের উপর দিতে হবে চাষাদের ঘরে ঘরে শিখিয়ে দেবার জন্য। সার দেওয়ার বেলায় চাষা সেই প্রাচীন প্রথানুসারে চলছে, জমি চষবার সময়ও সে সেই আবহমান কাল হতে যে ব্যবস্থা চলে আসছে তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করে না। তার একটু মৌলিকতার চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় না। দাদা যে নিয়মে জমি চষেছে, যে প্রকরণে সার ছড়িয়ে বীজ বুনেছে সেও ঠিক সেই নিয়ম প্রকরণের বিরুদ্ধে যায় না সময়ের সুব্যবহারও জানে না, কাজের প্রণালীও বুঝে না। শৃঙ্খলা ত নাই-ই। কোন সময়ে কাজ করলে বেশি কাজ করা যায়, কি প্রণালী অবলম্বন করলে কাজটা অল্প পরিশ্রমে অল্প সময়ে স্বল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হতে পারে সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তার নাই। সকল কাজেই তার ঐ প্রথা একমাত্র উপায়।

জমি উর্বরাশক্তি শূন্য হয়ে উঠেছে বলে চাষা যেমন দুর্গতির চরম সীমায় এসে পৌছেছে তেমনই পুরাতন একঘেয়ে অবৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করতে গিয়ে সে কোন উন্নতিই চোখে দেখতে পাচ্ছে না পেটে খেতে পাচ্ছে না তাতে একদিকে তার শরীর ধ্বংসমুখে চলেছে অন্য দিকে ঋণের চাপে অহর্নিশ নিরন্তর দুশ্চিন্তায় মরে যাচ্ছে—তার মন শুকিয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে। এই রোগগ্রস্ত মন ও শরীর আবার পুত্রকন্যাতে প্রবেশ করছে। পুত্রকন্যা ভূমিষ্ট হওয়ার পর মুহূর্ত হতে বিবিধ রোগের সঙ্গে লড়াই করতে করতে অকালে পরাস্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করে। এই হল আমাদের চাষার জীবন যাত্রার সাধারণ গতি।

কয়েক বিঘা জমি ও পিতার লাঙ্গল ছাড়া চাষার পৈত্রিক সম্পত্তি আর কিছু হতে পারে না। দিন রাত মাঠে খেটে পেটের ভাত ছাড়া আর বড় কিছু সংগ্রহ করতে পারে না। তার আর কোন শিল্প বা বাণিজ্য কিছু করবারই অবসর হ'চ্ছে না। একদিকে সারের অপ্রাচুর্য ও জমির ক্রমসার শূন্যতা, অন্যদিকে চাষার অশিক্ষিত দুর্বল অনশনক্লিষ্ট, অমার্জিত মস্তিষ্ক ও চিন্তাক্ষুব্ধ মন এই উভয়ের যুদ্ধই চাষার জীবন। উভয়েই অধোগামী। উভয়েরই শক্তি নষ্ট হচ্ছে—কে এই শক্তি উদ্ধার করে? এই যুদ্ধ মিটিয়ে দেবে কে? এই যুদ্ধের অবসান কবে হবে?

শিক্ষিত সমাজের ওপর এই প্রশ্ন সমাধানের ভার পড়েছে। চাষার ছেলে লেখাপড়া শিখে জ্ঞানেগুণে বিভূষিত হয়ে ওই প্রশ্নের উত্তর করতে যে দিন বসবে সেই দিন চাষার সৌভাগ্য

ফিরবে। চাষার ছেলে লেখা পড়া শিখে চাকুরি করে চাষের কথা প্রাণপণ ভুলবার চেষ্টা করছে। সে পাছে চাষা নামে খ্যাত হয়ে পড়ে—পাছে সে 'চাষার ছেলে' বলে ভদ্র বাবু, ভদ্র মিয়া মজলিশে ঠাঁই না পায়—পাছে তার লেখাপড়া শুধু 'চাষার ছেলে' হয়েছে বলে কোন আদরই সভ্যসমাজে না পায়—এই ভয়ে সে হয় বাপের নাম করতে চায় না, তার পরিচয়টা পর্যন্ত দিতে সাহস করে না, আর নাহয় তার পিতার নাম রূপান্তরিত করে তার ব্যবসায় অন্য কিছু বলে নিজের মর্যাদা মানকে বাড়িয়ে তোলে। এইরূপে চাষার সংখ্যাও ক্রমে ক'মে যাচ্ছে—তাতে করে শহরে ৩০ টাকার একটা চাকুরি খালি হলে দুহাজার তিন হাজার শিক্ষিত যুবক দাঁড় হয়ে, সাহেব সুভা, নাবাব সার হতে উঁচু দরের কেরানি বাবুকে পর্যন্ত অস্থির করে তোলেন। তাদের প্রাণ আই ঢাই করে ওঠে। কত লাঞ্ছনাই না এই যুবকের দল খেয়ে ফিরছে। তবু তাদের ঘোর কাটছে না। চাষার ছেলে এই চাকরিকে অমৃত মনে করে যেমন কলমের সঙ্গে আফিসের চেয়ারের পায়ে বাঁধা পড়ছে তেমনি তার পিতা-পিতামহ চাষ করতে গিয়ে বাবু মহাশয়ের দুয়ারে আটক হয়ে যাচ্ছে।

চাষের উৎপন্ন বৃদ্ধি করবার মত ও হ্রাসনীতিকে দমন করবার জন্য কোন জ্ঞানই তার নাই। সেই প্রাচীন প্রথাই তাকে যা দুমুঠো জোগাইতেছে। তার বাপ পিতামহের যুগে জমির উৎপাদিকাশক্তি (productive power) ও বীজ ধারণের উপকরণ (properties of the soil) অনেক বেশি ও অনেক তীক্ষ্ণ ছিল বলেই তারা যথেষ্ট সৌভাগ্যের মালিক হতে পেরেছিল। তাঁরা ধান চাল সেই জন্য অত সস্তা দেখতে পেয়েছিল। তারা অতি অল্প আয়াসেই অতি অল্প পরিশ্রমেই প্রচুর উৎপন্নের মুখ দেখতে পেত—সে জন্য তারা অনেক অবসরও পেত। অবসর ছিল বলেই তারা চাষবাসের সঙ্গে অন্য আর একটা ব্যবসায় ছোটই হোক আর বড়ই হোক করতে পারত ; সুতরাং সহজেই সৌভাগ্যশালী হয়ে উঠত। গ্রামে যাঁরা ফিরেছেন তাঁরা দেখেছেন ও শুনেছেন সে কালে লোকে চাকুরি না করেও শুধু জমি খুঁড়েই কত বড় বড় বাড়ি করে গিয়েছে—তার ভগ্নাবশেষ এখনও সেই যুগের অফুরন্ত সম্পদ ও কল্যাণের সাক্ষ্য দিচ্ছে। সেই বনজঙ্গলে ঘেরা ভূমিসাৎ সৌভাগ্যের ছবি দেখলে অতীতের কত কথাই না মনে ওঠে। তখন মাটির নবশক্তি 'সোনার বাংলা' নামের প্রচার করতে সমর্থ হয়েছিল।

সে শক্তিও কমেছে আর এখন সোনার বাংলা 'শনির বাংলায়' পরিণত হয়েছে। এই শনিকে দূরীভূত না করলে বাংলা ছারেখারে যাবে। চাষার জ্ঞান বুদ্ধি নাই, সে শনিগ্রস্ত হয়ে সেই দুর্বল মাটির বুকে সারাদিন সারা সাঁঝ বসে ফসল তুলছে কিন্তু তার পেট ভরছে না। এই শনি তাড়াতে হলে জ্ঞানের অস্ত্র চাই। মাটিকে আবার শক্তি সম্পন্ন করে তুলতে হবে। নূতন সার, নূতন চাষের যন্ত্র আবিষ্কার করে চাষার অবসর এনে দিতে হবে। চাষাকে গৃহীও করতে হবে—তাকে অবসরের শিল্পী করতে হবে এবং অবকাশের বণিক করে তুলতে হবে—তার ছেলেকে কলমপাশ শেখা বন্ধ করে দিয়ে হালপাশ কৃষিপাশ শেখাতে হবে—তাকে তার বৃদ্ধ পিতার হাতের কাজে জীবন আরম্ভ করতে হবে, তবে চাষার আঁধার ঘর আলোকে ভরে উঠবে—তাই ত চাই—নয়ত আর তার পরিত্রাণ নাই!

চাষার ঋণ কোঅপারেটিব ক্রেডিট

ঋণের দায়ে চাষা ভেঙ্গে পড়ছে। অতিরিক্ত হারে সুদ দিয়েঁ দিয়ে চাষা ঋণ কিছুতেই পরিশোধ করে উঠতে পারে না। ১ টাকা ধার করে একজন চাষা সারা জীবন মহাজনের ঘরে উসুল করে শোধ করতে পারেনি—তার ছেলে সেই জের টানতে শুরু করেছে। বাংলার পল্লী সমাজে এই চাষার ঋণ একটা দানবের খেলা বলে বোধ হয়। মহাজনের আসন পল্লী সমাজের মাথায় তোলা আছে। মহাজন টাকা না দিলে চাষার মরতে চব্বিশ ঘণ্টাও লাগে না। সে মহাজনের গোলা হতে ধান আনছে খাচ্ছে আর চষে খুঁড়ে যা পাচ্ছে তা পিঠে করে নিয়ে মহাজনের গোলা ভরছে। এইরূপে চাষার দুনিয়াটী সত্য সত্য ঘুরছে। বৎসরে এক একবার ঘুরে এসে অমনি মহাজনের প্রাঙ্গণে তার এক আবর্তন পূর্ণ করে। চাষা মহাজনের বাড়ি হতে যাত্রা আরম্ভ করে, আর মাঠ ঘুরে এসে মহাজনের গোলার মুখে 'তুচ্ছ দিনের ক্লান্তি গ্লানি' নিমেষে দূর করে। চাষার সঙ্গে এই মহাজনের এমনি সম্বন্ধ হয়েছে যে, কেহই কাহাকেও ছাড়তে পারছে না। চাষা ক্রমেই মহাজনের বাড়িতে বসে যাচ্ছে। মহাজনও সুযোগ বুঝে তার স্কন্ধে চেপে বসছে খুব ভাল করে। চাষা ফিরে বাড়ি যেতে পারছে না। এখন চাষাকে বাড়ি নিতে হলে, তার মাঠে ধান নিজের গোলায় ওঠাতে হবে, মহাজনের গোলার খুঁটি হতে তার পায়ের শৃঙ্খল মুক্ত করতে হবে। সে যে নানা উপায়ে সেখানে বাধা পড়েছে। তার জমি ক্ষেতগুলিও মহাজনের বাকসের মধ্যে আটকানো। সেগুলিও বের করে দিতে হবে। মহাজনের সঙ্গে চাষার কোন সম্পর্কই যাতে করে না থাকতে পারে তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

ভারত গভর্নমেন্ট এ যে করতে হবে, অনেক দিন পূর্বে তা বুঝে কো-অপারেটিভ ক্রেডিটের জারি করলেন। অমনি হাজার হাজার কর্মচারী নিযুক্ত হয়ে গেল। দেশে সোসাইটি গঠিত হল বাংলাদেশে এমন শত শত সোসাইটি হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে চাষার ঋণ কমিয়ে দিয়ে তাকে ঋণমুক্ত করা—তাকে মহাজনের গ্রীবা (কবল) হতে নিষ্কৃতি দেওয়া। আজ প্রায় একুশ বৎসর হতে এই অনুষ্ঠান বাংলা দেশের জেলা মহকুমায় বৎসর বৎসর সম্পন্ন হচ্ছে। ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে চাষাকে টাকা দেওয়ার জন্য। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর সেক্রেটারি বড় বড় শিক্ষিত উকিল মোক্তার ইত্যাদি। তাঁরা চাষাকে ঋণ মুক্ত করবার জন্য ব্যবস্থা করতে লেগেছেন। কো-অপারেটিভ ক্রেডিট কাকে বলে সে সম্বন্ধে-আমি বলব না। তবে এই চাষার 'ঋণগ্রস্ত হওয়া' রোগটাকে সারবার জন্য অল্প সুদে ঋণের যে ব্যবস্থা খোলা হয়েছে তাতে চাষার রোগ সারছে কি বাড়ছে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু বলে এই প্রবন্ধের উপসংহার করতে চাই।

পল্লী মহাজন যে চাইত তাকেই টাকা দিত, তবে সুদের হার বেশি। আর ক্রেডিট ওয়ালারাও টাকা দিচ্ছে তবে তাদের সুদের হার খুব কম—প্রভেদ শুধু সুদের অল্প হারেই দেখা যাচ্ছে, তা নয়, আর ও একটু বৈসাদৃশ্য আছে। মহাজনের নিকট একজন দুইজন দশজন বলে কোন বাঁধা বাঁধি নিয়ম নাই—সে প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন টাকা দেয়। কিন্তু ক্রেডিট দাতৃগণ 'গাতা' করে অর্থাৎ দশ, বিশজন একসঙ্গে না গেলে টাকা ছাড়েন না। গ্রামের মাতবর যাঁরা তাঁরাই জামিন হয়ে সোসাইটি গঠন করে টাকা বিতরণ করেন। পূর্বে যে ঋণ করত না বা ঋণের ভয় করত ও মহাজনের নাম শুনে আতঙ্কে কাঁপত, অল্পসুদের লোভে সেও নির্ভয়ে ধীরে ধীরে সোসাইটির খাতায় নাম লেখাচ্ছে। টাকা আদায় করতে ডিরেক্টরদের কোন কষ্টই নাই। গ্রামের মাতবরগণ ঋণীদের কে কেমন অবস্থাপন্ন সমস্তই জানেন। তাঁরা অমনি তাদের গরু বাছুর ধান চাল আটক করে টাকা আদায় করে লন। আবার ঋণীরা নূতন বৎসরে এসে নূতন করে টাকা ধার করে। তাতে করে ঋণ কমছে না বা প্রথম ঋণীরা ঋণমুক্ত হয়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখে না। তাদের স্বভাবও পরিবর্তন হয় না। সুদের হার কম হওয়াতে তারা টাকা বেশি গ্রহণ করে ; কিন্তু জমিতে জন্মায় পূর্বপেক্ষা বেশি নয়, কাজেই তারা মহাজনের নিকট কম টাকা গ্রহণ করে যে পরিমাণ সুদ দিত সোসাইটিতেও তারা সেই পরিমাণ সুদই দিচ্ছে কারণ টাকা বেশি এখানে। তা ছাড়া যারা মহাজনের কাছে ঘেঁসত না, তারাও সোসাইটিতে এসে ঋণী হয়ে বসেছে শুধু অল্প হারের লোভে। চাষাদের অভাব সকলেরই। তবে টাকা পাওয়া কঠিন হলে তাদের অনেক কষ্ট সহ্য করেই কাটাতে হয় ; কিন্তু টাকা পাওয়া সহজ হলে সে কষ্টটুকু আর করতে হয় না। অতএব দেখতে পাওয়া যায়, ক্রেডিট সোসাইটি ঋণ কমাচ্ছে না বরং ঋণীর সংখ্যা অনুপাতে বেশি করছে। সোসাইটি আরও বৈজ্ঞানিক উপায়ে টাকার ব্যবসায় করতে বসেছে। পল্লী মহাজনের পরিবর্তে আমরা শহুরে বৈজ্ঞানিক মহাজন পেয়েছি। তাতে চাষারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঋণগ্রস্ত হতে শিখছে।

কিন্তু আমরা ত তা চাই না, চাষাকে ঋণী হতে আমরা দিব না। সে নিজে উপায় করে আয় উৎপন্ন করে স্বচ্ছন্দ সচ্ছল সম্পদশালী হোক এই আমরা চাই। সুদ কমিয়ে তাকে ঋণ করতে অভ্যস্ত করালে সে ত ঋণের হাত হতে মুক্তি লাভ করতে পারবে না। সে ঋণই করে চলবে। সে ঋণ ছাড়তে হয় কিরূপে তা ত শিখতে পারছে না। ক্রেডিট সোসাইটির পরিদর্শকবর্গ অনেক সময় সত্য ন্যায় ধর্মের মস্তকে পদাঘাত করতে ইতত করেন না ; কাজেই তাঁরা চাষার কর্তব্যগুলিও দেখিয়ে দিতে চান না অতখানি কষ্ট স্বীকার করে। সবাই শোষণ করবেন তবে আর পূরণ করবে কে ?

কৃষকের দুর্দশা

চাষার দুর্গতির কথা যখন মনে পড়ে তখন ওপারের কলের কৃতিত্বের কাতরানি ও গোঙানি চোখের সামনে ভেসে আসে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে কল যে সম্পদ ও কল্যাণ জগতের বুকে এনেছে তা দেখে বাহবা দিচ্ছে না এমন লোক খুব কমই দেখা যায়। তাঁরা বড় বড় শহরের বড় বড় অট্টালিকা, কলের হাওয়া, কলের আলো দেখে মুখে বলেন, 'বাহবা! পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান কি সভ্যতাই না সৃজন করেছে।' এতে তাঁরা মেতে উঠে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশটাকেও সেই দিকে অগ্রসর করাবার জন্য কত না প্রয়াস পান! "এই দেশ কলে ছেয়ে যাবে। সকল পল্লী শহর হয়ে উঠবে। মানুষ কত সুখের সামগ্রী ঘরে বসে পাবে—এই হল তাঁদের স্বপ্ন। কিন্তু আমি যখন ঐ কথা ভাবি তখন আমার প্রাণ আঁতকে ওঠে। ভবিষ্যত মানুষের বিনাশ সাধনই এই কল বৃদ্ধির অন্যতম ফল। মানুষের পরিধেয় ও বিলাস সামগ্রীর প্রাচুর্য ও যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য কলের প্রবর্তন আবশ্যক। এই আবশ্যকতাকে মানতে রাজি আছি যদি এতে করে মানুষের আত্মা ও আস্ত মানুষটী কলের মুখে ব্যয় হয়ে না যায়। কিন্তু তা সম্ভবপর নয়। কলও বাড়বে মানুষেরও দরকার হবে। কল এসে মানুষের শ্রম কমায়নি বরং বাড়িয়েছে। ওঁরা বলেন, কল হচ্ছে মানুষের শ্রম লাঘব করবার জন্য। কিন্তু কার্যত শ্রম কমেনি। মানুষের শ্রম বেড়েই চলছে। এই শ্রম বেড়েছে ও সঙ্গে সঙ্গে তার সকল স্ফূর্তি সকল স্বাধীনতা কলের পাকে নিহত হয়েছে। সে কলে ঢুকবার আগে নিজে খাটত ও পল্লীর নগ্ন-উদার প্রকৃতির কোলে অবসরের আনন্দে খাটুনির ক্ষুদ্র সাফল্যকে উপভোগ করতে পারত। আজ তার মাথার উপর কলের কাল ছাউনি, পাশে কলের কলবর ও কল-নিযুক্ত মানুষের অশান্ত কোলাহল তাকে মুহুর্মুহু অবসন্ন করে ফেলছে। প্রতিদিনই সে একটু খানি করে মরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আমার কথাটা আর একটু পরিষ্কার করেই বলি।

বর্তমান শিল্পপ্রসূত সভ্যতার (Industrial Civilisation) গোড়া কোথায়? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলন্ডে এই সভ্যতার উৎস। ক্রমশ সমস্ত জগত এই সভ্যতায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। ঐ সভ্যতার প্রধান কারণ হল ধন-সম্পদ বর্ধন-শক্তির অপরিসীম আতিশয্য। বাষ্প ও তড়িৎ ; উৎপাদনের প্রকৃষ্ট প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন ও শ্রমকাঘবকারী কল ; অধিকতর শ্রমবিভাগ ও বহুল-উৎপাদন-প্রকরণ এবং সুদূর দেশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ও শিল্পজ পদার্থের বিক্রয়ের জন্য জলস্থলে নানাবিধ আশ্চর্য সুযোগ আবিষ্কৃত হওয়ায় মানুষের শ্রম নিরতিশয় কার্যকর হয়ে পড়েছে। এই সমস্ত কারণে বস্তুত সকলেরই ধারণা হল, "শ্রম বাস্তবিক লঘু হবে—শ্রমীর অবস্থা ফিরবে—এই প্রকাণ্ড ধন-বর্ধন-শক্তি দারিদ্র্যকে অতীতের উপকথায় পরিণত করবে। সৌরকিরণ-হাস্যও আবার মধুর হয়ে মানুষের ঘরে ঘরে ঘুরবে—

চতুর্দিক সম্পদের স্ফূর্তি গর্বিত হয়ে জীবনের অবকাশকে সরগরম করে তুলবে।" অষ্টাদশ শতাব্দীর ওদিকে কে এই ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করতে পেরেছিল? পালতোলা জাহাজকে সরিয়ে দিয়ে বাষ্পপোত দেশ-বিদেশে ঘুরে ফিরছে—বাষ্পশকট মানুষকে মুহূর্তে দূর দূরান্তরে রেখে আসছে—কল মানুষের সামান্য ইশারায় কত কি সৃষ্টি করে তার সহস্র ইচ্ছাকে পূর্ণ করছে যা নাকি শত শত মানুষ, শত শত জন্তু, শত দিনেও সম্পন্ন করতে পারত না। ভীষণ সাগর তরঙ্গ, গিরিপর্বত, নদনদী উল্লঙ্ঘন করে কত অসমসাহসিক কার্য কলের সাহায্যে ঘটবে তা কে ভেবেছিল? এই কল এসে দরিদ্রতম শ্রমীকে ছুটি দিয়েছে। সে অবকাশের আনন্দ সুখে উপভোগ করছে। মানুষ অভাবকে আর চোখে দেখছে না। শান্তি ও নির্ভাবনা সকল দিক নিবিড় করে ভরেছে। এই হল কলভক্তদের রায়।

এঁরা বলেন, এই সম্পদের মধ্যে মানসিক সম্পদ ও নৈতিক কল্যাণ জেগে উঠবে। সোনার যুগ আবার ফিরবে। সকলেই অবকাশ উপভোগ করবে। মানুষের চিরদিনের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে। মানুষ আর বুভুক্ষু থাকবে না, খর্ব হবে না ; লোভ আর মানুষকে পাপাসক্ত করতে পারবে না। সকলেই অভাবের ওপরে উঠবে। শিশু শার্দুলের সঙ্গে খেলা করবে। আসমানের নক্ষত্র ও শশীর কিরণসুধা পানে বিভোর হয়ে মানুষ নশ্বর পৃথিবীকে দেবগণের শাশ্বতভবনে পরিণত করবে। যত আবিলতা দূরে সরে যাবে ; নিষ্ঠুর কঠোরতা কোমল হয়ে উঠবে এবং সকল অশান্তি মনোরম শান্তি ও মনোহারিত্বে ফুটে সুরভি সঞ্চার করবে। তা হলে দারিদ্র্যসম্ভূত পাপ, অজ্ঞতা, পাশবিকতা ও নৈতিক দুর্বলতা কি করে তিষ্ঠিতে পারবে? দারিদ্র্য লোপ পাবে ও দারিদ্র্যের ভয় আর থাকবে না। কে তাহলে অধীন থাকবে? কে তাহলে উৎপীড়িত হবে? সকলেই সেখানে স্বাধীন ও সকলেই সেখানে ধনসম্পদশালী রাজাধিরাজ হয়ে দাঁড়াবে।

কলের মরীচিকা এই স্বপ্নে সমাজের স্তরে স্তরে মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আলাউদ্দিনের প্রদীপের মত কত না আশ্চর্য আবিষ্কারে এই আধুনিক যুগ অতীতকে ডিঙিয়ে জ্বলজীবন্ত মূর্তিমান হয়ে উঠেছে। আর ঐ আবিষ্কারের ফলে কতকগুলি অভিনব প্রক্রিয়া এসে অর্থকে প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করে ঐ স্বপ্নকে সফল করে তুলবার আয়োজন করেছে। এই স্বপ্নজাত দুরাশা দুরাকাঙ্ক্ষা প্রত্যেককে এরূপ ভাবে অভিভূত করেছে যে, সমাজগতি দিক পরিবর্তন করে বিভিন্ন চিন্তাধারায় ও বিভিন্ন নীতিতে মানুষকে দীক্ষিত করে ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন—সকল জ্ঞানশাখাতে বিস্ময়কর বিপ্লব এনেছে। প্রাচীন চিন্তা ও ভাব্না, সংস্কার ও জীবনের উদ্দেশ্য, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, কর্মনীতি ও ধর্মকর্তব্য সমস্তই বিকৃত হয়ে গেছে। সমস্তই ওলট পালট হয়ে গেছে। মানুষ নিরন্তর কর্মপ্রচেষ্টা ও নিদারুণ ব্যস্ততাকে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করে তুলেছে। এই অবিরাম কার্যকঠোরতা আজ সভ্যতার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। একে ওঁরা বলেন কাজ (business)। যে এই উদ্বিগ্ন কর্মকাঠিন্যকে ঘৃণা করে নিবিড় নিরিবিলি জীবন শিশিরসিক্ত সমীরণের মধ্যে খেলিয়ে রাখতে চায় সে অকেজো—এটা একটা গালি আজকের দিনে। প্রাণের বহু বিকাশ ও হৃদয়ের উন্মীলন, সমাজে ও ক্ষুদ্র তুচ্ছ ব্যাপারে প্রকটিত হতে আজ আর পারে না। সকলেই গৃহ-পল্লীর শান্তনিবিড় জীবনকে অপছন্দ করে শহরের ভাড়াটে সঙ্কীর্ণ জীবন যাপন করা খুবই আনন্দজনক মনে করছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দিন দিন বাস্তব জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ ঘটছে। স্বপ্ন ও দুরাশা যে কি অঘটন ঘটিয়ে তুলেছে তাই আজকার দিনে দানবের আকৃতি ধরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। সে ক্রমেই আসমান ধরতে চাচ্ছে। সে ভুল থাকবার নয়। স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। অমৃতের পরিবর্তে বিষ উঠেছে বেশি। কল এসেছিল সুখ ঘটাতে কিন্তু সে যে কি দিয়েছে তার অভিযোগ আজ পৃথিবীর সর্বত্র মর্মান্তিক ও নিদারুণ নিনাদে নির্ঘোষিত হচ্ছে। কলের গর্ব খান খান হয়ে শ্রমীর সঙ্ঘকে বিপুল করে তুলেছে।

শ্রমী করুণ অভিযোগ বিশ্বপ্রভু খোদার আসন টলিয়ে দেওয়ার জোগাড় করেছে, সে ইতিহাস এখানে বলার দরকার নাই। আজ সকলেই 'নিদারুণ সময়ে' (Hard times) এসে পৌঁছেছে। যেখানে মানুষ গণতন্ত্রের আওতায় স্বাধীনতা পেয়েছে, আবার সেখানে মানুষ রাষ্ট্রতন্ত্রের শতজালে জড়িত হয়ে শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম করেছে। যেখানে ব্যবসায় সচল, সেখানে বিপুলবাহিনী সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বসেছে। সে দেশে মাত্র কাগজ অর্থের জ্ঞাপক হয়ে ফিরছে। যে দেশে স্বর্ণ রৌপ্যের ছড়াছড়ি সে দেশেও ঐ 'নিদারুণ সময়ের' হাহাকার নিরবচ্ছিন্নভাবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এর ভিতর একটি সাধারণ হেতু খুঁজে পাওয়া যায়। দেশকাল পাত্র ভেদে কলের প্রভাব বিভিন্ন হয়েছে বটে, কিন্তু তবু কতকগুলি কারণ সর্বত্র এক এবং তার ফলও এক। এই কলের প্রধান কীর্তি হচ্ছে পার্থিব সম্পদের প্রভূত বৃদ্ধি (material progress), যাকে 'সংসারের উন্নতি' বলা যেতে পারে। ঐ উন্নতির জন্য কতকগুলি কারণ একত্র মিলিত হওয়া আবশ্যক। যেখানে যে শহরে নগরে এই কারণ সমূহ সম্পূর্ণ সমাবিষ্ট হয়েছে সেখানে তত উন্নতি হয়েছে। কিন্তু ঐ উন্নতির বুক চিরে লোকচক্ষুর অন্তরালে যে রক্তনদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে তা আর কেহ লক্ষ্য করছে না। তাই দেখা যায় যেখানে লোকসংখ্যা খুব বেশি, ধনসম্পদ প্রচুর, উৎপাদনের কল ও বণ্টনক্রিয়া (Exchange, Distribution) পূর্ণরূপে স্ফূর্তিলাভ করেছে সেখানেই গভীরতম দারিদ্র্য, জীবনযাত্রার কঠোরতম প্রয়াস, এবং নিরুপায় অলসতা কর্মাভাবকে ঘনীভূত করে তুলেছে। মানুষ পেটের জ্বালায় রাস্তার উপর ভিড় করে কলের কারসাজিকে অভিশাপ ও তিরস্কার করতে করতে অনিবার্য মৃত্যুর কোলে আশ্রয় লাভ করছে। ধনী ধনের গর্বে স্ফীত হয়ে যেমন তেমনি অবিচলিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে। পল্লীর বুক শূন্য হয়েছে শহরের এক ইঞ্চিও শূন্য নাই। ভিক্ষুকের সংখ্যা বর্ধিত হয়ে চলেছে। যেখানে কল এখনও শিশুর মত দুর্বল ও স্ফূর্তিলাভ করতে পারেনি সেখানে এখনও দারিদ্র্য ও কর্মহীন আলস্য পুরা বৃদ্ধিলাভ করেনি! কিন্তু কলের চরম স্ফূর্তির সঙ্গে সঙ্গে অফুরন্ত প্রাচুর্যের মধ্যে হৃদয়বিদারক দুরবস্থা ও দারিদ্র্য দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। কল যেখানে এখনও ধনীর ঘরে প্রচুর আরাম ও বিলাসকে এনে দিতে পারেনি সেখানে তাকে কাজ করতে হয় ও সাধারণ মানুষও খাটে সুতরাং সেখানে দরিদ্র ও ভিক্ষুকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম। শহরে ভিক্ষুক, রোগী ও দুরবস্থাপন্ন অসহায় নারী পুরুষ বালক বালিকার সংখ্যা যত বেশি, পল্লীতে তত নয়। কলের উপর কল বেড়ে গিয়ে শ্রম কমাবার ছল করে যতই উন্নতি করে যাচ্ছে ততই দারিদ্র্য ভীষণ মূর্তি ধরছে। সমাজের মুষ্টিমেয় লোকের একশ্রেণী অনিন্দ্য সুখে কাল যাপন করছে আর অধিকাংশ এক

মুষ্টি অন্নসংগ্রহ করতে প্রাণপাত করে দিচ্ছে। এই সত্য ক্রমশ প্রতিপন্ন হচ্ছে। কল যে গতি ধরেছে তাতে ধনেরই বৃদ্ধি হচ্ছে বটে কিন্তু দারিদ্র্য কমছে না এবং কমবে এমন আশা করা যায় না। শ্রমীর শ্রম লঘু হচ্ছে না বরং শ্রমীর ভার ক্রমশ গুরু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ধনী নির্ধনের মধ্যে পার্থক্যের রেখা ক্রমশ বৃহত্তর হয়ে উঠছে। কলের সদ্ব্যবহার হচ্ছে কারখানার (factory) পর কারখানা করে পৃথিবীর খোলা বাতাস ও মুক্ত আকাশকে ঢেকে ফেলা আর রাশি রাশি ধনে ধনীর গৃহপ্রাঙ্গন ভরে দেওয়া। কিন্তু তারই মাঝে মানুষ ক্ষুধায় প্রাণ হারাচ্ছে। ক্ষুদ্র শিশু কর্মরত জননীর শুষ্ক বুক টেনে নিঃসাড় হয়ে থাকছে আর চতুর্দিক অর্থগৃধ্নুতা ও ধনপূজা তাণ্ডব নৃত্য করে অভাবের নিষ্ঠুরতার হাত হতে পরিত্রাণ-তৃষ্ণা আরও প্রখর করে তুলছে।

সত্য বলতে, ধন বর্ধিত হয়েছে বিষম। কল শান্তি, অবসর ও পরিচ্ছন্নতাও এনেছে ; কিন্তু অনেকের পক্ষে উহার বিন্দুপরিমাণও জুটে ওঠেনি। যারা সমাজের তলে পড়ে রয়েছে অর্থাৎ যারা সমাজের নিম্নস্তরে পড়ে উচ্চস্তরের চাপে প্রাণ হারাতে বসেছে তারা ঐ সুখ শান্তির কণা পরিমাণও চোখে দেখতে পায় না। কল ঐ উচ্চ ও নিম্নস্তরের মধ্যে যে দাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছে তা আর মুছতে চায় না। নিচে যারা পড়েছে তারা ধ্বংসের মুখে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, সমাজ অনুদ্বেগের ঔদাসীন্যে উপরের স্তরকে বাহবা দিচ্ছে।

দারিদ্র্য ও ধনোন্নতি (poverty and progress) আজকার জগতে কল-সভ্যতার দুইটী যমজ সন্তান। এদের মধ্যে দারিদ্র্যের প্রভাব অতীব ভীষণরূপে দেখা দিয়েছে ! এই সভ্যতাকে কেন্দ্র করে বর্তমান যুগের সকল চিন্তা—রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক—ভবিষ্যতের সমস্যা মীমাংসা করতে বসে গেছে। কল যতই বাড়বে ততই তার যমজ সন্তানের মধ্যে বিপুল সংঘর্ষ উপস্থিত হবে। উভয়ই বিপরীত মুখে চলছে। একে অপরকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয়েছে এ দ্বন্দ্ব কবে থামবে তা খোদাই জানেন। একটা অভাবকে প্রবল করে তুলবে—আর একটা কয়েকজনের ক্ষুধা নিবৃত্তি ত করবেই তা ছাড়া তাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করতে থাকবে ; অবশেষে প্রতিঘাত শুরু হবেই। দ্বিতল ত্রিতল যতই বাড়ছে ততই সমাজ শেষ প্রলয়ের ও ভয়ঙ্কর বিপ্লবের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

পূর্বকালে সকলকে কাজ করতে হত। সকলেই স্বাধীন জীবন যাপন করত। ভিক্ষুকের শ্রেণী হিসাবে পৃথক অস্তিত্ব ছিল না। ধনেরও প্রচুর বৃদ্ধি হত না। সকলেই স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকত। তারপর ক্রমশ গৃহশিল্পের উন্নতি হল, পরিবার ক্রমে বেড়ে গেল। তখন লোক গৃহত্যাগ করে আয়ের সন্ধানে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এই সময়ে মানুষের আত্মস্বার্থ বিপুল হতে লাগল সুতরাং অক্ষমেরা গোটা সমাজের ওপর চেপে বসল। দারিদ্র্য ধীরে ধীরে মূর্তি পরিগ্রহ করতে লাগল। কিন্তু প্রবল বেগে এই দারিদ্র্য বাড়েনি।

চাষার জীবন মাটির ওপর নির্ভর করছে। তার গৃহশিল্প পশ্চিমের কল বিনষ্ট করে দিয়েছে। সব তার যোগাতে হচ্ছে ঐ মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে। মাটি আর কত পারে? তার ত শক্তির একটা সীমা আছে। সে ত আর কল্পতরু কামধেনু নয় যে, যত ইচ্ছা ততই তার নিকট পাওয়া যাবে। মাটির উর্বরতা কমে গেছে। প্রতি বৎসরই মাটি খেটে খেটে চাষার হাতে দিচ্ছে কিন্তু প্রতি বৎসরই মাটি কিছু কম করেই দিতে পারছে। চাষা কম পাচ্ছে, তার অভাব বেড়ে

যাচ্ছে। মাটির ফল দিয়ে তার সকল অভাব পূরণ করতে হচ্ছে। সে যে ফল পায় তার আবার অংশিদার কতজন—সেটা দেখা আবশ্যক। একা চাষা খাটছে আর তার কাঁধে চেপে কতজন সে খাটুনির ফলটা উপভোগ কচ্ছে তা দেখলে বোঝা যাবে চাষার দুর্গতি ঊর্ধগামী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কল তৈরি করছে আর কয়েকটী লোকে তার ফলে ভাণ্ডার পূর্ণ করে রাখছে আর সাধারণে বুভুক্ষু জীবন লয়ে ব্যস্ত। এখানে চাষা তৈরি করছে আর সকলে এসে তার সব ভাগবাটরা করে তিল তিল করে নিয়ে যাচ্ছে। চাষা যেমন তেমনি শূন্য পেটে টোকা মাথায় নিড়ানি হাতে মাটির আতপতাপে দগ্ধ হচ্ছে।

চাষা যা জমি খুঁড়ে পেল তা সব জমিদার ও মহাজন ভাগ করে গ্রাস করল। চাষা একেবারে অন্নহীন বস্ত্রহীন হল। এখনও চাষা মহাজনের আশ্রয় পেয়ে জীবন ধারণ করতে লাগল। এবার তার আর উপায় নাই। মহাজনের ঘরে যে দেনা জমেছে তার পরিমাণই ভয়ানক—তখন আর কে তাহাকে সাহায্য করবে? এইবার জমি ছেড়ে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে বেঁধে শহরমুখে ছুট। পুত্রকন্যা পরিবার যে যেখানে পারে সেখানে অন্নের জ্বালায় বের হয়ে পড়ে। জমি ক্ষেত সব মহাজন জমিদারের ঘরে উঠে। পৈত্রিক ভিটা একেবারে বন জঙ্গলে ভরে যায়। এই জমিহীন অবস্থা চাষাকে কাঙ্গাল করে ছাড়ছে। এ অবস্থা স্থানে স্থানে এসে গেছে। বহু লোক বাস্তুহীন হয়ে জমি ছেড়ে দেউলিয়া সেজে গ্রাম কি গ্রাম উজাড় করে তুলছে।

আর উদাসীন হয়ে থাকলে ভবিষ্যতে জাতীয় মহামৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠবে। জাতির জীবনীশক্তি একেবারে বিলুপ্ত হবে। চাষার মৃত্যু অর্থে জাতির মৃত্যু একথা দিবালোকের মত সত্য। এম এ, বি এ. পাশ করে আমাদের চাষা হতে হবে—জমির নষ্ট শক্তিকে সঞ্জীবিত ও পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে হবে—চাষার অস্তিত্ব যাতে রক্ষা পায় তার চেষ্টা পেতে হবে। জমিদার ও মহাজন ব্যবসায়দারদের অংশ কমাতে হবে। মহাজনের লাভ ও ব্যবসায়দারদের মুনাফা চাষার হাতে দিতে হবে। মহাজন ও ব্যবসায়দারদের টাকা জমির উর্বরতা বৃদ্ধিকল্পে খাটাতে হবে। চাষার অজ্ঞতা, মূর্খতা ও অসহায়তার সুযোগ যাতে তারা না নিতে পারে তার যথাসাধ্য প্রয়াস করতে হবে। চাষাকে জ্ঞানী ও সঙ্ঘবদ্ধ করে তার নিজের অধিকারকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। তারা শ্রম করে যাতে নির্বোধ হয়ে নিঃসহায়ের মত না থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। জমির শক্তিকে ফিরাতে পারলে চাষার চাষের ব্যয়ও কমে যাবে।

চাষা মনে করে জমি যত চষা যাবে ততই ফসল উঠবে ; জমি একেবারে অক্ষয়। একথা ভুল, তা তাকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে। নতুবা সে বিশ্বাস করবে না। এর জন্য দেশ-হিতৈষী ব্যক্তির দায়িত্ব বেশি। যাঁরা বক্তৃতা দিয়ে দিয়েই দেশের সেবা করে আসছেন ; শুধু হয় সরকারকে নাহয় আর কাউকে নিন্দা করেই কর্তব্য শেষ করছেন—তাঁদের প্রতি আমার বলবার কিছু নেই। কিন্তু যাঁরা শিক্ষিত হয়ে চাষার জীবনকে ঘৃন্য মনে করেন অথচ ত্রিশ টাকা বেতনের কেরানি জীবনকে ধন্য ধন্য করে বরণ করে নিচ্ছেন তাঁদের প্রতি আমার এই অনুরোধ। তাঁরা যদি আগ্রহ করে এই চাষার জীবনকে বরণ করতে পারেন আর উপযুক্ত

বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধীরে ধীরে উদ্ভাবন করতে প্রস্তুত হন, আমি জোর গলায় বলতে পারি তাঁরা সহজে ধর্ম ও অর্থে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারবেন।

জমিদার ও সরকারের প্রাপ্য অনেক প্রকারের। জমির বার্ষিক খাজনা ত আছেই তার সঙ্গে আরও অনেক বেশি দিতে হয়। যথা :

ক. পেয়াদার রোজ। খাজনার তাগাদার জন্য লোক (সাধারণত পাইক) পাঠানো হয় তার খোরাকি ও শ্রম বাবদ খরচ।

খ. হিসাবানা। জমিদারের গোমস্তা বা নায়েবের নজর নির্ধারিত খাজনার প্রতি টাকায় এক আনা হইতে ছয় আনা।

গ. পথকর অর্থাৎ সেস নির্ধারিত খাজানার প্রতি টাকায় তিন পয়সা হইতে তিন আনা।

ঘ. কিস্তি খেলাপি সুদ। টাকায় দুই পয়সা হইতে দুই আনা।

ঙ. নজররানা। জমিদার কি ম্যানেজার বা সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট যখন প্রজাদের কল্যাণ কুড়িয়ে আনতে মফঃস্বলে অভিযান করেন তখন প্রত্যেক প্রজাকে হুজুরে হাজির হয়ে এক টাকা হতে দশ পাঁচ টাকা সমানের চিহ্ন প্রদান করতে হয়।

চ. এছাড়া মোকদ্দমা খরচ ত আছেই। প্রজা সময়মত খাজনা দিতে পারে না কাজেই কোর্টে মোকদ্দমা রুজু হয়ে যায়। এটা অন্যূন শতকরা ৬০ জনকে বহন করতে হয়।

ছ. এবার সরকারের দাবি পূরণ করতে হয়। চৌকিদারি ট্যাকস ত বাঁধা আছেই।

মহাজনের প্রাপ্য দুই প্রকারের। বলা হয়েছে চাষাকে টাকাও কর্জ করতে হয় আর ধানও ঋণ করতে হয়। উভয়েরই জন্য তাকে বাড়তি বহন করতে হয়। মহাজন আসলের উপর সুদ ও ধান্যের উপর বাড়তি আদায় করে। আসল ত থাকেই। এই বাড়তি বৎসর বৎসর বেড়ে চলে। কাজেই আসলে আর হাত পরে না। সেটা মহাজনের চিরদিনকার আয়ের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

ব্যবসায়দারদের রক্তশোষণ ক্রিয়া কম নয়। তারা অল্পমূল্যে চাষার ঘর থেকে তার কাঁচা ফসল ক্রয় করে শহরের বড় ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রি করে মোটা লাভ করে। এ লাভটা বস্তুত চাষারই প্রাপ্য কিন্তু চাষার দুর্বুদ্ধির জন্য সে কিছুই পায় না। অনেক সময় ব্যয় যা হয়েছে তার চেয়ে অনেক অল্পে বিক্রি করতে হয় ; কারণ মহাজন ও পাইকের তাগাদা তাকে আধমরা করে তোলে। তাকে নিরুপায় হয়ে যা জুটে তাই নিয়েই নিজের রক্ত ব্যয় করে তৈরি করা ফসলকে ঘর থেকে বের করতে হয়। এমনি করেই চাষার দিন সন্ধ্যা ও রাত্রি প্রভাত হয়ে যাচ্ছে। এই কঠোর নিঃসহায়তা হতে চাষাকে মুক্ত না করতে পারলে জাতির মুক্তি অসম্ভব।

সকলেই ত বড় বড় অংশ অধিকার করে বসল। চাষার ভাগে যে অংশটুকু পড়েছে তার আকার কত ক্ষীণ। এই ক্ষুদ্র অংশের মধ্য হতে তার নিজের শ্রম ও পরিবারের আহার ও পরিধেয় সংগ্রহ করতে হয়। এই সামান্য আয়ে তার সব কিছু কিনতে হয়। আজকার দিনে সরকারের ট্যাকস যতই বাড়ছে, চাষার নিতন্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য ততই মহার্ঘ হয়ে

উঠছে। ওদিকে জমির ফসলও দিন দিন কমে যাচ্ছে। দুদিক হতেই সে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হচ্ছে। ঐ সামান্য উদ্বৃত্ত দিয়ে তাকে দুর্লভ গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতে গিয়ে দুর্গতির চরম সীমায় পৌঁছতে হয়। এই উদ্বৃত্ত যত কম হয়ে যাবে ততই বর্তমানের দুরাচার, পাপ, মিথ্যা ও সর্বপ্রকার দারিদ্র্য শত মুখে ব্যাপ্তি লাভ করবে। এই ক্ষুদ্র উদ্বৃত্তই আজকার সকল দুর্বৃত্তিরই মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই উদ্বৃত্তকে বৃহতাকার করতে হবে। গণতন্ত্রের বিকাশের পথে সরকারের ক্ষুধাবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। আর এ ক্ষুধার শান্তি করতেই হবে নতুবা পাশবিক শক্তির খেলা ও উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম হয়ে উঠবে। কাজেই এই ক্ষুধাকে শান্ত করবার মত শক্তি পেতে হলে চাষাকে বলবান হতে হবে। তাকে পরিপুষ্ট হতে হবে, কারণ সামাজিক সকল ভার তার স্কন্ধে চেপে বসবে। তাকে ধনশালী ও বলশালী হতেই হবে তা না হলে গণতন্ত্র অচল হবে এবং অবশেষে ভেঙ্গে পড়বে! তখনই উভয় সঙ্কট—ভেঙ্গে পড়লেও পুরাতন অশান্তি দুর্জয় হয়ে উঠবে আর টিকে থাকলেও চাষা ভেঙ্গে পড়বে। সমাজের খেলাঘর চুরমার হয়ে যাবে।

এস্থলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী কয়টি তাহা দেখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রধানত আমাদের দেশবাসীকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে! কৃষক, মধ্যবিত্ত ও ধনী। কিন্তু ধনীর সংখ্যা এত কম যে এদেশবাসীকে সাধারণত মোটামুটি কৃষক ও মধ্যবিত্ত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করাই যুক্তিযুক্ত। এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী কৃষক শ্রেণীর উপর চেপে বসেছে।

দেশের লোকদিগকে মোটামুটি দুভাগে বিভক্ত করা যাক—কৃষিজীবি সম্প্রদায় ও মধ্যবিত্ত (middle class) সম্প্রদায়। যাকে আমি অকৃষকশ্রেণী বলতে চাই, চাষের কাজ করে না। কৃষকশ্রেণীই সংখ্যায় বেশি। চাষার সংখ্যা শতকরা ৭০ এরও বেশি। কৃষকদের মধ্যে সকলেরই কিছু না কিছু, দুই এক কাঠা জমি ছিল; কিন্তু আজ এমন কৃষক দেখা যাচ্ছে যার এক ছটাকও জমি নাই; দিন আনা, দিন শ্রম করা, দিন উপার্জন করাই তার জীবন ধারণের একমাত্র উপায় হয়েছে। আবার জমিহীনদের অনেককে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হচ্ছে। এই ভিক্ষাবৃত্তিকে এক সম্প্রদায় ব্যবসায় ও পরিবারের আয়ের উপায় করে নিয়েছে। এই ভিক্ষুক শ্রেণী প্রতি বৎসর সংখ্যায় বেড়ে যাচ্ছে। জমি হতে বিতাড়িত হয়ে দায়গ্রস্ত চাষা হয় দৈনিক পরের ক্ষেতে খেটে পেটের ক্ষুধা নিবারণ করছে—নাহয় শহরে গিয়ে কলে ঢুকছে আর না হয় সহজ সরল ভিক্ষার রাস্তা ধরে সটান শহরের দ্বারে দ্বারে ফিরতে লেগে যাচ্ছে। এছাড়া তাদের আর উপায় নাই। তার গৃহশিল্প লোপ পেয়েছে। সে অবসর সময়ে তার আচ্ছাদন নিজ হাতে তৈরি করত, আজ তাকে পরের দুয়ারে তার জন্য হাত পেতে বেড়াতে হচ্ছে। এ অভিশাপ হতে কবে তার মুক্তি হবে কে জানে? সামাজিক প্রথা এর ওপর নিদারুণ হয়ে ব্যাপারটা আরও সাংঘাতিক করে তুলেছে।

এদেশের প্রথা, বাল্যকালে বিবাহ করতেই হবে। জমিহীন চাষা পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে একেবারে পল্লী ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াচ্ছে। পুত্রকন্যা আসছে, অকালে বিদায় নিচ্ছে কিন্তু এ দুঃখের মাঝেও এ অবিরাম আসা যাওয়ার শেষ হচ্ছে না। দুঃখ শতগুণ বেড়ে যাচ্ছে। অভাব চুতুর্দিকে হুঙ্কার ছাড়ছে! ভীতচকিত হয়ে অবস্থাপন্ন পরিবার ও শহরবাসী দ্বার রুদ্ধ করে

দিচ্ছে। কাঙ্গাল এবার পথের পরে মরে থাকছে। কে কারে দেখে? শহরে এ দৃশ্য অতীব সচরাচর ঘটছে। সভ্যতা ও অর্থ শহরেই জমেছে। সেই লোভে পল্লী ছেড়ে জমি ছেড়ে বিপন্ন চাষা শহরের অলি গলিতে চিৎকার করে ফিরছে। তার করুণ ক্রন্দন বড় বড় কোঠা ডিঙ্গিয়ে আকাশে বাতাসে মিশে যাচ্ছে কিন্তু শহরের গৃহ প্রাঙ্গনে ঢুকছে না। এই শ্রেণীর ভিক্ষুকদের শ্রমশক্তি একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই কিন্তু শ্রম করবে কোথায়? কাজ জুটিছে না। যারা অক্ষম তারা ত পথেই পড়ে রয়েছে। এখন দেখা গেল জমি যাদের নেই তারা হয় ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে আর নাহয় পরের ক্ষেতে কি অন্যত্র পরিশ্রম করে জীবিকার সংস্থান করছে। জমি যাদের আছে তাদের মধ্যে কেহ বা অতি অনটনের মধ্যে জমির চাষ করে ফসল তুলছে—ঘুরিয়ে আনতে ফুরিয়ে যাচ্ছে। আর অবশিষ্ট সকলে একরূপ অভাবের উৎপীড়নকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে কিন্তু কেহই অভাবের উপরে উঠতে পারছে না।

তারপর অকৃষক শ্রেণীর কথা বলা যাক। ইহাদিগকে পাঁচটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীতে সংক্ষেপে বিভক্ত করা যায়। এই শ্রেণীগুলির মধ্যে রাজসেবা ও চাকুরি সবচেয়ে অধিকাংশের পেশা হয়েছে। শিল্পীদের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হতে বসেছে। যে ভারতশিল্প এক সময়ে রোমের রাজ্ঞীকে বিমুগ্ধ করেছিল—যে শিল্প ভারতবাসীকে নানা আনন্দের সামগ্রীতে প্রফুল্ল করত—যে শিল্প ভারতনারীর নিত্যকার্যে ও অবসরে বিরাম এনে দিত—যে শিল্প ভারত সভ্যতাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীরাষ্ট্র ও গৃহপরিবারকে শান্তনিবিড় প্রাচুর্যের মধ্যে পূর্ণ সার্থক করে তুলেছিল—সেই শিল্প আজ কলের হাওয়ায় বিমলিন বিশুষ্ক হয়ে গেছে। এখন তারই পরিবর্তে কলের অপরিসীম তৃষ্ণা জীবনকে তীব্র ব্যস্ততায় ভরতে বসেছে—একি ভয়ানক! ব্যবসায়দারদের মধ্যে সকলই ব্যবহার্য পদার্থের স্থান পরিবর্তন করেই অর্থ সংগ্রহ করছেন। জমিদার ও মহাজনদের কথা বলে কাজ নাই। এখন দেখা হল যে, এই অকৃষকশ্রেণীর মধ্যে মুষ্টিমেয় শিল্পী ব্যতীত বাকি সকলই অনুৎপাদক। সকলই চাষার ঘাড়ের উপর চেপে বসে রয়েছে। চাকুরে গভর্নমেন্টের ঘর হতে আনছেন আর গভর্নমেন্টের আয় অধিকাংশ অবশেষে চাষার ক্ষেত হতে উঠে। জমিদার ও মহাজন চাষার সঙ্গে কারবার করেই বড় মানুষের বাহাদুরি বজায় করেন। ব্যবসায়ী চাষার উৎপন্নকে কমমূল্যে ক্রয় করে চাষার লাভকে গ্রাস করে; আবার বিদেশ হতে সামগ্রী এনে ঐ চাষার নিকটই অধিক মূল্যে বিক্রয় করে তার রক্তে নিজে পুষ্ট হয়—এই করেই ব্যবসায়ী ধনাঢ্য হয়ে উঠছে। তারা কৃপা করেও বেচারা চাষাকে এতটুকু ছাড়তে চায় না।

এখন চাষার দারিদ্র্য কিরূপে দেশের অর্থাৎ গোটা ভারতের দারিদ্র্য ঘোষণা করে এই কথাই বলতে চাই। খাদ্য দ্রব্য হতে আরম্ভ করে কয়েকটী দফা বিচার করলেই প্রতিপন্ন হবে যে, চাষার দারিদ্র্য ভারতের দারিদ্র্য জ্ঞাপন করছে। আর ভারত দরিদ্র হতে দরিদ্রতর হচ্ছে।

প্রথম খাদ্য সামগ্রী ধরা যাক। জমি খুঁড়ে চাষা খাদ্য দ্রব্যকে বের করছে। তার অধিকাংশ বেচে তাকে বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় পরিধেয় ইত্যাদি আনতে হচ্ছে, কাজেই তার আহার কমে গেছে। আজকাল ভারতে প্রায় শতকরা ৬৪ জন লোক অর্ধাহারে ও অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। খুব বেশি হয়ত মোটে শতকরা ৫ জন একটু পেট ভরে খেতে পায়। লোকসংখ্যা

ক্রমাগত বেড়ে চলছে। জন্মের সংখ্যাও বেশি এবং মৃত্যুর সংখ্যাও বেশি, কিন্তু তাহলেও লোকসংখ্যা মোটের উপর বেশি হয়েছে। বিদেশ হতে এসে দিন দিন ভারতের মাটিতে বহু বিদেশী বাসা বাঁধছে। ভারতের আহার্য বিদেশীরাও অবলম্বন করছে আবার এই কাঁচা উৎপন্নকে বিদেশে পাঠিয়ে ভারতের শাসনব্যয় ও বিদেশীয় পণ্য আমদানির মূল্য পরিশোধ করতে হয়। সুতরাং লোকসংখ্যার পরিমাণে খাদ্যের পরিমাণ অনুপাতে কম হয়ে গেছে। এর ওপর আবার জমির শক্তি কমে গেছে বলে জমি খাদ্য দিচ্ছেও কম। এই উভয় টানে চাষা মাঝখানে নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে দুর্ভিক্ষ ও অনাহারকেই অদৃষ্টের লেখা বলে ধরে নিয়েছে।

অর্থজ্ঞ ম্যালথাস বলেন, মানুষের জননলিপ্সা চিরন্তন ও অতীব প্রবল— একে দমন করা সুকঠিন। আবার প্রকৃতিও অত্যন্ত কৃপণ। মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে কিন্তু তদনুপাতে প্রকৃতি আহার যোগাবে অনেক কম। এ অবস্থায় অনেক মানুষকেই অনাহারে অর্ধাহারে থাকতে হবে। পরাক্রান্ত যারা তারাই সিংহের অংশ ভোগ করবে আর দুর্বলকে অল্প নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ফলে দুর্বলেরা নিয়তির কবলে ধরা দেবে। মৃত্যু, রোগ, জরা, দুর্গতি, দারিদ্র্য, দুরাচার ও পাপ ধীরে ধীরে দুর্বলকে নিষ্পেষিত করতে থাকবে। রণে ভঙ্গ দিয়ে দুর্বল তাদের হাতে ধরা পড়বে। এই জননলিপ্সাকে যথাসম্ভব সংযত করতে হবে, লোকসংখ্যাকে আহার্যের অনুপাতে সমান করে রাখতে হবে। আহার্যের আয়োজন না করে কোন মানুষই যেন জননলিপ্সার পরিতৃপ্তি সাধনে ব্যগ্র না হয়। সে যে করেই হোক। সামাজিক প্রথাকে যদি তার জন্য উল্লঙ্ঘন কিংবা সংস্কার করতে হয় সেও করতে হবে। বেশি বয়সে বিবাহ করতে হবে, উপার্জনের উপায় করে। বাল্য-বিবাহকে উড়িয়ে দিতে হবে এবং বিবাহকে অনিবার্য করে তুলতে হবে না। তাহলে সমাজ রোগ ও পাপ, দুরাচার ও দারিদ্র্যের হাত হতে মুক্তি লাভ করবে। সকলেই পেট ভরে খেতে পাবে। এই কথাটা কি আমাদের পক্ষে খাটে না? বিবাহ দিতেই হবে কিন্তু খাওয়ার আছে কিনা তা দেখে কাজ নেই। অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। এই মন্ত্রবলে চলে ব্যাপারটা যা হয়েছে তা ত দেখাই যাচ্ছে। শত শত জন্মলাভ করছে আবার পরমুহূর্তে শত শত মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিচ্ছে। রোগ, শোক দুর্গতি আমাদের চিরসহচর হয়ে বসেছে। জাতির শারীরিক শক্তি এতে করে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হচ্ছে। বিশেষত নারীজাতি আমাদের সবচেয়ে নিষ্ঠুর বেদনায় দিন গুজরান করছে। এখন অবস্থাটা কোন দিকে দ্রুত চলেছে তা বুঝা হল। আনাহার অর্ধাহারে যে জাতির অধিকাংশই দিনরাত কাটাচ্ছে সে জাতিকে কি দরিদ্র বলতে হবে না? আর এইরূপে যদি চলতে থাকে তাহলে কি দরিদ্রতর থাকবে না? মাটি যোগাবে কম আর লোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং বিদেশে পাঠাতেই হবে এতে কি ক্রমশই প্রতি মানুষের অংশ কমে যাবে না?

দ্বিতীয়ত ধরা আবশ্যক গবাদি কৃষি উপযোগী পশুর কথা। গরুই হচ্ছে আমাদের চাষের একমাত্র বাহন। গরু না হলে চাষ বন্ধ থাকবে এই গরু দিন দিন ধ্বংসের পথে উঠছে। বৎসর বৎসর তিন চার লক্ষ গরু, অধিকাংশই গাভী, বিদেশে রপ্তানি হয়ে যাচ্ছে। ঐ সকল গাভীর দুধ জমিয়ে টিনের বাকসে করে বিদেশীরা আমাদের দেশে পাঠায় আর আমাদের শহরের চাকুরিজীবিরা ঐ জমান দুধ তরল করে সদ্যজাত শিশুর প্রাণ রক্ষা করেন। জীয়ন্ত গাভীর দুধ

তাদের জোটে না বা সংগ্রহ করতে তাঁরা শ্রম সাপেক্ষ মনে করেন। এই জমানো দুধ খাওয়ানর অন্য আরও কারণ আছে সেটা না বলাই ভাল।

জাতির সর্বনাশ এতে সূচিত হবে না ত কিসে হবে? আমরা স্থানে স্থানে গোহত্যা নিবারণী সভা করতে বহু প্রয়াস পাই কিন্তু কোন দিন এই নির্দয় শোষণ প্রক্রিয়াকে একটীবার অঙ্গুলি নির্দেশ করেও দেখাতে চাই না। ক্রোধ বা হিংসাজাত রিজল্যুশনের (সভার প্রস্তাব) তর্জন গর্জনে ধর্মের সংস্কারকে উৎপাটিত করা যায় না। শারীরিক অভাবই এই সংস্কারকে শিথিল করবে ও করতে আরম্ভ করেছে। আজ কাল এ কথা বলতে গেলে বিপদে পড়তে হয় কিন্তু এ কথা বলবার আবশ্যকতা আছে।

গোহত্যা চাষার (মুসলমান) দুনিয়া হতে উঠে যাচ্ছে। এটা সবার জন্য নয়। নিদারুণ ইকনমিক ধর্ম তাকে পালন করতে হচ্ছে বলে তার 'কেতাবের' ধর্ম, ধীরে ধীরে অবসর গ্রহণ করছে। এ কথা অস্বীকার করলে চলবে না। দু দশ বৎসর পূর্বে যেখানে যে সংখ্যায় গোহত্যা হত আজ সেখানে একেবারে উঠে গেছে না হয় নাম মাত্র হচ্ছে। কিসে এটা হল? তার গো-হত্যারূপ ধর্ম-বিলাসিতাকে উপভোগ করবার অবস্থা আর নেই। তার ধর্ম-তেজ নির্বাপিত হয়ে গেছে। কালক্রমে এইটাই অভ্যাস গত হয়ে দাঁড়াবে ও শিক্ষার প্রভাবে কৃষি-কার্যে গোজাতির স্থান কত আদরের তা সে বুঝবে—গোহত্যা চাষার ইকনমিক রাজ্যে আর দেখা যাবে না। প্রাণের ধর্মের সঙ্গে এই বিলোপ বিরোধী বলে মনে হবে না। এ ত গেল পল্লীর অবস্থা। শহরের ব্যবস্থা কি হবে? হিন্দু মুসলমান ত উভয়ের বিরোধকে মিটিয়ে নিলে। অপর ধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা নূতন করে করতে হবে। আমার কথা শেষ হয় নি।

গোহত্যায় গো-সংখ্যা কমে যেতে পারে কিন্তু গোজাতির শারীরিক অধঃপতনের কারণ কি? সে জন্যও কি গোহত্যাকারী দায়ী? পল্লী মাঠে ধর্মের জন্য বৃষের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সে প্রথা উঠে গেছে। এখানেও ইকনমিক ধর্ম এসে প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেতাবের ধর্ম বা সংস্কারগত ধর্মকে হিন্দু মুসলমান উভয়ই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়ে ইকনমিক ধর্মকে মাথায় করে তুলেছে। কারণ শারীরিক অভাবই অন্তরের অভাবকে ডিঙ্গিয়ে যায় শতকরা ৯৫ জনের জীবনে। কাজেই সেটাকে একটা অপরিহার্য পরিতাপের বিষয় বলে মানতে হবেই। এই শারীরিক অভাবের কঠোরতা যেখানে মাথা উঁচু করেছে সেখানে অন্তরের ধর্মকে জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে। এটা সাধারণ জীবনে নিত্যই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এই শারীরিক অভাবকে নিবারণ করবার সহজ উপায় না হলে মানুষ অনন্তের পথ ধরতে পারবে না,—অশান্ত কোলাহলে বিক্ষুব্ধ তৃষ্ণার জ্বালায় ছটফট করেই জীবন সাঙ্গ করবে।

তাই বলছিলাম বিদেশে গাভীর রপ্তানি ও গোজাতির অধঃপতন—এই দুইটি বিশেষ করে আমাদের কৃষিকে অচল করে তুলবার উপক্রম করছে। প্রতি বৎসর লাখ লাখ গাভী দেশ ছেড়ে যায়—অবশিষ্ট নির্জীব গাভী ও অপেক্ষাকৃত কৃশ খর্ব বৃষ হ'তে যে গরুর জন্ম হয় তার দ্বারা চাষাকে চাষ করতে হয়। গাভীকে লাঙ্গলে কাঁধ বাঁধাতে হয়েছে আবার অপরিণত বয়স্ক গো শিশুকেও লাঙল টানতে হচ্ছে—এতে করে গোজাতির অধঃপতন হবে না কেন?

এবার বলব লজ্জা নিবারণের কথা। কলের জন্মের পূর্বে আমাদের কোটি কোটি ভারতবাসী নিজ হাতে আচ্ছাদন তৈরি করত, বিদেশে পাঠাত, সুখে জমির দানকে ভোগ করত। গাভীর সদ্য দুগ্ধ, পুকুরের টাটকা মাছ আর ক্ষেতের ধান এখন স্বপ্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু এক সময় ছিল, যখন এই জিনিসটা সাধারণের নিত্য জীবনের শান্তি জুটিয়ে দিত। আজ আমরা হাত চালানো বন্ধ করেছি। কলের উপর ভরসা করেই আছি। কল যখন যা খুশী তাই করে আমাদের খাটিয়ে নিচ্ছে। আমরা কলের সেবা করতে কুণ্ঠিত নই। আমাদের আচ্ছাদন কলের দেশ থেকে আসছে—আমরা মাটির দানকে দিয়ে সেটা নিয়ে গতর ঢেকে রাখছি। তাই কেহ কেহ বলেন, 'আমাদের' দেশের লোক আগের চেয়ে সহজেই কলের কাপড়ে গা ঢাকতে পারছে। কলের কাপড় এখন যে পরিমাণে আমাদের কোটি কোটি চাষাকে ঢাকতে পারছে কলের পূর্বে তার অর্ধেকও ঢাকা পড়ত না। তিন শ বৎসর পূর্বে আমাদের চাষা এত মূল্যে শস্য বিক্রি করতে পারত না। আর এত বেশি করে গা ঢাকতেও.পারত না। কল এসে তাকে বাঁচিয়েছে।" এই অভিমতটীকে খণ্ডন করবার সময় এসেছে।

কলভক্ত বেজায় যাঁরা তাঁরা এটা মেনেই নেবেন ; কিন্তু আমার পক্ষে মেনে নেওয়া কেন শক্ত তাই বলতে চাই। আমাদের দেশের চাষারা পূর্বের মত গা ঢাকতে পারছে কি না সে যাঁরা শীতের সময় পল্লীর পাড়ায় ঘুরেছেন তাঁরাই ভাল বলতে পারবেন। চাষারা যুদ্ধের সময়ে উচ্চমূল্যে শস্য বেচেছিল কিন্তু তার অধিকাংশই বড় বড় বাঁধা অংশিদার লুটে নিয়েছিল উচ্চমূল্যের যথার্থ লাভ ব্যবসায়ীর পকেটে গেছে। জমিদার মহাজন তার বাড়তি বেশি করে আদায় করেছে। সকলই জানেন শস্যের মূল্য মহার্ঘ হলে জমিদার খাজনার হার বৃদ্ধি করেন। কাজেই চাষা যে তিমিরে সেই তিমিরেই ছিল। উচ্চ মূল্যের সুযোগ সে ভোগ করতে পারেনি। কিন্তু পক্ষান্তরে কিনতে হয়েছে চারগুণ পাঁচগুণ মূল্যে। ধূর্ত গৃধ্নু ব্যবসায়ী ত কড়া-ক্রান্তিও ছাড়েনি। চাষা এক গুণ পেয়েছে ত দশগুণ তাকে দিতে হয়েছে। অতএব শস্যের উচ্চ মূল্য বাজারে হয়েছিল বলে যে চাষা পেয়েছিল একথা বলা নেহাৎ ভুল। চাষা অজ্ঞ, মূর্খ, সে সুযোগ বুঝতে পারে না। শীতের সময় কাঠের আগুনে চাষার পরিবারকে সকাল সন্ধ্যা ও রাত্রি কাটাতে হয়েছে ও হচ্ছে। পুত্র কন্যা পরিবার একখানার বেশি কাপড় পরতে পায় না। শস্যের উপরই তার সব নির্ভর করে। কি করে সে বেশি করে গা ঢাকবে? নিতান্ত আবশ্যকীয় পরিধেয়ই সে সংগ্রহ করতে পারে না। কল এসে তাকে পঙ্গু করেছে। সে নিজে কাপড় তৈরি করবার পথ ভুলে গেছে। কাজেই তাকে কলের উপর নির্ভর করতে হয়। আর চাষার এই নিরুপায়কে ব্যবসায়ী যতদূর পারছে ব্যবহার করে নিজের লাভের পিপাসাকে চরিতার্থ করছে। এই নিরুপায়কে বিনাশ করতে হবে। চাষার ঘরে কাপড় তৈরির কৌশলকে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এস্থলে ঘরে বসে কাপড় তৈরি করলে যথেষ্ট হবে কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। কলকে একেবারে বর্জন করে হাতের শিল্পকে প্রাধান্য দিলে আমাদের আচ্ছাদন ব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে কিনা এই কথাটার মীমাংসার জন্য অনেকেই ব্যস্ত। এ প্রশ্নের সমাধান কল্পে আমিও দু একটা কথার উল্লেখ করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

কল ও চরকা

কল আমাদের মুষ্টিমেয় বাবু শ্রেণীকে ফাইন সাজে সাজিয়েছে বটে, কিন্তু কোটি কোটি নর নারী কোন গতিতে লজ্জা নিবারণ করছে? কল তাদের আচ্ছাদনকৃচ্ছ্রতাকে নিবারণ করতে সমর্থ হয় নি। তার কারণ অনেক। বর্তমানে আমাদের কাপড় আসছে তিন দিক হতে যথা— সাগরপারের কল, দেশের কল ও হাতের তাঁত। কল এসেও হাতের তাঁত মেরে ফেলতে পারেনি। তাঁতের আবশ্যকতা আছে। তাঁত আমাদের ধাতের জিনিস। একে তুলে দেওয়ার চেষ্টা আত্মঘাতী হবে। তাঁত আমাদের চাষার 'কাজের কাপড়' গামছা তৈরি করছে। বহুমূল্য সূক্ষ্ম শিল্পও তাঁতে হচ্ছে। কল এসে চরকাকে মেরে ফেলেছে। সূতা আমরা তৈরি করতে পারছি না। সাগরপারের কল কাপড় পাঠাচ্ছে আর দশ বিশগুণ লাভ করে চাষার শ্রমফলকে কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কল সূক্ষ্ম হালকা জিনিস পাঠাবে, আমাদের ভারী জিনিস দিয়ে তা কিনতে হবে। আমাদের খরচ বেশি। ক্ষতি আমাদেরই। তা ছাড়া আমাদের দেশের লোক হয় চাকরি করবে না হয় জমি চষবে, আর ওপারে কলে উৎপাদন করবে।

এখন এই উভয়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ইকনমিক সূত্র প্রযুক্ত হতে পারে না। উভয়েই যদি যন্ত্রশিল্প অবলম্বন করে দুইটী বিভিন্ন দ্রব্যের সৃষ্টি করত তাহলে উভয় দেশের অবস্থা বিশেষত দ্রব্যদ্বয়ের আদান প্রদানে উভয় দেশই লাভবান হত ; কিন্তু একদেশের লোক উৎপন্ন করবে আর একদেশের লোক নিরিবিলি সেটাকে ক্রয় করবে কাঁচা দ্রব্যের বিনিময়ে, সেটা শেষোক্ত দেশের পক্ষে কল্যাণকর নয়। কাজের বিনিময় কাজ হলে একে অপরের দ্বারা সাহায্য ও লাভ পেতে পারে। কিন্তু কাজের বিনিময় অকাজ ; সেখানে লাভ হওয়া ত দূরের কথা, একে অপরকে শুধু শোষণ করতে থাকে। এ অবস্থায় আমাদের দেহের আবরণের জন্য সাগরপারে কল বসিয়ে যদি আমরা হা করে বসেই থাকি তা হলে এমন সময় আসবে যখন আমরা লজ্জা নিবারণ করতে পারব না। এছাড়া যদি কোন কারণে কল বন্ধ হয়ে যায় তা হলে ত সর্বনাশ! সুতরাং যে করে হোক আমাদের দেশের মধ্যে কাপড় তৈরির ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে চাষার রক্ত শুকিয়ে যাবে ; সে মরবে ; সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সকলই ঠক ঠক করে খসে মাটির উপর বসে পড়বে। এ অবাক করবার কল্পনা নয়। কাপড় তৈরি দেশের মধ্যেই হওয়া চাই, এটা বোধ হয় সকলেই মানবেন। তবে তৈরি করতে হবে কলে না হাতে? কলে যদি করা যায় তাহলে পশ্চিমের ধনে ও শ্রমে যে তুমুল দ্বন্দ্ব সমাজের ভিত্তি ভূমিসাত করতে বসেছে সেই ধন ও শ্রমের অভিনয়–লোমহর্ষক কাণ্ড–করে শত ছিন্ন ভারতকে দীর্ণ বিদীর্ণ করে ফেলবে। শ্রমীর দল বেড়ে যাবে। ব্যবসায়ী পকেট পূর্ণ করে ধনের স্পর্দ্ধায় শ্রমীকে অবজ্ঞা করতে থাকবে। এই উৎপন্নের অসমান বন্টনের অবিচার পুঞ্জীভূত

হয়ে সমাজের প্রতি শিরা, প্রতি রক্তবিন্দুকে বিদ্রোহী করে তুলবে। এ অশান্তির দুঃখ এখনই ভারতকে প্রপীড়িত করতে শুরু করছে। পল্লী শূন্য হয়ে শহর ভরে যাবে। কলের আওতায় শত শত আবালবৃদ্ধবনিতা শ্রমী হয়ে নানা নির্যাতনের হাতে পড়ে জীবন্মৃত হয়ে পড়বে। শহরের ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে শত শত শ্রমীর একত্র অবস্থান কি ভয়াবহ তাহা কলিকাতার মেছুয়াবাজার ও টিটাগড়ের মিলক্ষেত্র যাঁরা দেখেছেন তাঁরা কথঞ্চিত হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। এতে নৈতিক পদ্ধতিকে নির্লজ্জভাবে লঙ্ঘন করতে তারা বাধ্য হয়। পাটের কলের শ্রমীদের বাসের আড্ডায় গেলে বুঝা যায় শ্রমীর জীবন ও পশুর জীবনের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রাককাল হতে শ্রমীর অভিযোগকে মিটিয়ে দিতে কত না প্রয়াস চলছে কিন্তু শ্রমীর অভিযোগ ক্রমশ উচ্চৈঃরবে আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। শ্রমীর দুঃখ বেড়েই চলেছে। তার নিবৃত্তি হয়নি ও হওয়ার আশাও করা যায় না ; যদি গতানুগতিক ভাবকে পরিত্যাগ করে কলকে সরল না করা হয়। সুতরাং পল্লীতে পল্লীতে নগরে নগরে কলের আখড়া করলে চাষার যেমন আজ অবস্থা তাতে, সে ভুঁই ছেড়ে কলে ঢুকবে, জমি 'আল্লা আল্লা' করবে ; তারপর আস্ত ইউরোপ এসে ভারতে ঢুকবে, তখন লেগে যাবে একেবারে যুদ্ধ।

আর এক দিক হতে ব্যাপার আরও শোচনীয় হয়ে উঠবে। ইউরোপে কল শিল্পরাজ্যে বিপ্লব এনেছিল ও সঙ্গে সঙ্গে কৃষিরাজ্যেও সমভাবে পরিবর্তন সাধন করেছিল। আমাদের দেশের বর্তমানে কল আসবে শিল্প জাগাতে কিন্তু কৃষি চির–অবহেলার সামগ্রী হয়ে উপবাস করবে। এর পরিণাম হবে ভয়ানক। আমেরিকার পূর্বভাগ শিল্পের জন্য বিখ্যাত কিন্তু পশ্চিমভাগের ষোল আনাই কৃষির জন্য বাঁধা রয়েছে। উভয় স্থলে কল লেগেছে। কৃষি শিল্পের ইন্ধন যোগাচ্ছে। উভয়ই স্ফূর্তি লাভ করেছে। বড় বড় ধনী কৃষির উন্নতি কল্পে সময়, অর্থ ও বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যয় করেছে। আমাদের দেশে কৃষির উন্নতি হবে না। শিল্পের ইন্ধন বিদেশ হতে আনতে হবে। আবার যে ঋণী—সেই ঋণীই হতে হবে। আমাদের কৃষি প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সময় সময় কৃষির জন্য পল্লীমাঠে বহুসংখ্যক কৃষি শ্রমীর আবশ্যক হয়। বর্তমানে কৃষিশ্রম মহার্ঘ ও দুলর্ভ হয়ে উঠেছে একথা সকলই জানতে পেরেছে। তাহলে কলে যখন দেশ ছেয়ে যাবে তখন বাঁধা বেতনের জন্য জমির শীতাতপের হাত হতে মুক্তি পাওয়ার লোভে সকলে কলের ছাউনিতে যেয়ে হাত লাগিয়ে দেবে। কৃষিশ্রম আরও দুর্লভ হয়ে উঠবে। অধিক মূল্য দিয়ে চাষ কার্য নির্বাহ করা তখন বিষম ক্ষতিকর ঠেকবে ; অনেকেই হাল ছেড়ে দিয়ে কল ধরবে।

আমি বলেছি কৃষির যদি উন্নতি না হয় তাহলে এই কলের লোভ দিন দিন বেড়ে যাবে। কিন্তু ধরা গেল কৃষি উন্নত প্রক্রিয়ার সাহায্যে বেশ স্ফূর্তিলাভ করল। তখনও কলের লোভ কমবে না। কলের মধ্যে দুরবস্থা ঘটবে এবং তারই মধ্য হতে যে দুর্বল কৃশ বালক বালিকার জন্ম হবে তারা কর্মী হবে কম। কলের মালিক তাদিগকে বিদায় দিয়ে অতিশ্রমী কৃষক সন্তানকে কলে নিযুক্ত করবে। রুগ্ন, ক্ষীণ, খর্ব সন্তান পথের ভিখারি হয়ে শহরের আকাশ বাতাসকে করুণ ক্রন্দনে উতলা করে ফিরবে। কৃষি অনাদৃত হয়েই থাকবে।

বর্তমানের এহেন অবস্থায় চরকা ও তাঁত আমাদের দুঃখ নিবারণ করতে পারবে অনেকটা। চাষারা বৎসরের সকল সময়েই জমির উপর বসে থাকে না। তাদের অনেক অবসর আছে। এই অবসর সময় তাঁরা চরকা ও তাঁতের সদ্ব্যবহার করতে পারে। এই চরকা ও তাঁত অতি সামান্য ব্যয়ে গৃহে খাড়া করা যেতে পারে কিন্তু একটা কলে লক্ষ লক্ষ টাকার আবশ্যক। আমাদের দরিদ্র দেশে লক্ষ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে না। কল বসাতে গেলেই বিদেশী ধনী এসে টাকা খাটাবে। চা বাগানের মালিক অনেকেই বিদেশী। বোম্বাই-এর সূতা ও কাপড়ের মিল বিদেশীর হাতে। এদেশে পাটের কল বিদেশীর। বিদেশী মালিক হয়ে আমাদিগকে ক্রীতদাস করে তুলবে আর আমাদেরই পরিশ্রমের ফল বিদেশীর গোলা ভরতি করবে।

এ অবস্থা কি সুখের হবে? আজ চাষা বৎসরের অনেক সময় কাজ না পেয়ে আলস্যে সময় কাটাতে বাধ্য হয়। এতে আলস্য তাকে পেয়ে বসে। আমাদের চাষার স্ত্রীকন্যা চাষার কর্মক্ষেত্রের নিত্য সহচরী—পাঁচ বৎসরের ছেলেটিকেও সে বসিয়ে রাখতে পারে না। তাকে তার পিতার সাহায্যের জন্য মাঠে বেরুতে হয়। বিদ্যাশিক্ষারও সময় তার জোটে না। অর্থের অভাব ত আছেই। সময়ের অভাব আছে। পাঁচ ছয় বৎসরের বালককে মাঠের কাজে পিতার সঙ্গী হতে হচ্ছে। স্ত্রী-কন্যাকে ত গৃহের সব কিছুই করতে হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে চাষার পরিবারের কেউ বসে নেই। এটা ঘটে বিশেষ করে যখন চাষের কাজ খুব বেগে শুরু হয়। আবার মাঠের কাজ ফুরিয়ে গেলে এদের সকলেই একরূপ অবসর পায়। এই অবসর সময়ে চাষা কোন কাজই পায় না। এই অবসর সময় যদি স্ত্রী কন্যা পুত্র ও বৃদ্ধ মাতা ও আত্মীয়ার প্রত্যেকে শক্তি অনুযায়ী চরকা ও তাঁতে কাজ করতে পারে—বৎসরের প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদ অনায়াসে গুছিয়ে তুলতে পারে এবং এই পরিচ্ছদের জন্য আবশ্যকীয় তুলা ক্ষেতে তৈরি করতে পারে। তাহলে ঘরের কাঁচা ফসল ব্যবসায়ীর হাতে নিরুপায় হয়ে আর তুলে দিতে হয় না। আর শত শত বিঘায় পাট জন্মাতে ও তাহতে অর্থ করতে চাষার জীবনশক্তি বৎসর বৎসর যে পরিমাণ কমছে—পাট তুলে দিয়ে তুলার পত্তন করলে সে শক্তিটা অপচয় হতে পারে না। অবশ্য টাকার জন্য পাট অত অধিক পরিমাণে করবার আবশ্যক কি? ঘর দুয়ার প্রভৃতির জন্য আবশ্যকীয় সামান্য কিছু করা যেতে পারে। ইহাতে বৎসর বৎসর নদী বিল খাল খানা ডোবা পুষ্করিণী যেরূপ পুতিগন্ধময় অস্বাস্থ্যকর হয় তাহাও নিবারিত হতে পারে। পাট ধোয়ার মৌসুমে চাষাকে যে নানাব্যাধির হাতে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় সেটাও কমে। তাই বলি চরকা ও তাঁত প্রবর্তিত হলে কলের নিরবচ্ছিন্ন শত দুঃখকে দূরে রাখা হবে—চাষার অবসর সময়ে কাজ দেওয়া হবে—অল্পব্যয়ে প্রত্যেকেই শান্তির সঙ্গে চরকা ও তাঁত ঘরে খাড়া করতে পারবে—আর কলি যুগের যে অনবচ্ছেদ ছবি—অবিরাম স্রোতের মত ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি—ধীরে ধীরে মুছে যাবে—ভিক্ষুকেরা অনেকেই চরকায় কাজ করতে পারবে। আজ লাখ লাখ ভিক্ষুকের শতকরা ৯০ জন কার্যক্ষম দেখতে পাবেন। অন্তত তারা চরকার সহজ কাজ অনায়াসে পল্লীর মুক্ত হাওয়ায় বসে করতে সমর্থ হবে। আর আমাদের এত কোটি নরনারী বালক বালিকা সকলই যদি চরকায় লেগে যায় তবে কত সূতা ও কত

কাপড় তৈরি হতে পারে। কে বলে যে, চরকা ও তাঁত আমাদের দেশকে নগ্নতা হতে মুক্তি দিতে পারবে না? যে সময় গেছে তখন কি ভারতের লোকসংখ্যা এতই কম ছিল এবং ভারত কি তখন উলঙ্গ হয়ে থাকত? একথা জোর করে বলতে পারা যায় কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে বিশ্বাস করা যায় না। চরকা ও তাঁত পরিচ্ছদ প্রশ্নকে সুচারুরূপে সমাধান করবে এ দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে। এই চরকা ও তাঁত কলের মত গৃহ পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করবে না—গৃহের শান্তিকে নিবিড় করে তুলবে—সহৃদয়তা মধুর হয়ে জমে উঠবে ; চরকার গানে পল্লীর লতাপাতা ও বনস্পতিশাখা ভরে গিয়ে প্রকৃতির সুরভিকে আরও গভীর মনোরম করে তুলবে। মাঠের মুক্ত বক্ষে কাজ করে চাষা গৃহে ফিরে চরকার গানে বিশ্রাম লাভ করবে।

কল হতে ফিরে শ্রমীকে আঁধার নিরানন্দ কুটীরে রাত্রি প্রভাত করতে হয়—ভাল করে নিঃশ্বাস ফেলবার মত একটুকু খোলা স্থান তার অদৃষ্টে জোটে না। নিরন্তর ব্যস্ততা ও অবিশ্রান্ত কোলাহলে তাঁর জীবনের সকল প্রফুল্লতা ডুবে যায়। এ দৃশ্য আমাদের ভারতে মুক্ত পল্লীতে নূতন করে পত্তন করতে প্রাণ ডরিয়ে উঠে। কলের শ্রমী আত্মীয় স্বজনের স্নেহ মমতা জীবনের তরে চুকিয়ে দিয়ে কলে ঢোকে। জীবন বায়ু বেরিয়ে গেলে শৃগাল-কুকুরের মত তাকে আকাশ বাতাস ও কীট পতঙ্গের খাদ্য হতে হয়, এক বিন্দু অশ্রু ফেলবার কেউ থাকে না। রোগ-যন্ত্রণায় একটা শান্তি-সান্ত্বনার কথাও কেউ তাকে শোনায় না। এমনতর শ্রমীর জীবনে আর এ দেশকে ক্লান্ত করে তুলতে দিতে চাই না। আমাদের চাষা খেতে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু গৃহ পরিবারে সে এখনও বাঁধা আছে। পেটের দায়ে হাহাকার চিৎকার করে বেড়াচ্ছে না। এই স্থির গম্ভীর পারিবারিক জীবনকে বিনাশ করতে চাই না। এর মধ্যে অভাব এসেছে বটে, কিন্তু অভাবকে দূর করে একটু সম্পদ আনতে পারলে পল্লী সুখ শান্তির কেন্দ্র হয়ে উঠবে সন্দেহ নাই। কল এসে এটাকে একেবারে বিনাশ করবে। একবার বিনষ্ট হলে আর ওটা ফিরে আসবে না। ইউরোপ হাড়ে মর্মে তা বুঝতে পারছে। যে শ্রমী একবার ঘর ছেড়ে মালিকের হয়ে খাটতে শুরু করেছে সে আর ঘরে ফিরতে পারবে না। পশ্চিম কত সমাজবিজ্ঞান ঝেড়ে কেটে লিখছে, মন্থন করছে কিন্তু, যা একবার হারিয়ে গেছে সে শান্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্র আর গড়ে উঠল না। এ বড় কম দুঃখের কথা নয়। এই অভিজ্ঞতা হতে আমাদের শিক্ষা করবার আছে।

সেজন্য এতখানি করে বলি, তাঁত ও চরকাই আমাদের মুক্তির পথ খুলবে, শান্তি আনবে—স্বাধীনতাকে মুর্তিমান করে তুলবে। একে উপেক্ষা করলে চলবে না। যারা ফাইনের ভক্ত তাদেরও নিরাশ হওয়ার কারণ নাই। তুলা ও রেশম আমাদের দেশে যে সমস্ত মাল তৈরি করবে তাতে কম বাবুগিরি হবে না! বিদেশকে আমাদের এণ্ডি মুগা মটকা বিমলিন করবে ; আমাদের দুর্ভাগা দেশকে আবার জয়যুক্ত করবে।

কৃষি-বিপ্লবের সূচনা

ইউরোপ কলের উপর কল চড়াইতে যাইয়া কলের মধ্যে জড়াইয়া গিয়া গোঙাইতেছে। কল বহুল পরিমাণে বাড়িয়াছে—উদ্দেশ্য ছিল মানুষের হাতের কাজ একেবারে তুলিয়া দিয়া মানুষকে অবসর প্রদান করিয়া তাহাকে 'শান্তং শিবং সুন্দরং' অবস্থায় পৌঁছাইয়া দিবে—কিন্তু আমরা যাহা দেখিতেছি তাহাতে স্বতই মনে হয় যে, আর মানুষের সুখের কাজ নাই, মানুষ বাঁচিয়া থাকুক। কলের আওতায় কোটি কোটি নরনারী পড়িয়া খোদার দেওয়া নির্মল মুক্ত বায়ু ও খোলা আসমান হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কলের সাহায্যে তাহারা ধ্বংস মুখে বিলীন হইয়া যাইতেছে। এই যে মানুষের ভীষণ অপচয় ঘটিতেছে তাহার জন্য কে দায়ী? খোদা দুনিয়ায় তাহাদিগকে পাঠাইয়াছেন কি শুধু কলের মধ্যে খাটিয়া খাটিয়া জীবন সমাপ্ত করিতে? এখন উপায় কি?

উপায়ের উদ্ভাবন করিবার পূর্বে পাঠকগণের ধৈর্য ভিক্ষা করিয়া কিঞ্চিত কলের বিপরীত অবস্থাটা দেখাইতে ইচ্ছা করি। কলের বিপরীত অর্থ কলহীনতার বিফলতা। কলের উপর কল বর্ধিত হইয়া ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের চরম আধিপত্যের খাদ্য যোগাইয়াছে। ইউরোপে আজ কলহীন কৃষিকার্যের চরম অসহায়তা ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষে এই বলহীন কৃষক ও কলহীন কৃষিকার্যকে আমি ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের বিপরীত অবস্থা বলিতে চাহিতেছি।

মোটামুটি দেখিতে পাওয়া যায় ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের যুগে যেমন একদিকে অসংখ্য নরনারী বালক বালিকা যুবক যুবতী অহর্নিশ পরিশ্রম করিয়া কল চালাইয়া শুধু প্রস্তুতই করিতেছে কিন্তু উপভোগ করিতেছে না—উপভোগ করিতেছে সমাজের সামান্য কতকগুলি ব্যক্তি; তেমনি অন্যদিকে কলের লোকের যাহা আবশ্যক তাহা ঐ হতভাগ্য বলহীন কৃষকই যোগাইতেছে। কল কেবল মানুষের বিলাস দ্রব্যের আয়োজনে অধিকাংশ সময় নিয়োজিত। ইহাতে লোকের বাবুগিরি, নবাবি চাল, সাহেবিয়ানা ইত্যাদি অনাবশ্যক সুখ ও 'ইন্দ্রিয় সাধনার' মাত্রা ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে। পেটে ক্ষুধা থাকে থাকুক—বাহিরের 'ঢংটার কোন ক্রমেই কমতি না ঘটে, এই হইয়াছে বর্তমান সভ্যতার আদি মন্ত্র। ইউরোপের অধিকাংশ লোক ঐ ঢংএর মসলা তৈরি করিয়া বড় বড় লর্ড বেরন প্রভৃতির গৃহে মৌজুত করিতেছে। তাহা দেখিয়া ভারতবর্ষের লোক ধানচাল দিয়া তাহা আয়ত্ত করিতেছে। এদিকে ধান ফুরাইতেছে, গ্রামের গোলা শূন্য হইতেছে। দেশের লোক আত্মরক্ষার্থে ছুটিয়া ঋণে জড়াইতেছে। আজ দেশের কৃষক শুধু দুটী অন্ন জোগাইতে পারিতেছে না। যদিও কষ্টে সৃষ্টে জুটায়, তাহা শুধু শুধু খাইয়াই প্রাণটা ধরিয়া রাখিতেছে। এই ত গেল ইউরোপের

ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের প্রবল বন্যার যে স্রোত এদেশে আসিয়া আঘাত করিতেছে তাহার ফল। এই ফলটা ভারতের কৃষকের উপর কিরূপ হইয়াছে ও হইতেছে তাহাই এই সন্দর্ভের আলোচ্য বিষয়।

ওদেশে শ্রমীরা তৈরি করিয়া সমস্তই মুষ্টিমেয় ধনী শ্রেণী ও ধনাভিমানী অভিজাত সম্প্রদায়ের সুখ সম্পদ ও পুষ্টিসাধনকল্পে নিয়োগ করিতেছে। এক কথায় একজনের কল্যাণ—কল্যাণ নয়ত—শরীরের ও ইন্দ্রিয় পরিপুষ্টির—জন্য দশজন মানুষ জীবন ও প্রাণকে ব্যয় করিয়া দিতেছে। এই বাধ্যতামূলক আত্মবিক্রয় ও আত্মনিয়োগ সমাজের একশত পরিবারের ৯৯টী পরিবারকে কলের মুখে বলিদান করিতেছে। একটী পরিবার মাত্র গাড়ি ঘোড়ায় চড়িয়া সুখে কালযাপন করিতেছে। কলের জিনিস তাহারাই ব্যবহার করিতেছে। ইহাতে উভয়পক্ষের মঙ্গল অন্তর্হিত হইয়াছে ও হইতেছে।

ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের ফলে সমাজ কয়েকটী শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই শ্রেণীগুলিকে এক্ষণে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া আমরা কয়েকটী কথা বিবেচনা করিব। যথা উৎপাদক শ্রেণী ও ভোগী অনুপাদক শ্রেণী। উৎপাদক শ্রেণী সর্বদা অভাবগ্রস্ত তাই তাহারা চবিবশ ঘন্টার মধ্যে ১৮ ঘন্টা করিয়া শ্রম না করিলে দু-বেলা অন্নেরই সংস্থান করিতে পারে না ; খোদার নাম করা ত দূরের কথা। আর যাহারা উপরে আরামে বসিয়া ভোগ করিতেছে তাহারা ত ভোগের মধ্যে আত্মহারা হইয়া পড়িতেছে। তাহাদেরও পরমাত্মার চিন্তা নাই। জীবনের পরিতৃপ্তিকেই মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া তাহারা ধরিয়া বসিয়াছে। আবার এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যাহারা আছে তাহারা ঐ শ্রমীসম্প্রদায়ের স্কন্ধে চাপিয়া আছে। তাহাদের পরিশ্রমের লভ্যাংশকে অপরহরণ করাই তাহাদের (মধ্য শ্রেণীর) কাজ হইয়া পড়িয়াছে। শ্রমীসম্প্রদায় শ্রমের ফলভোগ করিতে পারে না। তাহার ফল ভোগ করে ঐ মধ্যশ্রেণী ও ধনীশ্রেণী। মধ্যশ্রেণী অর্থ সঞ্চয় করে আর ধনীশ্রেণী উপভোগ করে আসল জিনিসটা ! মধ্যশ্রেণীও ভোগ করে, কিন্তু অর্থই হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের চরম-পরম কাম্য ও লক্ষ্য—সুতরাং প্রকৃত দ্রব্য তাহারা কখনই একান্ত করিয়া উপভোগ করিতে পারে না। এক্ষণে দেখা যাইতেছে—নিম্নস্তরে শ্রমীসম্প্রদায় উদরপূর্তির জন্য জীবন ব্যাপিয়া উদ্বিগ্ন ; মধ্যস্তরে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অর্থের লালসায় দিবস রজনী ঘুরিয়া মরিতেছে ; আর উচ্চস্তরে--ধনী সম্প্রদায় বস্তু উপভোগে নিরন্তর রত রহিয়াছে। ইহাতে নিম্নস্তরের শ্রমীসম্প্রদায়ের উপর অবশিষ্ট দুই সম্প্রদায় চাপিয়া বসিয়া আছে। এই দুই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ অনুৎপাদক (unproductive)*—তাহারা কাজ করিয়া কোন বিশেষ দ্রব্য সৃষ্টি করিতেছে না। তাহারা কেবলই দশজনের দ্রব্য অপহরণ করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের দেশের উকিল, মোক্তার, ব্যারিস্টার, সরবারহকারক (middlemen parasites), মাড়ওয়ারি ব্যবসায়দার (speculators), জমিদার সম্প্রদায় ও নায়েব গোমস্তা সম্প্রদায় প্রভৃতি দেখানো যাইতে পারে।

---

* কেননা মানুষের উপকারে আসে এমন দ্রব্য সৃষ্টি করাকে উৎপাদন করা বলা হয়। উপকারক বস্তু তৈয়ার করা উৎপাদন (Production) ।—লেখক।

এই প্রসঙ্গে পলিটিক্যাল বিষয় একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, গণতন্ত্র যতই বাড়িতেছে, রাজকীয় কার্যকলাপ ততই শাখাবহুল হইতেছে—শাখাবহুলতার জন্য লোকের উপর ট্যাক্স বর্ধিত হইয়া চাপিতেছে। ট্যাক্সের অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর উপর বেশি চাপে। উদাহরণচ্ছলে বলা যায়—আমাদের জমিদারের উপর ট্যাক্স চড়িলে জমিদারগণ তাঁহাদের নিম্নস্থ তালুকদারদের নিকট হইতে অতিরিক্ত হারে আদায় করেন—তালুকদারগণ আবার তাঁহাদের নিম্নস্থ গাঁতিদারদের উপর চাপ দেন,—এইরূপে ক্রমশ নিম্নাভিমুখে বৃদ্ধির হারটি চলিতে চলিতে ট্যাক্সটীর সমগ্র, ও তাহার উপরও কিঞ্চিতঅধিক চাপ ঐ জমির উপর যাইয়া পড়ে। ট্যাক্স তখন রাজসরকারে গেল—জমিদারের গৃহে গেল—তালুকদারগণ কিছু গ্রহণ করিল—এই রূপে রাজসরকারের ট্যাক্স উপলক্ষ্য করিয়া প্রজাদের রক্ত শোষণের পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। মোটের উপর ভুক্তভোগী হইল ঐ বেচারা চাষা, যে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া মাটী ভাঙ্গিয়া শস্য উৎপাদন করিতেছে। একজন কৃষক উৎপাদন করিতেছে আর দশজন বসিয়া খাইতেছে।

ইউরোপে শ্রমীদের দশাও আর আমাদের চাষাদের দশা একরূপ হইয়াছে। ইউরোপে কলের শ্রমী সকল সমাজের ভার বহন করিতে যাইয়া নিজের জীবনকে বিক্রয় করিয়া বসিয়াছে আর আমাদের ভারতের চাষা বাবু, মহারাজ, রাজাবাহাদুর, নায়েব মহাশয়, মহাজন, গাঁতিদার, তালুকদারের পকেট ভরতি করিতে গিয়া নিজের গোলা শূন্য, শরীর আচ্ছাদনহীন ও রুগ্ন এবং বাসন খালি করিয়া ফেলিতেছে। সুতরাং ভারতে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে ৬ কোটি লোক মরে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? না খাইতে পাইয়া, না পরিতে পাইয়া তাহারা রক্তশূন্য দেহকে কতক্ষণ রোগের হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিবে? প্রচুর পরিমাণে খাইতে পাইলে, শরীরকে শীত-বর্ষা হইতে রক্ষা করিতে পারিলে, শরীর ও মনের স্ফূর্তি থাকিলে বিনা ঔষধে অনেক রোগকে দূরে সরাইয়া রাখা যায়। কিন্তু বর্তমান ভারতের চাষার অদৃষ্টমার্গে প্রচুর আহার, প্রচুর আচ্ছাদন ও স্ফূর্তি বোধ হয় লেখা ছিল না। পল্লীগ্রামে যাঁহারা আছেন তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন—গ্রামের বালক বৃদ্ধ যুবা প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠে কাজ করিতেছে—গৃহে পড়িয়া স্ত্রী, বৃদ্ধ মাতা, কন্যা, ভগিনী প্রভৃতি স্ত্রীলোক সংসারের কাজে সর্বদাই ক্লান্ত। বিশ্রাম কাহারও পক্ষে জুটিতেছে না। পল্লীর বৃদ্ধা আর পা ছড়াইয়া বসিয়া উপকথা বলিতেছে না—ছেলেরা রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত হাডুডু কাপাটি ও বুড়িচু প্রভৃতি খেলার স্ফূর্তিতে আর চেঁচামেচিতে গ্রাম মাথায় করিতেছে না—সন্ধ্যার আগমনে কালো অন্ধকার প্রকৃতিকে ঢাকিবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সকলকেই যেন আবৃত করিয়া ফেলে। সমস্তই নিস্তব্ধ নীরব। অন্যূন দশ বৎসরের পূর্বেকার কথা স্মরণ করিলে আমরা সকলেই গ্রামের মধ্যে যে পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিব।

আর একটা ব্যাপার আমরা দেখিতে পাই, পল্লীতে ছেলেদের সংখ্যা বৃদ্ধদের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম। বৃদ্ধরা যেন সংসার টানিয়া চলিয়াছে। বালক বালিকাগণই রোগে ভুগিতেছে ও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। সংসার নবীনদের জন্য। কিন্তু পল্লীতে গেলে মনে হয় যেন পল্লী-সংসারে নবীনদের স্থান নাই, প্রাচীনদেরই লইয়া সব।

পল্লীতে ঈদ ও পূজার সময় আমোদ আহ্লাদ নাই। কখন পূজা আসে যায়, তাহা কেহ যেন বুঝিতেই পারে না। ছেলেদের আহলাদে আটখানা হওয়া আর কেহ দেখিতে পায় না। হিন্দুদের পূজা পার্বণের সময় নূতন নূতন কাপড়ে বালক বালিকা যুবক যুবতীদের অঙ্গ শোভিত হইতে ক্বচিৎ দেখা যায়। ঈদের সময় 'আল্লা' 'আল্লা' রবে চারিদিক আর মুখরিত হয় না। ঈদের আনন্দ একেবারে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। ঈদ নীরবে আসিয়া নীরবেই চলিয়া যায়। প্রাণ খুলিয়া ঈদের মিলন উপভোগ আর কেহ করিতে পায় না। ঈদের সময় পল্লী পরিবারে আমরা বহু আত্মীয় স্বজনের সমাগম আর দেখিতে পাই না। পূজাপার্বণ, ঈদ, রোজা ও শবেবারাতের সময় পল্লী পরিবারে এক সময় যে অক্ষুরন্ত আনন্দের কোলহলে দিক দিগন্ত নিনাদিত হইত ; আর গ্রামের ছেলেরা কতদিন যে তাহার আলোচনা করিত—তাহা আর আজ নাই। সে সময় গ্রামের 'আণ্ডাবাচ্চা' 'বুড়াবুড়ি' 'ছেলেমেয়ে' সমস্ত প্রাণ খুলিয়া দিয়া ধর্মরক্ষার উদ্দেশ্যে এক অপূর্ব সমিলন করিত। সে সমিলন কোথায় গেল? সে আনন্দের উপায় আর হইতেছে না। চির অভ্যাস-বশত পল্লীবাসী মন্দিরে বা মসজিদে আসিয়া কেবল হাজিরা দিয়া চলিয়া যায়। তাহারা কাজে ব্যস্ত। তাড়াতাড়ি করিয়া ঐ কাজ সারিয়া পালাইতে পারিলে বাঁচে। সমস্তই এখন প্রাণহীন অভ্যস্ত আচারে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। মাঠের বুকে ধানের ক্ষেতে চাষারা গাঁতায় বসিয়া সপ্তম সুরে আর গান গাইতেছে না। এক সময় ছিল, যখন জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে সমস্ত দিনই প্রায় 'গাঁতার' গান ও সমস্বরে 'আল্লা' 'আল্লা' রবে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইত ও আকাশ বাতাস আনন্দে ভরপূর হইয়া যাইত—চাষার সমস্ত ক্লান্তি মাঠের মধ্যেই মিলিয়া যাইত। কিন্তু এখন চাষা সারা দিবসের শ্রান্তি শরীরে বহন করিয়া নিরানন্দ গৃহে ফিরে। তখন অভাবের কথা, দেনার ভাবনায় তাহার মাঠের শ্রান্তি দশগুণ বৃদ্ধি পায়। পল্লীগ্রামের লোকসংখ্যাও খুব কমিয়াছে। অনেকের ভিটা ভীষণ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। এক সময় ছিল যখন গ্রামের মধ্যে লোক জম জম করিত, প্রত্যেকের গৃহে একখানা দহলিজ, খানকা বা বৈঠকখানা থাকিত এবং রাত্রিতে ঐ সমস্ত বৈঠকখানা লোকে ও অতিথিতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। অনেক সময় এমনও হইত,—ভিন্ন গ্রাম হইতে কেহ আসিলে শুইবার স্থান পাইত না। কিন্তু আজ সমস্ত বৈঠকখানাই শূন্য থাকিতেছে, অনেকের বৈঠকখানার ভিটায় ধান, নাহয় তরকারি জন্মিতেছে। তখন এত লোক ছিল, তবু লোকের খাদ্যের অভাব হইত না—সেই সমস্ত জমি আছে, সমস্তই আছে ও লোকের সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু তবু লোকের অভাব, দারুণ দারিদ্র্য ঘুচিতেছে না। তারা রোগের হাত হইতে মুক্তি পাইতেছে না এবং অকালে মৃত্যুমুখে পড়িতেছে তখন গ্রামের বালক বালিকা যুবক যুবতীদের সংখ্যা দেখিলে বাস্তবিক "নবীনদের জন্য সংসার" তাহা বেশ বুঝা যাইত। কিন্তু এখন সমবয়স্ক যুবকদের দশজন একত্র দেখিতে পাওয়া যায় এমন গ্রাম খুব কমই আছে।

পল্লীর এমন দশা দেখিলে মনে হয় যেন পল্লীর অস্তিত্ব আর থাকিবে না। উদ্ভিদেরাই বাঁচিয়া মানুষকে সরাইয়া দিতেছে। ডারুইন এ সময় বাঁচিয়া থাকিলে বোধ হয় Survival of the trees and plants এই থিওরি প্রমাণ করিবার জন্য পল্লীগ্রামে বাস করিতেন। মানুষের ভিটা উজাড় হইতেছে, আর উদ্ভিদ জঙ্গলে তাহা অধিকার করিয়া বসিতেছে। হায়, কেন এমন হইল !

ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের স্রোত এদিকে বড় বড় শহরের সৃষ্টি করিতেছে। সকলেই সেই দিকে পাগলের মত ছুটিয়া আসিতেছে। নির্মল বায়ু মুক্ত গগনের সঙ্গে তাহাদের প্রাণের সম্পর্ক একেবারে চুকিয়া গিয়াছে। সকলেই একটা না একটা কল কারখানায় নাহয় কেরানিখানায় চাকুরি লইয়া নিযুক্ত আছে। আফিসের জন্য তাহাদের যত ভাবনা। প্রাতে উঠিয়াই 'আফিস। আফিস।' সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়াও ক্লান্তি—রাত্রিতে স্বপ্নেও আফিসের কাজ। এই আফিসের মধ্যে শহরের লোক নিজদিগকে বিক্রয় করিয়া বসিয়াছে। কলের মধ্যে যাহারা আছে তাহাদের কথা বলার আবশ্যক নাই।

অতএব দেখিতে পাইতেছি কোথায়ও মানুষ শান্তিতে নাই। ইনডাস্ট্রিয়াল ইউরোপে 'দাও শান্তি', 'শান্তি কৈ ?' আর চাষার ও চাকুরের ভারতে 'দাও শান্তি' 'শান্তি কৈ ?" রব উঠিয়াছে।

ভারতের চাষার চাষের অবস্থাটা এই প্রসঙ্গে আবার একটু না বলিলে কথাটা সম্পূর্ণ হইবে না। আমরা অনেকেই দশ বৎসর পূর্বে পল্লী গ্রামের মধ্যে, মাঠে ও চতুষ্পার্শ্বে অনেক জমি পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। সে সকল জমিতে গরু, ছাগল, মহিষ চরিত। কিন্তু এখন গ্রামে একটা গরু চরাইবার স্থান নাই। সমস্ত চাষ করিয়া চাষারা ধান করিয়াছে। অনেকে বাড়ির প্রাঙ্গণ পর্যন্ত চষিয়া ধান পাট করিতেছে। তবু লোকের অভাব যাইতেছে না। ইহার কারণ কি ? কারণ সম্বন্ধে বলিতে গেলে অর্থনীতির একটা সূত্রের উল্লেখ করিতে হয়। সূত্রটী এই—মাটি যদি যেমন তেমনি থাকে (অর্থাৎ তাহাতে যদি প্রচুর সার না দেওয়া কিংবা অন্য কোনরূপ উন্নতি না করা হয়) এবং জমির পরিমাণ যদি সমান থাকে এবং শ্রম তাহাতে সমভাবেই প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে সেই জমি প্রতি বৎসর কম পরিমাণে ফসল প্রদান করিবে। পূর্ব বৎসর অপেক্ষা পর বৎসর তাহাতে ফসল কম হইবে। উৎপন্ন ক্রমশ হ্রাস হইতে থাকে। আমাদের চাষাদের জমিও এই অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে বলিয়া চাষারা যেখানে যে জমি পাইতেছে তাহাতে ফসল উৎপাদন করিবার জন্য প্রাণ পণ করিতেছে। তাহারা জমিতে প্রচুর সার দিতে পারে না। সেই জন্য ফসল কমিয়াছে। ফসল কম হইয়াছে বলিয়া চাষারা প্রচুর খাইতে পাইতেছে না। শরীর তাহাদের দুর্বল হইয়া পড়িতেছে—ওদিকে আবার গরু চরাইবার জমিগুলি লাঙ্গলের তলে পড়িয়া গেল—গরুগুলি শুকাইতে লাগিল। তাই দেখিতে পাই কৃশ কৃষক, রুগ্ন গরু দ্বারা জমির চাষ করিতেছে। গরু রুগ্ন শীর্ণ হইতেছে বলিয়া জমির এক ঘণ্টার চাষের জন্য চাষা চারি ঘণ্টা লাগাইতেছে। ইহাতে উত্তম গরু ও জন্মিতেছে না। সে জন্য অনেকে বলদ ছাড়িয়া গাভী দ্বারা চাষের কাজ চালাইতেছে। গাভীর দুধ শুকাইয়া যাইতেছে। শিশু দুগ্ধ অভাবে শীর্ণ হইতেছে—কখনও কখনও অকালে কাল-গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে। এখন দেখা যাইতেছে কৃষির দুর্দশা চুতুর্দিকে। কৃষির উন্নতি নাই। উত্তম সার নাই—বলবান বলদ নাই—ঘাসের জমি নাই—কৃষকের স্বাস্থ্য নাই—দুগ্ধবতী গাভী নাই—জমির শক্তি হ্রাস হইয়াছে। ইহাতে কিরূপে প্রচুর ফসল হইবে ? কিরূপেই বা চাষার অবস্থা ফিরিবে ? ইহার উপর আবার খাজনা ও আবওয়াবের অত্যাচার ! কৃষির উন্নতি নাই কিন্তু জমিদার খাজনা কমায় নাই বরং বৃদ্ধি করিয়াছে এবং সময় সময় নজরানা উপলক্ষে প্রজার নিকট হইতে কত আদায় করিয়া লইতেছে। কৃষির অবনতি বোধ হয় বৎসর বৎসর দশাংশের একাংশ হিসাবে ঘটিতেছে। এতদ্ব্যতীত প্রকৃতির নিদারুণতা অনেক সময় প্রজাকে সর্বস্বান্ত করিয়া দেয়। বৃষ্টি অভাবে ফসল হইল না—ইহা প্রায় শুনা যায়। কিন্তু ইহাতেও

প্রজার নিস্কৃতি নাই—তাহাকে লিখিয়া দিতে হইয়াছে—"হাজাশুখা প্রভৃতি কোন কারণে ধার্য খাজনার কমি বেশি আমলে আসিবেক না।"

এই অজন্মা সত্বেও যে প্রজাকে দেনার জন্য জমিদারের অত্যাচার সহ্য করিতে হয় ইহার জন্য দায়ী কে? জমিদার শ্রেণী প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া নিজেদের রক্তপুষ্টি করে। তাহারা একেবারে অনুৎপাদক সম্প্রদায়। তাহারা প্রজার অর্থ লইয়া নানাপ্রকার অকথ্য বিলাসভোগে শহরের রম্যহর্ম্যে কালযাপন করিতেছে—আর নগ্ন কৃষক অনাহারে ঐ শীতে কাঁপিতেছে ও কাদায় বসিয়া নিড়াইতেছে। এ দৃশ্য আর কতদিন!

কলের বাহাদুরিতে ইউরোপের দুর্দশা দেখিয়াছি। ভারতের নিষ্ফল কৃষকের দুরবস্থাও দেখিলাম। ইউরোপের শ্রমী আর ভারতের চাষা; ইহারাই সমাজের ভিত্তি। ইহাদের উপরেই যত বড় বড় লোক বসিয়া আছেন। ইহারাই প্রকৃত উৎপাদক সম্প্রদায়। দশজন শ্রমীর উপর যেমন একজন ধনী ইউরোপে আধিপত্য করিতেছে সেইরূপ দশজন কৃষকের উপর একজন জমিদার স্বেচ্ছাচার ব্যবহার করিতেছে। দশজন শ্রমী যেমন একজনের শ্রীবৃদ্ধি কল্পে একেবারে বিক্রীত হইয়া বসিয়া পড়িতেছে সেইরূপ আমাদের দশজন চাষা জমিদারের দ্বারে বিক্রীত হইয়া আছে। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় এই শ্রমী সম্প্রদায় ও চাষা সম্প্রদায় বর্তমান যুগের 'দাস সম্প্রদায়'। আবার শুনিতে পাওয়া যায়, জগতের পৃষ্ঠে নাকি দাসত্ব আর নাই। শ্রমীদের অবস্থা আর চাষাদের অবস্থা কি দাসত্ব নয়? শ্রমী ধনাঢ্য মূলধনাধিকারীর হাতে বাঁধা। সে শ্রমীকে যাহা বলিতেছে সে তাহাই করিতেছে। আমাদের চাষার উপর যখন যে হুকুম হইতেছে—তখন তাহাকে তাহাই করিতে হইতেছে। যদি না করে তবে পাইক বা পেয়াদার লাঠির আঘাত তাহার পৃষ্ঠে পড়িতেছে। ইহার পরিণাম যাহা তাহা ইউরোপে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কেবল ভারতের চাষা এখনও নীরব অত্যাচারের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন ভোগ করিয়া চলিয়াছে। যুগ-যুগান্তরের অভ্যাস বশত তাহার চিরন্তন সহিষ্ণুতাবলে সে এখনও বহুদিনের সঞ্চিত নির্যাতনের বেদনা মূকের মত বহন করিতেছে—বুঝিবা কবে তাহার সহিষ্ণুতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়!

যতদিন শ্রমী তাহার শ্রমের উপযুক্ত মূল্য না পাইবে এবং যতদিন জমিদার কৃষকের জমির উর্বরা শক্তিকে প্রখর করিয়া না তুলিবে—যতদিন চাষা তাহার সমস্ত অধিকার স্বাধীনতা ফিরিয়া না পাইবে—যতদিন জমিদার নিজে উৎপাদক না হইবে—যতদিন তাহার বিলাস-ভোগ-তৃষ্ণা বিদূরীত না হইবে—যতদিন কৃষকের উৎপন্ন শস্যকে লইয়া জমিদার বিলাসিতার উপকরণ করিয়া অপচয় করিবে, ততদিন শান্তির আশা আকাশ-কুসুম থাকিয়া যাইবে—ততদিন প্রতি মুহূর্তে বিপ্লবের আশঙ্কা করাই স্বাভাবিক। ভারতের কৃষকদের মধ্যে যদি কোনদিন বিপ্লব (Bolshevism) উপস্থিত হয়, তজ্জন্য জমিদার সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে দায়ী হইবে। তাঁহারাই কৃষক-প্রজাকে তাহার স্বার্থ, অধিকার, স্বত্ব, স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া বিপ্লবের সূচনা করিতেছেন—তাঁহারা কর্তব্যচ্যুত হইয়াছেন। আমরা সেজন্য ইউরোপের শ্রমী সম্প্রদায়ের জাগরণে আমরা সতত আমাদের কৃষকের জাগরণ (Peasant Revolution) প্রতীক্ষা করি।

সমাপ্ত

বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা

সূচিপত্র

শিক্ষা-সমস্যা

বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনের দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি তখন দেখি, সে জীবন নিতান্ত হীন, নিতান্ত দরিদ্র, নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। অর্থ বলুন, রুচি বলুন, আনন্দ বলুন, কিছুই সে জীবনে নাই। মানুষের জীবন ধারণের জন্য যতটুকু না হলে চলে না, সেইটুকু মাত্রই তার সম্বল। চতুর্দিক হতে তার সমস্ত সম্পদ সরে যাচ্ছে। সমাজের গৌরব যা দিয়ে বাড়াতে হয় তার কিছুই তার নাই বললে অত্যুক্তি হবে না। আজ বাঙ্গালী মুসলমান দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট, কোনটিতেই নাই। সম্পদ ও কল্যাণ যে পথে আসে, সে পথ তার পক্ষে রুদ্ধ হয়ে আছে। কেবল ভিক্ষুক, কারা-নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, পরপদদলিত, পরাশ্রয় ভিখারির দল বেড়ে চলেছে। আজ প্রায় দেড়শত বৎসর হতে চলল ব্রিটিশ পতাকা এদেশে উড়ছে। সেই পতাকার তলে দাঁড়িয়ে হিন্দু আজ বিশ্বজ্ঞানের অধিকারী হয়ে বিশ্ব-সম্পদ আহরণ করতে শুরু করেছে। দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট প্রভৃতি সমস্ত বিভাগে হিন্দু আজ প্রতিপতি অর্জন করে স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মের গৌরব বর্ধন করেছে। আর আমরা মুসলমান সমস্ত সম্পদের পথ রুদ্ধ করে অবনতির চরম সীমায় দ্রুত অগ্রসর হয়েছি। এই পার্থক্যের কারণ কি? কেন মুসলমানের এ দুর্গতি?

এ প্রশ্নের উতর এক কথায় দিতে গেলে বলতে হবে, আমাদের শিক্ষা নাই—আমরা জ্ঞানের সঙ্গে বহুদিন হতে বিরোধ করে বসেছি এবং দর্শন, বিজ্ঞান ও আর্টকে আমাদের শিক্ষাকেন্দ্র হতে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছি—এই ভয়ে, পাছে তাতে আমাদের ধর্ম নষ্ট হয়। ধর্ম আমাদের এতই নাজুক। ব্রিটিশের সঙ্গে ইউরোপের জ্ঞানদীপ্ত মন যখন এদেশে আসল এবং আমাদের আড়ষ্ট মনকে আঘাত করল তখন হিন্দু সে আঘাতে জেগে উঠে সে মনকে আলিঙ্গন দ্বারা বরণ করে নিল, আর আমরা সে আঘাতে জাগতে ত চাই-ই নাই বরং চোখ রাঙিয়ে সে মনকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। ইউরোপের জ্ঞানকে আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি, কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজ পর্যন্ত আমরা আমাদের সে নিদারুণ ভুলের কোন সংশোধনেরই চেষ্টা করি নাই। বরং সে ভুলকে বর্তমানে আমরা আরও জোর করে আঁকড়ে ধরেছি। অথচ এই বলে আমরা সান্ত্বনা পাই যে, একদিন মুসলমানই ইউরোপকে তার দর্শন-বিজ্ঞান শিখিয়েছিল। কিন্তু এটুকু আমরা বুঝি না যে, আজ আমরা কড়ার ভিখারি—আমাদের মুখে সে গর্ব, সে আস্ফালন আদৌ শোভা পায় না।

আজ যদি আমরা সে গৌরবের অধিকারী হতে চাই এবং তার দাবি করতে চাই তাহলে আবার আমাদের মধ্যে ইবনে খলদুনের মত ঐতিহাসিক, আলগাজালি, ইবনে রোশদ, ইবনে সিনার মত দার্শনিক, হজরত ওমরের মত চরিত্রবান রাষ্ট্রবিদ, জাবেরের মত বৈজ্ঞানিক, আবু

হানিফার মত তত্ত্বদর্শী প্রতিভার আবির্ভাব হওয়া চাই। তাহলে আমরা অতীতের সত্যকে প্রমাণ করতে পারব—নতুবা আমাদের মুখে সে অতীতের গৌরব-কাহিনী অন্যের নিকট অলীক উপকথা বলে প্রতীয়মান হবে। নিজেকে খাড়া করে, নিজেকে সৃষ্টি করে অতীতকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এরই নাম অতীতকে নূতন করে সৃষ্টি করা। এই নবসৃষ্টি সুশিক্ষার উপর নির্ভর করে। হিন্দু আজ নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করে নানা জ্ঞানে বিভূষিত হয়ে তার অতীতের প্রতি বর্তমান জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে। আজ আমরা তাদেরও সমকক্ষ হতে পারছি না কেন? তার কারণ আমাদের সুশিক্ষার অভাব। আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি চিত-বিকাশ ও মস্তিষ্ক-সম্প্রসারণের অন্তরায় হয়েছে। এই শিক্ষা-পদ্ধতি কেমন করে যুগের প্রয়োজন মিটাতে পারে সেই হচ্ছে সমস্যার সমস্যা।

দেশের কল্যাণ-বৃদ্ধি যদি শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হয় তাহলে মোটের উপর বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি যে কি হিন্দু, কি মুসলমান কারও পক্ষে উপযোগী নয় তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মুসলমানদের শিক্ষা-পদ্ধতি অনেকটা বিভিন্ন এবং তার ফলও বিভিন্ন—এজন্য আমি এস্থলে শুধু মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা সম্বন্ধেই বলতে চাই। এই শিক্ষাপদ্ধতির ফলে মুসলমান-সমাজ অনেকটা অন্যান্য উন্নতিমুখী জাতির উপর ক্রমশ বোঝা স্বরূপ হয়ে উঠেছে, তা এখনই ভাল করে সমঝে দেখা প্রয়োজন। বর্তমান জগতের যে যে দেশে মুসলমান আছে সেই সেই দেশে তাদের অবস্থা নিতান্ত হীন। তাদের দুরবস্থা ততৎদেশের অমুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতির পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিন আমাদের শ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহ সাহেবের পত্রে পড়লাম যে, ফ্রান্সের মুসলমান সম্প্রদায়ের অবস্থা বাংলার মুসলমানদের চেয়ে খুব ভাল নয়। গত বৎসর অধ্যাপক লিমের মুখে শুনেছিলাম, চীনের কোটি কোটি মুসলমান নিতান্ত দুঃস্থ, নিরক্ষর ও নির্বোধ। এ সমস্ত কথায় আস্থা স্থাপন আমরা না-ও করতে পারি কিন্তু একথা ঠিক যে, বর্তমান জগতের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কোন দেশের কোন মুসলমান কোন উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি কিছুই করেন নি। বর্তমান দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট ঘেঁটে দেখুন মুসলমানের সৃষ্টি কিছু নাই বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। অবশ্য আমার জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ। যদি কেউ আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন তবে আমি খুব বাধিত হব। কিন্তু যদি এই কথা সত্য হয় তাহলে কি খুব লজ্জার কথা নয়? এই যে জ্ঞানের রাজ্যে মুসলমান একেবারে গরহাজির, এর কারণ কি? যে মুসলমান একদিন নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করে মানুষের শ্রী, কল্যাণ ও জ্ঞানকে বহুমুখী করে ছড়িয়ে দিয়েছিল তারই বংশধর আজ বিপুল অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন! এটা ভাববার কথা।

মুসলমানের এই দুর্গতির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ডক্টর Crozier তাঁর *Progress and Civilisation* গ্রন্থে বলেছেন,

"Islam did open up an outlet for social aspect of human thought and aspiration but soon its secret structure began to reveal itself and was found to be incapable of expansion, devoid of sympathy and fatal to material and intellectual advancement. The Koran professed to be not only a spiritual

revelation but a scientific treatise ; to close not only the book of inspiration but the book of knowledge. It accordingly discouraged all attempts of man to discover the order of the world and thereby to improve his condition ; while its central doctrine led him to repose indolently on the decrees of an inexorable fate. The consequence was under this belief human mind stagnated ; as we see at this hour in those nations that are deeply imbued with its spirit, progress, civilisation and morality lie rotting together."

অর্থাৎ, "সত্যই ইসলাম মানব-চিন্তার ও আকাঙ্ক্ষার সামাজিক দিকটা বিকশিত করবার জন্য একটা পথ উন্মুক্ত করেছিল ; কিন্তু শীঘ্রই ইহার মূল ভিত্তি ও গঠন প্রকাশিত হয়ে পড়ল—ফলে দেখা গেল ইহার উপর সৌধনির্মাণের আর উপায় নাই—এবং ইহা বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও জ্ঞান-বৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোরান যে কেবল ধর্মগ্রন্থ বলে দাবি করে তা নয়, ইহা সর্বজ্ঞানের ভাণ্ডার বলে পরিচিত। কোরানের আবির্ভাবে শুধু যে খোদার বাণী রুদ্ধ হয়েছে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও রুদ্ধ হয়েছে। কোন পুস্তক নাই বা হবে না যা কখন কোরানের সমকক্ষ হবে, এই হল মুসলমানের ধর্মমত। কাজেই, এই বিশ্বাসের বশবর্তী মুসলমান জগতের রহস্য উদঘাটনের সর্বচেষ্টা ত্যাগ করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার স্বকীয় জীবনের শ্রী ও সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টাও ত্যাগ করেছে। তকদিরের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়েই সে নিষ্কৃতি লাভ করতে চাচ্ছে। এতে মুসলমানের মন ও কর্মস্রোত রুদ্ধ হয়ে গেছে। তাই দেখতে পাই, যেখানে মুসলমান সেখানেই উন্নতি, সভ্যতা ও নৈতিক বল সমস্তই একধারে সরে যাচ্ছে।"

—একথা হয়ত ষোল আনা ঠিক নয় ; কিন্তু এর মধ্যে যে সত্যটুকুর ইঙ্গিত আছে সেটা আজ প্রণিধানযোগ্য।

এখন আমাদের ঘরের দিকে তাকাই। আজ আমরাও যে উন্নতিমুখী হিন্দু সম্প্রদায়ের সকল শুভ চেষ্টায় আমাদের দুর্বুদ্ধি ও দুর্গতির দ্বারা বিঘ্ন ঘটাচ্ছি তা বোধ হয় প্রমাণ করতে হবে না। তারই কারণ নির্ধারণ করা এ প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য। আজ আমাদের কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করতে হবে যে, ব্রিটিশ এদেশে পুরাপুরি আধিপত্য বিস্তার করেই দেশবাসীর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেছে। প্রথমত সে ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানের আইন-কানুন জানতে হলে তাদের পরিচিত ভাষা ও গ্রন্থের চর্চা করা প্রয়োজন। এজন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা এবং জোনাথান ডানকান ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে বেনারসে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা মাদ্রাসা সর্বপ্রথম ব্রিটিশ-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্র। সরকার এই উভয় শিক্ষাকেন্দ্রে প্রভূত অর্থ ব্যয় করতেন। ১৭৮৪ অব্দে বাংলার এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আরবি ও সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার দ্রুত চলতে থাকে। সার উইলিয়াম জোনস প্রমুখ পণ্ডিতগণের গবেষণায় আরবি ও সংস্কৃত বিদ্যার চর্চা বহুল পরিমাণে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। ১৮১৩ অব্দে লর্ড মিন্টো দেশীয় বিদ্যার সঙ্গে ইউরোপীয় জ্ঞান-চর্চার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ১৮২৩ অব্দ পর্যন্ত মিন্টোর প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা হয় নাই। ১৮২৩ অব্দে উক্ত টাকা আরবি ও সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ মুদ্রিত করার জন্য ব্যয় করা হয়।

ইতিমধ্যে দুইটি কারণের আবির্ভাবে সরকারের শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়। প্রথম কারণ খ্রিস্টান পাদ্রিদের চেষ্টা এবং দ্বিতীয় কারণ ইউরোপীয় শিক্ষার জন্য কলিকাতায় তৎকালীন চিন্তাশীল দুরদৃষ্টিসম্পন্ন হিন্দু-নেতৃবর্গের স্বতঃপ্রণোদিত দাবি ও আন্দোলন। স্কটিস চার্চ কলেজ ও মাদ্রাজ খ্রিস্টিয়ান কলেজ পাদ্রিদের কীর্তি ; আর হিন্দু কলেজ হিন্দুনেতৃবর্গের সেই আন্দোলনের ফল। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিবৃত করবার প্রয়োজন এখানে নাই ; কিন্তু যে মহাপুরুষ এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ ছিলেন তাঁর দুই-একটি কথা এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি। রাজা রামমোহনই সর্বপ্রথম 'ইউরোপীয় শিক্ষার জন্য ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষা আরব্ধ হওয়ার পূর্বেই তিনি ইংরেজিতে দক্ষ হয়েছিলেন ; শুধু ভাষায় নয়, ইংরেজি দর্শন, ইতিহাস ও কালচারে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ হয়েছিলেন। তখনও দেশে ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। রামমোহন শিক্ষা-ক্ষেত্রে নূতন প্রণালি অবলম্বন করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। এই নব-পদ্ধতি দ্বারা তিনি দেশবাসীর গতানুগতিক স্থিতিশীল মনের উপর পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং অতীতের কুসংস্কার ও ধারণা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত উজ্জ্বল হয়ে দেশবাসীকে গলা ছেড়ে এই নব-শিক্ষায় আহ্বান করেছিলেন। কলকাতায় যখন প্রথম সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয় তখন তিনি তাঁর প্রতিবাদ বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের পরিবর্তে আধুনিক আর্ট কলেজের আদর্শে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ জেমস বলেন, "To him must be ascribed the introduction of liberal education in Bengal." অর্থাৎ, বাংলার আধুনিক শিক্ষার জন্য সমুদয় বাহাদুরি রামমোহনের প্রাপ্য। তিনি এই সম্পর্কে বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে যে পত্র লিখেন তার মধ্যে তিনি সংস্কৃত শিক্ষার বিরুদ্ধে অনেক কথা প্রকাশ করেন। এ স্থলে তিনি (রামমোহন) বলেন,

"This Seminary (proposed Sanskrit School) similar in character to those which existed in Europe before the time of Lord Bacon, can only be expected to load the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinction of little or no practical use to the possessors or to society."

অন্য এক স্থলে তিনি বলেন, "It had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge. The Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the Schoolmen which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner, the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature, But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural philosophy, Chemistry, Anatomy with

other useful sciences which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talent and educated in Europe and providing a college furnished with necessary books, instruments and other apparatus."

এই পত্রে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ফারসি, আরবি ও সংস্কৃত শিক্ষায় যে এদেশের কোন কল্যাণ সাধিত হবে না এবং ইংরেজি শিক্ষা ব্যতীত যে দেশের কুসংস্কার দূরীভূত হবে না, তা রামমোহন সম্যকরূপে উপলব্ধি করেছিলেন। এই দূরদর্শিতার ফলে এদেশের যুগসঞ্চিত দৃঢ়নিবন্ধ ধারণাকে উচ্ছেদ করতে তিনি যে বিপুল সহায় হয়েছেন তা বলাই বাহুল্য। বাংলা তথা ভারতের সৌভাগ্য যে, সে যুগে রাজা রামমোহনের মত মহাপুরুষ জন্মেছিলেন এবং তার সঙ্গে মহাচেতা ডেভিড হেয়ার ও স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট সংযুক্ত হয়েছিলেন।

কিন্তু দুঃখের সহিত লিখতে হবে যে, সে যুগে, এমনকি আজ পর্যন্ত মুসলমান সমাজে রামমোহনের মত পাশ্চাত্য-জ্ঞানদীপ্ত প্রতিভার আবির্ভাব হয় নাই। রামমোহন যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য আন্দোলন করেন তখন মুসলমান রাজ্যহীন হয়ে ক্ষোভে দুঃখে ইংরেজকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখতে থাকে, সুতরাং ইংরেজি শিক্ষার কথা তার মুখে উঠতেই পারে না। মানুষ সাধারণত প্রাচীনপন্থী স্থিতিশীল। শিক্ষাক্ষেত্রে এ কথাটি আরও সত্য। ওয়ারেন হেস্টিংস এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মুসলমান সমাজকে স্থির করবার জন্য কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত করেন। দূরদর্শী হিন্দু নেতৃবর্গ কালবিলম্ব না করে এবং মুসলমানের মত আক্ষেপে দিন না কাটিয়ে পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করবার জন্য হিন্দু কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে। হিন্দু কলেজ কালক্রমে প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হয়। মুসলমান সমাজ কলকাতা মাদ্রাসা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকল। কলকাতা মাদ্রাসার পর চট্টগ্রাম, ঢাকা, হুগলি মাদ্রাসা ব্যতীত সরকার ১৯২৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানদের জন্য অন্য কোন শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন নাই। কিংবা ১৯২৬ সালের প্রতিষ্ঠিত সা'দাত কলেজ ব্যতীত মুসলমান সমাজ স্বাধীনভাবেও আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোন শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তার কারণ, মুসলমান সমাজে তার জন্য তীব্র কোন আন্দোলন হয় নাই। হিন্দু নেতৃবর্গ যা ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠা করতে সরকারকে বাধ্য করেছিলেন তাই মুসলমান সমাজ পেয়েছে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে মাত্র ১৯২৬ সালে। এই হিসাবে ধরলে বলতে হবে মুসলমান সমাজ হিন্দু সমাজের একশত নয় বৎসর পশ্চাতে। এই এক শত নয় বৎসরের জের যদি পূরণ করতে হয় তাহলে যে আজ মুসলমানকে কি করা উচিত তাও মুসলমান নেতৃবর্গ অবগত নন। যদি ১৮১৭ সালের হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের সহিত বর্তমান ইসলামিয়া কলেজের শিক্ষকদের তুলনা করি তাহলে বুঝতে পারা যায় মুসলমান সমাজে প্রকৃত শিক্ষার জন্য কোন ক্ষুধা নাই কিংবা তার জন্য কোন আকাঙ্ক্ষাও নাই। ডিরোজিওর মত শিক্ষক হিন্দু সমাজের শিক্ষাকে কতখানি উন্নত করেছেন তা ভাবলে সত্যই ইসলামিয়া কলেজের ব্যবস্থা দেখে নিতান্ত নিরাশ হতে হয়। বর্তমান মুসলমান সমাজ কি ডিরোজিওর মত লোককে আর এখন পেতে পারেন? কখনও নয়। এমন অবস্থায় ইসলামিয়া কলেজে যে

সমস্ত বিষয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে তা আরও অধিকতর উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের হাতে দেওয়া উচিত ছিল। এইরূপ অল্প উপকরণ দিয়ে এই কলেজ কেমন করে মুসলমানের জ্ঞানকে প্রস্ফুটিত করতে সমর্থ হবে তা ভেবে পাই না। যে সমস্যার সমাধান-কল্পে হিন্দু-সমাজ হিন্দু কলেজ পেয়েছিল আজ একশত বৎসর পরে আমাদের সেই সমস্যাই বিষম হয়ে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু ঐ সমস্যা ঠিক ১৮১৭ সালের ব্যবস্থা দ্বারা সমাধান করলে প্রকৃত সমাধান পাওয়া যাবে না। আজ আমাদের নূতন করে সে সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে।

একশত বৎসর পূর্বে হিন্দু সমাজ সংস্কৃত শিক্ষাকে দূরে সরিয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞানকে বরণ করেছিল—আর একশত বৎসর পরে আমরা সেই আরবি শিক্ষাকেই পুনঃপ্রবর্তিত করছি নব-প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাসমূহে। প্রাচীন শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করে যে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, সে বুদ্ধি আজও আমাদের হয় নাই। আজ তাই আমরা প্রাচীন শাস্ত্রের সঙ্গে একটুখানি ইংরেজি জুড়ে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা দিচ্ছি।

সেনসাস ঘেঁটে দেখি, একটি হিন্দু ছেলে ৮ বৎসর বয়সে যা আয়ত করে ঠিক তাই আয়ত করে একটি মুসলমান ছাত্র ১১ বৎসর বয়সে। কাজেই শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষত উচ্চশিক্ষায় মুসলমান হিন্দুর কাছে হটে যেতে বাধ্য। এর কারণ মুসলমানদের ধর্মশিক্ষার জন্য উৎকট উদ্বিগ্নতা। শিশু কথা না বলতে শিখতেই দুর্বোধ্য আরবি শব্দের সঙ্গে লড়াই করতে বাধ্য হয়। হয় পিতা না হয় শিক্ষক বেত্রহস্তে সেই আরবি শব্দ কণ্ঠস্থ করাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। প্রতিদিন প্রাতে যখন শিশু প্রকৃতির মনোরম দৃশ্যের সহিত একটু পরিচয় করবে ঠিক সেই সময় তাকে কোরান শরিফ বগলে কি কাঁধে করে মসজিদে যেতে হয়। সেখানে উস্তাদজির সেই নিদারুণ বেত্রাঘাতের সহিত তার জীবন-যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেই নিষ্ঠুরতার মধ্যে মুসলমান ছাত্রের ধর্মশিক্ষা আরম্ভ হয়। অতিকষ্টে আরবি শব্দ কণ্ঠস্থ করতে করতে তার শিক্ষার প্রতি তীব্র ঘৃণার উদ্রেক হয়। সুকুমার-মতি শিশু অনেকেই এই নিষ্পেষণের চাপে একেবারে ভেঙে পড়ে। একদিকে তাদের সমুখে আরবি ভাষা অন্যদিকে উস্তাদজির তাম্বি ও বেত্রাঘাত—এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে মুসলমান শিশুর শিক্ষা শুরু হয়। এই জবরদস্তির ফল যে বিষময় হয়েছে সমাজপতিরা আজও তা খতিয়ে দেখছেন না—কোরান খতম করে অনেকেই শিক্ষার হাত হতে চির-বিদায় গ্রহণ করে এবং উতরকালে তারাই নানাবিধ অধর্মের অনুষ্ঠান করে। কোন দার্শনিক বলেছেন, morality enforced is immorality in fact. জবরদস্তিতে ধর্ম শিক্ষা দিলে তার ফল বিপরীত ফলে। মুসলমান সমাজের মধ্যে আজ যারা নানা কু-আচরে লিপ্ত তাদের বাল্যজীবনের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে তাদের অনেককেই উস্তাদজির একমাত্র সম্বল সেই বেত্রাঘাত খেতে হয়েছে এবং সেই বেত্রাঘাতই তাদেরকে বিপথে চালিয়েছে। শিক্ষার প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা যে এহেন কোরান শিক্ষার আশু ফল তা প্রমাণ করার জন্য বেশি কষ্ট পেতে হয় না। যে সমস্ত ছাত্র মসজিদে কোরান পড়েছে তাদের কয়জন শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি করেছে? আর যারা সৌভাগ্যক্রমে কোরান শিক্ষার পর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তারা সাধারণত পরিণত বয়স্ক—কিন্তু তাদের মস্তিষ্কের শক্তি দুর্বোধ্য ভাষা কণ্ঠস্থ

করতে করতে যথেষ্ট পরিমাণে কাহিল হয়ে পড়ে এবং তাদের মানসিক স্ফূর্তি একেবারে থাকে না। এমন অবস্থায় মুসলমান ছাত্র অনেকটা আধমরা হয়েই যেন শিক্ষা লাভ করতে যায়। তার নিকট হতে বেশি আশা করাই বাতুলতা। এজন্য আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

ব্রিটিশের প্রতি বিদ্বেষবশত মুসলমান সমাজের সারথিগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে ফতুয়া জারি করলেন। সে ফতুয়ার বিষময় ফল আজও সমাজের শিরায় শিরায় বর্তমান। কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর মুসলমান শিক্ষার্থী মাদ্রাসাতেই ভর্তি হয়েছে, কিন্তু ইংরেজি বিদ্যালয়ে খুব কম আকৃষ্ট হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাই বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে। মাদ্রাসা হতে উত্তীর্ণ হয়ে মৌলভি সাহেবগণ গ্রামে গ্রামে ধর্মশিক্ষা দিয়ে স্ব স্ব উদরান্নের সংস্থান করেছেন। তাঁদের সেই ধর্ম-ব্যবসায়কে উঞ্ছবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। তাঁরা পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে নিরক্ষর গোমরাহ নির্বোধ মুসলমানকে শিষ্যত্বে বরণ করে তাদের মূর্খতাকে ক্রমশ পাকিয়ে তুলেছেন। যে সমস্ত উপাখ্যান, উপকথা আউড়ে তাঁরা ইসলামের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করেছেন এবং ইসলামের প্রবর্তক মহাপুরুষ মুহম্মদ (দ) কে নানা কুসংস্কারের আবর্জনায় আবৃত করে তাদের সমুখে ধরেছেন এবং তদ্দ্বারা শ্রমক্লান্ত পানাহার-অন্বেষণে সদা-ব্যস্ত পল্লীবাসী মুসলমানদের ধারণা ও বুদ্ধিকে যেরূপে বিকৃত করেছেন তাতে আজ তারা এক অপরূপ জীবে পরিণত হয়েছে। তাদের জীবনে শ্রী নাই—তারা দুনিয়ার সৌন্দর্য, সম্পদ, সুখ বৃদ্ধির জন্য কোন আকাঙক্ষাই পোষণ করতে শিখে নাই। কালক্রমে শিক্ষা ও সম্পদ অর্জনের উপযোগী জ্ঞানের অভাবে যখন গ্রাম্য মুসলমানের সঙ্গতি কমতে শুরু করল ও সঙ্গে সঙ্গে মৌলভি সাহেবগণের উঞ্ছবৃত্তিও অর্থলাভের প্রতিকূল হতে লাগল, তখনই তাঁরা অর্থকরী অর্থাৎ 'চাকরি করা' বিদ্যা ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করলেন। তখন ইংরেজি শিক্ষা জায়েজ করবার জন্য নানা হাদিস খুঁজে বের করা হল। তাঁরা গ্রামে গ্রামে দুই একটি ছেলেকে ইংরেজি বিদ্যালয়ে দিতে থাকলেন এবং তাদের আদর্শ দেখে নিরক্ষর পল্লীবাসী মুসলমানও ইংরেজি বিদ্যালয়ের পক্ষপাতী হল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরেজি বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্র ক্রমাগত বর্ধিত হয়েছিল। ১৮৭৪ অব্দে ক্রফট সাহেব তাঁর রিপোর্টে লেখেন, "অবস্থাপন্ন মুসলমান ছাত্র ইংরেজি বিদ্যালয়ে দ্রুত প্রবেশ করেছে।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি দেখান, "১৮৭২ অব্দে ঢাকা বিভাগে মাত্র ৮৫৬ জন মুসলমান ছাত্র ছিল এবং ১৮৭৪ অব্দে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে ১৩২৬১ ছাত্র হয়।" ভূদেব বাবুও বলেন, "দিনাজপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, পাবনা প্রভৃতি জেলার ভদ্র মুসলমানগণ কোরান শিক্ষা ব্যতীত আরবি বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে না-পসন্দ করেন এবং ক্রমশ ইংরেজি বিদ্যালয়গুলি তাঁদের আদরণীয় হয়ে উঠছে।"

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আরবি শিক্ষার প্রতি মুসলমান জনসাধারণের বিশ্বাস ও ভক্তি এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ অক্ষুণ্ণ হয়ে রইল। বিশেষত মাদ্রাসা হতে উত্তীর্ণ মৌলভি সাহেবগণ তাঁদের পেশা বহাল রাখবার জন্যই হোক বা অন্য কারণেই হোক ঐ বিশ্বাস (credulity) অটল করে রাখতে সহায় হলেন। পক্ষান্তরে ইংরেজি-শিক্ষিত মুসলমান আরবি

শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন। এইরূপে মুসলমান সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায় দুইটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। উভয় দলের সঙ্গে কোন রফা বা বনিবনাও হল না ; বরং একে অপরের নিন্দা অপবাদ দিয়ে সমাজের জনসাধারণকে বিব্রত করতে লাগলেন। জনসাধারণ মৌলভি সাহেবদেরই প্রভাবে যুগসঞ্চিত কুসংস্কারপীড়িত হয়ে ইংরেজি শিক্ষিতগণকে ঘৃণা করতে লাগল। তারা তাদের প্রচারিত ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবে 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই' পড়ে থাকল। প্রকৃত শিক্ষার কথা কানে কে পৌঁছায়? ইংরেজি-শিক্ষিতগণ সরকারের চাকুরিতেই জীবন কাটাতে লাগলেন। ফলে মুসলমান সমাজে চিন্তাশীল লোকের আবির্ভাব হল না। ইংরেজি ও আরবি শিক্ষিতের পরস্পর দ্বন্দ্ব-দ্বেষাদ্বেষি প্রবল থেকে প্রবলতর হতে লাগলো। ইংরেজি শিক্ষা দ্বারা আরবি শিক্ষাকে আধুনিক দর্শন-বিজ্ঞানের প্রভাবে নতুন করে প্রবর্তিত করবার কথা মুসলমান সমাজের মনে জাগল না। আরবি শিক্ষা যে আধুনিক জগতের জীবন-সমস্যা সমাধানের অনুকূল নয়, সে কথাও মুসলমান আদৌ বুঝল না। মধ্যযুগের প্রবর্তিত কালাম, মনতক, বালাগাৎ শিক্ষার জন্য শক্তি ও অর্থ ক্ষয় যে বর্তমান যুগের পক্ষে অনেকখানি নিরর্থক, সে কথা গলা ছেড়ে বলবার মত শক্তিমান পুরুষের আবির্ভাব আজও মুসলমান সমাজে হয় নাই। ইংরেজি ও আরবির যে সমন্বয়ে বর্তমান যুগের প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে তেমন সমন্বয়ের চেষ্টাও আজও হয় নাই। ফলে, ইংরেজি-আরবি দ্বন্দ্ব এখনও প্রবলরূপে বিদ্যমান থাকায় সমাজ-মনের ঋজুতা ও একাগ্রতা সম্ভবপর হচ্ছে না।

কিন্তু এই দ্বন্দ্ব চুকিয়ে ফেলবার জন্য কিছু চেষ্টা যে হয় নাই, তা বলা যায় না। দুঃখের বিষয়, সে চেষ্টায় এমন কোন শক্তিমান পুরুষের হাত পড়ে নি—যাঁর জ্ঞান ও রুচি প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংযোগ সাধন করতে পারে এবং মুসলমানের মুক্তির জন্য যাঁর বুদ্ধি ও অনুভূতি সম্পূর্ণ সজাগ। যে চেষ্টা হয়েছে তার ফলে ১৯১২ সালে পুরাতন আরবি মাদ্রাসাগুলির পরিবর্তে নূতন মাদ্রাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবর্তন কিছুই হয় নাই—পাঠ্য তালিকায় ইংরেজি ও বাংলা সংযুক্ত হয়েছে মাত্র। পুরাতন শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করার ব্যবস্থা যেমন তেমনি রয়েছে। ইংরেজি যুক্ত হয়েছে, কেননা তা না হলে চাকরী পাওয়া দুষ্কর। সরকারের ঘরে চাকরি জুটাতে হলে ইংরেজি জানা দরকার—কিন্তু জনসাধারণ শুধু ইংরেজি শিখতে নারাজ অথচ চাকরির জন্য উদ্বিগ্ন। এমন অবস্থায় ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত না করে কিংবা আধুনিক জগতের দাবির দিকে লক্ষ্য না করেই নব মাদ্রাসা-শিক্ষা-পদ্ধতি করা হল। তাতে পুরাতন মাদ্রাসার সমস্তই থাকল, কেবল এক ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা ও উর্দুর পরিবর্তে বাংলা শিখবার ব্যবস্থা করা হল। এই পদ্ধতি মুসলমান সমাজের যে মনঃপূত হয়েছে তা সরকারের কাগজ-পত্র হতে প্রমাণ করা যায়। মুসলমান জনসাধারণ এখন ছাত্রকে মধ্য-ইংরেজি বা উচ্চ-ইংরেজি বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে পাঠায় জুনিয়র ও সিনিয়র মাদ্রাসায়। তাদের ধারণা, এক গুলিতে দুই বাঘ পড়বে—দ্বীনও হবে দুনিয়াও হবে। ছেলেরা ইংরেজি শিখে কাফের হবে না ; তাদের লুঙ্গি, টুপি, কুর্তা সমস্তই ঠিক থাকবে—মনের মধ্যে কোন বদ-খেয়াল ঢুকবে না ; মাতা-পিতার আর শঙ্কার কারণ থাকবে না। এমন চমৎকার শিক্ষা-পদ্ধতি আর কোথায় পাওয়া যাবে? এইরূপে জনসাধারণের অন্ধ বিশ্বাসকে (credulity) এমনি করেই ব্যবহার করা হয়েছে যে

M. E. ও H. E. school হতে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। শিক্ষা-বিভাগের রিপোর্টে দেখি :

	১৯২৩–২৪	১৯২৪–২৫	১৯২৫–২৬
H. E. school	শতকরা ১৫.২ ٪	শতকরা ১৪.৪ ٪	১৩.২ ٪
M. E. school	শতকরা ১৯.৪ ٪	শতকরা ১৮.৫ ٪	১৬.৪ ٪

কারণ মক্তব ও নব-প্রবর্তিত মাদ্রাসা ক্রমশ বেড়ে চলেছে এবং মুসলমান অভিভাবক এই মাদ্রাসাতেই ছাত্র পাঠাতে অতিশয় উদ্বিগ্ন।

	১৯২৩–২৪	১৯২৪–২৫
মাদ্রাসা	৩৪৬	৩৭৪
ছাত্র	২৬,১৫৬	৩১,৬১৩
সরকারি ব্যয়	৩,৩৯,২৯৬ টাকা	৬,১৯,৭৭৬ টাকা

শতকরা ৪২জন মুসলমান ছাত্র মক্তবে পড়ে। নব-মাদ্রাসার শিক্ষা যে আদরণীয় হচ্ছে, তার কারণ—ইহাতে আরবি ও ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ভালো করে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে, এই শিক্ষায় মুসলমান সমাজের জীবন শ্রী-সম্পন্ন হবে না—তার মন জাগবে না—রুচি ফিরবে না—বুদ্ধি বিকশিত হবে না—জগতের জ্ঞান গ্রহণ করতে তার শক্তিও বাড়বে না। শুধু ভাষা শিখলেই যে জ্ঞান বর্ধিত হয়, বুদ্ধি বিকশিত হয়, মন সম্প্রসারিত হয়, কর্মশক্তি বাড়ে এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়েই বোধ হয় প্রবর্তকগণ নব-মাদ্রাসা-শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু শিক্ষাতত্ত্ববিদগণ এক বাক্যে বলবেন, এরূপ ধারণা নিতান্ত ভুল। মন বিকশিত ও বুদ্ধি সজাগ করতে যে-সমস্ত বিষয় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ছাত্রের সামর্থ্যানুসারে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, সেগুলি প্রকৃষ্ট উপায়ে শিক্ষার ব্যবস্থা যে শিক্ষা-পদ্ধতিতে থাকে না সে পদ্ধতি জীবন-সমস্যা সমাধান করতে পারে না। যে শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক নাই—সে শিক্ষা পঙ্গু। যেমন, যে জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক নাই সে জীবন অন্ধ। যে শিক্ষা হৃদয় প্রশস্ত করে না—বুদ্ধিকে জাগ্রত করে না—চিতকে মার্জিত করে না—সংস্কার হতে মুক্তি দেয় না, সে শিক্ষা জাতির প্রাণ বিনাশ করে। সঙ্কীর্ণ মন নিয়ে কোন জাতি টিকে থাকতে পারে না।

শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলেছেন, "মনোজগতে যে জাতি একঘরে সে জাতি পতিত।"

মাদ্রাসা শিক্ষার পরিণাম চিন্তা করলে আমার ঐ কথাটাই মনে পড়ে। আজ নব-মাদ্রাসায় বর্তমান জগতের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস বা আর্ট কিছুরই স্থান নাই, অথচ যে-সমস্ত শিক্ষা-কেন্দ্রে এই সমস্ত বিষয়ের স্থান করা হয়েছে সেখানে মুসলমান যাচ্ছে না। আর কিছুকাল পরে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা সাধারণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিতান্ত কম হয়ে যাবে। তখন এই নব-মাদ্রাসা হতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণও তাদের সঙ্কীর্ণ-মন, স্বল্প-দৃষ্টি, আড়ষ্ট-বুদ্ধি নিয়ে মুসলমান সমাজকে জগতের অন্যান্য শক্তিমান্ জ্ঞানদীপ্ত জাতির সমুখে নিতান্ত হেয় বলে

অকাট্য সত্য বলে শিক্ষার্থীকে মেনে নিতেই হয়। সে তার পারিপার্শ্বিক জীবন হতে লব্ধ-জ্ঞান দ্বারা সে সূত্রকে সমালোচনা করতে পারে না। সে শিক্ষা তাকে দেওয়া হয় না। এই যে শুধু 'মেনে নেওয়া' এর চেয়ে শিক্ষার বিড়ম্বনা আর কি হতে পারে? এতে চিতবৃতি বিকশিত হয় না, বুদ্ধি স্তম্ভিত বিড়ম্বিত হয়ে ক্রমশ জড়তায় আচ্ছন্ন হতে থাকে। ধারণাশক্তি এতে রুদ্ধ হয়ে যায়। চিন্তাস্রোতে ভাটা পড়ে। মাদ্রাসা-শিক্ষা মস্তিষ্কের খাদ্য যোগায় না। গণিত—যাতে বুদ্ধি বিকশিত হয়—তার মাত্র যৎকিঞ্চিত শিক্ষা দেওয়া হয়—তার মধ্যে আবার বীজগণিত বা Algebra গরহাজির। বর্তমান Logic, বর্তমান ইতিহাস ভূগোল—যাতে মনের স্ফূর্তি হয়—দৃষ্টি খোলে—হৃদয়বৃত্তি বিকশিত হয়—তার স্থান মাদ্রাসায় নাই। মাদ্রাসার ইতিহাসের পাঠ্য-সীমা দেখলে মনে হয় ইসলামের ইতিহাস যেন হজরত আলীর সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদুনের পরের ইতিহাস যেন পাঠ্যোপযোগীই নয় এদের নিকট। জগতের সঙ্গে পরিচয় করতে হলে যে সমস্ত বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন মাদ্রাসায় তার কিছুরই ব্যবস্থা হয় নাই। সাহিত্য ও কাব্য যাতে জীবনের রুচি ও সৌন্দর্যজ্ঞান বর্ধিত হয় তারও স্থান অতি সামান্য। এই শিক্ষায় ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মজীবন দুটী পৃথক করতে শেখায় না। এতে এই ধারণা জন্মায় যে ধর্মশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করলেই ধর্মজীবন লাভ করা যায়। ফলে, অনেক মৌলবি সাহেব ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়েও নিতান্ত গর্হিত জীবন যাপন করেন। তাঁরা কিছুতেই বুঝেন না ধর্মজীবন যাপন করতে হলে শুধু ধর্মশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করলেই চলে না, সঙ্গে সঙ্গে জীবন যাপনের সমুদয় কায়দাকানুনও শিখতে হয়, হৃদয় ও মনোবৃত্তিগুলির চর্চা করতে হয়। ধর্মশাস্ত্রকে কণ্ঠস্থ করে সিকেয় তুলে রাখলে চলে না। তাকে অন্যান্য পুস্তকের সংসর্গে এনে আয়ত করতে হয়, বুঝতে হয়, জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয় এবং তজন্য আবশ্যক হলে কিছু কিছু ত্যাগও করতে হয়—কারণ জীবন আমাদের শাস্ত্রের চেয়ে সত্য। "জীবন নানা শাস্ত্রকে সৃষ্টি করে"—আজ আমাদের এই কথা ভাল করে বুঝে মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করতে হবে। নতুবা এজীবন সুন্দর ত হবেই না বরং ধর্মজীবনও আমাদের গর্হিত হতে থাকবে।

কেহ কেহ বলেন, মাদ্রাসায় ছেলেরা অল্প খরচে লেখা পড়া শিখতে পায়। ঠিক,—কিন্তু একথা হয়ত আপনারা জানেন—'সস্তার তিন অবস্থা'। সস্তা জিনিস সব সময়ই আক্রা। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরি অনেকেই জায়গিরে থেকে পড়েন। এই জায়গিরে যাঁরা থাকেন তাঁদের জীবন অতি কঠোর। কিন্তু জায়গিরে থেকে শিক্ষা লাভ করে তাঁরা যতটুকু লাভ করেন আমার মনে হয় তাঁরা তার দশগুণ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। জায়গিরে থেকে গৃহপ্রভুর হুকুম তামিল ও সুনজর বজায় করতে করতে শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা যে দিন দিন কত হীন হয়ে পড়ে তা বর্ণনা করা যায় না—পরিণামে তাঁর চরিত্র যে দুর্বল হয়, তেজ ও সাহস যে ক্ষীণ হয়ে পড়ে তা বলাই বাহুল্য। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায় তার জীবন কত ক্ষীণ, আকাঙ্ক্ষা কত দুর্বল—সাহস কত কম—মুখ বিশীর্ণ! সমস্ত চেহারাতে যেন তাঁর দৈন্য ফুটে পড়ছে; জীবনের স্বাদ যেন তাঁর ফুরিয়ে গেছে—কোন বস্তুতেই যেন তাঁর আর স্পৃহা নাই! এরূপ জীবন্মৃত হয়ে এই ঝঞ্ঝাপীড়িত সংসারে তাঁর পথ কেটে বের করতে হয়। কিন্তু সে পথ কাটতে যে শক্তির দরকার সে শক্তি অর্জন করার শিক্ষা মাদ্রাসা হতে প্াওয়া যায় না।

তারপর মাদ্রাসায় যেরূপ প্রণালিতে শিক্ষা প্রদান করা হয় তাহাও শিক্ষার্থীর মনোবিকাশের অনুকূল নয়। শৈশবেই মাতৃভাষার সহিত পরিচয় ঘটবার আগেই আরবি প্রাথমিক ও তার উর্দু তর্জমা কণ্ঠস্থ করতে করতে শিশুর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। ৮-১০ বৎসর বয়সেই একটী বালককে তিনটী ভাষা পড়তে হয়, আরবি, উর্দু ও বাংলা। তার দুই বৎসর পরই ইংরেজি তার উপর চাপে। ১২ বৎসর বয়সে তাকে চারিটী ভাষার সহিত যুঝতে যুঝতে জুনিয়ার মাদ্রাসার সীমা অতিক্রম করতে হয়। অবশ্য চারিটী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা সাধু কিন্তু method নিয়ে ও stage নিয়ে যত মুশকিল। কোন সময় কোন প্রণালিতে শিক্ষা দিতে হবে সেইটাই বিচার্য। নব মাদ্রাসায় যে প্রণালি অবলম্বন করা হয়েছে এবং যে stage এ ভাষার চাপ দেওয়া হয়েছে তা বিজ্ঞানসমত নয়। তাতে সুফল ফলতে পারে না। এজন্যই ১২ বৎসর পর্যন্ত পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই এইরূপ নিষ্ঠুর পাঠ্যপদ্ধতির চাপে অনেককে শিক্ষাক্ষেত্র হতে চিরবিদায় গ্রহণ করতে হয়। এই ব্যবস্থার বিহিত প্রতিকার সত্বর করা প্রয়োজন। নতুবা আর কিছু কাল পরে দেখব আমরা ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিভাগে চিরদিনের তরে গরহাজির হয়েছি। হিন্দু-সম্প্রদায় উতরোতর নানা জ্ঞান আহরণ করে শক্তিমান হবে আর আমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপে লুকিয়ে থাকব। জগতের সঙ্গে আমরা একেবারে যোগ হারিয়ে ফেলব। শুধু ইংরেজিভাষা আমাদের রক্ষা করবে না। ইংরেজি ভাষার সঙ্গে ইংরেজি দর্শন বিজ্ঞান কাব্য প্রভৃতি গ্রহণ করতে হবে-হজম করতে হবে, তার উপর আমাদের ধর্মশাস্ত্রের যুগধর্মসম্মত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করতে হবে। এজন্য আমাদের শিক্ষা একমুখী করতে হবে—কেমন করে করা দরকার তা ভাবতে হবে।

আজ আমাদের সকল দুর্গতির কারণ হচ্ছে আমাদের আড়ষ্ট বুদ্ধি—অন্ধবিশ্বাস, বর্তমান জীবন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য এবং বর্তমান জগতের জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কহীনতা। তার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি অনেকখানি দায়ী। মুসলমান সমাজের ঐক্য-সাধন বা একদিল করতে হলে আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি একমুখী করতে হবে—জগতের সমস্ত বিদ্যা বর্তমান জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। আজ আমাদের সকল শুভ চেষ্টা আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে মুক্ত করতে নিয়োজিত হোক।

পূর্বে বলা হয়েছে, সাধারণত বাঙ্গালি মুসলমানের শিক্ষা ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ হতে যুগধর্মকে অবজ্ঞা করে চলে এসেছে। ফলে, আজ তার সঙ্গে পড়শী হিন্দুজাতির cultural পার্থক্য এমন মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তাতে উভয় সম্প্রদায়ের কোন প্রকার মিলন সম্ভবপর হচ্ছে না বরং একে অপরের গলা কাটতে প্রস্তুত হয়েছেন। এই মনোভাব দূর করতে হলে উভয়ের শিক্ষা অনেকটা একমুখী হওয়া চাই। সামাজিক আচার এবং ধর্মসঙ্গত আকায়েদ ও আমল (faith and practice) সম্পর্কে শিক্ষার ব্যবস্থা পৃথক হলেই চলতে পারে। তাছাড়া জাগতিক জ্ঞান গুণ শিক্ষার secular education এর জন্য উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষাক্ষেত্র এক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহলে একে অপরকে ভাল করে জানতে পারবে। একে অপরের ত্রুটি, স্নেহ ও ক্ষমার চক্ষে দেখতে শিখবে। নতুবা ভিন্ন ভিন্ন communal school ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে কেবল সঙ্কীর্ণতাচর্চাই সার হবে। ফলে দেশের কোন প্রচেষ্টাতেই উভয় সম্প্রদায় একই

পরিদৃষ্টি (outlook) দিতে সক্ষম হবে না। তাহলেই ঝগড়া ফাসাদই প্রবল হতে থাকবে। আসল সমাধান এর দিকে সমবেত চেষ্টা কেন্দ্রীভূত হবে না। এজন্য আজ **আমি বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যাকে সমগ্র ভারতের জাতীয় সমস্যা বলতে চাই**। পূর্বে আমি দেখাতে প্রয়াস পেয়েছি যে, আমাদের শিক্ষা সংস্কারের evolution এর ফলে আমরা যে নব মাদ্রাসা প্রণালি পেয়েছি তা আমাদিগকে প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারছে না। এই প্রণালির প্রবর্তক আশা করেছিলেন এর ফলে বাঙ্গলাদেশে কতকগুলি আধুনিক মোল্লা ছড়িয়ে পড়বেন, যাঁরা পুরাতন অন্ধসংস্কারাচ্ছন্ন মোল্লাগুলিকে সরিয়ে মুসলিম জনসাধারণকে তাদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার নাগপাশ হতে মুক্তি দিতে সমর্থ হবেন। এই প্রণালির একমাত্র উদ্দেশ্য যদি শুধু মোল্লা তৈরি করাই হত তাহলে বোধ হয় এর সংস্কার করবার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ ছিল না কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশত বাঙ্গালী মুসলমান এই প্রাণালীকে তার একমাত্র শিক্ষা প্রণালি মনে করে প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজ বর্জন করে ছেলেপুলে সব দ্রুত মাদ্রাসায় পাঠাচ্ছেন।

বাংলার গ্রামে গ্রামে আজ মাদ্রাসা করবার প্রয়াস বেড়েছে। খুব প্রশংসার কথা : কিন্তু তাতে তৈরি হচ্ছে কি? তাতে শিক্ষাপ্রীতি না বেড়ে বেড়েছে শিক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণা ; তাতে জ্ঞানের উদারতা ও শক্তি না বেড়ে বাড়ছে ধর্মান্ধতা ও আত্মপ্রবঞ্চনা ; তাতে সত্য-অনুসন্ধিৎসা না জেগে জাগছে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ; পরধর্মের নিকৃষ্টতা প্রমাণের জন্য আকুল আগ্রহ ; স্বধর্মের প্রতি অন্ধ অনুরাগ ; অজ্ঞতার কুয়াসায় আচ্ছন্ন আত্মপরিতৃপ্তি ও নিজকে সবচেয়ে নিরাপদ মনে করে ইৎমিনানে থাকার মনোবৃতি ; বাহ্যিক পরিচ্ছদ দিয়ে অন্তরের দৈন্য লুকিয়ে লালন করবার নির্লজ্জতা এবং তাতে বাড়ছে নৈতিক ভীরুতা (moral depravity), স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি হৃদয়হীনতা, জ্ঞানার্জনে পরাঙ্মুখতা ও ব্যক্তিত্বহীনতা। মাদ্রাসা বা উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মৌলবি সাহেব আজ বড় জোর একজন সবরেজিস্ট্রার আর না হয় কোন মাদ্রাসার হেড মৌলবির বেশি ক্ষমতা রাখেন তার প্রমাণ দিতে সক্ষম হচ্ছেন না। এর উতরে মাদ্রাসাপন্থী ছাত্র বলে উঠবেন, কি? এতবড় কথা। আমরা খাদেমুল ইসলাম সমিতির পুরস্কার লাভ করছি, মুসলিম সমিতির বক্তৃতায় পুরস্কার পাচ্ছি, আমরা মিটফোর্ড মেডিকেল কলেজে ভর্তি হচ্ছি। আর কি চাই?" তোফা জবাব ! যদি বলা হয় তোমরা ত মেডিকেল কলেজে ঢুকবার শক্তিলাভ করতে পারছ না ও পারবে না, তাহলে চুপ—নাহয় আস্ফালন করে উঠে বলবে, "হবে, সব আস্তে আস্তে।" এই যে ভুলকে ভুল বুঝেও স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত এতে কেমন করে আমাদের ভবিষ্যত সুন্দর হবে। আমরা আজ বড় ডাক্তার চাই আমাদের জীবন বাঁচাবার জন্য, আমরা চাই বড় ইঞ্জিনিয়ার আমাদের শ্রীসম্পদের ভাণ্ডার বড় করবার জন্য, আমরা চাই বড় উকিল আমাদের ফাঁসিকাষ্ঠ হতে খসিয়ে আনবার জন্য, আমরা চাই বড় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক আমাদের জীবন সৌষ্ঠবশালী করে তুলবার জন্য। মাদ্রাসা শিক্ষা কি সে প্রয়োজন নিবারণ করতে পারবে? সে potentiality (সম্ভাবনা) কি এই শিক্ষা-প্রণালির মধ্যে আছে? নাই, নাই—তবু সমাজ তাই আঁকড়ে ধরছে আর স্বার্থপর নেতৃবৃন্দ বলছেন, 'বেশ, মাদ্রাসা খুব ভাল কাজই করছে।' এই নিষ্ঠুর আত্মপ্রবঞ্চনা হতে আমাদের মুক্তি কে দেবে? সরকার ত মনে মনে বেশ খুশী হয়েই

অজস্র টাকা ব্যয় করছেন আর বলছেন, "বাহ্ বা বাহ্! বেশ, বাছা সকল! খুব ঘুমিয়ে থাক, আমরা একটু ঘর সংসার করে নেই। আমরা ত জানি জ্ঞান বাড়লে তোমরা চঞ্চল হয়ে উঠবে। সে জ্ঞানের শরাব তোমাদের পক্ষে যত দুর্লভ হয় ততই আমাদের মঙ্গল। সত্যই জ্ঞান না হলে মুক্তি অসম্ভব। মাদ্রাসা সে জ্ঞানের পথ রোধ করছে। এম. ই. স্কুলের পাশে পাশে জুনিয়ার মাদ্রাসা খাড়া হয়েছে আর উর্দু, বাংলা, আরবির চাপে শৈশবেই শিক্ষার্থীর মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্ক নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। গণতি করে দেখা যাক, আমি খুব জোর করেই বিশ্বাস করি, শতকরা অন্তত ষাটজন জুনিয়ারের ছাত্র শেষ শ্রেণীতে উঠবার আগেই শিক্ষার খাতা হতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। আর যারা উত্তীর্ণ হচ্ছে মুষ্টিমেয় কয়টি সিনিয়র মাদ্রাসায় পড়বার জন্য তাদের অনেকেই সংস্থান করতে পারছে না। এই যে বিপুল অপচয় এর জন্য দায়ী কে? সরকার একটী জুনিয়র মাদ্রাসায় যে টাকা সাহায্য করেন তার সিকিও একটী এম. ই. স্কুলে দেন না। এই সুযোগ নিয়ে আজকাল অনেক বেকার-পীড়িত বুভুক্ষু মৌলবি সাহেব যেখানে সেখানে গিয়ে জুনিয়ার মাদ্রাসা খুলে পেটের জোগাড় করতে শুরু করছেন। একটা জুনিয়ার মাদ্রাসায় ৫০ টাকা হতে ১২০ টাকা পর্যন্ত মাসিক সাহায্য দেওয়া হয়। এতে আরও মাদ্রাসা বাড়বে না কেন? ফলত একটী মাদ্রাসায় যে ব্যয় হয় তাতে ৪টা এম.ই. স্কুল চলতে পারে। এত ব্যয় করবার কারণ, সরকার চান প্রিমিয়াম দিয়ে মুসলমানের নির্বুদ্ধিতা, গোঁড়ামি ও কুসংস্কারকে পাকা করে তাকে অধিকতর নিরুপায়, দুর্বল, ভীরু, ভণ্ড ও মূক (uncritical) করে রাখতে। মুসলমান ও মধ্যযুগের ইসলামী কৃতিত্বের মোহমুগ্ধ আছেই, তার সেই জোশের সুযোগ নিয়ে তিনিও তার মতলব হাসিল করছেন। ভারতবাসী যখন লবণের ট্যাকস তুলে দিতে চায়, ম্যানচেস্টারের কাপড়ের উপর শুলক বসাতে চায়, ব্রিটিশ সৈন্যের রসদ খরচ কাটতে চায়, অভারতীয় কর্মচারীর বেতন কমাতে চায় তখন সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে অভিভাবকের দায়িত্বের দোহাই দিয়ে সে দাবির ভুল বুঝাতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু এই মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য সরকার একটু টু শব্দ করেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা চাইলে তিনি অভিভাবক হয়ে দাঁড়ান কিন্তু মুসলমানের ভুলটা সম্বন্ধে তিনি কথা বলতে চান না। তখন তিনি মুসলমানের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে তার স্বাধীনতায় হানা দিতে চান না। পক্ষান্তরে, জমিদারের অত্যাচারে যখন মুসলমান প্রজার স্বাধীনতা গোল্লায় যায় তখন সরকারের খোঁজ পাওয়া দুষ্কর। প্রাথমিক শিক্ষা দ্বারা মুসলমান কৃষককে সম্পদ বৃদ্ধির একটী কার্যকর উপকরণে পরিণত করা যে তার জীবনের জন্য আজ প্রয়োজন হয়েছে তা সরকার স্বীকার করেও করছেন না। কারণ তাঁরা জানেন ভারতের শিক্ষিত কৃষক একটী ভয়ানক শত্রুতে (potential danger) পরিণত হবে। কিন্তু তাদের বেশ হোশ আছে যে, মাদ্রাসার মৌলবি বেশ ভীরু ও জ্ঞান-বিবেকবর্জি—তাকে দাস করে রাখা আদৌ শক্ত হবে না। সামান্য প্রলোভনেই তার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তিলাভ করবে। অমুসলমান ভারতীয়ের বিরুদ্ধে মুসলমান ভারতীয়ের বিদ্বেষ লালন করবার জন্য মৌলবির আবশ্যক। তাঁদের তা বেশ জানা আছে। মৌলবিদের আগেকার কাজ ছিল এই দেশের মুসলিম কানুন ব্রিটিশ শাসনকর্তাদের গোচরীভূত করা। এখন তাদের কাজ হয়েছে ব্রিটিশের হাত ধরে মুসলমানকে

অধিকতর ধর্মান্ধ করে তোলা। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে যে, ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে আবুল কালাম প্রমুখ কয়েকজন আরবি শিক্ষিত পুরুষই মুসলমানের গৌরব বজায় করেছেন। কিন্তু তাঁদের মত লোককে আমি যাঁদের মোল্লা বা মৌলবি নামে অভিহিত করেছি তাঁদের শ্রেণীভুক্ত করতে চাই না। মাদ্রাসা হতে যাঁরা বের হচ্ছেন তাঁদের অধিকাংশের কথাই আমি মনে করছি। এক্ষেত্রে একটা কথা উঠবে যে, স্কুল কলেজের ছাত্রগণই বা কি বীরত্ব ও উদারচিতের পরিচয় দিচ্ছেন। 'মোহাম্মদীতে' সম্প্রতি এই উভয় শ্রেণীর শিক্ষিত মুসলমানের পার্থক্য দেখান হয়েছে। তাঁদের রায় অনুসারে কোন প্রকার শিক্ষিতের কদর ও সার্থকতা বেশি তা আপনারা অনুমান করে নেবেন। তার উতর না দিয়ে শুধু এইটুকু ইঙ্গিত করলেই যথেষ্ট হবে যে, আজ বাঙালি মুসলমান সমাজ যাঁদের নিয়ে গর্ব করছে ও যাঁদের মুখপত্র করে জগতের সামনে পেশ করছে তাঁদের প্রায় সেণ্ট-পার্সেন্ট ইংরেজি শিক্ষিত এবং তাঁদের জীবনধারা আরবি শিক্ষিতের জীবনধারা হতে ঢের পৃথক এবং অনেক স্থলেই হাদিস কোরাণের বরখেলাপ। তবু তাঁরা মুসলমান সমাজের গৌরব স্থল। আজ ইংরেজি শিক্ষিতের মর্যাদা হয়ত আশানুরূপ হচ্ছে না কিন্তু তবু তাদের বিচার বুদ্ধি, কর্মশক্তি, সৌন্দর্য-জ্ঞান, রুচি, জ্ঞান-পিপাসা, উদার-চিন্তা, পড়শী-প্রীতি আরবি শিক্ষিতের চেয়ে ঢের বেশি তা জোর করেই বলতে হবে। তার কারণ শিক্ষার প্রণালি পৃথক বলে উভয়ের 'মরতবা' ও 'মরুয়ৎ' পৃথক পৃথক। যে সমস্ত বিষয় পড়লে রুচি-জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়, মস্তিষ্ক প্রখর ও প্রবৃতি সংযত হয়, আকাঙ্ক্ষা শাণিত হয়, সৌন্দর্যের স্বপ্ন জমে উঠে, কল্পনা উদ্দীপিত হয় সে সমস্ত বিষয়ের স্থান মাদ্রাসার পাঠ্য-তালিকায় নাই—আবার যে বিভিন্ন সমাজের শিক্ষার্থীর সংসর্গে থাকলে চরিত্র সংযত হয় ও মানসিক সংকীর্ণতা দূরীভূত হয়—সে সংসর্গ মাদ্রাসায় নাই। অথচ যে ইসলামের ইতিহাস নিয়ে আমরা গর্ব করি ও আস্ফালন দ্বারা বিধর্মীকে নিরুত্তর করতে দাম্ভিকতার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকি সেই ইতিহাসেই দেখতে পাওয়া যায় বাগদাদ ও কর্দোভার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বার য়িহুদি খ্রিস্টান প্রভৃতি অমুসলমান ছাত্রের জন্যও সমানভাবে খোলা ছিল। শুধু তাদের জন্য দ্বার অবারিত ছিল তা নয়, তাদের জন্য উপযুক্ত বৃতিরও ব্যবস্থা ছিল। সেই উদার ইতিহাসের গর্বে গর্বিত আমরা আজ ঢাকার ইসলামিক কলেজ ও কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজের দ্বার অমুসলমানের জন্য রুদ্ধ করে রেখেছি।

এই যে ব্যবস্থা এতে অমুসলমানের কিছুই এসে যাবে না, কিন্তু মুসলমানের সমূহ ক্ষতি যে হবে তাতে সন্দেহ নাই। মুসলমান ছাত্রগুলি সব কূপমণ্ডুক হবে ও জ্ঞানোদ্ভাসিত অমুসলমান ছাত্রের সামনে তারা মুশড়ে পড়বে। তারা নিয়ত মুসলমানি হাসি, মুসলমানি কাশি, মুসলমানি পোষাক, মুসলমানি ভাষা, মুসলমানি চিন্তা, মুসলমানি আদব কায়দা, মুসলমানি গালি দুরস্ত করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে মন ও মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারবে না। ফলে মুসলমান যে কি জীবে পরিণত হবে তা আপনারা একবার ভাববার চেষ্টা করবেন—এইরূপ বাহ্যিক রূপ দুরস্ত করতে গিয়ে মনের দরজা, জ্ঞানের দরজা একবারে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে—তাই আমার আশঙ্কা। বাস্তবিক পক্ষে, এবিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা কি নেই? দেড় শত দুই শত বৎসর ধরে মাদ্রাসাগুলিতে যে 'মুসলমানি' তমিজ শেখাবার জন্য কোশেশ করা হয়েছে তার কি ফল

পাওয়া গেছে? সমাজের রাজপথে সে মাদ্রাসার সৃষ্টিগুলির চেহারা দেখতে পাওয়া যায় না। গোমরাহির অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে তাঁরা জীবন কাটিয়ে চলেছেন সমাজের বোঝাকে আরও ভারাক্রান্ত করে। আজ আবার তা-ই আমরা experiment করতে শুরু করলাম—তাতে যে ফল হচ্ছে তা কি আমাদের চোখে পড়ছে না? আর যে ফল হবে তা কি আমরা অনুমান করতে পারি না? তবু আমরা সোয়াস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলছি, "বেশ হচ্ছে, আজ আমরা বেশ টুপি পরতে শিখছি।"

এদিকে স্কুল কলেজগুলিতে মুসলমানের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। আপনারা হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন, সাধারণ Matriculation পরীক্ষায় এবার মুসলমান কত কম কৃতকার্য হয়েছে। গত বৎসরের চেয়েও কম। এর হয়ত এক কারণ এই হতে পারে যে, মুসলমান পরীক্ষা দিয়েছে বেশি কিন্তু কৃতকার্য হয়েছে কম। কিন্তু আমি তা স্বীকার করি না। আমার ধারণা পরীক্ষা দিয়েছে যারা তাদের সংখ্যাই কম। কম হওয়ার কারণ—দেশে জুনিয়ার মাদ্রাসা ছড়িয়ে পড়ায় এম. ই. বিদ্যালয়গুলি হতে মুসলমান ক্রমশ খসে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে High School গুলিতেও তাদের সংখ্যা কমছে। কাজেই Matriculation পরীক্ষায় তাদের সংখ্যা কম হওয়া অনিবার্য। এর মারাত্মক ফল এই যে, I Sc Class, B. Sc. Class, Medical College, Engineering প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রে মুসলমান একেবারে গর হাজির হচ্ছে। এই গরহাজির হওয়ার পরিণাম মুসলমান জাতির উত্থানের পক্ষে কতখানি সাংঘাতিক তা ভাবলে অস্থির হয়ে পড়তে হয়। এতে আমাদের রাষ্ট্রীয় সমস্যার কিছুতেই সমাধান হতে পারবে না। দ্রুত অগ্রগামী হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত রাষ্ট্রীয় সমন্বয় (Political adjustment) সাধন করা দুষ্কর হবে। অবশেষে আমরা রাষ্ট্রের দিক থেকে একটী পতিত জাতি Political pariahs or Helots হয়েই থাকতে বাধ্য হব। আমাদের অধঃপতন অগ্রগামী (progressive) হিন্দু জাতিকে আর কতকাল পিছনে টেনে রাখবে? বেশি দিন নয়। তাই আজ আমাদের সতর্ক হতে হবে।

পুরাতন মাদ্রাসা-উত্তীর্ণ ছাত্র সমূহ শিক্ষকতা ও মোল্লাকি দ্বারা উঞ্ছবৃত্তি করা ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য পেশার উপযোগী যে হতে পারেন, তার সন্তোষজনক প্রমাণ আজও তাঁরা দিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে, তাঁরা আধুনিক জ্ঞানালোক হতে বঞ্চিত হওয়ায় গোঁড়ামি-চর্চায় সমাজজীবনে মুক্তির পথ রুদ্ধ করছেন। নব-মাদ্রাসা উত্তীর্ণ ছাত্রগণও তাঁদের প্রাচীন-পন্থী ভ্রাতৃবৃন্দের চেয়ে খুব উন্নত হতে পারছেন, তাও বোধ হচ্ছে না। হয়ত তাঁরা চলাফেরায়, পোষাক পরিচ্ছদে, হাবভাবে অনেকখানি দড় (smart) হয়েছেন, কিন্তু শিক্ষায় যে তাঁদের চেয়ে উন্নত হয়েছেন তার প্রমাণ তাঁরা দিতে পারেন নাই। দুই একজন হয়ত দুই একটী বড় চাকরি পেয়ে থাকবেন বা দুই একজন Medical Schoolএ ভর্তি হয়েছেন কিন্তু সাধারণত তাঁরা আধুনিক জগতে চলবার মত বিশেষ যোগ্যতা লাভ করতে পারছেন না। তাঁরা Medical School এ হয়ত যেতে পারছেন কিন্তু কস্মিনকালেও যে Medical College এ ঢুকতে পারবেন না, তা তাঁরা উপলব্ধি করছেন বলে মনে হয় না। অন্যান্য বিভাগে প্রবেশ করা ত দূরের কথা যেখানে বিজ্ঞান-চর্চার আবশ্যকতা আছে এবং যেখানে জীবনায়োজন সংগ্রহের কায়দাকানুন শিক্ষা করতে হয়।

প্রকৃত শিক্ষার লক্ষণ হচ্ছে মন ও হৃদয় বৃতির সমধিক স্ফূর্তি (development), অপরিচিত অবস্থার মধ্যে শক্তি প্রয়োগ করবার যোগ্যত্ব (capacity), নব নব সমস্যায় নব নব সমাধান উদ্ভাবনে সক্ষমতা (resourcefulness) ও জাতি ধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের প্রতি প্রীতি (love of humanity) প্রদর্শনে জাগ্রত সহৃদয়তা ও প্রবৃতি। এসব লক্ষণ দ্বারা test করলে নব মাদ্রাসার শিক্ষা যথেষ্ট বলে প্রমাণ করা যায় না।

এই শিক্ষা যে জীবন-সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট নয় তার বড় প্রমাণ এই যে, অনেকেই আজ মাদ্রাসা হতে উত্তীর্ণ হয়েই সাধারণ ইস্কুল কলেজে ঢুকবার জন্য ছুটেছে। এতেই এই Scheme অবশেষে ব্যর্থ হবেই, (The Scheme will kill itself) কিন্তু তার পূর্বেই বাঙ্গালি মুসলমানের এমন সর্বনাশ হবে যে, তা আর শোধরান যাবে না। সুখের বিষয়, প্রিন্সিপাল খান বাহাদুর মৌলবি মুহম্মদ মূসা সাহেব তাঁর বার্ষিক Report-এ এই Warning এর ইঙ্গিত করেছেন। জীবন সংগ্রামে এই মাদ্রাসা শিক্ষা এত অপর্যাপ্ত যে, সংস্কারের পূর্বে মুসলমান সংগ্রামে হটে হটে নিস্তানাবুদ হতে থাকবে ; কোন স্থানেই আর ঠাঁই করতে পারবে না। একবার বিলম্বে আরম্ভ করে তারা দেখছে হিন্দু আজ সর্বত্র জায়গা জুড়ে বসেছেন। আর এই শিক্ষাপ্রণালির ফলে তাঁরা আর একেবারেই ঠাঁই করতে পারবে না। এ যাবত আমাদের অযোগ্যতা বা অল্পযোগ্যতার সঙ্গে সরকারের হাত লাগান ছিল, কিন্তু যত দিন যাবে ততই সে হাত শিথিল হতে থাকবে ; অথচ ক্রমশ অধিকতর যোগ্যতার প্রয়োজন হবে। সুতরাং মুসলমানের অবস্থা কি হবে তা সহজেই অনুমেয়।

এমত অবস্থায়, আমাদের সত্বর এমন একটা ব্যবস্থা করা আবশ্যক যাতে করে আমাদের শিক্ষা একমুখী (Unitary System) হয় ; আমাদের সময় ও অর্থ অযথা নষ্ট না হয় অথচ উন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমরা সমান যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হওয়ার সুযোগ করতে পারি।

অনেকে মনে করছেন, এই নব মাদ্রাসার কিছু কিছু সংস্কার করলেই বেশ হবে। কিন্তু আমার মনে হয় তা হবে না। কারণ সমস্ত স্কিমটাই একটা ভুল ধারণা ও ভুল উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর আগাগোড়া সংস্কার আবশ্যক।

একথা সত্য যে, মুসলমান তার একটা বিশিষ্ট Culture ও সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে ব্যস্ত ; অথচ তাকে ভারতবর্ষে হিন্দু পড়শীর সহিত একত্র বসবাস করতে হবেই—তাঁর প্রভাব একেবারে এড়িয়ে গেলেও চলবে না। এর উপর আবার ইংরেজ শাসনের প্রভাব। এই তিনের সামঞ্জস্য রক্ষা করে এই শিক্ষা প্রণালির সংস্কার করতে হবে। এক কথায়, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আর ইসলামের Culture একত্র সংযোগ করতে হবে। ব্যাপারটা খুব গুরুতর তাতে আর সন্দেহ নাই। কাজেই সমাজের শক্তিমান নেতৃবর্গের মস্তিষ্ক ও দূরদৃষ্টি প্রয়োগ করে এই শিক্ষা-সংস্কার অতি সত্বর করা আবশ্যক।

বর্তমান মাদ্রাসা স্কিমে সরকার পক্ষ কোন আপত্তি তুলছেন না। কারণ সরকার পক্ষের তাতে লাভ ছাড়া লোকসান নাই। মুসলমান অর্ধশিক্ষিত বা কুশিক্ষিত থাকলে বিদেশী শাসন সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব কিছু বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারবে। শিক্ষার অসমতা unequal

education অনুন্নত সম্প্রদায়কে উন্নত সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় সর্বদা মস্ত বড় অন্তরায় করে রাখে। উভয় সম্প্রদায়ের Political outlook বা ideal এমত অবস্থায় এক হতে পারে না। ভয় ও সন্দেহ অনুন্নত সম্প্রদায়কে উন্নত সম্প্রদায়ের সাধনার পথে কাঁটা স্বরূপ করে রাখে। এজন্য আজ আমাদের হিন্দু মুসলমান নেতৃবৃন্দের কর্তব্য মুসলিম বাংলার শিক্ষাকে উন্নতধরণে সংস্কার করার চেষ্টা করা। এতে পক্ষান্তরে আমাদের দুর্ভাগা দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথ অনেকখানি সহজ করে তুলা হবে।

অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে শিক্ষা বিভাগের দু-একজন সহৃদয় কর্মচারী যথা ডঃ জেঙ্কিনস ও মিঃ সার্প এই স্কিমকে নাপসন্দ করেছেন এবং মুসলমানের ভবিষ্যত এতে খারাপ হচ্ছে তাও তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। দুঃখের বিষয়, সেজন্য তাঁরা মুসলমানের শত্রু বলে গণ্য হয়েছেন। কিন্তু একদিন তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হবেই। সুখের বিষয়, ইতোমধ্যেই সমাজের দুএকজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এই স্কিমের কুফল সম্বন্ধে অবগত হয়ে সমাজকে হুশিয়ার করতে চাচ্ছেন। আশা করি, সত্বরই তাঁরা তাঁদের বাতিনী মতামত জাহির করে শিক্ষা সংসারের একটী আন্দোলন কার্যকর করে তুলতে প্রস্তুত হবেন এবং এই আন্দোলনে পড়শী হিন্দু সম্প্রদায়ের হৃদয়বান প্রখর-মস্তিষ্ক ব্যক্তিবর্গের সহযোগ লাভ করতে হবে। নতুবা ষোলআনা ফল পাওয়া অসম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।

পূর্বে আমি বলেছি আমাদের শিক্ষা একমুখী করতে হবে এবং কেমন করে করা দরকার তা ভাবতে হবে। আজ আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে এ সম্বন্ধে যা ভেবেছি তাই লিপিবদ্ধ করব।. ভরসা, সমাজের যোগ্যতর ব্যক্তিগণ সত্বর এসম্বন্ধে তাঁদের চিন্তা কেন্দ্রীভূত করবার জন্য প্রবৃত হবেন।

আমার মতে যে সমস্ত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার একটীও নষ্ট করবার প্রয়োজন নাই। কেবল পাঠ্যতালিকা, policy ও outlook পরিবর্তন করলেই কাজ হাসিল হবে। এখন পাঠ্যতালিকা কিরূপে পরিবর্তন করা যায় তাহাই বিবেচ্য ও বিচার্য।

আমাদের সর্বপ্রথম দেখতে হবে এই সমস্ত মাদ্রাসা হতে যে সমস্ত ছাত্র উত্তীর্ণ হবে তারা যেন দুনিয়ার বুকে পা শক্ত করে দাঁড়িয়ে বেশ স্বচ্ছন্দচিতে রীতিমত আলো-বাতাস উপভোগ করতে পারে। তাদের মস্তিষ্ক, হৃদয় ও শরীর এই তিনের যথাযথ বিকাশ-সাধন করাই আমাদের উদ্দেশ্যে। আবার যে সমস্ত হতভাগ্য উচ্চ শিক্ষা লাভে সমর্থ হবে না তাদের এমন এক একটী বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া দরকার যার উপর নির্ভর করে তারা জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে এও দেখতে হবে যে, প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত না হলেও ধর্ম বিষয়ে ও নিজেদের ইতিহাস ও Culture সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভ করতে সমর্থ হয় অথচ অন্য ধর্মাবলম্বীদের সহিত উদার ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত না হয়।

এই কয়টী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি একটী পাঠ্যতালিকার খসড়া (skeleton) সমাজের বিচারার্থে খাড়া করতে দুঃসাহসী হচ্ছি। আশা করি, এই খসড়া অবলম্বন করে অবিলম্বে যুক্তি-তর্ক আলোচনা-সমালোচনা চারিদিকে শুরু-হবে এবং অবশেষে একটী সুন্দর যুগধর্মসঙ্গত পাঠ্যতালিকা (Curriculum) নির্দ্ধারিত হবে।

এই পাঠ্য তালিকা নির্ধারণ করবার পূর্বে আমাদের কতকগুলি সমস্যার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যেতে পারে ১. ভাষা সমস্যা ২. রাষ্ট্র সমস্যা ৩. ধর্ম সমস্যা ও ৪. সমাজ সমস্যা। ভাষা সমস্যা নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। ইংরেজি আমাদের রাজভাষা—তা শিখতেই হবে। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা—তা উপক্ষো করা আত্মঘাতী। আরবি বা সংস্কৃত আমাদের ধর্মভাষা—তা ছেড়ে দিলে ধর্মহীন হওয়ার আশঙ্কা—তা শিখতেই হবে। এর উপর আবার হিন্দি বা উর্দু Lingua Franca যা না শিখলে আমাদের রাষ্ট্রীয় ঐক্য political unity কার্যকর হবে না। অতএব দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক বাঙালির তথা ভারতবাসীর চারিটী ভাষা শেখা অবশ্য কর্তব্য। অনেকে হয়ত মনে করতে পারেন চারিটী ভাষা শেখা কি সহজ কথা! কিন্তু আমার মনে হয় ভারতবাসীর পক্ষে চারিটী ভাষা শেখা কিছুই শক্ত হবে না। যদি সময়মত ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা করা হয়। কোন একজন জার্মান linguist বলেছেন, "ভাষাশিক্ষার জন্য দুইটা জাতির বিশেষ দক্ষতা (aptitude) দেখা যায়; Russians ও Indians-দের দক্ষতা সবচেয়ে বেশি। কারণ প্রকৃতিই তাদের সে দক্ষতা প্রখর করেছে।" Russiansরা বলে, "সাগরে পৌঁছতে হলে তাদের অনেক ভাষাভাষী দেশের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।" এতেই ঐ উক্তিটার খানিকটা পোষকতা পাওয়া যায়। Russianদের নিচেই Indians, তারপর আধুনিক জগতে প্রত্যেক সভ্যজাতিকেই তিনের অধিক ভাষা শিখতেই হয়। প্রত্যেক ইংরেজ বালককে মাতৃভাষা ইংরেজি, Lingua franca ফরাসি, trade ভাষা German এবং Classical ভাষা Latin বা Greek শিখতেই হয়। প্রত্যেক জার্মান বালককে মাতৃভাষা German, Trade ভাষা ইংরেজি, Lingua france ফরাসি, Legal ভাষা Latin, Classical ভাষা Greek মোট পাঁচটী ভাষা শিখতে হয়। কাজেই আমাদের aptitude থাকা সত্ত্বেও আমরা চারিটী ভাষা শিখতে পশ্চাদপদ হব কেন? বস্তুত উর্দু বা হিন্দি শেখা কিছুই শক্ত নয়। আরবি বা সংস্কৃত সময় মত পাঠ্য বিষয় করলে কাহারও পক্ষে কঠিন হবে না। আধুনিক প্রণালিতে ভাষা শিক্ষা দিলে চারিটী কেন দশটী ভাষাও শেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্র সমস্যা সম্বন্ধে একথা বললেই চলবে যে ইংরেজদের সংস্পর্শ ত্যাগ করা যখন আপাতত আমাদের পক্ষে কঠিন এবং যুক্তিসঙ্গত নয় তখন তাঁদের জ্ঞানগুণ অর্জন করবার জন্য তাঁদের আদর্শ আমাদের অনুকরণ করাই শ্রেয়। তবে সকল ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় আদর্শ এক হওয়া কর্তব্য। এক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য বা বিরুদ্ধ মনোভাব থাকা উচিত নয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সেই আদর্শ হৃদয়ে পোষণ করতে এবং তদনুসারে দেশের মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা করতে শেখে, শিক্ষাকেন্দ্রে তার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের পার্থক্য থাকবেই। তবে শিক্ষার্থীর মনোভাব এমন করে গড়তে হবে যাতে ঐ পার্থক্য আমাদের কল্যাণের বা মুক্তির পথে বিঘ্ন না হয়ে বরং সহায় হতে পারে। প্রত্যেক ধর্ম ও সমাজ-পদ্ধতির শাসনাধীনে একটী চরিত্রগত দৃঢ়তা লাভ করা যায়। সেটী আমাদের জাতীয় জীবনের সম্পদ। কিন্তু সে সম্পদ লাভ করতে হলে শিক্ষাকেন্দ্রে যাতে ঐ বিশ্বাস ও আচারে প্রাণ সঞ্চার হয় তার উপযুক্ত ব্যবস্থা

করতে হবে। জ্ঞান ও প্রীতিই সে প্রাণের জননী। সুতরাং হিন্দু মুসলমানকে সাধারণ শিক্ষাকেন্দ্রে একত্র বসে সে জ্ঞান ও প্রীতি অর্জন করা সর্বপ্রথম কর্তব্য। পৃথক পৃথক মনোভাব দিয়ে পরিচালিত পৃথক পৃথক সাম্প্রদায়িক শিক্ষাকেন্দ্রে আবশ্যকীয় জ্ঞান ও প্রীতির চর্চা সম্ভবপর হবে না ; আবার তা না হলে আমাদের রাষ্ট্রীয় মনোভাব (political outlook) বীর্যবন্ত হবে না। হিন্দু মুসলমানকে Protestant ও Catholic এর সঙ্গে তুলনা করা চলে না।

এখন পাঠ্যতালিকার একটী সংক্ষিপ্ত outline দেওয়ার চেষ্টা করব। এস্থলে আর একটী সমস্যার কথা মনে পড়ছে। সেটা হচ্ছে পাঠ্যপুস্তকের অভাব। নূতন Curriculum এর জন্য নূতন বিষয় অবলম্বনে নূতন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করার দরকার হবে। সে সমস্ত পুস্তক চেষ্টা করে উপযুক্ত লোকদ্বারা প্রণয়ন করাতে হবে। তার জন্য ভিন্ন কমিটী করে নূতন নূতন পুস্তক তৈরি করা যেতে পারে। হায়দ্রাবাদে যেমন উর্দুগ্রন্থ তৈরি হচ্ছে তেমনি নূতন Curriculum এর জন্য নূতন পুস্তক তৈরি করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। চেষ্টা না করলে কোন সংস্কারই সম্ভবপর হবে না।

বলা বাহুল্য, শিক্ষার চারিটী স্তর (stage), Primary, Secondary, Intermediate ও University. Primary stage এ ছয় বৎসর ; Secondary stage এ চারি বৎসর ; Intermediate stage এ দুই বৎসর এবং University srage এ চারি বৎসর ব্যাপী পাঠ্যতালিকা দীর্ঘ হওয়া কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত Law, Medical ও Engineering বা অন্যান্য Technical line এর কথা স্বতন্ত্র। এদেশে পাঁচ বৎসরই Minimum School going age ধরা যেতে পারে।

এস্থলে মাদ্রাসা ব্যতীত সাধারণ স্কুল-কলেজের শিক্ষার কয়েকটী দোষ উল্লেখযোগ্য। যে দোষগুলির প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রেখে এই শিক্ষা সংস্কার করতে হবে। সেগুলি এই :

১. আধুনিক শিক্ষিত ছাত্র ধর্ম ও নীতি বিবর্জিত।
২. আধুনিক শিক্ষিত মুসলমান মুসলিম-কালচার ও ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ।
৩. আধুনিক শিক্ষিত ছাত্র স্বাস্থ্যহীন।
৪. আধুনিক শিক্ষিত ছাত্র জীবিকার্জনে শ্রমবিমুখ ও নিরুপায় অর্থাৎ বেকার—নব সমাধান-উদ্ভাবনে অক্ষম (impotent.)
৫. আধুনিক প্রাইমারি বিদ্যালয়ের ছাত্রকে কোন শিল্প শেখানো হয় না।

আমার প্রস্তাবিত নিম্নলিখিত পাঠ্যতালিকা কার্যকরি করতে হলে সর্বপ্রথম একথা মনে রাখতে হবে যে মাদ্রাসাগুলি সমানভাবে হিন্দু মুসলমানের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। মুসলমানের মাদ্রাসা হিন্দুদের সোহবৎ হতে একেবারে আলগ করলে আমাদের পক্ষে আত্মঘাতী হবে। আমরা সাধারণ প্রতিযোগিতার আদর্শ হতে পৃথক থেকে পূর্ণবিকাশ লাভ করতে পারব না। উভয় জাতির পরস্পর মিলন ও প্রীতি অত্যাবশ্যকীয়। তজ্জন্য স্কুল কলেজ পৃথক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। প্রাচীন খলিফাদের যুগে মুসলমানদের মাদ্রাসা জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। আমরা কি সে আদর্শ অনুসরণ করব না? তাতে যে আমরা আরও শক্তিমান

হতে পারব। হিন্দু বা অন্য জাতির সংস্পর্শে এসে পরস্পর দোষগুণের খবর পেয়ে আমরা পরস্পরের দুর্বলতা এড়িয়ে শক্তি সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করতে পারব। আজকার দুনিয়ায় পৃথক হয়ে থাকলে মৃত্যু অনিবার্য (aloofness is death)। ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে শিক্ষাদানকালে মুসলমান ও হিন্দু ছাত্রকে পৃথক পৃথক class এ বসান যেতে পারে ; কিন্তু সাধারণ শিক্ষাদানকালে তাদের একত্র একই class এ বসান কর্তব্য। কারণ উভয়কেই পরস্পর প্রীতির সাগরে অবগাহন করে উভয়ের অতীতকে ভুলে গিয়ে নূতন বর্তমানকে গড়ে তুলতে হবে—একথা এক মুহূর্তও ভুললে চলবে না। এই প্রীতির উপরই আমাদের সমস্ত Educational policy খাড়া করতে হবে। তবেই আমাদের নব ভারত জন্মলাভ করে বিশ্বের দরবারে গৌরবময় আসন লাভ করবে।

আমাদের প্রস্তাবিত পাঠ্যতালিকা

প্রাথমিক শিক্ষা [Priarmy Stage]

শিশুশ্রেণী

বয়স : ৫ বৎসর হইতে ৬ বৎসর

বস্তু সাহায্যে শিক্ষারম্ভ করা আবশ্যক। মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার বাহন। বর্ণজ্ঞান–লিখন ও পঠন। অঙ্গুলি, বীচি, কড়ি, ফিতা প্রভৃতির সাহায্যে গণনা শিক্ষা।

বর্ণশিক্ষার জন্য একখানি পাঠ্যপুস্তক থাকা চাই। সচরাচর ব্যবহৃত শব্দ সমূহ থাকা চাই। Unity of God ; Fraternity of men ও Universe সম্পর্কে কিছু কিছু দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রথম আভাষ (Lessons of first impression of Religion) দেওয়ার চেষ্টা করা দরকার। Aristotle এর Teleological method এস্থলে ব্যবহার্য।

ধর্ম ও দেশ–ভক্তি সূচক সহজ সহজ সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে সুকুমারমতি শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করার সাধু চেষ্টা করা আবশ্যক। শিশুর যে বস্তুর প্রতি বিশেষ আগ্রহ সেইটাই শিক্ষার বস্তু হওয়া উচিত।

প্রচুর খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকা চাই। খেলাধুলার পরীক্ষা হওয়া উচিত। প্রতিযোগিতার আকাঙ্ক্ষা–বৃদ্ধির চেষ্টা করা দরকার।

প্রথম মান (Standard I)

বয়স : ছয় হইতে সাত বৎসর

এই শ্রেণীতে মাতৃভাষায় রচিত দুইখানি পাঠ্যপুস্তক এবং একখানি গণিত থাকবে।

একখানি পাঠ্যপুস্তক সাধারণের জন্য—হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে। ইহাতে মানুষ ও পশু সম্পর্কীয় ছোট ছোট গল্প—জাতি ধর্ম–নির্বিশেষে মহৎলোকের জীবন চরিতাখ্যায়িকা—প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছোটখাট বর্ণনা। উভয় জাতির culture এর কথা অবলম্বনে anecdotes (গল্প), বিভিন্ন জাতির ইতিহাসের গল্প, যাতে প্রত্যেক জাতির কৃতিত্বে শ্রদ্ধা জাগে,—দেশভক্তি সম্পর্কে যুদ্ধকাহিনী ও বড় বড় বীরের কীর্তিকাহিনী গল্প আকারে লিপিবদ্ধ থাকবে।

দ্বিতীয় পাঠ্যপুস্তকখানি মুসলমানদের জন্য পৃথক ও হিন্দুদের জন্য পৃথক হবে। ইহাতে মুসলমানের চিত্তে মুসলিম সভ্যতার স্মৃতি এবং হিন্দুদের চিত্তে হিন্দু সভ্যতার কাহিনী জাগরূক করবার জন্য নানা প্রকার ঐতিহাসিক কাহিনী—যেমন, মুসলিম জাতির যুদ্ধ কাহিনী, বড় বড় মুসলিম চরিত অথবা রামায়ণ মহাভারতের গল্প ও বড় বড় লোকের জীবন চরিত লিপিবদ্ধ করা হবে।

ছোট ছোট কবিতা কতকগুলি প্রথম পাঠ্যপুস্তকে রাখা প্রয়োজন। কিছু কিছু কণ্ঠস্থ করানো চাই।

এরূপভাবে বিষয় নির্বাচন করা চাই যাতে ছাত্রদের মুসলিম সভ্যতা ও ইতিহাসের এবং হিন্দু সভ্যতা ও ইতিহাসের প্রতি তুল্য শ্রদ্ধা জাগতে পারে। মনে রাখতে হবে, সমস্ত বিষয়েই মাত্র first impression দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

প্রথম পুস্তক ৫০ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় পুস্তক ৫০ পৃষ্ঠার বেশি হওয়া উচিত নয়। বলা বাহুল্য, ভাষা খুব সহজ ও গল্পগুলি খুব কল্পনা উদ্দীপক, আমোদজনক ও বিস্ময়কর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গণিত। অমিশ্র চারি নিয়ম। শিশুর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বিষয়ীভূত সহজ সহজ Problems (প্রশ্ন)।

এ সমস্ত বিষয় নির্বাচন খুব সতর্কতার সহিত করা চাই। যে সমস্ত গল্প বা কথায় এক সম্প্রদায়ের হৃদয়ে চোট লাগে—তা একেবারে বর্জন করতে হবে। যেমন আওরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষ—রাণা প্রতাপের মুসলিম নিধন—অন্ধকূপহত্যা ইত্যাদি। এ সমস্ত নব Curriculum-এ কিছুতেই স্থান পাবে না। কারণ আমাদের এই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হবে হিন্দু মুসলিম culture এর সমন্বয় (synthesis) সাধন করে হৃদয়বান আধুনিক ভারতবাসী তৈরি করা।

এ ছাড়া সঙ্গীত ও ধর্মসম্বন্ধে শিক্ষাদান শিশু শ্রেণীরই অনুরূপ হবে। খেলাধুলাও ঐরূপ। Test সঙ্গে সঙ্গে চলবে।

দ্বিতীয় মান (Standard II)

বয়স : সাত হইতে আট বৎসর

১. সাহিত্যপাঠ : দ্বিতীয় ভাগ

জীবনচরিত—প্রাকৃতিকদৃশ্য—স্বাস্থ্য—শরীরচর্চা—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের রহস্য (Romance of scientific discoveries)—সামাজিক নীতি-রাষ্ট্র পদ্ধতি—বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য, ধনসম্পদ ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে রচিত প্রবন্ধের সমষ্টি।

২. ভৌগোলিক (Geographical Phenomena) বিষয় সম্বন্ধে পাঠ—(Natural History)

৩. গণিত শিক্ষা—চারি নিয়ম—কঠিনতর প্রশ্ন। মিশ্র যোগ বিয়োগ। সদা সর্বদা ব্যবহার্য Problems.

৪. ইসলাম অথবা হিন্দুধর্ম সম্পর্কীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবলম্বনে পাঠ। সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান পালনের প্রথম চেষ্টা। দীনিয়াত চর্চা।

৫. Manual Training, Drawing, designs etc.

৬. খেলাধুলার ভিতর দিয়ে শরীরচর্চার ব্যবস্থা—পরীক্ষা।

তৃতীয় মান (Standard III)

বয়স : আট হইতে নয় বৎসর

১. সাহিত্যপাঠ—তৃতীয় ভাগ। দ্বিতীয় মানের বিষয় অবলম্বনে রচিত পাঠ।

২. উর্দু বা হিন্দী প্রথম পাঠ। (First Lessons)

৩. মানবজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে গল্প (Lessons from the History of Nations)—প্রাচীন হিন্দুকীর্তি ও মুসলিম গৌরবের কাহিনী।

৪. ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভৌগলিক পাঠ ও Natural History.

৫. গণিত ও জ্যামিতিক অঙ্কন—Drawing.

৬. হিন্দুধর্ম বা ইসলাম সম্পর্কে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবলম্বনে বিস্তৃত পাঠ—দীনিয়াত।

৭. ইহার সহিত প্রত্যেক ছাত্রকে নিম্নের যে কোন একটী কার্য শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

   ক. সূত্রধরের কাজ (Carpentry) ; খ. সঙ্গীত

   গ. কর্মকারের কাজ (Smithy), ঘ. Painting.

   ঙ. দরজির কাজ (Tailoring) ; চ. Book-Binding

   ছ. কৃষিকার্য ও বাগান রচনা (Agriculture ও Gardening) স্থানীয় অভাব ও প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য কাজ শিক্ষা দেওয়া দরকার।

   জ. ব্যবসায় ও বাণিজ্যের কথা। বাণিজ্য-প্রধান জাতিসমূহের উত্থানের ইতিহাস অবলম্বনে পাঠ। জাপান, ইংরেজ জার্মান, মাড়োয়ারি প্রভৃতি জাতির Adventure, Success ও Romance of Commerce অবলম্বনে পাঠ।

৮. ধর্ম ও সমাজের অনুষ্ঠান পালন—খেলাধুলা—শরীরচর্চা। মুসলমানদের জন্য নামাজের Discipline-এর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

চতুর্থ মান (Standard IV)

বয়স : নয় হইতে দশ বৎসর

১. সাহিত্য ও ব্যাকরণ : দ্বিতীয় মানের বিষয় অবলম্বনে পাঠ (Advanced Lessons)

২. উর্দু : ২য় ভাগ

৩. গণিত ও জ্যামিতি : Drawing, Designs, etc.

৪. ইংরেজি প্রথম পাঠ (First Lessons in English)

৫. ভারতের ঐতিহাসিক গল্প (Lessons from Indian History)—সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলে এমন গল্প বর্জিত বরং প্রীতি ঘনিয়ে উঠে এমন সমস্ত পাঠ থাকা চাই।

৬. ভূগোলপাঠ—পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও Natural History of India.

৭. কার্য শিক্ষা তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ

   জ. ব্যবসায় বাণিজ্য (First Lessons on Inland Trade and Transport in Vernacular)

৮. কোরানের মাতৃভাষায় অনূদিত নির্বাচিত পাঠ (Selections from the Quran)

   অথবা

   রামায়ণ মহাভারত বা গীতার মনোনীত পাঠ।

   এই Selection-এর উদ্দেশ্য হবে মানবপ্রীতি জাগিয়ে তোলা-তৌহিদের ধারণা প্রখর ও ভ্রাতৃত্ব-জ্ঞান বৃদ্ধি করা।

৯. অনুষ্ঠানের অর্থ-জ্ঞান বৃদ্ধি করার চেষ্টা। রোজা, নামাজ, হজ্জ, যাকাত, জুমা, ঈদ ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান ও তাহার অর্থ ও উপকারিতা (meaning ও utility)—দীনিয়াত সম্বন্ধে পাঠ।

   হিন্দুদের জন্য অনুরূপ পাঠ।

১০. খেলাধুলা, শরীরচর্চা, উৎসব অনুষ্ঠান পালন।

পঞ্চম মান (Standard V)

বয়স : দশ হইতে এগার বৎসর

১. সাহিত্য ও ব্যাকরণ : Primary Selections from Various authors—Hindus, Muslims : গদ্য ও পদ্য। Style ও Composition এর দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা চাই। দুই paper করা কর্তব্য।

২. উর্দু পাঠ : ৩য় ভাগ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প—lives of saints.
৩. ইংরেজি পাঠ : ২য় ভাগ—লিখন ও বাক্যরচনা।
৪. গণিত ও জ্যামিতি—Drawing.
৫. ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের ভূগোল—এবং Natural History of Bengal
৬. ভারতবর্ষের ইতিহাস (মুগল ও ব্রিটিশ রাজত্ব)
৭. ইসলামের মূলসূত্র—দীনিয়াত অথবা হিন্দুধর্মের মূলসূত্র ও তাহার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অর্থ।
৮. হিন্দুভারতের ইতিহাস অথবা মুসলিমজাতি সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
৯. First lessons in Arabic or Sanskrit
১০. কাজ শিক্ষা ৪র্থ মানের অনুরূপ
    জ. ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা (Theory and practice of Trade and Transport in Vernacular).
১১. খেলাধুলা, শরীর চর্চা।

ষষ্ঠ মান (Standard VI)

বয়স : এগারো হইতে বারো বৎসর

১. সাহিত্য ও ব্যাকরণ : পঞ্চম মানে যে Selections হবে তাহাই এই মানেও চলবে। দুই paper—Style ও Composition এর উপর বিশেষ জোর (stress) দেওয়া কর্তব্য।
২. উর্দু পাঠ : ৪র্থ ভাগ ও ব্যাকরণ—Composition এর দিকে জোর দেওয়া কর্তব্য। বোলচাল (Conversation)
৩. ইংরেজি পাঠ : ৩য় ভাগ ও ব্যাকরণ—ছোট ছোট গল্প রচনা।
৪. গণিত ও জ্যামিতি (অঙ্কন—ড্রইং)
৫. ইউরোপ ও আমেরিকার ভূগোল।
৬. ভারতবর্ষের ইতিহাস (মুগল ও ব্রিটিশ রাজত্ব)
৭. শাসনতন্ত্র ও পৌরজনের কর্তব্যাকর্তব্য সংক্রান্ত (Civic rights and duties) ও জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় অবলম্বনে পাঠ।
৮. ইসলাম ও হিন্দুধর্ম সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান।

    ইহার সঙ্গে মুসলমানদের জন্য কোরান, হাদিস ও হজরতের জীবন চরিত হতে মনোনীত অধ্যায় এবং হিন্দুদের জন্য রামায়ণ মহাভারত বা গীতা হতে মনোনীত অধ্যায়।

এখানে প্রত্যেক ছাত্রকে হিন্দুধর্ম ও ইসলাম সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করতে হবে। এর জন্য এই paper-এর অর্ধেক Compulsory করতে হবে হিন্দু মুসলমান উভয়ের জন্য।

৯. Arabic or Sanskrit—দ্বিতীয় ভাগ।

১০. কাজ শিক্ষা ৫ম মানের অনুরূপ

জ. Theory and Practice of Trade and Transport.

(A Text Book to be written in Vernacular.)

১১. খেলাধুলা, শরীরচর্চা, দীনিয়াত চর্চা।

এই মানের শেষে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত। এই স্তর হতে যে সমস্ত ছাত্র শিক্ষাকেন্দ্র হতে বিদায় গ্রহণ করবে তারা প্রত্যেকেই এক একটী কাজ শিক্ষা করে জীবনসংগ্রাম শুরু করবে, এবং আশা করা যায় ঐ শিক্ষার উপর নির্ভর করে তারা জীবিকানির্বাহ করতে কোন বেগ পাবে না। ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কেও আবশ্যকীয় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় তারা জেনে ছোটখাট ব্যবসায় অবলম্বন করতে সাহসী হবে। ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধে পাঠ বিভিন্ন ব্যবসায়-প্রধান জাতির কিছু কিছু ইতিহাস অবলম্বন করে মাতৃভাষায় রচনা করা বাঞ্ছনীয়। এ সমস্ত Details পরে ঠিক করা যেতে পারে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

[Secondary Stage]

সপ্তম মান (Standard VII)

বয়স : ১২ হইতে ১৩ বৎসর

১. সাহিত্য—পদ্য ও গদ্য

মনোনীত প্রবন্ধ (Selections)—Style, Composition ও Grammar.

Natural phenomena—Great Social and Economic movements—World culture—Great personalities—Man and Society—Historical events—Present day movements সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পদ্য—Selections—Critical Study.

Essay—Descriptive—Historical—Reflective.

২. উর্দু সাহিত্য—Selections—Prose and Poetry.

From Notable Authors—Grammar and Composition—Conversation—Urdu News paper Selections—Its Style.

৩. English—Prose and Poetry—Selections from Notable Authors.

Composition and Grammar.

৪. Arabic or Sanskrit—Reader III.
Grammar and Composition.

৫. History of the British Empire—Stories of the Adventures, expansion and exploration by the British—General Outline of English History—(A text book to be written and taught in Vernacular).

৬. Mathematics—Arithmetic—Algebra—Geometry.

৭. Geography—Effect of Geographic phenomena on man—Human activity and Nature—physical Geography—Climates and civilisatin—Commercial Geography—Interpretation of historical Geography—including Nature Study and Hygiene relating to the influence of Geographic factors on Human health and Vegetation.

৮. Critical study of Indian History—Development—meaning of events—Social and Economic Condition—Great Kings—Important epochs—personalities—with a brief account of several important nations who faught for freedom and of their Heroes and martyrs. (The Text Book to be written in Vernacular).

৯. A brief account of the Present day world—Capital and labour—Heroes of to-day and their reconstruction—Social movements—their purpose—Future outlook—with a comparison to our present day condition—Social and Economic. (The Text Book to be written in Vernacular).

১০. Selections from the Quran and the traditions and Great Characters of Islam—with a brief account of Intellectual and Social movements in Islamic History—Salient features of Islamic culture.
(The Text Book to be written in Vernacular)
A Similar Course for the Hindu Students.

১১. Any one of the following :
   a. Painting.
   b. Wood work.
   c. Draughtsmanship
   d Surveying.
   e. Clay modelling or pettery.
   f. Tailoring.
   g. Dyeing.
   h. Photography.
   i. Agriculture and Gardening.
   j. Music.
   k. Accountancy.
   l. Book-binding.

m. Elements of commerce—Pioneers of Industry—Foreign trade—Practice—Statistics—Transport facilities—The Text Book to be written in Vernacular.

n. Elements of theology—Kalam—Usul—Diniat.

১২. খেলাধুলা—শরীরচর্চা—শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চর্চা যাতে হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রত্যেক ছাত্রকে প্রত্যূষে স্কুলের শরীরচর্চাআগারে (Gymnasiam)-এ এক ঘণ্টা কসরত ইত্যাদি করা অবশ্য কর্তব্য। এ বিষয়ে প্রত্যেককে পরীক্ষা দিতে হবে। বয়স অনুসারে প্রত্যেক ছাত্রের গঠন, ওজন, দৃষ্টিশক্তি ইত্যাদি ঠিক Normal আছে কিনা সেটা periodical test দ্বারা নির্ধারণ করতে হবে। এজন্য প্রত্যেক স্কুলে এমন একজন Physical Instructor রাখার দরকার হবে, যাঁর medical knowlodge আছে। প্রাচীন Drill Master এর স্থলে Physical Instructor রাখলেই চলবে।

এই মানের Curriculum-এ দেখা যাচ্ছে চারিটী ভাষা ও কতকগুলি Art শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। Courseটী একটু heavy মনে হচ্ছে কিন্তু ১২—১৩ বৎসরের ছেলের বুদ্ধি যদি রীতিমত বিকশিত হয় তাহলে আদৌ heavy হবে না। Text Book, শিক্ষাদান এবং পরীক্ষাও যখন Vernacular-এ হবে তখন বিশেষ কিছু শক্ত হবে না বলে আমার বিশ্বাস।

অষ্টম মান (Standard VIII)

বয়স : ১৩ হইতে ১৪ বৎসর

সপ্তম মানের Curriculum অনুসরণ করতে হবে। ঐ মানের যাবতীয় পুস্তক এই মানে শেষ করতে হবে। কার্যশিক্ষাও চলবে। এই মানের শেষে একটী General test হবে। এই test-এ উত্তীর্ণ হলে নবম মানে প্রত্যেক ছাত্রকে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে যে কোন একটী Group অবলম্বন করতে হবে। সেই Group-এর Corresponding Group ক্রমশ উচ্চ শিক্ষার Stage-এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই Test-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেক ছাত্রকে তার আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য বাধ্য করা—যাতে করে সে ভবিষ্যতে আধুনিক যুবকদের মত উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে অনর্থক অর্থ, শক্তি ও সময় নষ্ট না করে।

নবম মান (Standard IX)

বয়স : ১৪ হইতে ১৫ বৎসর

১. সাহিত্য—(সপ্তম ও অষ্টম মানের অনুরূপ)—advanced—A little more Critical Study and appreciation of literature—Bengali Authors—acquaintance with them—Grammar—Composition—Essay (ঐ অনুরূপ)

২. উর্দু—Similar course—Authors—acquaintance with them.

৩. English—Prose and Poetry—Advanced lessons—Selections from Notable authors—acquaintance with them—Composition—Grammar—Essay.

৪. Arabic or Sanskrit—Stories from ancient Books, e.g. Alif Laila or Panchatantra etc.

Grammar and Composition—Unseen Passages.

৫. Geography of the world, with Commercial Geography—acquaintance with brief outline of History of Islam and Ancient India.

৭. Mathematics.

৮. খেলাধুলা ও শরীরচর্চা।

৯. Any one of the following Groups :

GROUP A (Arts)

Any **two** of the following :

a. English Literature (Advanced Course).
b. Vernacular literature (Advanced course)
c. Persian.
d. French or German.
e. History of Europe (A brief outline in English).
f. History of the Muslim Peoples (Text Book in Vernacular).
g. A brief acquaintance with great thinkers and their thoughts on man, Society, God and the Universe—(A Text Book written in Vernacular).
h. History of the Ancient Races—Hindus—Egyptians—Persians—Chinese. (A Course in Vernacular).
i Elementary Civics. (A Course in English).

GROUP B (Science)

Any **two** of the following :

a. Mathematics (Advanced Course).
b. Elementary Science.
c. French or German.
d. Hygiene and Elements of Physiology.
e. Geography (Advanced Course) and Natural History.

GROUP C (Theology)

Any **two** of the Subjects :

a. Advanced Lessons in Arabic or Sanskrit Literature and Grammar.
b. Persian (First Lessons).
c. French or German (First Lessons).
d. Elements of Islamic Theology—outline of Sharaul Islam—Fiqh—Hadith—Usul—Kalam—Aqaid.
   or Hindu Theology.
e. Islamic History and Culture—A brief Course in Vernacular.
   or History of Hindu Culture.

GROUP D (Technical)

Any **two** of the following :

a. Typewriting.
b. Accountancy.
c. Theory and Practice of Trade and Transport (Advanced).
d. Elements of Botany.
e. Agriculture and Gardening.
f. Elementary Chemistry
g. Dyeing.
h. Photography, Painting.
i. Surveying.
j. Mensuration, Geometry (advanced Course).
k. Elementary Physics.
l. Music.
m. Other Technical and Chemical Arts that may be provided.

দশম মান (Standard X)

বয়স : ১৫ হইতে ১৬ বৎসর

নবম মানের Course এরই Revision and Completion.

এই মানের শেষে Matriculation পরীক্ষা।

নবম মানের প্রথমেই যে চারিটী Group করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ছাত্রদের Energy যাতে গোড়া থেকে তাদের aptitude অনুসারে একটী দিকে concentrate হতে পারে তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। Group A হচ্ছে খাঁটি Arts এর পক্ষপাতী যারা

তাদের জন্য। Group B হচ্ছে তাদের জন্য যারা medical, কি Engineering, কি উচ্চতর Scientific Research-এর আকাঙ্ক্ষা করবে। Group C হচ্ছে ঐ সমস্ত ছাত্রদের জন্য যারা মৌলবি মৌলানা বা পণ্ডিত হতে ইচ্ছা করবে। Group D হচ্ছে তাদের জন্য যারা Matriculation-এর পর আর উচ্চতর শিক্ষার জন্য অর্থ বা সময় নষ্ট করতে সক্ষম হবে না। তারা একটা না একটা Art শিক্ষা করে দুপয়সা রোজগার করবার শক্তি অর্জন করেই matriculation পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবে। তারপর ছাত্রগণ হয় Intermediate College Stage-এ, নয় Lower grade-এর technical or medical or Engineering or Agricultural Education-এর জন্য চেষ্টা করতে পারে।

Intermediate College Stage

First year Class

বয়স : ১৬ হইতে ১৭ বৎসর

1. Vernacular Literature :
   a. Prose and poetry.
   b. Essay and Unseen passages.
2. English Literature :
   a. Prose and Poetry.
   b. Essay and unseen extract.
3. Current Topics and General Knowledge.
4. Sports and Physical Culture.
5. Any one of the following Groups.

GROUP A (Arts)

Any **three** of the following subjects :

a. English Literature (Advanced Course).
   i. A Short History of its origin and development.
   ii. Prose-Text and Unseen passages.
   iii. Poetry and Drama—Text with Unseen poems.

b. Vernacular Literature (Advanced Course).
   i. The same as in (a) (i).
   ii. Prose-Text and Unseen passages.
   iii. Poetry and Drama—Text with unseen poems.

c. History (any **two**) :

   i. History of England.

   ii. History of Rome.

   iii. History of Islamic Peoples.

   iv. History of Greece.

   v. History of India (Mediaeval and Modern).

   vi. History of Japan.

   vii. History of America.

   viii. History of Ancient India.

d. Logic : Decuctive and Inductive.

e. Mathematics.

f. Arabic or Sanskrit.

g. Persian.

h. French or German.

i. Civics.

j. Economics.

k. Urdu Liturature.

   i. History of its origin and development.

   ii. Prose-Text and Unseen passages.

   iii. Poetry-Text and unseen poems.

l. Elements of Philology.

GROUP B (Science)

Any **three** of the following :

a. Mathematics.

b. Chemistry—Theoretical and Practical.

c. Physics—Theoretical and Practioal.

d. Physiology—Theoretical and Practical.

e. Botany— do do

f. Geography.

g. Anthropology.

h. French or German.

One Additional Subject may be taken up to make up four subjects instead of three.

GROUP C (Theology)

Any **four** of the following :

a. Select portions of the Quran in original—Critical and Historical meaning—present-day Significance.

b. Select traditions (Hadith)—Chronologically arranged—meaning—Critical and Historical—Present day application.

c. Persian (Advanced Course)—with Grammar and Composition.

d. French of German with a view to research in Islamic Literature in those languages—

e. Elements of Comparative Religion—Hinduism—Budhism—Christianity and Islam—Significance of Islam as a world Religion—its elements in other Religions.

f. History of Islamic Culture—Influences at different epochs—their effects on the Society of the Muslims—Caliphate—its History and Significance.

g. Mantaq and modern logic.

h. Kalam and Shar'usl Islam—Fiqh—usul.

i. Arabic Literature.

 i. Short History of Arabic Literature—its origin and growth.

 ii. Prose—Text and unseen passages.

 iii. Poetry—Text and unseen poems.

j. Comparative philology.

GROUP D (Commercial)

Economics এবং any **three** of the following :

a. Advanced course in Accountancy—Auditing.

b. Elements of commercial Law.

c. Trade and Transport.

d. Commercial Geography—Problems—practice of Commercial centres regarding localisation of industry and transport—with special reference to India.

e. History of Commercial Developements with a brief account of the struggles for commercial supremacy made by the most powerful nations of today—Japan—America—English—German—their modern position.

f. Theory and practice of Correspondence—Drafting—Indexing—Summarising—Reports—Banking.

g. Statistics—Graphical Representation of statistics.

h. Indian Commerce—in relation to the Commercial Development in the British Empire—Tariffs—Shipping—Industrial Developments in India—Difficulties—Solutions.

i. French or German.

Commerce এর Groupটী একটু heavy করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, Commerce Curriculum University Stage এ Economics এর সঙ্গে alternative subject করলে ভাল হয়। Intermediate Stage এর শেষে Commerce Group নিয়ে যারা উত্তীর্ণ হবে তাদের এক একটী Diploma দিয়ে দিলেই ভাল হয়। এরা অনর্থক University তে দুই বৎসর সময় নষ্ট না করে এই Diploma নিয়ে দুই বৎসর পূর্বেই কোন Business বা Service-এ ঢুকে গেলে এই দুই বৎসরে ঢের practical জ্ঞান লাভ করতে পারবে এবং দুই পয়সা রোজগারও করতে পারবে।

আর একটী লক্ষ্যযোগ্য বিষয় এই যে, প্রত্যেক Group-এর জন্যই Vernacular ও English Compulsory করা হয়েছে—তার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেক Intermediate Stage এর ছাত্রদের English ও Vernacular এর জ্ঞান একটু প্রখর করা। আজকাল University তে প্রবেশ করেন যাঁরা তাঁদের English ও Vernacular এর জ্ঞান অপর্যাপ্ত। এই ত্রুটি দূরীভূত করার উদ্দেশ্যেই ঐ দুইটী Subject Compulsory করা হয়েছে ।

Second year Class

বয়স : ১৭ হইতে ১৮ বৎসর

First-year এর Course—Revision and Completion—পরীক্ষা।

University Stage

[Pass Course]

First year class

বয়স : ১৮ হইতে ১৯ বৎসর

1. Vernacular Literature and Language... 2 papers.
2. English Literature and Language ... 2 papers.
3. Modern World and General Knowledge ...
   Great movements—Causes and Effects—
   Great personalities—their activities—
   History and Development ... ... 1 paper.

4. Sports and Physical culture—Test.
5. Any **one** of the Groups.

GROUP A (Arts)

Any **three** of the following Subjects (3 papers each)

a. English Literature ... (Advanced)—Critical—Historical study—Prose—Poetry—Drama—

b. Arabic or Sanskrit literature.
History—Prose—Poetry.

c. Persian—Literature.
History—Prose—Poetry.

d. French or German Literature.

e. History—(Any three) :
    i. History of the British Empire.
    ii. History of America.
    iii. History of the Muslim Peoples.
    iv. History of the Far East.
    v. History of Europe.
    vi. History of the Modern world since 1914.
    vii. History of India.

f. Economics and Commerce.

g. Politics and Sociology.

h. Comparative Philology.

i. Islamic culture and Socio-political Meaning of Islam.

j. Hindu culture.

k. Philosophy.
    i. General Philosophy (metaphysics).
    ii. Ethics and Psychology.
    iii. Islamic Philosophy.
    Or
    Hindu Philosophy.

l. Experimental Psychology.

m. Mathematics.

n. Vernacular Literature
Critical and Historical Study—Prose—poetry—Drama.

GROUP B (Science)

Any **three** of the following (3 papers each) :
a. Mathematics.
b. Chemistry.
c. Physics.
d. Botany.
e. Physiology.
f. Anthropology.
g. Geology.

GROUP C (Theology)

Any **three** of the following (3 papers each) :
a. Arabic Literature and Language.
b. Persian Literature and Language.
c. French or German Literature and Language.
d. Comparative History of the Muslim Peoples.
e. Comparative Religion—Hinduism—Budhism, Christianity and Islam—
f. The Quran with Commentaries—Modern Significance.
g. The Traditions (Hadith)—Modern Values.
h. Fiqh and Usul—Laws of Shariat—Faraiz etc.
i. Ethics and Philosophy of Islam.
j. Comparative Philology.
k. Urdu Literature and Language.

Second year Class

বয়স : ১৯ হইতে ২০ বৎসর

First year এর Course—Revision and Completion—Degree Examination.

Honours Course (তিন বৎসর)

বয়স : ১৮ হইতে ২১ বৎসর

Pass course এর Compulsory Subject Honours Candidate-দের জন্যও Compulsory.

Additional তিনটী Subject এর মধ্যে একটী Honours Subject বাদে বাকী দুইটী Subject Pass Course এর অনুরূপ। ঐ দুই Subject এর পরীক্ষা— Pass Degree

Examination এর সময় তারা দিয়ে শেষ করতে পারে। Honours Subject টীতে ৮টী Paper থাকবে। এ সম্বন্ধে Dacca University-র arrangement অনুসরণ করা যেতে পারে।

Post Graduate Course

বয়স : ২১ বৎসর হইতে ২২ বৎসর

এই এক বৎসর ছাত্রদের একটী Particular Subject-এ Special Study করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু research করার চেষ্টা করতে হবে। Research এর ফল হবে পরীক্ষার বিষয়।

Pass Degree নিয়ে যারা Post Graduate-এ পড়তে চায় তাদের Honours Degree Examination এর পাঁচটী Paper-এ পরীক্ষা দেওয়া কর্তব্য। তারা Pass Degree নিয়ে Honours Student-দের সঙ্গে Class Work করতে পারে। তাদের জন্য ভিন্ন Class করার বিশেষ প্রয়োজন নাই ; কারণ Post Graduate Study Honours Student-দের জন্যই Reserved রাখা উচিত। তাহলে Post Graduate Study সার্থক হবে।

আজকাল গভর্ণমেন্টের সমস্ত কাজের যোগ্যতাই B.A. পরীক্ষা-উত্তীর্ণ হয়েই লাভ করা যায়। Post-Graduate শিক্ষা নিত্যনূতন জ্ঞান আবিষ্কারের পথ সহজ করার উদ্দেশ্যেই Concentrate করা উচিত। যাদের অর্থ ও অবসর আছে তাদেরই এই শিক্ষায় যাওয়া উচিত। অদ্য ভক্ষ্য ধুনুর্গুণ যারা তারা কোন গতিকে Degree টা হাসিল করেই বাস করে। তাতে Advancement of Learning এর জন্য আর কজন চেষ্টা করতে পারে? গভর্ণমেন্টও চাকরির বাজারে Post-Graduate Degree-র উপর জোর দেওয়ায় উহার কদর ঢের কমে গেছে। ফলে আমাদের সকলেরই জ্ঞান Superficial হচ্ছে। এম.এ. Degree নিয়েও আমরা কাঁঠালের আমসত্ব হয়ে থাকি। জ্ঞানের পরিধি Professor দের নোটের বাইরে বড় বাড়ে না। কারণ চাকরির জন্য Degree নিতে হবে যখন তখন উত্তীর্ণ হওয়ার যে অমোঘ উপায় Note, তার বাহিরে যাওয়ার ত কোন দরকার নাই। এইরূপে আমাদের Knowledge অত্যন্ত Poor হয়ে যাচ্ছে। এদিকেও শিক্ষা-সংস্কারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

এখন, অনেকে কথা তুলতে পারেন, 'তাহলে কি নূতন পুরাতন মাদ্রাসার Curriculum একেবারে তুলে দেওয়া উচিত? আমার মনে হয় উচিত। কারণ এতে আমাদের বহু রত্ন অনাবশ্যকভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এই huge waste (মারাত্মক ক্ষতি) নিবারণ করা দরকার। অবশ্য আমার আলোচ্য Curriculum অনুসরণ করলে যাঁরা মোহাদেস হতে চান বা বড় মৌলানা হতে চান তাঁরা অনায়াসেই আধুনিক জ্ঞান গুণ আয়ত্ত করার ক্ষমতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তা হাসিল করতে পারবেন। ইউনিভার্সিটীর শেষ পর্যন্ত Faculty of Theology-র বিষয়গুলি গ্রহণ করলে তাঁরা এক একজন মস্ত বড় মৌলানা হতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। তাঁরা ঐ সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্র নিংড়ে নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করে আধুনিক

জগতের রঙে রাঙিয়ে সকলের হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে পারবেন। প্রাচীনপন্থী মৌলানারা একরূপ barren—আবৃত্তি করাই তাঁদের কাজ ; নূতন করে ভাববার ক্ষমতা তাঁদের আদৌ নাই এবং সে সাহসও অর্জন করতে তাঁরা পারবেন না। কিন্তু এই Faculty of Theology যাঁরা উত্তীর্ণ হয়ে আসবেন তারা হবেন দস্তুরমত Productive. তাঁরা নূতন করে ভাববার জন্য যে নৈতিক বলের দরকার তা সহজেই অর্জন করতে পারবেন। তাঁদের দ্বারাই ইসলামের নবস্ফূর্তি সম্ভবপর হবে বলে আমার বিশ্বাস।

উপরোক্ত বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তৃত পঠনীয় বিষয়সমূহ একটী উপযুক্ত কমিটির সাহায্যে নির্ধারিত করা কর্তব্য। Graduation of Lessons ব্যাপারটী detail এর বিষয়।

এইক্ষণ শিক্ষা সংস্কারের জন্য কিরূপে কমিটি গঠিত হতে পারে সে বিষয় একটু আলোচনা করেই উপসংহার করব।

এখন এই শিক্ষাসংস্কার করবার জন্য পাঁচটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

১. আমাদের individual cultural বৈশিষ্ট্য

২. Culture of our neighbour (হিন্দু কালচার)

৩. ব্রিটিশ জাতির প্রভাব।

৪. আধুনিক Science ও Philosophy

৫. আমাদের জন্মভূমির ভবিষ্যত রাষ্ট্রীয় আদর্শ (Political Ideal)

এই পাঁচটি বিষয়ের সামঞ্জস্য সাধন করে আমাদের শিক্ষা প্রণালির সংস্কার করতে হবে। সুতরাং এমন কমিটি গঠিত হওয়া চাই যাতে হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ মনোভাবের একটি effective reconciliation সম্ভবপর হতে পারে। কমিটি শুধু মুসলমানদের নিয়ে গঠন করলে আশানুরূপ ফল হবে না। উভয় সম্প্রদায়ই তাহলে কমিটিকে সন্দেহের চক্ষে দেখবেন। তাহলে সকলের confidence পাওয়া যাবে না। অথচ শিক্ষা সংস্কারের মূলে confidence একটি মস্ত বড় মূলধন। তাছাড়া মুসলমান মেম্বরগণ ইংরেজি ও হিন্দু মনোভাব সম্বন্ধে হয়ত অনেক ভুল ধারণা পোষণ করতে পারেন। সুতরাং সেই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে যদি কমিটি সংস্কার প্রস্তাব করেন তাহলে সে প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত কার্যকরি হবে না। মনে রাখতে হবে। এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে প্রত্যেক মুসলমান ছাত্র হিন্দু ও ইউরোপীয় কালচারকে হজম করে তার উপর মুসলিম কালচারের সৌধ নির্মাণে নৈপুণ্য লাভ করতে পারে। চরিত্র শক্তি ও জ্ঞান প্রাখর্যে মুসলিম ছাত্র যেন কাহারও চেয়ে নিকৃষ্ট না হয় এই হবে কমিটির উদ্দেশ্য। কাজেই সকলেরই মত, মনোভাব ও পরামর্শ সংগ্রহ করে সে ব্যবস্থা করা কর্তব্য। খুব সতর্কতার সহিত সর্বশ্রেষ্ঠ দূরদর্শী অভিজ্ঞ প্রখর-মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণকে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হওয়া উচিত। এই জন্য আমি প্রস্তাব করতে চাই, বাংলার শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী অবিলম্বে একটি Special Conference আহ্বান করুন, এই Conference-এ দল বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত গণ্যমান্য নবীন প্রবীন ব্যক্তিকে আহ্বান করা হোক। তাঁদের মত

নিয়ে একটি ছোট Sub-Committee গঠিত হোক। এই Conference-এ বিভিন্ন প্রদেশের বাছা বাছা দু-চারজন হিন্দু মুসলমানকেও আহ্বান করা কর্তব্য।

উপসংহারে আশা করি, এই Schemeটী সহৃদয় ব্যক্তিগণ বিশেষভাবে আলোচনা সমালোচনা করবেন—ফলে এর দোষ ক্রুটী সমস্ত ধরা পড়বে এবং Hindu, Muslim ও European Culture-এর ত্রিধারা reconcile করবার ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হবে। এই তিনের সমন্বয় (Synthesis) না হলে ভারতবাসীর কোন প্রচেষ্টাই সার্থক ও সফল হবে না। সকলের চিন্তা কেন্দ্রীভূত হলে এই Scheme হতে আমাদের Primary Secondary ও Higher Education এর Problems Solve করবার পথ বাহির হয়ে পড়বে।

এস্থলে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা আবশ্যক। উপরের যেকোন Curriculum-ই অনুসরণ করতে পারে। তবে তাদের Curriculum এ Cookery, Knitting, Embroidery ইত্যাদি domestic প্রয়োজন অনুসারে কাজ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া তাদের হৃদয়, মন ও শরীরের বিকাশের জন্য পৃথক পৃথক বিষয় অবলম্বন করে একটু একটু পৃথক ব্যবস্থা (arrangement) করতে হবে। এটা detail এর বিষয়।

যে ক্ষুদ্র চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার ফলে আমি আজ এই সমস্যার কথা সমাজের সামনে পেশ করতে দুঃসাহসী হয়েছি তাই উপলক্ষ করে যদি সমাজের Expert-গণ সত্যকার শিক্ষা সংস্কারের জন্য ব্রতী হন তাহলেই আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব।

পরিশিষ্ট

১৯২২-২৩ হইতে ১৯২৬-২৭ সনের সরকারী পঞ্চবার্ষিক রিপোর্টে দেখতে পাই মুসলিম ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার উন্নতি হয় নাই। রিপোর্ট হতে উদ্ধৃত করা যাক।

	১৯২২-২৩	**১৯২৬-২৭**
মোট ছাত্রসংখ্যা	৮,৮০,৩৭৪	১১,৩৯,৯৪৯

এতে আনন্দ করবার কিছুই নাই।

	১৯২২-২৩	**১৯২৬-২৭**
হাই মাদ্রাসা	৮	১৭
ছাত্রসংখ্যা	১,১৯৬	৪,২০৪
জুনিয়র মাদ্রাসা	৩২৯	৫২১
ছাত্রসংখ্যা	২৩,৮৪০	৪৬,৭৯৫

মাদ্রাসার দিকে কেমন ঝোঁক তা এতেই বুঝা যাবে। কিন্তু কৃতিত্বের পরিমান বড় অল্প। রিপোর্টে দেখি, 'only 115 students passed from the 17 High Madrassahs, and 731 from 521 Junior Madrassahs—a very poor out turn.'

এর পরিণাম কি, ভেবে দেখুন। মাদ্রাসা শিক্ষা যে inefficient তা রিপোর্টেও উল্লিখিত হয়েছে। মুসলিম শিক্ষা যে আশানুরূপ উন্নতি লাভ করতে পারছে না, তার কারণ রিপোর্টে দেখছি এই—There is then little room for Congratulation on the progress of the Community in education. The forces that retard progress are the same as those exposed in the 5th Quinquennial Report :

1. The apathy of the people ;
2. The dispersion of the Mahammadan population in villages often far from Secondary School ;
3. The scarcity of Mulsim-managed high school ;
4. The preference for special institution like Madrassah and Maktab controlled by Muslims and teaching Islamic ritual and Religion. These couses are still operative and apperently in no diminishing measure.

Calcutta Gaz, Aug. 2, 1928, p. 910

এই সমস্ত কারণ দূর করবার জন্য আমাদের কি উঠে পড়ে লাগা উচিত নয়?

সমাপ্ত

মুসলিম কালচার

সূচিপত্র

মুসলিম কালচার*

মুসলিমের জন্য এক আইন ও অমুসলিমের জন্য অন্য আইন—ইসলামে এরূপ কোন বিধি নাই। আল্লাহর রাজ্যে কোন বিশেষ প্রিয়পাত্র নাই। পবিত্র আইন সকলের জন্যই এক এবং যে অমুসলিম এই আইন মেনে চলে, সে আইনদ্রোহী দীক্ষিত মুসলিমের চেয়েও ভাগ্যবান।

"নিশ্চয়ই, আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না—যতক্ষণ সে জাতি আপনার অবস্থা ও গতির পরিবর্তন না করে।"—কোরান

ধর্মবিশ্বাস নয়, কর্মই কালচারের প্রকৃত মাপকাঠি! প্রত্যেক মানুষই তার কর্মদ্বারা ইহকাল-পরকালের শুভাশুভ অর্জন করে। আশা করি, মুসলিম ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে আপনাদের মোটামুটি একটা ধারণা আছে। এই ইতিহাসকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—আরব, পারশ্য ও তুর্কি। আমি মনে করি, আপনারা প্রত্যেকেই শুনেছেন—ইসলাম প্রথমে তরবারি দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল।

পবিত্র কোরানে আছে :

"ধর্মে কোনরূপ জুলুম বা জোর জবরদস্তি চলবে না। এখন হতে সত্যপথ ও ভ্রান্তির মধ্যে পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে গেল। এবং যে অন্ধ-মূঢ় কুসংস্কার ত্যাগ করে আল্লাহকে বিশ্বাস করবে, সে এমন একটী দৃঢ়হস্ত লাভ করবে—যা কখনও শিথিল হবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী।"

পুনরায় :

"তোমার সহিত যারা যুদ্ধ করে, তাদের সঙ্গে আল্লাহর জন্য যুদ্ধ কর, কিন্তু শত্রুতা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ শান্তিদ্রোহীকে পসন্দ করেন না।"

এইরূপ আমি আরও বহু আয়েত উদ্ধৃত করতে পারি এই কথা প্রমাণ করবার জন্য যে, মুসলিমগণ মতবিরোধের জন্য কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট বা বলপ্রয়োগ করতে পারে না। এর বিরুদ্ধে কোন আদেশ আমি খুঁজে পাই নাই। পরবর্তী মুসলিম ইতিহাস হয়ত কিছু কলঙ্কিত হয়েছে, কিন্তু যে যুগে কোরান একমাত্র আইন বলে গণ্য হত এবং ক্ষুদ্র মহত, ধনী-নির্ধন—সকলেই খোদার বাণী বলে সমানভাবে কোরানকে গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখত—সে যুগে এবংবিধ আদেশ যে লোকে অমান্য করত, এমন ধারণা করা অসঙ্গত।

---

* ১৯২৭ সনের জানুয়ারি মাসে মুহম্মদ মারমাডিউক পিকথল্ কর্তৃক (ইংরেজ মুসলমান) মাদ্রাজে প্রদত্ত ইংরেজি বক্তৃতার অনুবাদ। মাসিক 'সওগাত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এখানে সওগাত থেকে সঙ্কলিত।

হজরতের জীবদশায় এবং তাঁর সাহাবিদের যুগে যে সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটেছিল, সমস্তই আত্মরক্ষার জন্য করতে হয়েছিল। এই সমস্ত যুদ্ধে শত্রুর প্রতি যেরূপ মনুষ্যত্ব ও ভদ্র ব্যবহার প্রদর্শন করা হয়েছিল, তার দৃষ্টান্ত পূর্বে জগতের ইতিহাসে ছিল না বললে অত্যুক্তি করা হবে না। তখনকার মুসলিমদের যুদ্ধ-নৈপুণ্য ও শৌর্যই যে তৎকালীন পরিচিত জগতের অর্ধাংশকে ইসলামের পতাকার অধীন করেছিল—এত দৃঢ়ভাবে যে আজ পর্যন্ত অটল হয়ে আছে—তা নয়, তাদের ধর্মজীবন, সত্যনিষ্ঠা ও মনুষ্যত্বই অন্যান্য জাতির চেয়ে উন্নত ছিল বলে তারা মানুষের চিত্ত আকর্ষণ ও অবশেষে জয় করতে পেরেছিল।

আরবের পড়শি জাতির তৎকালীন অবস্থা কি ছিল, তা আপনারা একবার ভাবুন। মিসর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও পারশ্যের অধিবাসীদের মধ্যে শকতরা ৯০ জন দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। তাদের সে শৃঙ্খল কখনও ছিন্ন হত না। খ্রিস্টানধর্মের আবির্ভাবেও তাদের অদৃষ্টের কোন পরিবর্তন ঘটল না। সে ধর্ম শাসনকর্তাদের জন্য ছিল—সুতরাং জনসাধারণের জীবনে তা একরূপ চেপে দেওয়াই হয়েছিল? তাদের শরীর ছিল বড় বড় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির হাড়ে এবং মন ছিল ধর্মপুরোহিতের হাতের মুঠোয় বাঁধা। খ্রিস্টানধর্মের আদর্শ যা পুরোহিতদের মুখ থেকে একটু আধটু বেরুত—তা থেকে তারা এইটুকু মাত্র আশা করত যে, তাদের মুক্তি পরকালে হবে। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর বিলাসপরায়ণতা ও ব্যভিচার তৎকালীন সভ্যতার নিদর্শন বলে গণ্য হত। আর জনসাধারণের জীবন নিতান্ত শোচনীয় ছিল। এমন সময় আমাদের হজরতের দূতগণ ভিন্ন ভিন্ন রাজন্যবর্গের নিকট ইসলামের শুভ-বার্তা বহন করে পৌঁছে দিলেন। তিনি সকলকে আহ্বান করলেন,—"তোমরা কুসংস্কার ত্যাগ কর, পৌরোহিত্য বর্জন কর, একমাত্র আল্লাহর সেবায় আত্মনিয়োগ কর।" এই আহ্বান ও তাঁর প্রেরিত দূতগণের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার ঐ সমস্ত দেশে একটা তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল। সকলেই যেন চাঙ্গা হয়ে উঠল। বিশেষত কোন কোন জাতি এই নবধর্ম ধ্বংস করবার জন্য যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হল। জনসাধারণকে সাবধান করে দেওয়া হল এই কথা প্রচার করে যে, 'ইসলাম শয়তানের খেয়াল এবং মুসলিমগণ তাদের ধ্বংসের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে।' এ সত্ত্বেও কিন্তু যখন মুসলিমগণ এতৎদেশে বিজয়ীরূপে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁরা তাঁদের কর্ম ও ব্যবহার দ্বারা বিজিত দেশবাসীদের অন্তর জয় করলেন। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে জগতের ইতিহাসে এই দেখতে পাওয়া যেত যে, পরাজিত বিজয়ীর করুণা-ভিখারি হয়ে সম্পূর্ণরূপে তার করতলগত হয়ে থাকত—এমনকি, যদি উভয়ের ধর্ম একও হত, তাতেও পরাজিতের অবস্থার কোন পরিবর্তন হত না। যুদ্ধের এই নীতি এখনও ইসলামের বাহিরে বিদ্যমান। ইসলামের এ নীতি নয়। মুসলিম-বিধি অনুসারে পরাজিত জাতির মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করত, তারা সর্ববিষয়ে বিজেতার সমকক্ষ হত। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করত না, তাদের রক্ষার জন্য কিঞ্চিত কর দিতে হত ; কিন্তু তারা তাদের বিবেকের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত এবং স্বচ্ছন্দে আপন আপন পেশা অবলম্বন করে জীবিকানির্বাহ করতে পারত।

'ইসলাম ও তরবারি—' এই দুইটীর একটী সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভ্রমপূর্ণ অর্থ দেওয়া হয়ে থাকে। তরবারি অর্থে মনে করা হয়—'হত্যা'। তরবারি অর্থে যুদ্ধ-বিগ্রহ বুঝতে হবে। ইসলাম

অর্থে 'আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ' ধরতে হবে। কিন্তু সাধারণত তখন ইসলাম অর্থে শুধু 'আত্মসমর্পণ' বুঝা হত। ফলে অর্থ দাঁড়াত এইরূপ—হয় ইসলাম, নয় যুদ্ধবিগ্রহ। যে জাতি আত্মসমর্পণ করত না ও সম্পূর্ণরূপে বিজিত হত না, সে তখনও যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকত।

মিসর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, পারশ্য ও সমুদয় উত্তর আফ্রিকার বিজিত জাতির সহিত বিজয়ী মুসলিমগণ স্বচ্ছন্দ-চিত্তে পরস্পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হত—এই আন্তর্জাতিক বিবাহ-প্রথা তাদের পূর্বতন বহু বিজেতার মধ্যে কেহই প্রবর্তন করে নাই। ইসলামের আবির্ভাবে শুধু যে তারা তাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পেয়েছিল তা নয়—সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তার উপর যে পৌরোহিত্যের দৌরাত্ম্য ছিল, তাহাও তিরোহিত হয়েছিল। পারশ্য ব্যতীত ঐ সমস্ত দেশের অধিবাসী আরবি ভাষা তাদের মাতৃভাষা বলে দাবি করে এবং যদি তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমাদের রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য (Nationality) কি—তা হলে তারা বলে, "আমরা আরব-সন্তান।" তারা এখনও ইসলাম-রাজ্য মর্ত্যে খোদার রাজ্য বলে মনে করে।

যে সমস্ত জাতি কোনদিন জীবনে সুযোগ-সুবিধা পায়নি, তারা ইসলাম-পতাকার তলে মুক্তি লাভ করে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে সোৎসাহে তাদের রুদ্ধ শক্তি প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হল। ফলে একটী সুন্দর অথচ বিস্ময়কর সভ্যতার পুষ্প ফুঠে উঠল—যা কালক্রমে বিজ্ঞান আর্ট ও সাহিত্যরূপ ফলে পরিণত হয়েছিল। অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ সত্ত্বেও এই সময়টাই মুসলিম ইতিহাসের সবচেয়ে আনন্দকর যুগ। এই যুগটার সম্বন্ধে বিচার বা ধারণা করতে আপনারা ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য বলে মেনে নেবেন না। শত্রুর প্রচারিত কথার মূল্য যতটুকু দেওয়া উচিত, আপনারা সেইটুকুই দেবেন।

যৌবনকাল আমি সিরিয়ার অনেক খ্রিস্টান-ধর্মী দেখেছি—তারা ইসলামের প্রাথমিক যুগের অমুসলিম সম্প্রদায়ের বংশধর বলে পরিচিত—তারা বিজিত হয়েও ইসলাম গ্রহণ করে নাই। তাদের আধুনিক বংশধরদের অনেকের মুখে শুনেছি—"প্রাথমিক মুসলিম যুগ স্বর্ণযুগ ছিল। খলিফা উমর তাদের ধর্মের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী ও রক্ষাকর্তা ছিলেন।" লৌকিক কথা অনেক সময় লিখিত ইতিহাসের চেয়ে বেশি জ্ঞানদায়িনী। তবু একটু অনুসন্ধান করলে লিখিত ইতিহাস হতেই আপনারা বের করতে পারবেন যে, খ্রিস্টানদের প্রতি ক্রুজেডের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামে কোন প্রকার ধর্মান্ধতা প্রকাশ পায়নি—যদিও খ্রিস্টান-ধর্মীরা উদারতা প্রদর্শনের পক্ষে নিতান্ত সহজ পাত্র ছিলেন না। তাদের অনেকে ইসলাম-ধর্মকে খোলাখুলিভাবে অপমানিত করা পুণ্যজনক কাজ মনে করত। কাজেই তারা শাসনকর্তাদের বিরাগভাজন হয়ে ধার্মিক বলে গণ্য হত। এইরূপ ধর্ম-বায়ুর সংক্রামক ব্যাধি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে মানুষের চিত্তকে অনুর্বর করেছে ; কিন্তু মুসলিম খলিফাগণ যেরূপ বিচার-বুদ্ধিসহকারে ও স্থিরচিত্তে এই ব্যাধি দূর করবার চেষ্টা করেছেন, তা বাস্তবিক মানব-ইতিহাসের গৌরবের বস্তু। ধর্মবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির বাড়াবাড়ি সম্বন্ধে আমি আপনাদের নিকট লুইশ-র "আরব্য স্পেন" গ্রন্থ পড়তে অনুরোধ করি। খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে খ্রিস্টান-ধর্মীরা মুসলিমদের উপর যেরূপ গালি বর্ষণ করেছিলেন এবং মুহম্মদ ও তার প্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে যেরূপ বিদ্বেষ প্রচার করেছিল, তার তুলনা বোধ হয় কোন ইতিহাসেই খুঁজে পাওয়া যায় না।

এইরূপ ধর্মের জোশ প্রাচ্যদেশেও দেখতে পাওয়া গিয়েছে। সমস্তই মুসলিমগণ উদারচিত্তে ও দৃঢ়তার সহিত সহ্য করেছিল। খ্রিস্টানধর্মীরা মুসলিমের হাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে উভয় দেশেই সমভাবে উদার ব্যবহার পেয়েছিল। সুপ্রসিদ্ধ পারসি প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্র মিঃ জি. কে. নারিমান গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, পারশ্য হতে অগ্নি-উপাসকগণ মুসলিম কর্তৃক বিতাড়িত ও সবংশে নিহত হয়েছিল—এই গল্পের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

আজও অগ্নি-উপাসক পারস্যে বিদ্যমান। সিরিয়ার খ্রিস্টান ধর্মীরা চারি খলিফার এবং উমীয়া রাজত্বের যুগকে মুসলিম মহত্ব ও উদারতার স্বর্ণযুগ বলে থাকে। একথা শুনে আমি বিস্মিত হতাম—কারণ উমীয়বংশের একটা বদনাম আছে—তাঁদের কোন কোন খলিফার ব্যক্তিগত অসচ্চরিত্রের জন্য এবং বিশেষত তাঁদের নিষ্ঠুর যুদ্ধ-অভিনয়ের জন্য—যার ভিতর দিয়ে তাঁরা সিংহাসনের অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু একথা সত্য যে, ইসলাম বানি উমাইয়ার নিকট ইতিহাসের দিক দিয়ে অনেকখানি ঋণী। তাঁরা ইসলামের সরল, বিচারবুদ্ধিসম্মত, খুঁটি আরবিয় স্বরূপ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। দামস্কে তারা রাজা ও প্রজার হৃদ্যতা ও আন্তরিক সম্পর্ক দৃঢ় করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং মদিনার খিলাফতের এইটাই ছিল বিশেষতত্ব। সে সময় খলিফা নিজেই খোতবা পড়তেন এবং মসজিদের ইমামতি করতেন। এই বংশের জনৈক বিশেষ বুদ্ধিমান খলিফার উদ্বিগ্নতা সম্বন্ধে একটী ছোটগল্প 'কিতাবুল' ফখরি'তে বর্ণিত আছে। একজন আবদুল মালিককে বললেন "আপনার চুল বড় শীগগির পেকে গেছে।" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি মসজিদে খোতবা পড়তে গিয়ে চুল পাকিয়ে ফেলেছি, কারণ সতত ভয় হয়—পাছে আরবি পড়তে ভুল করি। কারণ আরবিতে ভুল করা আমি অত্যন্ত সাংঘাতিক অপরাধ বলে মনে করি।"

যাহোক, তাঁরা পৌরোহিত্যের বাড়াবাড়ি ও ধর্মন্ধতা দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন—ফলে এর বিরুদ্ধে একটী লোকমত গঠন করতে তাঁরা অনেকখানি সহায় হয়েছিলেন এবং এই প্রকারে কয়েক শতাব্দী ইসলাম-পতাকা অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। চারি খলিফার পর উমীয় বংশের খলিফা উমর-পুত্র আবদুল আজিজ আসেন। এই বংশের একজন তাঁদের পতন ও হত্যার পর পশ্চিমাভিমুখে পলায়ন করে স্পেনে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজত্বের ফলে স্পেন পাশ্চাত্যে সভ্যতার পুষ্প হয়ে উঠেছিল।

সওগাত, শ্রাবণ ১৩৩৪

ইতিহাসরসিকের পক্ষে একথা স্মরণ রাখবার যোগ্য যে, উমীয়দের সুন্নিমত ও ফাতিমীয়দের শিয়ামতের মধ্যে মিলন-সংস্থাপনের একটী চেষ্টা বানি-আবাসের খিলাফতের সময় হয়েছিল। কিন্তু বানি-আবাস বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। একদিকে তাঁর অনুচরবর্গ হজরতের খাস বংশধরদের (আহলুলবায়েতের) একজনকে খলিফার পদের জন্য, চেষ্টা করতে প্রবৃত্ত করলেন, অন্যদিকে অনেক সুন্নিকেও প্রলুব্ধ করলেন খলিফাকে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত করবার জন্য। ফলে তাঁরা কোনটাই না করে নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন—বানি-উমীয়বংশের সকলকে নিহত করে। মাত্র একজন স্পেনে পলায়ন করেন। আহলুলবায়েতের উপরও যথেষ্ট অত্যাচার হয়েছিল। এই সমস্ত বিগ্রহ ষড়যন্ত্রের মূল কারণ যে ধর্মমতের.

অনৈক্য, তাহা নহে ;—এ বিগ্রহ বহু পুরাতন—দক্ষিণ ও উত্তর আরবের সঙ্গে সংঘর্ষ প্রাগৈসলামিক যুগ হতে চলে আসছিল। হজরত বহু চেষ্টায় তা অনেকটা দূর করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু খলিফা ওসমানের হত্যার পর ঐ সংঘর্ষ পুনরায় নবজীবন লাভ করে। পরবর্তী উমীয়গণ ও হজরতের পরিবারবর্গ এই সংঘর্ষের আঘাতে অনেকখানি নাকাল হয়ে পড়েছিলেন। এই সংঘর্ষের কারণের উপর তাঁদের কোন হাত ছিল না। মুসলিম শাসনের সরল, সবলবুদ্ধি-সম্পন্ন আরবি স্বরূপ শেষ উমীয়ের সঙ্গে স্পেনে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর প্রাচ্যখিলাফত পারস্য-প্রভাববান্বিত বানি-আবাসের হাতে গেল। রাজধানীও সিরিয়া হইতে মেসোপোটেমিয়ায় উঠিয়া গেল। বাগদাদ নগরী বর্তমান বাগদাদের চেয়ে ঢের বেশি ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠেছিল। স্বাস্থ্য, সম্পদ, রুচি শান্তি প্রভৃতি সর্ববিষয়ে বাগদাদ অতুলনীয় হয়ে উঠেছিল। পরবর্তী তিন শতাব্দীর মধ্যে সেখানে মুসলিম কালচারের উন্নতি চরম স্ফূর্তি লাভ করেছিল। কিন্তু স্পেন ব্যতীত অন্যত্র মুসলিম কালচার সরল আরবি প্রভাব হতে বঞ্চিত হয়ে ক্রমশ পারসি ঐশ্বর্যের প্রভাব লাভ করতে থাকে। গাই লা স্ট্র্যাজের কথায় বলতে হয়, "জগতের ইতিহাসের এই যুগে কর্ডোভা, কাইরো, বাগদাদ এবং দামেশক—মাত্র এই শহরগুলিতে পুলিশ ও রাস্তায় আলোকস্তম্ভের ব্যবস্থা অতি সুন্দর ছিল। খোলাফায়ে রাশিদুন ও উমীয়গণ যে ভক্তি ও সমানসূচক আহ্বান অবৈধ বলে গ্রহণ করতেন না, আবাসীয় বংশের খলিফাগণ তাহা সর্বপ্রথম গ্রহণ করলেন।"

কড়া পর্দাপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হল এবং যে নারী প্রথম যুগের মুসলিমদের মধ্যে মুক্তচিত্তে মহত জীবন যাপন করতেন, তিনি এখন শঠ, প্রতারক বন্দীতে পরিণত হলেন। এই সময় ইসলামকে সঙ্কীর্ণ করে সামান্য একটী মজহাবে পরিণত করবার চেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু সে চেষ্টা জ্ঞানদীপ্ত মুসলিম পণ্ডিতগণ ব্যর্থ করেছিলেন তাঁদের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের বলে। খলিফা ঐ চেষ্টায় তাঁর শক্তি নিয়োগ করেছিলেন স্বীয় রাজত্বকে স্থায়ী করবার জন্য।

খলিফার শাসনাধীন জনসাধারণকে বহুকাল যাবত নিরবচ্ছিন্ন শ্রীসম্পদের মধ্যে থেকে তাঁদের যুদ্ধপ্রিয় স্বভাবকে ত্যাগ করতে হয়েছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ যে একেবারে হয় নাই, তা বলা যায় না ; তবে তাহাতে সমস্ত জনসমাজ যোগ দেয় নাই। কোরানতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ এবংবিধ অবস্থাকে না-পসন্দ করেছিলেন, কিন্তু ধর্মান্ধ পুরোহিতগণ খলিফাকে চিরস্থায়ী সম্রাট বলে তোষামোদ করে তাকে একটা মিথ্যা শান্তির আশ্বাস দিয়ে তুষ্ট করত।

সীমান্তের শান্তিরক্ষার ভার তুর্কিপ্রমুখ যুযুৎসু জাতির হাতে ন্যস্ত ছিল। তারাই খলিফার শরীররক্ষীও ছিল। এরাই ক্রমে শরীররক্ষী হতে খলিফার প্রভু হয়ে দাঁড়ায়। এদের স্বভাব সরল, চিত্ত মুক্ত—কিন্তু চরিত্র বর্বর ছিল। তাদের কর্মশক্তি ও সহজবুদ্ধি প্রখর ছিল। শক্তিমান খলিফা মামুন ও হারুনর-রশিদের তখতে যে সমস্ত দুর্বলচিত্ত, কাপুরুষ বিলাসপরায়ণ খলিফা আরোহণ করেছিলেন, তাঁদের প্রতি এদের ঘৃণার অবধি ছিল না। একের পর এক তাদের হাতে নিহত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ঘৃণিত ও লজ্জাকর উপকরণসমূহও বিলুপ্ত হল। এতে করে তারা পতনোমুখ সাম্রাজ্যের মধ্যে পৌরুষ ঢুকিয়েছিল। এরা তা না করলে

নিশ্চয়ই সাম্রাজ্যের নাম ও নিশান কিছুই থাকত না। কোন গতিকে তারা সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রদেশগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ করে শান্তির মধ্যে রাখতে পেরেছিল। সীমান্তপ্রদেশসমূহে খলিফার প্রভুত্ব নামমাত্র ছিল। মুসলিমের সর্দার হওয়ায় বাগদাদ-খলিফা প্রাদেশিক খলিফা নিযুক্ত করবার হুকুম দিয়েছিলেন। এই হুকুম জনসাধারণের নিকট ধর্মাদেশ বলে গণ্য হয়েছিল। পারস্য স্বাধীন হয়ে গেল। মিসর হজরতের বংশ-উদ্ভূত ফাতিমীয় কিংবা ওবাইদীয় পরিবারের একটী শাখা কর্তৃক অধিকৃত হল। তৎকালীন সুন্নিগণ তাঁদের দাবি অস্বীকার করে তাঁদিগকে কারবালার কোন এক য়িহুদির বংশধর বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু তারাই প্রতিদ্বন্দ্বী খিলাফত খাড়া করলেন—প্যালেসটাইন ও সিরিয়া দুইবার এবং হেজাজ একবার জয় করলেন।

বাগদাদের আবাসীর খিলাফত নামে পাঁচশত বৎসর স্থায়ী হয়, কিন্তু শেষ সাড়ে তিনশত বৎসর প্রকৃতপক্ষে খলিফার প্রভূত্ব তুর্কিদের হাতে গিয়েছিল এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও গৌরবের সত্যকার অধিকারী হয়েছিল তুর্কি সর্দারগণ। সেলজুকদের মধ্যে তোগরল বে, আলপ আরসলান ও মালিক শাহ, চেঙ্গিসদের মধ্যে ইমাদুদ্দিন ও তাঁর পুত্র নুরুদ্দিন এবং আইয়ুবীয়দের মধ্যে সালাহ-উদ্দিন, মালিক আদিল, মালিক কামিল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু প্রভুত্ব হস্তান্তরপ্রাপ্ত হলেও সভ্যতার ধারা চলেছিল সেই আবাসীয় বাগদাদের। বস্তুত সে সভ্যতা তুর্কির হাতে পড়ে একটুকুও ম্লান হয়নি। তখন জনসাধারণের অবস্থা মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বত্র শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শান্তি ও স্বাধীনতার স্ফূর্তিতে পরিচিত জগতের অন্যান্য জাতির চেয়ে অনেক ভাল ছিল।

পাশ্চাত্য-জগত মুসলিম সাম্রাজ্যের আর্থিক উন্নতি দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়েছিল। পাশ্চাত্যের বণিকসম্প্রদায় মুসলিম রাজ্যে বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করত। এই আর্থিক উন্নতির স্বরূপ কি ছিল, জনৈক আধুনিক ইংরেজ-লেখকের কথা হতে তার কিঞ্চিত ধারণা করা যেতে পারে। তিনি নিরপেক্ষভাবে খ্রিস্টান-স্পেন সম্বন্ধে বলেছেন, "ষোড়শ খ্রিস্টাব্দের স্পেন আমেরিকার সহিত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করে কিছু উন্নতি লাভ করেছিল বটে, কিন্তু স্পেনের শিল্প-শক্তি ও সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকৃত উন্নতি খ্রিস্টান নৃপতিগণের আমলে ক্রমশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে থাকে। অবশেষে মুসলিমগণ তৃতীয় ফিলিপ কর্তৃক বিতাড়িত হ'লে স্পেন তার শিল্প-বাণিজ্য হারিয়ে ফেলে। ইসাবেলা ধর্ম-স্বার্থ রক্ষার অজুহাতে মুসলিমগণকে স্পেন হতে বহিষ্কৃত করে দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিল। তৎকালে অন্যান্য দেশে, বিশেষত ইউরোপে, কৃষকগণ জমিতে দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা ছিল। শিল্পীদের অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল—বণিকসম্প্রদায় ঘুষ ও আত্মবিক্রয়ের সাহায্যে সবে কিছু-কিছু সুবিধার যোগাড় করছিল। কিন্তু মুসলিম সাম্রাজ্যে কৃষক, শিল্পী ও বণিক সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে যে, মুসলিম জগতেও দাসত্বপ্রথা ছিল ; কিন্তু দাসগণই সবচেয়ে বেশি ভাগ্যবান ছিল। কারণ হজরত বলেছেন, "তুমি যে খাদ্য খাও, তোমার দাসকেও সেই খাদ্য দাও—তুমি যে পরিচ্ছদ পরিধান কর, তোমার দাসকেও সেই পরিচ্ছদ পরাও—যেহেতু যে দাস উপাসনা করে, সে তোমার ভাই।" তৎকালীন মুসলিম

জগতের সর্বত্র এই মহাবাণী অক্ষরে অক্ষরে পালিত হত। আনন্দের সময়, বা শরিয়তের কোন নিয়ম-লঙ্ঘন বশত শাস্তি বা অনুশোচনার পরিবর্তে দাসকে মুক্ত করবার কড়া হুকুম কোরানে ঘোষিত হয়েছে। যুদ্ধবিগ্রহলব্ধ দাসের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও এই হুকুমের ফলে দাসত্বপ্রথা মুসলিম জগতে চিরস্থায়ী হতে পারেনি।

দাস পরিবারের মধ্যে পুত্র বা কন্যারূপে গণ্য হত এবং উত্তরাধিকারীর অভাবে সে প্রভুর সম্পত্তি প্রাপ্ত হত। এইরূপে সম্রাটের গোলামদের মধ্যে অনেকে রাজ্য পর্যন্ত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হত। পুত্র হতে বঞ্চিত প্রভুদের অনেকেই গোলামের সঙ্গে স্বীয় কন্যাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করতেন—গোলামকেই তাঁদের বংশের গৌরবরক্ষা করতে হত। প্রভুর প্রতি গোলামের ভক্তি এবং গোলামের প্রতি প্রভুর স্নেহ একরূপ প্রবাদবাক্য হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীযুগে যখন যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়ে দাসের আমদানি কমে গেল এবং দাস-ক্রয়-প্রথা মাত্র ককাসস ব্যতীত অন্যান্য স্থান হতে উঠে গেল, তখন অনেক মুসলিম এই বলে আক্ষেপ করত, "গোলাম আজাদ করা কোরানের আদিষ্ট কর্তব্য—কিন্তু গোলামই যদি না থাকে, তবে আমরা কি প্রকারে কোরানের নির্দিষ্ট এই কর্তব্য পালন করব?" কিন্তু এটা ইসলামের আদেশ সম্বন্ধে ভুল ধারণা। ইসলামের আসল উদ্দেশ্য হল দাসত্বপ্রথাকে উঠিয়ে দেওয়া—সমাজের ভিতর তদরুণ কোনপ্রকার অশান্তির সৃষ্টি না করে। এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক মিসরীয় মোল্লাকে সুদানের দাস ব্যবসায়কে সমর্থন করতে আমি শুনেছি। কিন্তু দাস-ব্যবসায়ের নৃশংসতা ইসলাম একেবারেই সমর্থন করতে পারে না।

আমি অবশ্য বলতে চাই না যে, মুসলিম জগতে কোন অপকর্ম ছিল না ; কিন্তু আমি বলতে চাই—সেরূপ ছিল না যেরূপ ইউরোপীয় লেখকগণ কল্পনা করে থাকেন বা এঁকেছেন। তার সঙ্গে খ্রিস্ট-জগতে অনুষ্ঠিত অপকর্মের কোন তুলনা হতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে—আমেরিকার দাসত্ব-প্রথার দৃষ্টান্ত মুসলিম জগতে ছিল না। বর্ণ বা জাতিবিদ্বেষ ইসলামে ছিল না। কৃষ্ণ, জরদ, শ্বেত ও পীতবর্ণের মানুষ সমস্তই একত্র বাজার, ঘাট, মসজিদ ও রাজপ্রাসাদ সর্বত্র সম্পূর্ণ সাম্য ও মৈত্রীর ক্ষেত্রে মিলিত হয়ে জীবনের শ্রী ফুটিয়ে তুলত। ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট, সাধু ও জ্ঞানীর মধ্যে কেহ কয়লার মত কৃষ্ণকায় ছিলেন—যেমন, আবাসীয় যুগের পতনের সময় ইয়ামেনের ঋষিতুল্য রাজা জাইরাশ এবং খেদিব-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আরলাউত মুহম্মদ আলির সময় মিসরের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আহমদ-আল-জাবারতি। কেহ যদি মনে করেন, এই প্রবল ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে কোন শ্বেতবর্ণের জাতি সংযুক্ত ছিল না, তাকে আমি বলব, সারকাসিয়ান ও আনাতোলিয়ার পাহাড়ীয় জাতির চেয়ে অধিকতর শ্বেতবর্ণের লোক নাই। কিন্তু এরাই সর্বপ্রথম ইসলামের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। মুসলিম সভ্যতা উচ্চপদ ও ধন-মর্যাদার পার্থক্য অস্বীকার করে নাই, কিন্তু পাশ্চাত্যের শ্রেণী-বিভাগ ও হিন্দুর জাতি-বিচার ইহার শত্রু।

ইউরোপ যখন পলিদ ও পবিত্রতা একত্র করে রেখেছিল, তখন ইসলাম পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার আদর্শ পালন করতে থাকে। ইহা মুসলিম সভ্যতার একটা প্রধান স্বরূপ। প্রত্যেক শহরেই সর্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী হামামখানা অর্থাৎ উষ্ণ স্নানাগার ছিল

এবং সরকারি ঝরণা ছিল পান ও ধৌত করবার জন্য। যেখানেই মুসলিমগণ গিয়েছেন, সেখানেই সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করেছেন। অজু-গোসল (ধৌত করবার অভ্যাস) ইসলামের এমন একটী প্রধান অঙ্গ বলে পালিত হত যে, ১৫৬৬ অব্দে আন্দালুসিয়ায় স্নানাগার ব্যবহার করা অপরাধ বলে ঘোষিত হয়েছিল—কারণ এতে জনসাধারণের মনে ইসলামের কথা জেগে উঠতে পারে, এরূপ ভয় খ্রিস্টান প্রভুদের হয়েছিল। এমনকি, সেভিলির জনৈক হতভাগ্য মালি কাজের সময় হাত-মুখ ধোয়ার অপরাধে নিতান্ত নির্যাতিত হয়েছিল। আনাতোলিয়ায় আমি স্বকর্ণে একজন গ্রিক-খ্রিস্টানকে এই বলতে শুনেছি যে, "লোকটী অর্ধমুসলিম, কারণ সে তার পা ধৌত করে।"

সমস্ত মুসলিম-প্রতিষ্ঠিত শহরে খাদ্য ও পানি সরবরাহ করবার জন্য সরকার কড়া ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করেছিলেন। গোশত প্রভৃতি যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য ধূলা ও মক্ষিকার হাত হতে রক্ষা করবার জন্য বিক্রেতাগণকে মসলিন দিয়ে ঢেকে রাখতে বাধ্য করা হত।

সমাজের সর্বশ্রেণীর মধ্যে সহজভাবে মেলামেশা চলত। পরস্পর বিবাহ-প্রথাও প্রচলিত ছিল। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে দিল খুলে আলাপ করত।

আমি মুসলিম সভ্যতার আসল স্বরূপ যা কিছু দেখেছি ও জেনেছি—মিসর, সিরিয়া ও আনাতোলিয়ায় থেকে—তাই বলছি। আমি যখন 'আলিফ লাইলা' পাঠ করি,দামেশক, জেরুজালেম, আলেপপো, কাইরো এবং অন্যান্য শহরের দৈনন্দিন জীবন আমার নিকট একই প্রকার লাগে—যেমন আমি বিগত শতাব্দীর শেষভাগে দেখেছিলাম। সেই ধ্বংসোমুখ ও দৈন্যপীড়িত জীবনের মধ্যেও যে আনন্দ আমার চোখে ঠেকেছিল, তার তুলনা বর্তমান ইউরোপেও বিরল। ইউরোপের জীবনের উদ্বিগ্নতা, ধন-পিপাসা ও মৃত্যুভয় ঐ সমস্ত শহরের মুসলমানদের জীবনে একেবারেই দুর্লভ।

এবং তারপর তাদের বদান্যতা! কোন মানুষ মুসলিম সাম্রাজ্যের কোন শহরের কোন পড়শির দরজায় ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে মৃত্যু আলিঙ্গন করেছে, এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তাদের জীবনে এমন কিছু ছিল, যা ইউরোপে বিরল ;—তেমনি পাশ্চাত্যে এমন কিছু আছে, যা তাদের জীবনে ছিল না। পরে আমি জানতে পেরেছি যে, তারা একদিন আর্থিক উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের অন্তরে গভীর আনন্দ বিরাজ করত। সে আনন্দ আমার হিংসার উদ্রেক করে। পরে প্রায় বিশ বৎসর পড়াশুনা করবার পর আমি জানতে পারলাম যে, তারা শরিয়তের অর্ধেক অবজ্ঞা করে তাদের আর্থিক অবস্থা হারিয়ে ফেলেছে।

এখন আমি বলতে চাই, কেমন করে মুসলিম সভ্যতার পতন হয়েছে।

আমরা দেখেছি, কেমন করে আবাসীয় পতন তুর্কি-সৈন্যের বিক্রম-বলে কতকটা রক্ষা পেয়েছিল। এটা বাস্তবিক বিস্ময়ের বিষয় যে, বহু শতাব্দী ধরে মুসলিম সভ্যতা একটা সভ্যজাতির হাত হতে অন্য একটা বর্বর জাতির হাতে গিয়ে একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়ে বরং কিছু কিছু উন্নতিলাভ করেছিল। এই বর্বর তুর্কিরা ভক্ত মুসলিম ছিল। খলিফাকে ব্যক্তিগতভাবে—খলিফা হিসাবে নয়—তারা খুব ঘৃণার চক্ষে দেখত কারণ তিনি একেবারে

অযোগ্য অপদার্থ ছিলেন। ইবন খলদুন তাঁর 'মোকদ্দেমা'তে যে একটা চরণ উদ্ধৃত করেছেন, তাতে তৎকালীন খলিফার চিত্র বেশ সুন্দর ফুটে উঠেছে।

"খলিফা পিঞ্জরাবদ্ধ—তাঁর এক পার্শ্বে একটী বালক ও অন্যপার্শ্বে একটী গণিকা—তারা যা বলছে, তিনি তাই-ই তোতার মত আওড়াচ্ছেন।"

কিন্তু খলিফা ও খিলাফত এক নয়। খলিফা অযোগ্য হতে পারে, কিন্তু খিলাফত অনুষ্ঠান হিসাবে সকলের ভক্তি আকর্ষণ করত—বিশেষত সরলচেতা তুর্কি সৈনিকদের। মুসলিম সভ্যতার আর একটী স্তম্ভ ছিল—তাকেও তুর্কিরা খুব শ্রদ্ধা করত।—সে হল উলামাদের মত। এই মত পঞ্চাশটী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য মিলে স্থির করত। উলামা অর্থে আইনজ্ঞ বা শরিয়তবিদ বুঝতে হবে।

মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তখনকার দিনে শিক্ষা ও তত্ত্ব আবিষ্কারে জগতের আদর্শ ছিল। জ্ঞানের সর্বশাখায় তারা শিক্ষক হয়েছিল। অবশ্য তখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্থক্য ঢের। তবু সেগুলি জ্ঞানচর্চার নিবিড় কেন্দ্র ছিল। জার্মান-অধ্যাপক বেল বলেন "ঐ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা সবচেয়ে বড় স্থান পেয়েছিল—কারণ ধর্মশিক্ষাই জ্ঞানের পথ মুক্ত করেছিল। সুতরাং কোরান, হাদিস ও আইন সর্বপ্রধান শিক্ষনীয় বিষয় বলে পরিগণিত ছিল। কিন্তু অন্যান্য বিষয় অনাদৃত হত না। মসজিদে ধর্মচর্চা যেমন হত, অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনাও তেমনি সমানভাবে হত। হজরতের তিরোধানের পর পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত মসজিদই ছিল ইসলামের বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে শিক্ষার স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বিরাজ করত। শিক্ষকের কোন ডিপ্লোমার দরকার হত না। তাঁর যোগ্যতা থাকলেই তিনি শিক্ষক হতে পারতেন। শিক্ষনীয় বিষয়ে ব্যুৎপত্তি ও অধিকার ছিল শিক্ষকতার যোগ্যতার মাপকাঠি।" এই যোগ্যতার পরীক্ষক ছিল শ্রোতৃবর্গ—তাদের মধ্যে জ্ঞানী পণ্ডিতও থাকতেন এবং ছাত্রও থাকতেন। শিক্ষকপদপ্রার্থী যদি তাঁর কথা সুন্দর ভাষা ও যুক্তিদ্বারা প্রকাশ করতে না পারতেন, তবে শ্রোতৃবর্গের বিরাগভাজন হতেন এবং শিক্ষকতার অযোগ্য বলে গণ্য হতেন। সেই যুগে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ পরীক্ষিত শিক্ষকগণের গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁরাই বর্তমান ইউরোপের শিক্ষক। তাঁদের মধ্যে জনৈক রসায়নশাস্ত্রবিদ পণ্ডিত বলেন, "মুখের উক্তি ও শ্রুত কথার স্থান রসায়ন শাস্ত্রে নাই। তার অকাট্য প্রমাণই ঐ শাস্ত্রের ভিত্তি।"

এই সমস্ত পণ্ডিতগণ ধর্মান্ধ বা অন্ধ উপদেষ্টা ছিলেন না। সেইযুগে তাঁরা খুব চোখাল তত্ত্বদর্শী ও চিন্তাশীল ছিলেন। হজরতের উপদেশ অনুসারে এঁরা জনসমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করতেন এবং সময় সময় খলিফাকে মানুষের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য উপদেশ দিতেন—তাঁকে দেশের অন্যায় অপচার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেন। এঁরাই সমাজের স্বার্থান্ধ ধর্মান্ধ সম্প্রদায়কে দমন করে রাখতেন, ধর্মমতের জন্য নির্যাতনকে সর্বতোভাবে ঘৃণা করতেন এবং নানাপ্রকারে মুসলিম কালচারকে ধ্বংশের হাত হতে রক্ষা করতেন। এঁরা রাজ্যলোলুপ খলিফাগণকে অযথা যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত করতেন—যুদ্ধের সময় নিরীহ লোককে রক্ষা করতে এবং দেশের শস্য, পশু ও সম্পদকে অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রবৃত্ত করতেন। তাঁরা

লোকসমাজে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন বলে শরিয়ৎদ্রোহী খলিফাকে সিংহাসনচ্যুত করতেও ছাড়তেন না।

চেঙ্গিস খাঁর বর্বরদল প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ধ্বংশ করেছিল এবং সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণকে নিহত করেছিল। ক্রুজেডের জিহাদে যখন তুর্কি খলিফাগণ নিযুক্ত ছিলেন, ঠিক সেই সময় মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্বসীমান্ত-রক্ষার জন্য সৈন্যসংখ্যা একটু কম হয়ে পড়েছিল ;—তখন সুযোগ বুঝে সভ্যতা-সংহারী চেঙ্গিসের দল হুড় হুড় করে মুসলিম সাম্রাজ্যে ঢুকে নৃশংস ধ্বংসের কাজে লেগে গেল। এ সময় শরিয়তের একটী প্রধান হুকুম—'প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হওয়া চাই'—মুসলিম জগত ভুলে গিয়েছিল। সুতরাং সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করে বর্বর দল অবাধে তসরূপ করতে শুরু করল—যুদ্ধবিদ্যার অভাবে কেহই তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারল না। এই হুকুম মুসলিমের মনের উপর খুব সজোরেই বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

চেঙ্গিস খাঁর আক্রমনের পর মুসলিম সাম্রাজ্য আবার পুনর্জীবন লাভ করেছিল এবং নব-উন্নতিতে কিছু অগ্রসর হয়েছিল। সে উন্নতিতে ইউরোপ শঙ্কিত হয়েছিল। ফলে ইউরোপের মনে বিদ্বেষ জাগ্রত হল। এই বিদ্বেষই ইসলামের পরবর্তী পতনের অন্যতম কারণ। এই পতনের মূল কারণ শরিয়তদ্রোহিতা বা শরিয়ত-লঙ্ঘন বলা যেতে পারে।

সওগাত, ভাদ্র ১৩৩৪

অতীত জোশের স্রোতে সাম্রাজ্য কিছু কিছু শ্রীবৃদ্ধি লাভ করছিল। চীনদেশে গিয়েও জ্ঞানলাভ করবার জন্য যে সমস্ত উলামা তপস্যা করেছিলেন, তাঁরা আর নাই। তাঁদের স্থানে উলামা নাম ধারণ করে সমভাবেই শ্রদ্ধালাভে অধিকারী যাঁরা আবির্ভূত হলেন, তাঁরা মাত্র সীমাবদ্ধ ইসলামের ক্ষেত্রেই জ্ঞানচর্চা করতে লাগলেন—সার্বভৌম ও বিচিত্র জ্ঞান তাঁদের লক্ষ্য হতে সরে গেল। কোরান ও হজরতের মুক্তি ও জ্ঞানালোকদায়িনী ধর্মকে তাঁরা এমন সঙ্কীর্ণ করে দেখতে লাগলেন—যেমন করে সমস্ত ধর্মই অবশেষে অনুদার ও অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়, যখন মানুষের ছায়াই মানব-মন ও খোদার ভিতর স্থায়ী আসন পেতে ধর্মের আস্ফালনকে বড় করে তুলে।

মুক্ত-চিন্তার ধর্ম ইসলাম একদিন তার জন্মভূমি হতে চিরদিনের জন্য পৌরোহিত্যের সংস্কার ও মানবমনের দাসত্ব দূরীভূত করেছিল—সেই ইসলাম পুরোহিতপ্রধান হয়ে পড়ল।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানচর্চা রুদ্ধ হয়ে গেল। সমস্ত বাহ্যবস্তুর জ্ঞান হারাম বলে গণ্য হল, কারণ উহা কি কাফেরদের জ্ঞান ছিল না? পক্ষান্তরে হজরতের আদেশ কি ছিল? 'তোমরা চীনদেশে পর্যন্ত গিয়ে জ্ঞান অর্জন কর ; সে জ্ঞান যদি অমুসলমানদের হয় ক্ষতি নাই—তা ঘৃণা কর না।' অজ্ঞতার মন্ত্রের সঙ্গে গর্বের আস্ফালন মিতালি করে বসল।

খ্রিস্টধর্মদীক্ষিত জাতিবর্গ মুসলিমদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিজ্ঞান-চর্চার মনোনিবেশ করে অচিরে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের প্রভু হয়ে উঠল,—যেমন মুসলিমগণ প্রাথমিক প্রেরণার যুগে

খোদার সৃষ্টি ও বৈচিত্র্য-বিপুল প্রকৃতি-জ্ঞান ও মুক্ত-চিন্তার চর্চার জন্য শরিয়তের হুকুম মেনে চলে শ্রী ও ঐশ্বর্য লাভ করেছিল। তাঁরা পৌরোহিত্যের শৃঙ্খল হতে মুক্তিলাভ করে মুক্তবুদ্ধি ও মুক্ত-চিন্তায় উৎকর্ষ লাভে মনোনিবেশ করলেন ; ফলে তাঁরা শ্রীসম্পদে বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করলেন—যেমন প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের বিজয়-লাভ বিস্ময়-বিপুল হয়েছিল।

উপসংহারে পৌঁছবার পূর্বেই আমি ইসলামের সার্বভৌম প্রকৃতি সম্বন্ধে একটী বিষয় উল্লেখ করব যা ইসলামের চরম দুঃসময়ে ঘটেছিল। কিতাবুল ফখরির প্রথম অধ্যায়েই—যেখানে ইসলামের শিক্ষানুযায়ী ন্যায়জ্ঞান রাজার অন্যতম গুণ সম্বন্ধে বিশেষ জোর দিয়ে লেখা আছে—বর্ণিত আছে, যখন হালাকু বাগদাদ অধিকার করে হতভাগ্য কিন্তু অপদার্থ আবাসীয় খলিফাকে তার দয়ার ভিখারি করে ফেলেছিল, তখন তার আদেশানুসারে আহুত উলামার মজলিসে সে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল এবং উলামাদের ফতোয়া দাবি করল। এই প্রশ্নের উত্তরের উপর খিলাফতের ভবিষ্যত নির্ভর করছিল। প্রশ্নটী এই—"শরিয়ত অনুসারে ন্যায়পরায়ণ অবিশ্বাসী অমুসলমান বাদশাহ ও অন্যায়-পরস্ত বিশ্বাসী মুসলিম বাদশাহের মধ্যে কে রাজ্যশাসনের জন্য বেশি উপযুক্ত।"

এই প্রশ্ন শুনে উলামাগণ বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে গেলেন, কিন্তু উত্তর লিখবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তখন উলমাভূষণ সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম রিজাউদ্দিন আলি-ইবন-তাউস প্রশ্নপত্র হাতে করে উঠে এই উত্তর লিখে আপনার নাম স্বাক্ষর করলেন যে, "ন্যায়পরায়ণ অবিশ্বাসী বাদশাহই সিংহাসনের যোগ্য।" সকলেই তখন আপন আপন নাম স্বাক্ষর করলেন ; কারণ এই হল একমাত্র উত্তর। মুসলিমগণ কখনও দুইটী বিভিন্ন ন্যায়দণ্ড রাখতে পারে না—একটী মুসলিমের অন্যটা অমুসলিমের জন্য। কারণ খোদার নিকট একটী মাত্র ন্যায় দণ্ড। তাঁর বিচার সকলের জন্যই এক, তাঁর নিকট কোন প্রিয়পাত্র নাই। তাঁর আইন যে মেনে চলে, সেই তাঁর প্রিয়পাত্র—সে যেই হোক আর যেখানেই থাকুক না কেন। কোন একটী বিশেষ ধর্মমত মেনে চলা বা কোন বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করা তাঁর বিচার-কাঠি নয়। তাঁর বিচার-কাঠি হচ্ছে চরিত্র ও কাজ। ভাল কাজের ফল ভাল, খারাপ কাজের ফল খারাপ—এ যেমন ব্যক্তির পক্ষে খাটে, তেমনি জাতির পক্ষেও খাটে।

এই হল ইসলামের শিক্ষা। এর মর্যাদা ও ফলের দৃষ্টান্ত মুসলিম-সভ্যতার উত্থান-পতনের ইতিহাস ব্যতীত অন্য কোথাও এত সুন্দরভাবে অঙ্কিত নাই।

শেষ আবাসীয় খলিফা ও তাঁর পরিবার অতি নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছিলেন এবং ক্ষণকালের জন্য বিজয়ী মুগল পশ্চিম এশিয়াতে তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু এক পুরুষ যেতে না যেতেই পারস্য-অশান্তি মুগলশক্তিকে স্থানান্তরিত করল—তুর্কি প্রভুগণ তাঁদের রাজ্যগুলি পুনরুদ্ধার করলেন। সেগুলি কোনিয়ার সুলতান আপনার অধিকারভুক্ত করবার জন্য অনর্থক চেষ্টা করলেন। ঠিক এই সময় ওসমানলি তুর্কি প্রথম দেখা দেন।

ওসমানলি তুর্কির উত্থানে মুসলিম সাম্রাজ্য পুনরায় বিস্তৃতি লাভ করল। এর সঙ্গে তৈমুরের ইতিহাসের অনেকটা মিল পাওয়া যায়। তুর্কি সাম্রাজ্য শৌর্য ও ঐশ্বর্যে আকবর,

শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যের চেয়ে কোন অংশেই নিকৃষ্ট ছিল না। এই সময় তৃতীয় মুসলিম ভাষা খুব প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। এই সময় স্থাপত্যশিল্পের চমৎকার সৃষ্টি —মসজিদ ও রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। ইসলামের সাহিত্যের ধ্বংসাবশেষ ব্রুসা, আদ্রিয়ানোপল ও অবশেষে স্তাম্বুলে জমা হয়ে উঠল। ওসমানলি তুর্কি সর্বপ্রকার শিল্প, সাহিত্যচর্চায় উৎসাহী ছিলেন। তাঁদের অনেকেই নামজাদা কবিও ছিলেন। তুর্কি কবিদের কবিতা আমাকে বড় অভিভূত করে। সে কবিতার মধ্যে একটী করুণ সুর আছে, কিন্তু তার মধ্যে নৈরাশ্যের ভাব নাই। এটী তুর্কিজাতির প্রকৃতিগত বলে মনে হয় ; কারণ তারা মৃত্যুকে সব সময়ই আলিঙ্গন করবার জন্য প্রস্তুত থাকে। প্রকৃতিকে তারা বড় ভালবাসে। তুর্কি কবিতার মুলসুরের সঙ্গে চীনা কবিতার চমৎকার মিল আছে। কিন্তু এই তুর্কি কবিতার করুণ অথচ জোরালো নির্ভর চিত্ত-প্রসূত সুরের জনক আমি তাদের সুন্দর শ্রীপূর্ণ পারিবারিক জীবন বলতে চাই। সে জীবন গভীর মহত্ত্বে গৌরবান্বিত। সেই মহত্ত্ব তুর্কির জীবন সম্পদশালী করে। সে জীবনে মৃত্যুর ভয় নাই—সর্বদা ন্যায়-প্রতিষ্ঠার জন্য তারা জীবন বিপন্ন করতে প্রস্তুত। তারা কেমন সহাস্যে মৃত্যু আলিঙ্গন করে, আর কেমন সহাস্যে তাদের স্ত্রী-জননী সেই মৃত্যু- কবলিত তুর্কির জন্য আশীর্বাদ করে ! এরূপ জীবন কে না চায় ?

ওসমানলি তুর্কি প্রথমে সৈনিক, তারপর কবি, তারপর রাষ্ট্রবিদ এবং অবশেষে ধর্মশাস্ত্র-কুশল (theologian)। ধর্মব্যাপারে যদি তারা অন্যের কথা নিয়ে থাকে, তাতে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। ধর্মভাষা ছিল আরবি—আর পণ্ডিতরাই সে আরবি জানতেন। সুতরাং সকলকেই না বুঝেও কোরান কণ্ঠস্থ বা আবৃত্তি করতে হত শুধু 'সওয়াবে'র জন্য—অর্থাৎ চিন্তা বা বুদ্ধি শিকেয় তুলে মন্ত্রের ন্যায় আওড়াতে হত। তাদের সব কাজই সৈনিকের মত ছিল। যুদ্ধ-কৌশল শিখতে যেমন তারা সেনাধ্যক্ষের অধীন ছিল, তেমনি ধর্মবিষয়ে তারা পুরোহিতের অধীন ছিল। জনসাধারণ উন্নতির চরমে উঠে যেমন তুষ্ট ছিল, ঠিক পতনের সময়েও তারা তেমনি তুষ্ট হয়ে বসেছিল ; কারণ পতন ক্রমশ ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে বেড়ে চলেছিল এবং সকলকে ধ্বংসের পথে তুলেছিল। এই ধ্বংস সম্বন্ধে তারা কিছুই অবগত ছিল না—কারণ বাহ্য আচরণ সমস্তই কিতাদুরস্ত ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অতীতের ঐশ্বর্যের মাত্র একটা ছায়া তার মোহকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমস্তই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সেখানে শিক্ষণীয় বিষয় পরিবর্তিত হয়েছিল। প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে অর্থনীতি না শিখিয়ে শুধু কোরান কণ্ঠস্থ করানো হত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিকার চুল-চেরা চর্চা করা হত—ধর্মশাস্ত্র বা কানুন পড়ান হত। কিন্তু এরূপ প্রণালিতে যে শিক্ষা দেওয়া হত, তাতে কোন উপকার হত কিনা জানি না, তবে তা সবচেয়ে সর্বনাশ ঘটাত মানুষের বুদ্ধিকে বন্দী করে। ন্যায়-বিচার, স্বাস্থ্যচর্চা, পুলিস ও সরকারি কাজের প্রতিষ্ঠান সমস্তই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু কোনটাতেই কিছু কাজ হচ্ছিল না। এই দুর্দিনের ঘোর কাটল তখন—যখন ইয়ুরোপ-শক্তি তুরস্ক-প্রবাসী খ্রিস্টধর্ম দীক্ষিত প্রজাবর্গের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য তুর্কিদের উপর আঘাত করতে লাগল। তখনই তুর্কি বুঝল যে, তারা কালের প্রয়োজন মিটাবার পক্ষে একেবারে অযোগ্য হয়ে

পড়েছে—সময়ের দাবি রক্ষা করবার মত শক্তি তাদের হারিয়ে গেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে এসে যখন তারা আধুনিক যুদ্ধকুশল সৈন্যদলের সঙ্গে সাক্ষাতকার লাভ করল, তখনই বুঝল—"হায়! হায়! আমাদের সমস্তই ত পুরানো অকেজো হয়ে গেছে—এতে ত আর চলবে না।!" তখনই তারা হারানো শক্তিকে পুনরুদ্ধার করবার জন্য প্রাণপণ করতে উদ্যত হল।

পতনের স্রোতে তুর্কি গা ভাসিয়েছিল—কিন্তু ইউরোপের আঘাতে তারা জেগে উঠে পুনর্বার শক্তি গঠনে মনোনিবেশ করল। ফলে দেখতে পাই, গত পঞ্চাশ বৎসরের তুর্কি সাহিত্য প্রাচীন তুর্কি সাহিত্য থেকে অনেকখানি পৃথক। ইকরামও নামিক কামালের কাব্য-সাহিত্য স্বদেশপ্রেমের জোশে রোমাঞ্চকর। ভূতপূর্ব খলিফা-তনয় সাঈদ হালিম পাশার "ইসলাম লাশমাক" নামক গ্রন্থে শরিয়ত-নীতি আধুনিক ভাষায় সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখান হয়েছে, শরিয়তের প্রাচীন অর্থ অনেকস্থলে পরিবর্তিত হয়েছে। আধুনিক তুর্কি সাহিত্য দিন দিন বিকশিত হয়ে উঠছে। কালের প্রভুত্বকে তুর্কি সাহিত্যিকগণ স্বীকার করে নিয়েছেন। নব নব সৃষ্টিতে তাঁরা হাত দিয়েছেন। চিন্তার স্ফুরণই তাঁদের নবমন্ত্র হয়েছে। সে স্ফুরণে বাধা দেওয়া, আর অবনতির পথ উন্মুক্ত করা—তাঁরা এক বলে মনে করেন।

এই সাহিত্যে আশার সঞ্চার হয়েছে, যদিও তুর্কি নানাপ্রকার বাধাবিঘ্নের মধ্যে থেকেও সে সাহিত্য সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছে। তুর্কি মানুষের রক্তপাতের জিহাদের ভিতর দিয়ে নব-জিহাদ ঘোষণা করেছে এবং তা কার্যে পরিণত করবার চেষ্টা করছে। সেই জিহাদই ইসলামের সত্যকার জিহাদ-মানুষের মুক্তি, মানুষের কল্যাণবৃদ্ধি, মানুষের ভ্রাতৃত্ব ও তৌহিদের জিহাদ!

তুর্কির এই নব-জিহাদ ঘোষণার ভিতর যে বিদ্রোহ সূচিত হয়েছে, সেটা সুবৃহৎ ইসলামের পুনরুত্থানের সামান্য প্রারম্ভ মাত্র—যার কিছু-কিছু ইঙ্গিত বর্তমান মুসলিম জগতের সর্বত্র দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকেই এখন বুঝবে যে, ধর্মশাস্ত্রের মোহ বা গোড়ামি অধঃপতনের মূল কারণ; এবং জগতে প্রতিষ্ঠিত ইসলামকে সর্বদেশের সর্বকালের জ্ঞান আহরণ করতে হবে তার পুষ্টিসাধনের জন্য। মুসলিমকে চীনে যেতে হবে, ভারতে যেতে হবে, তার ইতিহাসের প্রারম্ভ হতে সঞ্চিত জ্ঞানকে হজম করতে হবে—তবে মুসলিম নাম সার্থক হবে। মানুষের সৃষ্টি কালের পটে অঙ্কিত হয়ে মানুষের সম্পদ হয়েছে। ইসলাম সে মানুষের দানকে অবহেলা করতে পারে না—শাস্ত্রের বাঁধনে তাকে আটকে রাখলে চলবে না। ইসলাম কখনও অন্ধকার ও অজ্ঞতার মধ্যে বর্ধিত হতে পারে না—একথা আমরা যতই বুঝব, ততই আমাদের মঙ্গল-পথ উন্মুক্ত হবে।

ভ্রাতৃত্ব

"হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহর প্রতি তোমার কর্তব্য সাধন কর নিষ্ঠার সহিত এবং মৃত্যুর পূর্বে তার নিকট নিজকে সমর্পণ কর।" "খোদার বার্তাবাহী তার খুব শক্ত করে ধর—বিচ্ছিন্ন হয়ো

না ; খোদার অনুগ্রহের কথা স্মারণ কর। তোমাদের পরস্পর শত্রুতা দূর করে তিনি তোমাদের অন্তরের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় করেছেন এবং ফলে তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা আজ ভাই-ভাই; তোমরা অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় টলমল করছিলে—তিনি তোমাদিগকে তা হতে মুক্ত করেছেন। এইরূপে আল্লাহ তাঁর বাণী স্পষ্ট করেছেন—যাতে তোমরা সুপথে চলতে পার।”—কোরান।

ইসলামের আবির্ভাবের কয়েক মাস মধ্যে যে উন্নতি হয়েছিল, উক্ত দুইটী আয়েত তাহারই স্মারক। এতে স্পষ্ট ইঙ্গিত করছে সেই উন্নতির পথে শরিয়ত-অনুযায়ী চলবার জন্য এবং যুযুৎসু জাতির অধঃপতনের পথ হতে মুখ ফিরিয়ে থাকবার জন্য। আমাদের হজরত বলেছেন, “মুসলিমগণ প্রাচীরের মত দৃঢ়—এক অংশ অন্য অংশকে খাড়া করে রাখে। মুসলিমগণ একটী দৃঢ় শক্তিসংঘ। যেমন একটী চক্ষু নষ্ট হলে সমস্ত শরীর পঙ্গু হয়ে যায় এবং একখানি পা ভাঙ্গলে সমস্ত শরীর কষ্ট পায়, তেমনি মুসলিমের একটী নষ্ট হলে ইসলাম পঙ্গু হয়ে যায়।”

জাবাল আরাফাত হতে হজরত সমবেত বিপুল জনসঙ্ঘের নিকট তাঁর মক্কায় শেষ যাত্রা উপলক্ষে বিদায় হজে বলেছিলেন, “হে জনমণ্ডলী ! আমার কথা মন দিয়া শুন—কারণ জানি না হয়ত এই বৎসর পরে আর আমি এই স্থানে আসতে পারব না।

“এই মাস ও এই দিন যেমন তোমাদের নিকট পবিত্র, তেমনি তোমাদের জীবন ও সম্পত্তি তোমাদের পরস্পরের নিকট পবিত্র ; এবং স্মরণ রাখ যে, তোমাদের কাজের জন্য খোদার নিকট জবাবদিহি একদিন করতেই হবে।

“খোদা প্রত্যেকের জন্য তার উত্তরাধিকারীর অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন ; সুতরাং অংশীদারকে বঞ্চিত করে দলিল সৃষ্টি করা অন্যায় ও আইনদ্রোহিতা।

“শিশু মাতা-পিতার। বিবাহ বন্ধন যে তোড়ে, তাকে প্রস্তরাঘাত করা উচিত।

“যে মিথ্যা করে একজনকে পিতা বা প্রভু বলে স্বীকার করে, তার উপর খোদা, ফেরেশতা ও সমস্ত মানব জাতির অভিসম্পাত পড়বে।

“হে জনসঙ্ঘ ! তোমাদের স্ত্রীর উপর তোমাদের অধিকার যেমন, ঠিক তেমনি অধিকার তাদের তোমাদের উপর। তাদের কর্তব্য তাদের পত্নীত্বের গৌরব ও বিশ্বাস বজায় রাখা। তারা যদি অবিশ্বাসী হয়, তাদের শাস্তি দাও ; আর যদি বিশ্বাসী হয়, তাদের যথোচিত আহার ও পরিচ্ছদ দাও। স্নেহ-করুণ ব্যবহার দ্বারা তাদের মন তুষ্ট কর—কারণ তারা তোমাদের সহিত বন্দীর মত থাকে। দেখ, তোমরা খোদাকে জামিন করে তাদের শরীর ব্যবহারযোগ্য করেছ। খোদার কালামই সে বন্ধন দৃঢ় করেছে।

“কুসিদবৃত্তি নিষিদ্ধ। ঋণী ব্যক্তি শুধু আসল ফেরৎ দিবে।

“তামসযুগে প্রচলিত রক্ত-পিপাসা ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার প্রবৃত্তি চর্চা এখন হতে। নিষিদ্ধ হল।

"তোমরা যে খাদ্য খাও, তোমাদের গোলামকে সেই খাদ্য দাও এবং যে পোযাক পর, তাদের সেই পোষাক পরাও। যদি তারা এমন অপরাধ করে যা তোমরা ক্ষমা করতে না পার, তবে তাদের ত্যাগ কর। তারাও খোদার বান্দা এবং তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করবার অধিকার তোমাদের নাই। যে গোলাম উপাসনা করে, সে তোমার ভাই।

"হে জনমণ্ডলী! শ্রবণ কর—মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই—অখণ্ড-ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে তারা আবদ্ধ। অন্যায় হতে বিরত হও।"

এই বক্তৃতার শেষে হজরত জনমণ্ডলীর ভক্তি দেখে গদগদ হয়ে পড়লেন, কারণ তাদের অনেকেই কিছুদিন পূর্বে ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল। তখন তিনি বললেন, "হে প্রভু! আমি আমার বার্তা প্রচার করলাম এবং আমার কাজ সম্পূর্ণ করলাম।"

নিম্নস্থ জনমণ্ডলী সমস্বরে চিৎকার করে উঠল—"হাঁ নিশ্চয়ই আপনি আপনার কর্তব্য সাধন করেছেন।"

হজরত উত্তর করলেন, "হে প্রভু, তুমি এর সাক্ষী হও।"

এরূপ পূর্ণ-কৃতি মানুষ কয়জন হয়েছে? জয়ের মুহূর্তে কে এমন করে নম্র হতে পেরেছে?

হজরত কখনও উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত হননি। নিজের জীবনে সে উপদেশ কার্যকরি করে তুলে নিজকে এক অপরূপ আদর্শে পরিণত করেছিলেন। সমস্ত আরবদেশের সম্রাট হয়েও তিনি কখনও রাজসিংহাসনে বসেননি বা সম্রাটোচিত হুকুম ঝাড়েননি। তিনি জনসাধারণেরই একজন ছিলেন। তার নেতৃত্ব বড় জোর মশ্জিদের ইমামতিতেই শেষ হয়ে যেত। মুসলিমের ভ্রাতৃত্ব যখন তিনি প্রচার করেন, তখন তিনি নিজকে বাদ দেন নাই। তিনি নিজেই এক বিরাট আদর্শ ছিলেন। এই ভ্রাতৃত্ব মুসলিমের এক বিপুল গৌরবময় কৃতিত্ব। জগতের সমস্ত জাতির নিকট ইহার মর্যাদা ঢের বেশি।

অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ে বিশ্বাস—খোদার পিতৃত্বে ও মানুষের ভ্রাতৃত্বে। কিন্তু এই বিশ্বাস দুঃখী পীড়িত জগতের মুক্তির পক্ষে কিছুই কার্যকরি হয়নি। ফলে তারা ধর্মকে ত্যাগ করে অন্যান্য মনুষ্য-সমাজহিতকর নীতি অবলম্বন করে মুক্তির খোঁজ করতে চাচ্ছে। "স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব" কার্ল মার্কসের এই নবমন্ত্র তাদের মনঃপুত হয়েছে। কিন্তু এই মন্ত্র কি কার্যকরি? মানুষের সমাজে স্বাধীনতা ও সাম্য কি হাসিল করা সম্ভব? অবাধ নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা অসম্ভব। স্বাধীনতা কি ব্যক্তির বা সমাজের অন্য ব্যক্তির বা অন্য সমাজের স্বাধীনতা দ্বারা সব সময়েই সীমাবদ্ধ ও শৃঙ্খলিত? তাই রাষ্ট্রবিদ ও দার্শনিকগণের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটে থাকে স্বাধীনতার সীমানির্ধারণ করবার জন্য। মানুষের অসীম স্বাধীনতা বলে কোন কথা হতে পারে না। মানুষ অধিকার নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয় না। সে তার কয়েকটী প্রবৃত্তি ও আকাঙ্খা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সে ক্রমেই অধিকার অর্জন করে যতই সেই ঐ সমস্ত প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষা খর্ব ও সংযত করে সমাজের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত করতে শেখে, তার এই অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে তার কর্তব্যও ততই বেড়ে চলে। কর্তব্যহীন অধিকারের কোন অস্তিত্বই মুসলিমগণ স্বীকার করে না।

সকল মানুষের জন্য স্বাধীনতা দাবি করা বাতুলতা। এমনতর স্বাধীনতা জোর-জবরদস্তিতে জারি করতে গেলে বিরাট মনুষ্যত্বকে খর্ব করা হয়। তারপর এই স্বাধীনতার আদর্শ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির নিকট বিভিন্ন। স্বাধীনতার এক আদর্শে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, অন্য আদর্শে সোভিয়েট প্রণালি গঠিত হয়েছে।

স্বাধীনতা ও সাম্যের দ্বন্দ্বে ভ্রাতৃত্ব একরূপ ভুল হয়ে গেছে এবং ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু ভ্রাতৃত্ব অর্জন করা যায় তখন, যখনই সদুদেশ্যপ্রণোদিত মানুষ একত্র মিলে কোন একটী বিশেষ আইনগ্রন্থকে ধর্মপ্রাণ হয়ে মানতে রাজি হয়। বর্তমান জগতে এরূপ আশা করা আহামকি ! কিন্তু ইসলামের আদর্শ আমাদিগকে ভরসা দেয় যে, ইহা অসম্ভব নয়। এই আদর্শই আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয় যে, মানুষের ভ্রাতৃত্বের উপর সত্য করে ডিমক্র্যাসি খাড়া করা যায় না—যদি না খোদাকে আদর্শ করা যায়।

হজরত মুসা মানুষের ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রচার করেছিলেন। তিনিও খোদাকে আদর্শ করেছিলেন ; কিন্তু তাঁর আদর্শ কখনও কার্যে পরিণত হয়নি, কারণ খোদাকে আদর্শ করে কোনও শাসনপ্রণালি বা সমাজপ্রতিষ্ঠান আজও খ্রিস্টজগতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

আমাদের হজরত মানুষের সার্বভৌম ভ্রাতৃত্বের আদর্শ ঘোষণা করেছিলেন এবং একেই তিনি সমস্ত বিধির ভিত্তি করেছিলেন। ইসলামের সমস্ত বিধিই নীতিমুখী। মানুষের সত্যকার কল্যাণের জন্য এটা অত্যন্ত কার্যকরি। সামাজিক অসাম্য বর্তমান থাকল ; কারণ প্রত্যেক শৃঙ্খলিত সমাজেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিছু সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। কিন্তু মানুষ ও জাতির মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব চিরস্থায়ী করে প্রতিষ্ঠিত করা হল এবং চরিত্রগত, বর্ণগত ও শক্তিগত পার্থক্যকেও স্বীকার করা হল। "উপাসনায় অভ্যস্ত গোলাম তোমার ভাই।" একথা শুধু কথায় পর্যবসিত হয়েই থাকেনি। মুসলিমগণ এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।

যোদ্ধৃমান জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামের দৌলতে। সে ভ্রাতৃত্ব এখনও স্থায়ী হয়ে আছে। উৎপীড়নপ্রিয় জাতীয়তা ইসলামের প্রভাবে খর্ব হয়েছে। হজরত বলেছেন, "যে ব্যক্তি হিংসাপরায়ণ জাতির একজন, সে আমার দলের নয় ;—সেইরূপ নির্যাতন করবার জন্য যে অন্য জাতিকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করে, তাকে আমি চাই না এবং যে জাতি অন্যায় পোষণ করবার জন্য অন্য জাতিকে প্রবৃত্ত করতে মৃত্যু আলিঙ্গন করে, তার উপর আমার অভিসম্পাত।"

ফলত ইসলাম ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা ধ্বংস করে বিরাট জাতীয়তা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। হজরত আরও বলেছিলেন, "ন্যায়পরায়ণ কাফ্রি দাস অন্যায়াচারী কোরেশের শরিফ অপেক্ষা সিংহাসনের জন্য অধিকতর যোগ্য।" সমাজসেবাই সমাজের শ্রদ্ধা ও সমান পাওয়ার জন্য একমাত্র উপায় ছিল। জন্মাধিকার, ধন ও পাশবিক শক্তির দাবির চেয়ে সমাজসেবার দাবি সবচেয়ে বড়।

"তোমার প্রতি লোকের যেরূপ ব্যবহার তুমি ইচ্ছা কর, লোকের প্রতিও তুমি ঠিক সেরূপ ব্যবহার কর।" নির্বোধ লোককে একথা কেমন করে বুঝানো যায়? অন্যে তার উপর অন্যায়

করলে সে যেমন অনুভব করে, ঠিক তেমনি অনুভব করা চাই—সে অন্যের উপর অন্যায় করলে অন্যে কেমন অনুভব করে—অর্থাৎ নিজের অনুভূতি দ্বারা অন্যের অনুভূতিটা স্পষ্ট বোধ করা আবশ্যক। এজন্য মুসলিমের উপর বিধি আছে, অপরাধীর কার্যের পরিমাণের সীমা অতিক্রম না করা। শাস্তি কার্যের চেয়ে গুরুতর না হয়। মানুষকে ভয় দেখাবার জন্য অতিরিক্ত শাস্তির ব্যবস্থা ইসলামে নাই। "ক্ষিপ্ত কুকুরের প্রতিও অতিরিক্ত শাস্তি প্রদান যে করে, তার উপর অভিসম্পাত।" প্রতিহিংসামূলক কার্যানুযায়ী বা ক্ষতি-অনুযায়ী শাস্তির ভিতরে যে কঠোর ন্যায়বিধি আছে, তাহার সত্যকার মূল্য আছে মানুষের মর্যাদার দিক থেকে।

কোরানের বিধি এই মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, "মানুষের প্রতি এমন ব্যবহার কর—যে ব্যবহার তুমি তার কাছ থেকে চাও।" এই নীতি দ্বারা কি ব্যক্তির কি সমাজের জীবন-পদ্ধতি এমন বিস্তৃতভাবে পরিচালিত হয় যে, কি বুদ্ধিমান কি নির্বোধ সকলেই তাহাদের নিজ নিজ কর্তব্য বুঝতে সক্ষম হয়। কুসীদ সমাজ-সংহারক—কারণ ইহাতে ভ্রাতৃত্বের সৌধ শিথিলমূল করে, সমাজে অশান্তি ও কলহের সৃষ্টি করে। কোরানে আছে, কুসীদ নিস্ফল ও অনুৎপাদক, কিন্তু দান ফলবান ও উৎপাদক। অপরাধী ও অপবিত্র জীবকে খোদা ভালবাসেন না। এইরূপ ধন সঞ্চয় করে জমিয়ে রাখাও সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর। এজন্য মুসলিমকে প্রয়োজনের অতিরক্ত ধনসঞ্চয় করে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। বর্তমান জগতে কোরানের কুসীদনীতির সত্যটা অনেকে বুঝতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে ধনের স্রোত প্রখর করলেই যে মানুষের জ্ঞান ও সুখ বৃদ্ধি হয়, তাহা নহে—মানুষের সৃষ্টি ও সুখের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করা যায় শুধু ধনকে অনবরত সমভাবে সমাজের স্তরে স্তরে বিতরণ করে দিয়ে—অর্থাৎ ব্যক্তিগত লোভকে সংযত করে ও বদান্যতাকে বৃদ্ধি করে।

মুসলিমদের মধ্যে অনেকেই এখন কুসীদনীতির বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করে থাকেন। তাঁরা বর্তমানের ঐশ্বর্যের জাঁকজমক দেখে বিহ্বল হয়ে পড়েন। বর্তমান জগতের অধিকাংশ ব্যবসায়-বাণিজ্য নৃশংস কুসীদবৃত্তির তুলনায় হিতকর বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রভাব সাধারণ সমাজের উপর যেরূপ অনিষ্টকর, তাহাতে সত্যকার ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়ছে। আজ Socialism, Communism, Syndicalism কেন দেখা দিয়েছে? ধনীপ্রধান সমাজের আয়ু বড় জোর একশত বৎসর হবে। কিন্তু এরই মধ্যে নির্ধন সম্প্রদায়ের দুঃখদৈন্য দূর করিবার জন্য নানাপ্রকার আন্দোলন শুরু হয়েছে কেন? রুশিয়ার প্রাচীন শাসন-প্রণালি ভেঙে Bolshevism যখন অবির্ভূত হল, তখন তার প্রথম প্রোগ্রাম হল সুদ উঠিয়ে দেওয়া। এখন প্রত্যেক সোস্যালিস্ট প্রোগ্রামেই ধনজ বা মুনাফা উঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ—ধনীপ্রধান সমাজের ভিত্তি মূলধনলব্ধ মুনফার উপর প্রতিষ্ঠিত, আর এই মুনাফাই সর্বপ্রকার সামাজিক দৈন্য, অবিচার, অন্যায়ের জনক।

শরিয়তে বাণিজ্য নিষিদ্ধ নহে; কিন্তু কুসীদ নিষিদ্ধ আছে। কোরানে যে বাণিজ্যের বিধান আছে, তাহা বর্তমান জগতের মুনাফা-পরিপূর্ণ নৃশংসতালবব্ধ বাণিজ্যের মত নহে; তার

অধিকাংশই ইসলামি অর্থে কুসীদশ্রেণীভুক্ত হতে পারে, কারণ বর্তমান জগতের নরনারীর ক্ষুৎপিপাসার তীব্র দাবি উপেক্ষা করে এই মুনাফা সঞ্চয় করা হয়। মদ্যাসক্তি সমাজ-সংহারক, জুয়া খেলাও তদ্রূপ। এজন্য উভয় প্রকার আসক্তিই নিষিদ্ধ হয়েছে। ইসলাম ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করে, কিন্তু এই অধিকারকে স্বেচ্ছামত ব্যবহার করা যেতে পারে না—যদি ইহাতে সমাজের অনিষ্ট ঘটে। সর্বপ্রকার সম্পত্তিই খোদার নিকট হতে প্রাপ্ত এবং ইহার ব্যবহার শরিয়তের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আয়ের কিয়দংশ দরিদ্রের জন্য ও কিয়দংশ সমস্ত সমাজের জন্য ব্যয় করা নিতান্ত আবশ্যক। আর যখন একজন মানুষের মৃত্যু হয়, তখন তার সম্পত্তি পুত্র, কন্যা, স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়ের মধ্যে বিতরণ করা কর্তব্য। এক হাতে ধন জমলে ধনের অপব্যবহারই বেশি হয় এবং উহা নানাপ্রকার নৃশংসতা ও অত্যাচারের অস্ত্র হয়ে উঠে।

শক্তি প্রতিষ্ঠা মূলক জাতীয়তা মানুষের পক্ষে হিতকর নয়। এজন্য ইসলাম তা ত্যাগ করেছিল। মুসলিম ভ্রাতৃত্বলালিত রাষ্ট্রে বর্ণ ও জাত্যাভিমানের স্থান একেবারেই নাই। সেখানে শ্রেণীর পার্থক্য দাম্ভিকতা বা ব্যক্তিত্বহীনতা হতে মুক্ত হয়ে পেশার পার্থক্যে পরিণত হয়। মুসলিম সভ্যতা একটী পূর্ণ প্রোগ্রাম—যাতে কি ধনী কি নির্ধন, কি ধার্মিক কি অধার্মিক, কি উচ্চ কি নীচ সকলেরই স্থান সমান—সর্বপ্রকার চিন্তা ও কাজের পরিসর তাতে ভুক্ত। এ যে শুধু প্রোগ্রামেই পর্যবসিত হয়ে গেছে, তা নয় ; কাজেও পরিণত হয়েছে।

মুসলিম সভ্যতার পতনের কারণ—পবিত্র শরিয়তের আদেশ লঙ্ঘন। বর্তমান জগতে সম্পূর্ণরূপে লাগতে পারে এমন সভ্যতা আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। কিন্তু আজ অন্তত একটী বিষয়ে মুসলিম সমাজ জগতের অন্যান্য জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে, যেমন করেছিল ওমরের যুগে, হারুণর রশীদ অথবা সালাউদ্দিন কিংবা মহামতি সুলেমানের শাসনকালে ;—সেটী 'অখণ্ড ভ্রাতৃত্ব'।

সওগাত আশ্বিন ১৩৩৪

এমন ভ্রাতৃত্বের আদর্শ কোথায়? সমস্ত মানুষের ইতিহাস খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। এই ভ্রাতৃত্ব নানা প্রকার অবস্থায় লালিত—নানা বর্ণ নানা শ্রেণীকে বেষ্টন করে আছে। একটী জাতি নিয়ে নয়—বিভিন্ন জাতিকে নিয়ে ইসলামের ভ্রাতৃত্ব।

আজকার League of Nations (রাষ্ট্র-শক্তি-সঙ্ঘ) ইসলাম যা করেছে, তাই করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে—জগতের শান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধিকল্পে আন্তর্জাতিক একখানি আইনগ্রন্থ রচনা দ্বারা সমস্ত জাতির অন্তর্মিলন প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে তার একটা বিশেষ অন্তরায় ঘটছে—কারণ লীগের মন্ত্র হচ্ছে হিংসাপরায়ণ জাতীয়তা ও সাম্রাজ্যতন্ত্র। যে সমস্ত জাতি এই অমানুষিক রাষ্ট্রতন্ত্রকে নীতিসিদ্ধ করে শ্রদ্ধেয় বলে ধরে নিজেদের কার্য হাসিল করছে দুর্বল জাতির উপর অত্যাচার করে, তাদের নিয়েই এই লীগের কারবার। এই মন্ত্রদীক্ষিত সত্যপ্রধান লীগ যে কি করে এই মানুষ ও জাতির সাম্য-সমস্যা সমাধান করতে পারবে, তা বুঝা শক্ত। ব্যক্তির যেমন অধিকার, জাতিরও তেমনি অধিকার

—একই নীতিধর্ম ও আইন ব্যক্তির উপর যেমন প্রযুক্ত হবে জাতির উপরও তেমনি প্রযুক্ত হওয়া চাই। এই লীগের আদর্শ হওয়া চাই "ইসলামের ভ্রাতৃত্ব"—যেখানে সমস্ত জাতি এক দিল হয়ে আছে। মুসলিম রাষ্ট্র ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে, কিন্তু মুসলিম জাতিবর্গের একতা, একপ্রাণতা এখনও অটুট হয়ে আছে। কোন কোন সমালোচক মুসলিম-সঙ্ঘের ঐক্য নানাপ্রকার বাহিরের নির্যাতন সত্ত্বেও অটুট থাকতে দেখে অবজ্ঞাভরে বলে থাকেন—"যে মুসলিমগণ স্বরাষ্ট্রপ্রীতির ভান করে থাকেন, তাঁরা বাস্তবিক স্বদেশপ্রেমিক নন—ধর্মান্ধ মাত্র।" কিন্তু তাঁরা আমাদের মহাজাতি-সঙ্ঘের আদর্শ ত্যাগ করে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ হিংসাপরায়ণ রাষ্ট্রতন্ত্রের আদর্শকে আঁকড়ে ধরতে আমাদের উপর জবরদস্তি করেন। মুসলিম যদি তাই করে তাহলে তারা নিশ্চয়ই, কোরানের কথায়—'সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুর পরিবর্তে সর্বনিকৃষ্ট বস্তু ক্রয় করবে'—যেমন প্রাচীন বাণী-ইসরাইল করেছিল। এসব বিষয়ে ইসলাম ইউরোপের তেরশত বৎসরের অগ্রজ।

ইসলাম কতকগুলি আদেশ জারি করেছে যা পালন করলে ইসলামের এই সার্বভৌম ভ্রাতৃত্ব অটুট ত থাকবেই, সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বিস্তৃতিলাভ করবে। এইরূপ ভ্রাতৃত্বের তুলনা জগতের ইতিহাসে নাই। এই ভ্রাতৃত্বের গণ্ডীর মধ্যে শ্বেত-কৃষ্ণ, পীত-তাম্রবর্ণের যাবতীয় জাতি সম্পূর্ণ প্রীতি ও সাম্যের সূত্রে গ্রথিত হয়েছে, এবং তা ধনী-নির্ধন, রাজাপ্রজা, দাস-প্রভুর দাবির সামঞ্জস্য সাধন করেছে। এই সমস্ত আদেশের মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে দৈনিক ও সাপ্তাহিক জামাত উপসনা, যেখানে সমস্ত মুসলিম ধনীনির্ধন নির্বিশেষে নম্র হয়ে দাঁড়ায় একে অপরের সঙ্গে সমান হয়ে। জামাতের অধ্যক্ষ—জন্মগত অধিকার বা ধনের দাবির জন্য নয়, পবিত্রতার জন্য মনোনীত হন। অন্য অনুষ্ঠান হচ্ছে বার্ষিক হজ্জ। মুসলিম কালচার ও মুসলিমের এক-দিল অক্ষুন্নরাখার জন্য এর চেয়ে বড় অনুষ্ঠান আর নাই। এজন্য ইসলামদ্রোহিগণ বলে থাকেন, "ইসলাম বর্তমান যুগের—বর্তমান বিলাসপরায়ণ যুগের—অনেক পশ্চাতে পড়ে আছে।" হজ্জে রাজা, কৃষক, সম্ভ্রান্ত ধনী, শ্রমিক, দীন, নির্ধন—সকলেই একই প্রকার মোটা পরিচ্ছদ পরিধান করে একই প্রকারে একই অনুষ্ঠান ও ব্রত পালন করেন—সমগ্র মানবজাতি এমন সাম্যের সাধনা করে, যে সাম্য মৃত্যু মূহূর্তে সকলকে বরণ করতে হয়। প্রত্যেক সঙ্গতিসম্পন্ন মুসলিমকে জীবনে অন্তত একবার এই হজ্জব্রত পালন করতে হয়। কিন্তু পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গকে কষ্টের মধ্যে ফেলে যাওয়া অপরাধ। যাওয়ার সময় দুনিয়ার সমস্ত গুছিয়ে, তার মায়া ত্যাগ করে, বাড়িঘরের মমতা, পুত্র-কন্যাা স্ত্রী আত্মীয়বর্গ ধন-দৌলতের মমতা বিসর্জন দিয়ে এমন সুদীর্ঘ পথের যাত্রী হতে হয়, যাতে এতটুকু পার্থিব লাভ নাই। এই জগতে অনেকে মনে করেন, এ যাত্রা অনর্থক। আমি এরূপ মনে করি না।

তারপর রমজানের উপবাস—বৎসরের মাসিক তপস্যা। প্রত্যেক মুসলিমকে উপবাস করতে হয়। দুর্বল ও প্রবাসীকে এ তপস্যা হতে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজা-প্রজা ধনী-নির্ধন অন্য কাকেও এ উপবাসের কঠোরতা হতে মুক্তি দেওয়া হয়নি। অনেকে এই অনুষ্ঠানকে দুর্বুদ্ধিতার পরাকাষ্ঠা বলে মনে করেন ; আমি কিন্তু করি না। আমার বিশ্বাস,

যাঁরা মানব জীবনের কঠোর বিঘ্নবিপত্তির বিষয় এবং তা অতিক্রম করবার জন্য মানুষের কিরূপ শিক্ষা দয়কার, সে সম্বন্ধে একটু চিন্তা করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই মুসলিমের রমজান-তপস্যার উপকারিতা ও আবশ্যকতা অস্বীকার করতে পারবেন না। মনুষ্যপদবাচ্য সকলকেই দুর্দিনের জন্য প্রস্তুত থাকা চাই—বিশেষত যাঁরা মনুষ্যত্ববিকাশের অনুকূল নীতি পালন করতে চেষ্টা করেন।

প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত আদেশের ভিতর দিয়ে হজরতের একটী কথাই ধ্বনিত হচ্ছে—সেটী এই, "মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যু আলিঙ্গন কর" অর্থাৎ খোদার ইচ্ছাতে মানুষের ইচ্ছা উৎসর্গীকৃত হোক—কোরানে যার ইঙ্গিত হয়েছে এবং যা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিকশিত হচ্ছে। এই-ই হচ্ছে ইসলাম। দৈনিক উপাসনায় জায়-নামাজ কবরের ইঙ্গিত করে—রুকু (উপুড় হওয়া) অর্থে খোদার ইচ্ছাতে নিজের ইচ্ছা বিলিয়ে দেওয়া এবং সজুদ (মস্তক অবনমন) একেবারে মৃত্যু অর্থাৎ একেবারে নিজকে উৎসর্গ করা তাঁর কাছে যিনি বিচারদিনের অধিপতি।

রমজান মাসে মুসলিম তাঁর সমস্ত জীবনধারা পরিবর্তন করে—ধনী-নির্ধন সমানভাবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ক্ষুৎপিপাসার যন্ত্রণা ভোগ করে। সম্রাটও সূর্যাস্তে সামান্য এক গ্লাস পানির জন্য খোদাকে ধন্যবাদ দিতে বাধ্য হন।

হজ্জে মুসলিম মৃত্যুর সমুখীন হন—দুনিয়ার সমস্ত দেনা-পাওনা পরিশোধ করে—সমস্ত ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে দিয়ে—সমস্ত মায়া-মমতা হতে নিজকে মুক্ত করে।

জীবন নানা আমোদ-প্রমোদ, আবেগ-উদ্বেগ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়ে মানুষকে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু করে তুলে। মৃত্যু সকলকে পরস্পর ভাই করে। ইসলাম আমাদের নিরন্তর সতর্ক করে দিচ্ছে যে, খোদার সামনে আমরা সকলেই ভাই ভাই এবং আমাদের গর্ব, আকাঙ্ক্ষা, ধন ও শক্তি—যাতে আমাদের পরস্পর পার্থক্য ঘটায়—সমস্তই মৃত্যুর সামনে খসে পড়বে। মনুষ্য-জীবনে মৃত্যু সবচেয়ে মূল্যবান ঘটনা ; মৃত্যুকে ভুলে বা মৃত্যুর কথা উপেক্ষা করে যে কোন জীবনায়োজন মানুষকে পথভ্রষ্ট করবে। পক্ষান্তরে যে জীবনায়োজনে শুধু মৃত্যুর চিন্তায় জীবনের সমস্ত শক্তি ব্যয় করতে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে জগতের কর্তব্য সম্বন্ধে ঔদাসীন্য জন্মায়। ইসলাম জীবনায়োজনের যে প্রোগ্রাম করেছে, তাতে মানুষ একদিকে যেমন মৃত্যুর ভয় হতে মুক্তি লাভ করে, অন্যদিকে তেমনি মৃত্যুকে তার যথার্থ মূল্য দিতে শিখে। সে জীবনযাত্রা সদানন্দময়, সেখানে নৈরাশ্য বা দুশ্চিন্তার অন্ধকার নাই। এ সমস্তই সরলচিত্তের পক্ষে সরল এবং বুদ্ধিমানের পক্ষে গভীর। মোটের উপর এ সমস্ত অনুষ্ঠানই মানুষের ভ্রাতৃত্বসাধনের জন্য দৃঢ়তর ভিত্তি।

ভ্রাতৃত্বের ব্যাপারে ইসলাম তার গৌরবময় যুগেও যেমন জগতের অগ্রগণ্য ছিল, বর্তমান যুগেও তেমনি অগ্রগণ্য। এতে আমি এই মনে করি না যে, ইসলামের পতন আদৌ হয় নাই। তবে বলি অন্যান্য জাতির মধ্যে এরূপ ভ্রাতৃত্ব-গঠনের উদ্দেশ্যে এতটুকু চেষ্টাও করা হয় নাই। নিশ্চয়ই আধুনিক ইসলামের এই ভ্রাতৃত্ব শিথিল হয়েছে—তার কারণ শরিয়তকে

অবহেলা করা হয়েছে। যাকাতের অনুষ্ঠানকে অবহেলা করে এ অবস্থা হয়েছে। আরবি জাকাহ্ শব্দের অর্থ চর্চার দ্বারা উৎকর্ষসাধন। যখন জাকাত রীতিমত আদায় করা হত, বিতরণ করা হত এবং উদ্বৃত্ত বায়তুলমালে রাখা হত, তখন আমরা ইতিহাসে পড়ি কোন অভাবগ্রস্ত মুসলিম দেখা যাইত না। বায়তুলমাল সমস্ত সমাজের সমবেত চেষ্টা সফল করবার জন্য একপ্রকার ব্যাঙ্কের কাজ করত। এখনও জাকাত যে দেশে রীতমত আদায় করা হয় ও বিতরণ করা হয়, যেমন নেজদ, সেখানে অভাবগ্রস্ত মুসলিম নাই। যেখানে এই বিধি উপেক্ষিত হচ্ছে, সেখানে মুসলিম ভিখারির সংখ্যা অনন্ত। এই অবহেলা এবং তদ্ধেতু মুসলিম দৈন্যের জন্য জনসঙ্ঘ দায়ী নয়। এর জন্য দায়ী পূর্বকালের নৃশংস রাষ্ট্রতন্ত্র—যার ফলে জনসঙ্ঘের হাত হতে সমস্ত ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়েছিল ; জনসঙ্ঘ কোন কাজই করতে পারত না—রাজ কর্মচারির মুখাপেক্ষী হয়ে তার ন্যায্য অধিকার পরিচালনা করতে পারত না। কর্মচারী দ্বারাই সমস্ত পরিচালিত হত। এখন যাঁরা মুসলিমের উন্নতি চান, তাঁদের সর্বপ্রথম চেষ্টা হোক জাকাত অনুষ্ঠান ও বায়তুমালকে পুনরুজ্জীবিত করা।

এজন্য তাঁদের মুসলিম রাজত্বপরিচালন-বিজ্ঞান পড়তে হবে। লোকে মনে করে, এমন কোন বিজ্ঞান মুসলিমদের ছিল না এবং মুসলিমগণ স্বভাবতই অব্যবসায়ী ; আর ব্রিটিশ-শিক্ষা প্রদত্ত মি. হাইদরি ব্যতীত মুসলিম ইতিহাসে আর একজনও রাজস্ববিদ ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় না।

তারা অজ্ঞ। মুসলিম ইতিহাসে ভুরি ভুরি রাজস্ববিদ কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়। মুসলিম রাজস্ব-বিজ্ঞান একটী পূর্ণ বিজ্ঞান ছিল। মুশকিল হচ্ছে—বর্তমান ব্যবসায়ী রাষ্ট্রবিদগণ তা বুঝতে পারেন না এই জন্য যে, তাদের লক্ষ্য ব্যক্তিগত লাভ অথবা রাষ্ট্রের লাভ। কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রের লক্ষ্য ছিল সমস্ত সমাজের লাভ, উন্নতি ও কল্যাণ। মুসলিম সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির জন্য এটী একটী প্রকাণ্ড শক্তির কাজ করেছিল। এটাই অবহেলা করায় তার পতনও অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। প্রাচ্যশাস্ত্রবিশারদ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে অনেক পুস্তক লিখেছেন—বিশেষত আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক য়্যাগনিভিস এ সম্বন্ধে প্রকাণ্ড পুস্তক লিখে সভ্যজগতের চিন্তারাজ্যের পরিধি বাড়িয়েছেন। শরিয়ত অনুযায়ী গঠিত রাজস্ববিধি প্রকাশ মুসলিম সাম্রাজ্যে সুন্দর ফল প্রসব করেছিল। সেই প্রাচীন প্রণালি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করলে অনেক মুসলিমই বিস্মিত হবেন—বিশেষত যাঁরা বর্তমান বাণিজ্য ও রাজস্ববিজ্ঞান পড়ে একটু গোলে পড়েছেন।

এই রাজস্বনীতি একটী শক্তিমান সমাজগঠনের জন্য অথবা একটা মরণোমুখ বা পতিত জাতির উদ্ধারের জন্য সবচেয়ে সরল অথচ কার্যকরি। কিন্তু তা অবলম্বন করলে সমাজের প্রত্যেককেই কিছু কিছু ত্যাগ করতে হবে। শরিয়ত মানতে গেলে আমাদের ধন-সম্পদ সমস্তই খোদার পথে উৎসর্গ করতে হবে—নিজেদের প্রবৃত্তিচরিতার্থের জন্য নয়। বর্তমান জগত বলে, "খেয়ে না খেয়ে সঞ্চয় কর, ব্যাঙ্কে ডিপজিট কর, শেয়ার ক্রয় কর, সুদে খাটাও, ডিভিডেন্ট আদায় কর।" পবিত্র কোরান বলছেন, "যা উদ্বৃত্ত থাকে তা খরচ কর।" অর্থাৎ তোমার সমস্ত অভাব ও তোমার অধীনস্থ সকলের অভাব মিটিয়ে, তোমার দেয়

জাকাত আদায় দিয়ে, দান-খায়রাত করেও যা উদ্বৃত্ত থাকে, তা খরচ কর এমনভাবে যাতে তোমার সমাজের উন্নতি হয়, যোগ্য ব্যক্তি উৎসাহিত হয় এবং মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কোরান সুদকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছে। সুদ অর্থে ভাইএর অভাবের সুযোগ নিয়ে ভাইএর রক্ত-শোষণ করা। তেমনি নিষিদ্ধ হয়েছে ইসরাফ—যার অর্থ খোদাদত্ত সম্পদকে নানা কু-কার্যে উড়িয়ে দেওয়া। এ সমস্ত বিধি আজকাল অসম্ভব বলে মনে হবে—যদি না বুঝতে পারা যায় যে, এগুলি যে সমাজের জন্য হয়েছিল সে সমাজ প্রতিযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে ভ্রাতৃত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে সমাজে কাকেও অনশনে থাকতে দেওয়া হত না—সে সমাজ তার উন্নতির যুগে, "গোটা সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলের" দিক থেকে চমৎকার শ্রীবৃদ্ধিলাভ করেছিল। আমার বিবেচনায় বর্তমান মুসলিম জগতের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে—মুসলিম রাজস্ব-বিজ্ঞান বিশেষ যত্নের সহিত অধ্যয়ন করা।

বর্তমান মুসলিমের অধঃপতনের আর একটী কারণ হচ্ছে—শরিয়তের অন্যতম আদেশ লঙ্ঘন। সেটা এই—"প্রত্যেক নরনারীর পক্ষে বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানার্জন করা অবশ্য কর্তব্য।" এই আদেশের অবহেলার ফল ভারতীয় মুসলিম সমাজে যেমন প্রকটমান, অন্যত্র কোথাও সেরূপ নয়। তুর্কি ও মিসর-প্রমুখ মুসলিম রাজ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলিত হওয়ার পূর্বে সার্বভৌমিক শিক্ষাপদ্ধতি বিদ্যমান ছিল। এ পদ্ধতি অতি পুরাতন ছিল। যদিও তা সে সময়ে জগতের নিকট আদরণীয় ছিল, কিন্তু তা অচিরে শক্তিহীন, অন্ধসংস্কারের জনক হয়ে পড়েছিল। তাহলেও প্রত্যেক মুসলিমই ইসলামের শিক্ষা ও তার ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু কিছু আয়ত্ত করত। ভারতে সেটুকুও নাই। এখানে মুসলিম নামধারী কতকগুলি মানুষ আছে, যারা মাত্র 'কলমাটী' জানে; তা ছাড়া ধর্মসম্বন্ধে তারা আশ্চর্যরূপে অজ্ঞ। তারপর প্রত্যেক দেশে অনেকেই ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনা করতে নারাজ। ফলে তারা অবনতির গর্ভে নিপতিত হয়েছে-অন্যে তাদের শীর্ষে আরোহণ করেছে। তারা বুঝতেও পারল না—কেন অন্যজাতি তাদের উপরে উঠে গেল। তারা ক্রমে ভগ্নোৎসাহ ও নৈরাশ্য-পীড়িত হয়ে দৈন্যের পথে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকল। এ সমস্তই শুধরানো যায়; সেজন্য কাজও কিছু কিছু আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু এই নিদারুণ দৃশ্যের ছবি দর্শকবৃন্দের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে এবং ইসলামের মহাদান বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে বুঝতে দিচ্ছে না।

মুসলিম রাজন্যবর্গের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাষ্ট্রনীতির পার্থক্য, জাতি ও বর্ণের বৈসাদৃশ্য এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে শিথিল করতে পারে না। এ কথা অমুসলমান কখনও বুঝতে পারে না। "আমি একজন মুসলিম"—এর মধ্যে কিছু অর্থ আছে এবং 'আসসালামু আলায়কুম' এই সম্ভাষণের ও এক চমৎকার শক্তি আছে—এতে প্রত্যেক মুসলিমের হৃদয় পরস্পর 'প্রীতি-পরশ' লাভ করে। অমুসলিম যেমন পৃথক পৃথক আমরা তেমন নই। আমাদের লক্ষ্য হিসাবে আমরা এক—লক্ষ্য করবার উপায় হিসাবে কিছু কিছু পৃথক বটে। ইসলামের উদ্দেশ্য যা, মুসলিমের উদ্দেশ্যও তাই। সেটী হচ্ছে—'এক খোদার সঙ্গে বন্ধনযুক্ত মানুষের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব সংস্থাপন।' আমাদের পার্থক্য কেবল এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় নিয়ে। প্রকৃত শিক্ষা-বিস্তার,

কোরানকে প্রত্যেকের নিকট পৌছে দেওয়া, যুগের প্রয়োজন অনুসারে তার শিক্ষার যথোচিত ব্যবহার আমাদের পার্থক্য ঘুচিয়ে ফেলবে এবং মুসলিম ভ্রাতৃত্বের পরিধি সম্বন্ধে যে সমস্ত ভ্রান্তিমূলক ধারণা আছে, তা দূরীভুত করবে। মুসলিম ভ্রাতৃত্ব যে শুধু মুসলিমকে নিয়ে, তা নয় ; এই গণ্ডীর মধ্যে তাঁদের সকলেরই সমান অধিকার—যাঁরা এ দুনিয়ায় খোদার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চান।

বিজ্ঞান কলা ও সাহিত্য

মুসলিম কালচারের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেরণা ও মূল কারণ হচ্ছে পবিত্র কোরান এবং এর প্রধান শিল্পী হচ্ছেন হজরত মুহম্মদ। কোরানে পুনঃ পুনঃ মানুষের সহজ বুদ্ধিকে উদ্বোধিত করে মানুষকে প্রত্যক্ষ জাগতিক জীবনের দিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে। ভৌতিক বা অলৌকিক ব্যাপারকে আমলই দেওয়া হয় নাই। তবু আধুনিক মুসলিম যে কেন ভৌতিক ও অলৌকিক গল্প দিয়ে কোরান ও হজরতকে ঢেকে রেখেছে, তা বুঝা কঠিন ; তবে ভারতবর্ষে হয়ত পারিপার্শ্বিক পৌত্তলিক সংসর্গে পড়ে মুসলিম এই ভৌতিক ব্যাপারকে বেশি করে বিশ্বাস করছে। হজরত বলেছেন—"প্রত্যেক নরনারীর পক্ষে জ্ঞানার্জন করা ফরজ (অবশ্যকর্তব্য)।" "যদি চীন দেশে যেতে হয়, তবু সেখানে গিয়ে জ্ঞানার্জন কর।" আরও বলেছেন—"খোদার সৃষ্টি সম্বন্ধে এক ঘন্টা ধ্যান ও অধ্যয়ন এক বৎসরের নমাজের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।"

এই মহাবাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুসলিম সভ্যতা—যার মূলধারা হচ্ছে স্বাধীন চিন্তা ও অবাধ অনুসন্ধিৎসা খোদার সৃষ্টিতত্ব সম্বন্ধে।

সওগাত, কার্তিক ১৩৩৪

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার ভিতরে আমি ইসলামের সর্বপ্রকার স্ফূর্তি ও উন্নতির বিস্ময়কর উৎস যে কোরান, সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে চাই না। বিজ্ঞানের কথাই প্রথমে ধরি। কোরানই সবচেয়ে বড় দান মানুষের চিন্তার ইতিহাসে। সেই কোরান ভৌতিককে ছেড়ে প্রাকৃতিককেই বেশি করে বর্ণনা করেছে—মানুষের সহজবুদ্ধি ও বিচারবুদ্ধিকেই পুনঃপুনঃ আকর্ষণ করেছে। হজরতের উপদেশগুলির মধ্যে কতকগুলি মুক্ত-চিন্তা ও মুক্ত-অনুসন্ধিৎসার ভিত্তির উপর খাড়া করে মুসলিম সভ্যতাকে বিকশিত করে তুলেছিল ; যেমন—"প্রত্যেক মুসলিম পুত্রকন্যার পক্ষে জ্ঞান অর্জন করা ফরজ (অবশ্য কর্তব্য)।" "চীনদেশেও যদি যেতে হয়, তবু তথায় গিয়ে জ্ঞান লাভ কর" "খোদার সৃষ্টি সম্বন্ধে একঘন্টা ধ্যান ও আলোচনা এক বৎসরের উপাসনার চেয়ে হিতকর।"

মানুষ যা আবিষ্কার করতে অক্ষম, তাই খোদা ইঙ্গিত করেন। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম ও ধারা মানুয অনুসন্ধান ও গবেষণা দ্বারা আবিষ্কার করতে সক্ষম এবং সে গবেষণা মানুষের

বিকাশের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। অসীম যখন সসীমের নিকট ব্যক্ত হয়, তখন তাকে সেই সসীমের ভাষায় ব্যক্ত হতে হয় ; নতুবা যে সসীম মানুষের নিকট অসীম ব্যক্ত হয়, সে মানুষ তাকে না বুঝতে পেরে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।

কোরানের মধ্যে এমন কতকগুলি বাক্য আছে, যার অর্থ বর্তমান জগতে বিজ্ঞান-সমত বলে প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু সে বাক্য তখনকার লোকের জ্ঞান-সমত হয়েছিল ; কারণ আজকার ভাষা তখনকার লোকের নিকট অবোধ্য বা দুর্বোধ্য হত। পক্ষান্তরে এমন বহু বাক্য আছে, যাতে মনে হয়, তখনকার যুগেই জ্ঞান চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল। একস্থলে আছে, "জগতে এমন কোন জীব নাই, কি পক্ষী নাই—যারা তোমাদের মতই এক এক জাতি নয়। আমরা কিছুই অবহেলা করি নাই। অবশেষে সকলই তাদের প্রভুর কাছে ফিরে যাবে।" অন্য স্থলে, "তাঁরই উদ্দেশে সকল প্রশংসা—যিনি পৃথিবীর সমস্তই স্ত্রীপুরুষ করে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক বস্তুরই বিশেষ বিশেষ জাতি আছে।"

বর্তমান জগতের সবচেয়ে আধুনিক আবিষ্কার এই যে, পৃথিবীর প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে স্ত্রীপুরুষ আছে—এমনকি প্রস্তর হতে বিদ্যুত পর্যন্ত।

আমার নিকটে সবচেয়ে দুর্জ্ঞেয় অথচ অর্থপূর্ণ বোধ হয় একটী কথা,—সেটি এই, "তোমাকে একটি অখণ্ড আত্মার মতই বিচার করা হবে।" এই আত্মা কি সমস্ত মানবজাতির আত্মা ? আমার মনে হয়, সমস্ত সৃষ্ট জীবের আত্মা। পদার্থবিজ্ঞান-চর্চা সমধিক স্ফূর্তিলাভ করেছিল প্রাথমিক মুসলিম জগতে—তার কারণ কোরানে পুনঃপুনঃ প্রাকৃতিক রহস্য উদ্ঘাটন করবার জন্য প্রেরণা দেওয়া হয়েছে। বর্তমান জগতের সকল প্রকার গবেষণা ও আবিষ্কারের প্রণালি হচ্ছে Inductive method (পর্যবেক্ষণানুগ)। কোরানের মধ্যে এই প্রণালির ইঙ্গিত আছে। তা হলে বলা যেতে পারে, বর্তমান জগতের বিজ্ঞান ও জাগতিক উন্নতির মূল কারণ হচ্ছে কোরান।

খ্রিস্ট-ধর্মীরা যখন যিশুখ্রিস্টের নামে প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল, মুসলিমগণ তখন খোদার নামে ঐ জ্ঞানগুণকে সংগ্রহ করবার জন্য তপস্যায় রত হল। খ্রিস্ট ধর্মীরা আলেকজান্দ্রিয়ায় পুস্তকাগার ধ্বংস করে ফেলল, অনেক দার্শনিককে নিহত করল। বিদ্যা তাদের নিকট শয়তানের শিকল বলে মনে হত। গ্রীক ও রোমক জ্ঞানের পাণ্ডুলিপি তাদের পুরোহিতগণ সর্বসমক্ষে অগ্নিসাৎ করে ফেলল। পশ্চিম-রোমীয়গণ বর্বরতার কবলে পতিত হল। কিন্তু পূর্ব-রোমীয় সম্রাটগণ তাঁদের পুস্তকাগার বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এবং কতকগুলি বিদ্বান ব্যক্তিকে তাঁদের প্রাসাদে আশ্রয় দিয়েছিলেন। পরকালের মালিক ছিল পুরোহিত। আমরা জানি, খলিফা আলমামুন কনসটণ্টিনোপলের খ্রিস্টধর্মী সম্রাটগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছিলেন শুধু কতকগুলি প্রাচীন পুস্তক ও জ্ঞান-বিস্তারের জন্য কতকগুলি প্রাচীন বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে। এই সমস্ত পণ্ডিত কনস্টাণ্টিনোপলের রাজপ্রাসাদে বন্দী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা যখন বাগদাদে আসলেন, তখন তাঁদের জ্ঞান ও বিদ্যা মানুষের উপকারে এসেছিল ; কারণ ঐ সমস্ত পণ্ডিত মুসলিম আলেমদের সহিত মিলে প্রাচীন গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করবার জন্য প্রবৃত্ত হলেন। এইরূপে মুসলিমগণ প্রাচীন জ্ঞানগুণ ধ্বংসের

কবল হতে উদ্ধার করে বর্তমান যুগের ভিত্তি পত্তন করেছিল। সেই ভিত্তির উপর আজ বর্তমান বুদ্ধিপ্রসূত সভ্যতা ও কালচারের সৌধ ধীরে ধীরে উঠছে।

তাঁদের রসায়নতত্ত্ব—যার চার অংশের তিন অংশ আলকেমি বা কেমিয়া—বৈজ্ঞানিকদের সূক্ষ্ম গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষায় ফল। তাঁরা পরীক্ষার পর সমস্তই হুবহু লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। তাঁদের পূর্বে এরূপ জ্ঞান প্রাচ্যে লুকিয়ে রাখা হত—আবিষ্কর্তারা তা প্রচার করতে চাইতেন না। কিন্তু মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ তাদের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ফলাফল প্রকাশ করতেন। পর্যবেক্ষণ-সূত্র অনুসারে তাঁরা বহুবার পরীক্ষিত ফলটি যাচাই করে গ্রহণ করতেন। এই প্রণালিই হচ্ছে বর্তমান রসায়নতত্ত্বের ভিত্তি এবং এই প্রণালির সাহায্যে আধুনিক নানা বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে।

তৃতীয় শতাব্দীর [আলহিজরি] একজন রাসায়নিক লিখেছেন, "গায়ের জোরের কথা বা শ্রুত তথ্যের কোন মূল্যই রসায়নশাস্ত্রে নাই। প্রমাণ যার নাই, তেমন কথার উপর ভরসা করা চলে না। প্রমাণ পেলেই সে কথা সত্য বলে গ্রাহ্য।" প্রথম নয় শতাব্দীর মধ্যে সমস্ত রাসায়নিকেরই এই মত ছিল। তাঁরা সর্বদাই প্রমাণ চাইতেন—বিনা পরীক্ষায় কোন তথ্যই তাঁরা গ্রহণ করেননি।

পদার্থ-বিজ্ঞানেও ঐ একই প্রণালি তাঁরা অবলম্বন করতেন। গবেষণা ও পরীক্ষা হাত-ধরাধরি করে চলত। তাঁরা গণিতজ্ঞ ছিলেন, জ্যামিতিতে তাঁরা পারদর্শী ছিলেন, বীজগণিতের আবিষ্কর্তা তাঁরাই। উদ্ভিদবিদ্যায় তাঁরা একেবারে আধুনিক বললে অত্যুক্তি হবে না। আরবি, পারসি ও তুর্কি শব্দকোষ তার সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বিজ্ঞান এমন করে হারিয়ে গেছে যে, এখন যদি কোন আরবিকে কোন একটি বন্য-উদ্ভিদের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে সে অবজ্ঞাভরে বলে বসবে, "ওটি এক জাতীয় ঘাস।" ঔষধে প্রযোজ্য এবং সুগন্ধি-প্রদায়ী উদ্ভিদ ব্যতীত আজ তারা অন্য কোন উদ্ভিদের নাম জানে না।

প্রকৃতি-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁরা আরিস্টটলের অনুসরণ করতেন—যেমন বর্তমান তাত্ত্বিকগণ করে থাকেন ;—কিন্তু তাঁকে তাঁরা অন্ধের মত অনুসরণ করতেন না। তাঁরা অনেক নূতন তথ্যের আবিষ্কার করে আরিস্টটলকে সংশোধন ও পরিবর্ধন করে জ্ঞানের পরিধি কিছু বাড়িয়েছিলেন। ভূতত্ত্বে তাঁরা অনেক অগ্রসর হয়েছিলেন। সে যুগে আরবিরাই সবচেয়ে বিখ্যাত বণিক, পর্যটক ও সমুদ্রবিহারী ছিলেন। পর্যটনের সমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁরা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পৃথিবীর বুকে তাঁরা যেখানে-সেখানে ঘুরেছেন, সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য, অধিবাসীর চরিত্র, পেশা, আকৃতি-প্রকৃতি, ব্যবসায়, পণ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁরা বিস্তারিত বিবরণ রেখে গেছেন। এ বিষয়টী বর্তমান যুগে এসে পৌঁছেছে ;—তাঁর কারণ, বিদ্যালয়ে এর চর্চা হত !

ডাক্তারি-শাস্ত্রে তাঁদের দান চমৎকার ! তাঁরা ধ্বংসোমুখ গ্রীক ঔষধগুলি বাঁচিয়ে ইউনানি শাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেছিলেন—তাঁদের বহু মৌলিক ও নব নব আবিষ্কার দ্বারা তাঁদের চেষ্টা ও যত্ন ব্যতীত গ্রীক-শাস্ত্র মানব-সভ্যতার ইতিহাস হতে একেবারে বিলুপ্ত হত।

মুসলিম কবিরাজগণই সর্বপ্রথম বায়ু ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুণাবলী বিবৃত করেন। তাঁরাই সর্বপ্রথম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে রোগীকে ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্ডে আলগা করে রাখবার ব্যবস্থা করেন। সেখানে বিশুদ্ধ মুক্ত বায়ু ও পরিচ্ছন্নতা চিকিৎসার অঙ্গ ছিল। রোগীর শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যই ছিল চিকিৎসকদের প্রথম উদ্দেশ্য।

পরবর্তী যুগে—অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে তুর্কিরাই ইউরোপকে জলবায়ু পরিবর্তন ও নির্ঝরের জলের উপকারিতা শিক্ষা দিয়েছিল। তুর্কিদের মারফতেই ইউরোপ অষ্টাদশ শতাবদীতে বীজ প্রবেশ করিয়ে অভ্যন্তরীণ রোগের বীজ নষ্ট করবার প্রণালি শিক্ষা করেছিল। বহু আবশ্যক বস্তুর মধ্যে এই টিকা দেওয়ার জ্ঞানও অন্যতম ছিল—সেগুলি এনেছিলেন স্টুয়ার্ট ওয়ার্ট মনটেগু। তাঁর স্ত্রী মেরির পত্রে এর খবর পাওয়া যায় ; তাতে স্পষ্টই তুর্কির বর্বরতা যে অলীক, তা প্রমাণিত হয়।

তাঁদের খ-তত্ত্বের তিন অংশ জ্যোতির্বিদ্যা। তাহলেও তাঁরা আকাশের জ্ঞান নানাপ্রকার যন্ত্রের সাহায্যলাভ করেছিলেন এবং তাঁদের পর্যবেক্ষণ খুব সূক্ষ্ম ও নির্ভুল ছিল। আকাশ-পর্যবেক্ষণের জন্য যে সমস্ত আগার ছিল, তার মধ্যে স্পেনের ও সমরকন্দের আগারগুলি খুব প্রসিদ্ধ ও সুবৃহৎ।

খ-তাত্ত্বিকগণ তাঁদের পর্যবেক্ষণের-ফলগুলি পর্যটক, ভূতাত্ত্বিক ও গণিতজ্ঞগণের অভিজ্ঞতার দ্বারা ঝালিয়ে নিতেন। এই তিন শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকদের সমিলিত পর্যবেক্ষণের ফলে স্পেনের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘূর্ণমান গ্লোব দ্বারা ভূতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল; —ঠিক সেই সময় পণ্ডিত ব্রুনো অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন—'পৃথিবী ঘুরছে' এই মত প্রচার করেছিলেন বলে। ব্রুনোর পরেও গ্যালেলিওকে নির্যাতনের ফলে'পৃথিবী নিশ্চল' বাইবেলের এই উক্তির সমর্থন করতে হয়েছিল এক প্রতিজ্ঞা-পত্রে তাঁর নাম স্বাক্ষর দ্বারা—যদিও স্বাক্ষর দান কালে তিনি গিড়মিড় করতে করতে বলেছিলেন, "এই যে, তবুও পৃথিবী এখনও ঘুরছে !" স্পেনের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হতেই কলম্বস জানতে পেরেছিলেন যে, পৃথিবী ঘুরছে ও পৃথিবী গোলাকার—যদিও তাঁকেও পরে নির্যাতিত হয়ে তা অস্বীকার করতে হয়েছিল। খলিফা তৃতীয় আবদুর রহমান ও আল-মামুনের সময় এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু খ্রিস্ট-ধর্মী ও য়িহুদি ছাত্র মুসলিমদের সহিত সমানভাবে সমাদর ও যত্নলাভ করে, এমনকি রাজকোষের অর্থে বিনা-ব্যয়ে বিদ্যালাভ করতে আহূত হত। ইউরোপ ও প্রাচ্য হতে বহু ছাত্র এই সুযোগ নিয়ে খ্রিস্টান পাদ্রির কবল হতে উদ্ধার লাভ করেছিলেন। তাদেরই মারফতে ইউরোপে নববিজ্ঞান ও নব-দর্শনের বীজ উপ্ত হয়েছিল—যে বীজ বর্তমান সময়ে অঙ্কুরিত হয়ে বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। এতেই বোঝা যায়, আধুনিক ইউরোপ ইসলামের নিকট কত ঋণী ! জ্ঞানদীপ্ত বর্তমান ইউরোপ খ্রিস্টান-গির্জার নিকট কিছুই লাভ করেনি। গির্জা পণ্ডিতগণকে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও অগ্নিদগ্ধ করেছিল।

এখন কলার কথা বলা যাক।

চিত্রবিদ্যা ও স্থাপত্যনৈপুণ্য প্রাণী ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় সৃষ্টিকে অবলম্বন করতে পারত। প্রকৃতপক্ষে কোরান ও হাদিসের মধ্যে এমন কোন উক্তি নাই, যাতে প্রাণী-চিত্র নিষিদ্ধ হয়েছে বলে বুঝা যায়। হজরত মাত্র একজন পারসি চিত্রকরকে তার স্বীয় চেহারা আঁকতে নিষেধ করেছিলেন—এই ভয়ে, পাছে পারসিরা সেই চিত্রের উপাসক হয়ে পড়ে। তবু পারসিদের মধ্যে পারসিচিত্রের ছড়াছড়ি ছিল। পৌত্তলিকতাকে দূরীভূত করবার উদ্দেশ্যেই সঙ্গীত ও অভিনয়কে নিম্নস্তরের কলা বলে ধরা হয়েছিল। তাহলেও জনসাধারণ সঙ্গীত ত্যাগ করে নাই। সঙ্গীত ভোজের অঙ্গ বলে প্রচলিত ছিল—কখনও কলাশ্রেণীভুক্ত ছিল না।

মুয়াজজিনগণই (নমাজে আহ্বানকারী) একমাত্র গায়ক বলে অভিহিত হত। এরা খুব সমাদৃত হত এবং মজলিসে আহুত হত উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত আলাপ করবার জন্য। তাদের পুরস্কারও খুব মোটা রকমের ছিল। মুসলিম জগতের সর্বত্র সঙ্গীত প্রচলিত ছিল—গায়কগণ আনন্দের ভাণ্ডারী বলে পরিচিত ছিল।

অভিনয়-সম্পর্কে মুসলিমগণ অপ্রকৃত চেষ্টারা অনুকরণ করবার পক্ষপাতী ছিলেন না। সেটাতে মুসলিম নরনারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হত। গ্রীক ও আরমেনিয়ানদের হাতে এই অভিনয় ছিল। এরা ঘুরে ঘুরে নানা বিষয় নিয়ে অভিনয় করত। সমাজের বুদ্ধিমান মাত্রই এতে যোগ দিয়ে চিত্তবিনোদন করতে পারত। ওমর খইয়ামের রুবাইরাতে এই ছায়া-অভিনয়ের উল্লেখ আছে!

খইয়াম শব্দের অর্থ 'তাবু-নির্মাতা'। এই শব্দ হতে আমরা মুসলিম ইতিহাসে আর একটী কলা-বিদ্যার ইঙ্গিত পাই। তাঁবুর অভ্যন্তরীণ অংশের উপর নানাপ্রকার লতাপাতার সূক্ষ্ম সুঁচি-কার্য নানা বর্ণে রঞ্জিত করবার কৌশল খুব সুন্দর বিকশিত হয়ে উঠেছিল। সেন্টপল একজন তাঁবু-চিত্রকর ছিলেন। তাঁবু-শিল্পিগণ যে শুধু ব্যবসায়ী ছিল তা নয়, তারা নিপুণ ও মার্জিতরুচি শিল্পী ছিল। আমি নিজে বহু ছায়া-অভিনয় দেখেছি—যখন আমি এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও মিসরে ছিলাম। এই অভিনয় এখন নিম্নস্তরের জনসাধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। তবু তার মধ্যে বাস্তব বুদ্ধি ও নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এ খুব আমোদজনক ও আনন্দকরও বটে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই আমরা মুসলিম জগতে যথার্থ অভিনয়ের প্রথম সূত্রপাত দেখতে পাই। তখন পারস্য ও তুরস্কে মুসলিম কর্তৃক কতগুলি সুন্দর নাটক লিখিত হয়েছিল, কিন্তু কখনও মুসলিম কর্তৃক অভিনীত হয়নি। সেগুলি আরনেনিয়াম ও য়িহুদি কর্তৃক অভিনীত হত!। কতকগুলি রোমাঞ্চকর নাটক—যা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে—লিখিত হয়েছিল দামেশক-নিবাসী জনৈক শেখ কর্তৃক মুসলিম জীবন ও ইতিহাস অবলম্বনে। তাঁর "সালাহদ্দিন-উল আইয়ুবি" একখানি ঐতিহাসিক নাটক এবং "আকিকাহ"-একখানি ক্ষুদ্র কাব্য-নাটিকা।

বর্তমান পাশ্চাত্য-সভ্যতায় অভিনেতার যে স্থান, মুসলিম সভ্যতায় গল্পীদের সেই স্থান ছিল। এরাই দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট ঘটনা অবলম্বন করে সুন্দর-আশ্চর্যজনক গল্প রচনা করত। গল্পগুলি বাস্তবিক জীবন্ত ও আমোদজনক হত। এই গল্প-রচনা কলার

অঙ্গীভূত ছিল না, কিংবা প্রাচ্যে এটী সাহিত্যের মধ্যে স্থান পেত না। রাত্রির আনন্দের জন্য এই গল্প আবৃত্তি করার প্রথাও জনসাধারণের জীবনে লেগে ছিল। "মাকামাহ" ও "সামার" এই দুইটী শব্দ হতে এই প্রথার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। উভয় শব্দের অর্থ হচ্ছে আনন্দ-বর্ধনকল্পে রাত্রি-জাগরণ। 'মাকামাহ' অর্থে রাজ-প্রাসাদ বা ধনী-গৃহে রাত্রি-জাগরণ ও 'সামার' অর্থে দোকানে বা রাস্তার পার্শ্বে রাত্রি-জাগরণ বুঝায়। এ প্রথা এখনও দামেশক ও কাইরোতে প্রচলিত আছে। আলহারিরি তাঁর "মাকামাহ" লিখেছেন আবুজায়েদ আল-হাজ্ জাজির গল্পচক্রের আদর্শ হতে। আরব্য উপন্যাসকে এই গল্পের খনি বলা যেতে পারে এবং পাশ্চাত্য এর সাহিত্যিক কদর স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

উলফ্রিড ব্লাণ্ট 'ঘোড়া চুরি' নাম দিয়ে আবু জায়েদের গল্পচক্রের কিয়দংশ অনুবাদ করেছেন। কিন্তু এ ছাড়া আরও বহু গল্পচক্র আছে, যার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রাকঐসলামিক যুগের কবি আনতারের গল্প-খনি আরবিতে মুদ্রিত হয়েছে? আনতারের উপন্যাস সাহিত্যে এক অপূর্ব সৃষ্টি।

স্থাপত্য-শিল্পে মুসলিমের কীর্তি অমর ও অনুপম ! কর্ডোভার মসজিদ হতে সমরকন্দের বাগিচা পর্যন্ত, আল-হামরা হতে তাজমহল পর্যন্ত, দানিয়ুব নদের এপার পেসতের উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত সেই ছোট দরবেশের কবর হতে কাইরোজান ও কাইরোর গুম্বজ ও জেরুজালেমের পর্বত-গুম্বজ পর্যন্ত—যাকে জনৈক জার্মাণ-পর্যটক জগতের বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিস্তম্ভ বলেছেন—আমরা বিচিত্র স্থাপত্য-নৈপুণ্যের নমুনা দেখতে পাই। মুসলিম জগতের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের স্থাপত্য-আদর্শ দেখতে পাওয়া যায়। সমস্তই ইসলামের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। মুসলিম জগতের মসজিদ, রাজপ্রাসাদ, দুর্গ, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, প্রমোদভবন এবং সর্বোপরি বাগিচা সর্বজাতির নয়নরঞ্জক প্রশংসার্হ। মুসলিম-স্থাপত্যের এ সমস্ত দৃষ্টান্ত হতে বুঝা যায়, মুসলিমগণ তাদের বেহেশতের বর্ণনা-অনুসারে মর্ত্যে তার প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে সৌন্দর্যের উপাসকের জন্য এক নয়নলোভা স্বর্গ রচনা করেছিল !

মুসলিমগণ সোন্দর্যের উপাসক ছিল। প্রাণীচিত্র আঁকতে নিষিদ্ধ হওয়ায় তারা প্রকৃতির রূপ ও রং-এর উপর বেশি দৃষ্টি দিয়েছিল। সেজন্য মসজিদ ও প্রাসাদের উপর তারা সেই প্রকৃতির অবিকল প্রতিচ্ছবি ফলিয়ে তুলতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। তাই দেখতে পাওয়া যায়, মুসলিম যে দেশে বাস করেছে, তার স্থাপত্যর নমুনাও সেই দেশের প্রকৃতির অনুরূপ হয়েছে। পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যকে তারা তাদের হাতের তুলিতে ফলিয়ে তুলতেই চেষ্টা করেছিল। পর্বত ও সমুদ্র-বেষ্টিত স্পেনের প্রাসাদগুলির গম্বুজে পর্বত ও সমুদ্রের গাম্ভীর্য ফুটে উঠেছে ! ছায়ার শীতলতা, সূর্য-কিরণের বিচিত্র বর্ণ, শক্তি ও জাঁকজমক সৌন্দর্য ও কমনীয়তার সঙ্গে মিশে এক অপরূপ সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে ! মুসলিম-স্থাপত্যের এই সমস্ত নমুনা জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আরবিয় খলিফা বা তুর্কি সুলতান অথবা মুগল বাদশাহদের মত আজ পর্যন্ত কখনও জগতের তেমন উদারচিত্ত স্থাপত্যের পূজারী, বাগিচার স্রষ্টা ও সৌন্দর্য-রচয়িতা জন্মগ্রহণ করে নাই। তাজমহলের কথা কে না জানে? কিন্তু সৌভলির রাজা মোতামিদের কথা খুব কম লোকই জানেন,—বিশেষত তিনি তাঁর প্রিয়তমা

স্ত্রীর আনন্দের জন্য যা করেছিলেন, সে সম্বন্ধে অনেকেই অজ্ঞ। তাঁর স্ত্রী ইত্তিমাদ একদিন ভ্রমণকালে পর্বতোপরি শুভ্র-তুষারপাতকে অত্যন্ত পসন্দ করেছিলেন। মোতামিদ তজ্জন্য কর্ডোভার বুকে একটী পর্বত রচনা করে তার শিরে বাদাম গাছ রোপণ করেছিলেন ;—যেহেতু বসন্তের সময় বাদামের শুভ্র ফুল ফুটলে দূর হতে মনে হবে, তুষারপাত হচ্ছে। যিনি একবার তুর্কি ও পারসি বাগিচাগুলির সৌন্দর্য দেখেছেন, তিনি কখনও তার স্মৃতি মুছে ফেলতে পারবেন না। বাগিচা-রচনা আমি স্থাপত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চাই ; কারণ প্রাচীন গ্রীক-বাগিচার মত মুসলিম-বাগিচা স্থাপত্যের আদর্শে রচিত হত।

লিপি-সৌন্দর্য মুসলিম জগতের আর একটী গৌরবের বস্তু। হাতের লেখা বিচিত্র নৈপুণ্যের সহিত অলঙ্কৃত হত। চিত্রবিদ্যার স্বাধীনতা কিঞ্চিত ক্ষুণ্ণ হয়েছিল প্রাণীচিত্র নিষিদ্ধ হওয়ায়,—কিন্তু এই ক্ষতি লিপি-সৌন্দর্যে পূরণ করেছিল। তা ছাড়া, অট্টালিকার ছাদ, দেওয়াল প্রভৃতি নানাপ্রকার লতাপাতার চিত্রে বিভূষিত হত। এটাই মুসলিম স্থাপত্যের বিশেষত্ব।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে কাব্যই একমাত্র সাহিত্য ছিল। পৌত্তলিক আরবিয়গণ কাব্যে অসাধারণ খ্যাতিলাভ করেছিল এবং বহু প্রাচীনতত্ত্ববিদ "সপ্তসঙ্গীতে"র জন্য তামসযুগের কতিপয় কবিকে মুসলিম ইতিহাসের শত শত কবির উপর আসন দিতে চান। এই হল ঐ সমস্ত লোকের মত—যাঁরা বর্তমান যুগের যান্ত্রিক সঙ্গীতের সুরের চেয়ে প্রাচীন মেষপালকের বাঁশীর সুরকে বেশি পছন্দ করেন। আমিও সেইদলের একজন। তামস-যুগের কাব্যের কয়েকটী দৃষ্টান্ত এমন করুণ সুর ঝঙ্কৃত হচ্ছে যে তাতে আমি বিভোর হয়ে পড়ি। কিন্তু কালচার ও গভীরতার দিক থেকে বোধ হয় কবি আনতার বা ইমরুল কিয়াসের কাব্যের সঙ্গে মুতানাবি বা অন্যান্য মুসলিম কবির কাব্যের তুলনা হতে পারে না। কবিতা দেবতাদের দান নয় ; ইহা সমস্ত প্রখরবুদ্ধি মানবের আনন্দ ও উপভোগের বস্তু। আরবি, পারসি ও তুর্কি কবির নাম করতে গেলেই কতকগুলি পুস্তক লেখা হয়ে যায়।

এই প্রবন্ধে প্রাচীন লাটিন ও গ্রীক সাহিত্যিকদের লেখনী-প্রসূত গ্রন্থ—যা আরবিয়গণ অনুবাদ করেছিল—সে সম্বন্ধে কিছুই বলব না ; কারণ যদিও সেই অনুবাদের জন্যই প্রাচীন জ্ঞান-সাধনার ফল আমরা সহস্র বৎসরের পরেও উপভোগ করতে পারছি—আমরা তাকে মুসলিম জগতের সৃষ্টি বলতে পারি না। নীতিশাস্ত্রের গ্রন্থ অসংখ্য। অলঙ্কার ও তর্কশাস্ত্র নিয়ে বহু গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। এগুলি আজ একরূপ অকেজো হয়ে উঠেছে। তবে আরবি দর্শন সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল ; তার মধ্যে বিশেষত আলগাজালীর গ্রন্থগুলি এখনও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

ইতিহাস-চর্চাও মুসলিম জগতে বহুল পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। সাধারণ আরবি ইতিহাস বর্তমান ইউরোপীয় ইতিহাসের মত তারিখ ও যুদ্ধের বর্ণনায় পূর্ণ। কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের ইতিহাসও আছে—যাতে ঘটনার বৈচিত্র্য, মানব-প্রকৃতির জটিল ভঙ্গিমতা ও সমসাময়িক আচার-অনুষ্ঠানের সূক্ষ্ম বিবরণ স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে। আরবি ঐতিহাসিকের মধ্যে আমি গল্পী-ঐতিহাসিক "উমারা", "কিতাবুল ফখরি", "ইবনুল আথির", এবং ইবন খলদুনের রচনায় অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। বিশেষত ইবন খলদুনের ইতিহাস-রচনা এত আধুনিক যে, তা

পড়তে পড়তে তিনি যে এত যুগ পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এমন ধারণা করা অত্যন্ত শক্ত। সেইরূপ আমি আহমদ আল জাবারতির রচনাও ভুলতে পারি না। এঁরা ইউরোপীয়দের মতে জাগতিক ঐতিহাসিক বলে পরিচিত। এছাড়া, আরও বহু ঐতিহাসিক আছেন, যাঁরা কেবলমাত্র ইসলামের ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে আমি ইসমাঈল আবুল ফিদাকে বেশি পছন্দ করি। জেরুজালেম অর্থাৎ "বায়তুল মকদ্দসে"র ইতিহাস-রচয়িতা মজরুদ্দিনকেও আমি বিশেষ আদর করি—তাঁর রোমাঞ্চকর বর্ণনার জন্য।

পর্যটন-কাহিনীও নিতান্ত কম নয়। ইবন-বতুতার পর্যটন-কাহিনী জগদ্বিখ্যাত।

এখন আমি এমন একশ্রেণীর সাহিত্য সম্বন্ধে বলতে চাই, যার নমুনা বা তুলনা মুসলিম জগতের বাহিরে একেবারেই নাই। সেটা হল হজরতের বাণী ও তাঁর টিকা। এই বাণীর সত্যতা রক্ষার জন্য কি বিপুল পরিশ্রম ও অসাধারণ যত্ন করা হয়েছে! প্রাথমিক যুগের সংগ্রাহকদের চেষ্টা পরীক্ষিত হয়েছে। যদি কোন বাণীর সংগ্রাহকদের চরিত্র বা চেষ্টা সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ হত তখনই সে বাণী দুর্বল ও বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে পরিত্যক্ত হয়েছে। এইরূপে ছয়খানি সংগৃহীত বাণী-পুস্তক মুসলিম জগতে সত্য ও যথার্থ বলে পরিচিত—তার মধ্যে সহি বোখারি ও সহি মুসলিম প্রসিদ্ধ।

মুসলিম সাহিত্যের একটা প্রকাণ্ড অংশ হচ্ছে ফিকাহ অর্থাৎ মুসলিম ব্যবহার-শাস্ত্র। এতে কি রাষ্ট্র, কি সমাজ, কি দৈনন্দিন জীবন—প্রত্যেকটা নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য যে বিশেষ বিশেষ আইন রচিত হয়েছিল, তারই টিকাটিপ্পনী বিদ্যমান। এতে ইবাদত (উপাসনা) হতে আরম্ভ করে মানুষের সর্বপ্রকার ব্যবহারের নিয়ম লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই ব্যবহার-শাস্ত্র ধর্ম-পুরোহিতের গোঁড়ামির ফল—যে গোঁড়ামির ফলে মুসলিম অনুষ্ঠানের পতন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। এই শাস্ত্রকারদের উদ্দেশ্য ছিল—ইহজগতের জ্ঞানালোককে ত্যাগ করে কোরানের মৌলিকতা, অপরিবর্তনীয়তা ও অন্য শাস্ত্রের অনাবশ্যাকতা সপ্রমাণ করা। এতে তাঁরা অক্ষরকেই সার করে অর্থকে উপেক্ষা করেছিলেন। এতে এমন সমস্ত বস্তু আছে, যা আধুনিক মনের নিকট নিতান্ত সামান্য ও অনর্থক। তাহলেও এ ত্যাগ করা যেতে পারে না-অবজ্ঞা করা ত দূরের কথা।

আরবি ব্যাকরণও মুসলিম জগতে বিজ্ঞানের এক অঙ্গ বলে পরিচিত। আরবি ব্যাকরণের তুলনায় ইউরোপীয়—বিশেষত ইংরেজদের কোন ব্যাকরণ নাই বলতে হবে।

মুসলিম সাহিত্যের আর একটা অনুপম অথচ বিপুল অঙ্গ হচ্ছে খোদাপ্রাপ্তি-তত্ত্ব—যাকে তাসাউফ বলা হয়, যার সাহায্যে সাধকগণ খোদা-সান্নিধ্য লাভ করতে তপস্যা করেন। আধুনিক দার্শনিকেরা খোদার অস্তিত্ব নিয়ে তর্ক করেন, কিন্তু মুসলিমের নিকট সে তর্কের কোন অর্থ নাই; কারণ খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস যে শুধু বিশ্বাস মাত্র তা নয়, ইহা মুসলিমের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল। সুফিগণ ঐ অভিজ্ঞতার যথার্থস্বরূপ এরূপ সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করেছেন—যা আধুনিক মনস্তত্ত্ব-অনুশীলন-সমিতির সমুদয় প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ। আধুনিক পাশ্চাত্য জগত পরলোকের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে ; এসময়

মুসলিম তাসায়ুফ-চর্চা বিশেষ কার্যকর হবে। মুসলিম দর্শনের শ্রেষ্ঠ অংশ, গভীরতম চিন্তা ও মনোরম কাব্য এই শ্রেণীর সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এই তাসায়ুফ-চর্চা আবার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। তুর্কি ও আরবি সুফিদের সঙ্গে পারসি সুফিদের পার্থক্য ঢের। পারসি সুফিরা একটু অসংযত ও ভাবের-প্রাচুর্যে উধাও হতে চান ;—তাঁদের ভাবের মধ্যে শৃঙ্খলা ও ছন্দের সংযম নাই। আরবি সুফিরা পক্ষান্তরে সংযম ও ভাবের শৃঙ্খলাসাধনে তৎপর। পারসি সুফিরা মুসলিমকে অনেকখানি বিপথগামী করেছেন। তাঁরা সত্যের চেয়ে তন্ময়তাকে বেশি কদর করেন—কিন্তু আরবি-তুর্কি সুফিরা তন্ময়তার চেয়ে সত্যকে বেশি মূল্যবান মনে করে তারই জন্য প্রাণপণ করেন। সত্যকার সুফিবাদ ইসলামের অক্ষর-পূজাকে ডিঙ্গিয়ে প্রকৃত সারকে সার্থক করে তুলে। মুসলিম জগত যখন অক্ষর নিয়ে মুসলমান হয়েছিল, তখন সুফিরাই ইসলামের সার বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। আমি সকলকে এই সত্যকারের সুফিবাদ চর্চা করতে অনুরোধ করি।

মুসলিম কলা ও সাহিত্য মধ্যযুগের অন্ধকারেও জীবন্ত ছিল ; কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান-চর্চা দুইশত বৎসর অবধি মুসলিম জগত হতে উঠে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে মুসলিম সাহিত্য আবার বেঁচে উঠছে। মুদ্রাযন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে তুরস্ক, সিরিয়া ও মিসরে সাহিত্য-চর্চা খুব প্রবলবেগে চলছে। মিসর ও সিরিয়াতে ফিকাহ ও তাসায়ুফ হতে ইতিহাস প্রভৃতির চর্চা আরম্ভ হয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের সাহিত্য অনুদিত হচ্ছে। ভারতবর্ষে ফিকাহর জটিল প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ আলোচনা শুরু হয়েছে। হাইদ্রাবাদে মুসলিম জগতের চতুর্থ ভাষা উর্দুর ভিতর দিয়ে এক নবযুগের সূত্রপাত হয়েছে। জগতের সর্বত্র ইসলামের নবজীবনের সঞ্চার হয়েছে। এতে আশা হয়, অচিরে ইসলাম আবার জগতে একটী গৌরবময় স্থান অধিকার করে তার মূল উদ্দেশ্য সফল ও সার্থক করবে।

সওগাত, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

ঔদার্য ও প্রেম

মনুষ্যত্বের চরম বিকাশের একটী স্বরূপ হচ্ছে ঔদার্য ও প্রেম। যে জাতি যত উদার ও প্রেমপ্রবণ, সে জাতি তত উন্নত ও মনুষ্যত্বের অধিকারী। পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক ও ধর্মযাজকগণ ইসলামকে অনুদার বলে নিন্দা করে থাকেন। এ কথা তাঁরা বলে থাকেন খ্রিস্টানদের বর্বতার ইতিহাসকে ঢাকবার জন্য। সকলেই জানেন—খ্রিস্টানরা স্পেন, সিসিলি ও আপুলিয়ার একটী মুসলিমকেও প্রাণে বাঁচতে দেয়নি। ১৮২১ সালের বিদ্রোহের পর গ্রীসে একটী মুসলিমও বেঁচে ছিল না এবং একটি মসজিদও খাড়া ছিল না। বলকান ভূভাগের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান ছিল, কিন্তু বলকান-যুদ্ধের পর হতে সমস্ত ইউরোপের রাজশক্তির সমতি ও ষড়যন্ত্রের ফলে মুসলিমের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমানেও

মুসলিম শাসনাধীন খ্রিস্টানসম্প্রদায় মুসলিমকে নিহত ও বিতাড়িত করবার জন্য প্ররোচিত হয়েছে এবং তার উত্তর দিতে যখন মুসলিমগণ তৈরি হয়েছে, তখনই খ্রিস্টান-পরিচালিত সংবাদপত্রে তাদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অমূলক ও অলীক নৃশংস ব্যবহারের সংবাদ রটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ কথাও ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করেছে যে, মধ্যযুগের ইউরোপে য়িহুদিরা নিতান্ত নির্দয়ভাবে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়েছিল। স্পেন হতে মুরদের বহিষ্কৃত করে দেওয়ার পর য়িহুদিরাও খ্রিস্টান-নৃশংসতার করলে পড়ে নাজেহাল হয়েছিল। এই সেদিনও জারের রুশিয়ায় ও পোলাণ্ডে য়িহুদিরা যথেষ্ট নির্যাতিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, মুসলিম সাম্রাজ্যে খ্রিস্টান ও য়িহুদি সমানভাবে সম্পূর্ণ মানসিক স্বাধীনতা ও অভ্যন্তরীণ সর্ববিষয়ে স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করে জীবনযাপন করতে পেরেছিল।

উমীয় খলিফার অধীনস্থ স্পেনে এবং আবাসীয় খলিফাদের অধীনস্থ বাগদাদে খ্রিস্টান ও য়িহুদি মুসলিমদের সহিত সমভাবে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ-অধিকার পেয়েছিল; শুধু অধিকার নয়—রাজকোষের অর্থে তারা হোস্টেলে বিনা-খরচে বাস ও আহার করতে পারত। স্পেন হতে মুরগণ বহিষ্কৃত হওয়ার পর খ্রিস্টান বিজেতাগণ য়িহুদিদের উপর লোমহর্ষক অত্যাচার আরম্ভ করেছিল। যাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল, তারা পালিয়ে মরোক্কো ও তুরস্কে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তুরস্কে এখনও ঐ পলাতক য়িহুদিদের বংশধরগণ ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করছে। তারা এখনও প্রাচীন ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্পেনীয় ভাষায় কথাবার্তা বলে। মুসলিম সাম্রাজ্য খ্রিস্টান-নির্যাতন পীড়িত পলাতকদের আশ্রয়স্থল হয়েছিল। যদিও তারা মুসলিমদের সমকক্ষ ছিল না, তবু তাদের অবস্থা তৎকালীন ইউরোপের পণ্ডিতমণ্ডলীর অবস্থার চেয়েও ঢের ভাল ছিল। পশ্চিম সাম্রাজ্যের খ্রিস্টানগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত মুসলিমদের ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই জানত না, বা জানতে ইচ্ছাই করত না। খ্রিস্টান গির্জা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। অবশেষে এমন হল, পূর্ব সাম্রাজ্যের খ্রিস্টানগণ মুসলিম শাসনকে বরণ করতে ইচ্ছুক হল ;—কারণ তারা মুসলিম সাম্রাজ্যে নির্বিবাদে তাদের ধর্মচর্চা করতে পারত, কিন্তু খ্রিস্টান রাজাদের অধীনে তা পারত না। তাদের ক্যাথলিক করবার জন্য উৎপীড়ন করা হত। পশ্চিম সাম্রাজ্যের খ্রিস্টানগণ মুসলিমকে পৌত্তলিক বলে নিন্দা করত ; হজরত মুহম্মদকে-তার পুত্তলি বলে অবজ্ঞা করত। কিন্তু মুসলিমগণ খ্রিস্টানদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানত। সে সময় ইউরোপ যদি ইসলাম সম্বন্ধে মুসলিমগণ খ্রিস্টানধর্ম সম্বন্ধে যতটুকু জানত ততটুকুও জানত, তা হলে ক্রুজেডের নৃশংস রক্তবিপ্লব সংঘটিত হতে পারত না। খ্রিস্টান কবিগণ ইসলামকে পৌত্তলিক বলে নানাপ্রকার অসঙ্গত গল্প ও কবিতা লিখেছিলেন।

দ্বিতীয় চার্লস-এর রাজাত্বকাল জনৈক যুবতী কোয়েকারদের মত গ্রহণ করেছিলেন বলে নিষ্ঠুর নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। তৎকালীন গির্জার প্রথার বিরুদ্ধে তিনি কিছু মত প্রকাশ করেছিলেন বলে ইংলন্ডে দুবার তাকে বেত্রাঘাত খেতে হয়েছিল। তিনি আরও দুইজন কোয়েকারকে সঙ্গে করে আমেরিকার নিউ ইংলন্ডে তাঁর মত প্রচার করতে গিয়েছিলেন। তাঁদের তিনজনকেই কারাবদ্ধ করা হয়েছিল এবং অকথ্য নির্যাতনের পর তাঁরা কারামুক্ত

হয়েছিলেন। যুবতী ইংলন্ডে ফিরে আরও পাঁচজনকে সঙ্গে করে তুরস্কের সুলতানকে তাঁর মতে আনবার জন্য যাত্রা করলেন। ইউরোপের ভিতর দিয়ে চলতে গিয়ে নির্যাতনকারী পাদ্রিদের হাতে তাঁরা পড়েন। তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে মাত্র একজনের সংবাদ পরে পাওয়া গিয়াছিল। বহু বৎসর পর তিনি উম্মাদগ্রস্ত হয়ে ইংলন্ডে ফিরেছিলেন। যুবতী তার বিশেষ সাবধানতার ফলে পাদ্রিদের চক্ষু এড়িয়ে একাকী তুরস্ক অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তিনি যে-জাহাজে উঠলেন এবং মরিয়াতে অবতরণ করেন, সেখান থেকে তিনি পদব্রজে আদ্রিয়ানোপলে পৌছলেন। তাঁর পদব্রজে যাওয়ার দরকার ছিল না—কারণ মুসলিম সাম্রাজ্যে পদার্পণ করার পর হতেই তাঁর নির্যাতন শেষ হয়েছিল। সর্বত্রই তিনি অতিথির সমাদর ও আতিথ্য লাভ করেছিলেন ; রাজকর্মচারীরাও তাঁকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। অবশেষে তিনি আদ্রিয়ানোপলে পৌছে শুনলেন, সুলতান বায়েজিদ সেখানে অবস্থান করছেন। তিনি সম্রাটের সহিত সাক্ষাত করবার প্রার্থনা জানালেন। প্রার্থনা অবিলম্বে মঞ্জুর হয়ে গেল। সুলতান যথোচিত সমানের সহিত তাঁকে দূতের ন্যায় উচ্চাসনে স্থান দিলেন। খুব শিষ্টতার সহিত তিনি সপারিষদ তাঁর সমুদয় কথা শুনলেন। তাঁর কথা শেষ হলে তিনি নম্রতার সহিত উত্তর করলেন, "আপনি যা বললেন, তা আমরাও বিশ্বাস করি।" সুলতান তাঁকে তাঁর রাজ্যে বাস করতে অনুরোধ করলেন, এবং দেশে ফিরতে চাইলে তাঁর সহিত উপযুক্ত সঙ্গী দিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি কিছুই গ্রহণ করতে স্বীকৃত না হয়ে একাকীই পুনরায় দেশে ফিরে গেলেন। কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত তিনি নির্বিঘ্নে পৌছে সেখানে জাহাজে আরোহণ করে ইংলন্ডে গেলেন।

পাশ্চাত্য জাতি ধর্মচ্যুৎ হয়েই উদার হয়েছে, আর মুসলিম ধর্মচ্যুৎ হয়েই অনুদার হয়েছে। এতেই বুঝা যাচ্ছে, পার্থক্য ধর্মে শুধু, ব্যবহারে নয়। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ঔদার্য কখনও ধর্মের অঙ্গ বলে প্রচারিত হয়নি।

মুসলিমের নিকট য়িহুদি ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম ও ইসলাম এই তিনটা একই ধর্মের তিনটা বিভিন্ন রূপ। এই তিন-এর মূলভিত্তি হচ্ছে হজরত ইব্রাহিমের ধর্মমত—খোদার ইচ্ছার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। য়িহুদিরা খোদার অনুগ্রহকে তাদের জাতির জন্য একচেটিয়া বলে মনে করত। তদ্রূপ খ্রিস্টানগণও মনে করত, খোদার করুণা খ্রিস্টান-জাতির জন্য। ইসলামে খোদার রাজ্যের প্রকৃত স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে। কোরানে আছে, "নিশ্চয়ই, যারা বিশ্বাসী—যারা য়িহুদি ধর্ম পালন করে—আর খ্রিস্টান, সাবিয়ান আর যারা আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করে, আর তাঁর শেষ বিচার-দিনের প্রতি একিন করে এবং সুকাজ করে, তাদের পুরস্কার প্রভুর নিকট সঞ্চিত থাকে ; তাদের আর ভয় নাই, আর তাদের কোন দুঃখভোগ করতে হবে না।

"যিনি তাঁর ইচ্ছাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন, নিশ্চয়ই তাঁর পুরস্কার খোদার দরবারে সঞ্চিত থাকে। তাঁকে আর কোন ভয় করতে হবে না—কোন দুঃখও তার সইতে হবে না।"

আবার, "য়িহুদি বা খ্রিস্টান হও—তুমি বিপথগামী হবে না। আমাদের ধর্ম ইব্রাহিমের ধর্ম—যিনি সত্যপরায়ণ ও একেশ্বরবাদী ছিলেন। আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি ; আর

বিশ্বাস করি ঐ ধর্ম, যা নাজেল হয়েছিল হজরত মুসার কাছে— হজরত ইসার কাছে—এবং ইব্রাহিম, ইসমাইল ও ইউসুফ ও অন্যান্য পয়গম্বরের কাছে। আমরা পয়গম্বরগণের মধ্যে ইতর-বিশেষ করি না। কারণ আমরা তাঁর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছি।"

"এই সত্যে যারা বিশ্বাসী, খোদা তাহাদিগকে বিপথগামী করবেন না। খোদা সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী।"

"হে আল্লাহ! সর্বংসহ ও সদাজাগ্রত! খোদা ব্যতীত আর কেহই উপাসনাযোগ্য নয়। পৃথিবী-আকাশের সর্বসৃষ্টির স্রষ্টা তিনি—কিছুই তাঁর অবিদিত নাই—তিনি অসীম অনন্ত। ধর্মে জোর-জবরদস্তি চলে না ইত্যাদি"।

আজকাল মুসলমান অন্য ধর্মাবলম্বীকে "কাফির" বলে অনুদারতার পরিচয় দিয়ে থাকে। কোরানেও "কাফির" শব্দের উল্লেখ থাকায় ইসলাম-বিদ্বেষীরা মুসলমানকে অনুদার বলে নিন্দা করে থাকে। কিন্তু "কাফির" শব্দের প্রকৃত অর্থ এই,—সর্বধর্মের সত্যদ্রোহী খোদার করুণায় আস্থাহীন ব্যক্তি। কোন ধর্মই সে বিশ্বাস করে না। কোন ধর্মগ্রন্থেই তার আস্থা নাই। সে পয়গম্বরকে সত্যের দূত বলে স্বীকার করে না। প্রথম কাফির হচ্ছে—'ইবলিস'—শয়তান, যে অহঙ্কারস্ফীত হয়ে মানুষকে সেজদা করতে স্বীকার করে নাই।

কোরান সমস্ত ধর্মের সত্যকে সমন্বয় করতে প্রয়াস করেছে। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ নানা অলৌকিক গল্পের আবর্জনায় দৃষ্টির অন্তরালে লুক্কায়িত হয়ে রয়েছে; প্রাচীন পয়গম্বরগণও ভৌতিক জীব বসে পরিগণিত হয়েছিলেন। সুতরাং জনসাধারণ ধর্মশাস্ত্র ও পয়গম্বরদের সত্যতায় সন্দিহান হয়ে পড়েছিল। সেই সময় কোরান বলছেন,—"এই ধর্মগ্রন্থে কোন সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থের প্রচারক পয়গম্বর তোমাদেরই একজন। যারা এই গ্রন্থ ও এই পয়গম্বরকে বিশ্বাস করে না, তারা খোদার শিক্ষায় ও অপৌরুষেয় ধর্মে সন্দিহান।" .

পবিত্র কোরানে যুদ্ধের সম্পর্কে যেখানে 'কাফির', শব্দের উল্লেখ আছে, সেখানে তাকে ইসলাম-দ্রোহী বুঝতে হবে—অমুসলমান বা অন্যধর্মাবলীকে বুঝতে হবে না। এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে তখন, যখন আমরা সেই প্রসিদ্ধ মুক্তিঘোষণার শর্তের দিকে দৃষ্টিপাত করি।

"যে-সমস্ত পৌত্তলিকের সঙ্গে তোমাদের সন্ধি হয়েছে, তারা মুক্ত।"

"সুতরাং তোমরা চার মাস কাল নির্বিঘ্নে পর্যটন কর; আল্লাহকে কখনও দুর্বল করতে পারবে না, তিনিই তাঁর শত্রুকে নাকাল করবেন।"

"যারা সন্ধির শর্ত পালন করবে, তারা খোদার অনুগ্রহ লাভ করবে।"

'পৌত্তলিক" ও "কাফির" পৃথক। যে-ব্যক্তি মুসলিমকে সালাম করে, সে কখনও কাফির নয়।—একথা হজরত নিজেই বলেছেন। "কাফির" কোরানের মতে সর্বজাতি, সর্বসমাজ ও সর্বধর্মের শত্রু।

অনেক মুসলিম ভুলে যান যে, পৌত্তলিকদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই হজরতের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। এই বন্ধুত্ব ইসলাম-বিজয়ের পরও অটুট ছিল। মুসলিমের ধর্মজীবন ও সদ্ব্যবহারই ঐ সমস্ত পৌত্তলিকদের হৃদয়স্পর্শ করেছিল, আর তারা দীক্ষিত হয়েছিল।

বস্তুত পৌত্তলিকেরা মাত্র কুসংস্কারের বশবর্তী হয়েই ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। পশুবলই তাদের একমাত্র সম্বল ছিল। যুদ্ধের সময় তারা অনর্থক তাদের কল্পিত দেবতাদের সাহায্য ভিক্ষা করত।

কিন্তু কিতাবি-ধর্মপন্থীদের ব্যবহার অনুরূপ ছিল। যে-সমস্ত জাতি পয়গম্বরের মারফতে ধর্মগ্রন্থ পেয়েছিল, তাদের সঙ্গে ইসলামের আত্মীয়তা খুব ঘনিষ্ঠ। তাদের প্রতি হজরতের মনোভাব ও ব্যবহারও করুণাপ্রবণ ছিল। সিনাই-এর খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁর যে চুক্তি-পত্র হয়েছিল, সেটা শুধু শুভ-ইচ্ছা নয়, গভীর প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি মদিনার য়িহুদিদের মুসলিমদের সমান অধিকার দিয়েছিলেন। ধর্মমতে অসহিষ্ণু হয়ে তিনি কখনও অন্যের প্রতি কোনপ্রকার জোর-জবরদস্তি বা রূঢ় ব্যবহার করেননি—যুদ্ধ করা ত দূরের কথা। খ্রিস্টান ও অগ্নি-উপাসক অতিথিদের সহিত তাঁর যে ব্যবহার, তার-তুলনা অতি বিরল। ধর্মের জোশ বা বাড়াবাড়ির গন্ধও তাতে প্রকাশ পেত না। মুসলিমগণও ভুলে যান যে, আমাদের হজরত কখনও কিতাবি জাতিকে তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করবার জন্য আহ্বান করেন নাই। তিনি তাদের বলেছিলেন, "তোমরা আল্লাহর রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর—পৌরোহিত্য-প্রথা ত্যাগ কর—কুসংস্কার হতে তোমাদের ধর্ম মুক্ত করে তার আদি পবিত্রতার পুনরুদ্ধার কর।" তাঁর প্রশ্নটা ছিল এই—"তোমরা আল্লাহর রাজ্যের জন্য বাঁচতে চাও, যে রাজ্যে মানুষ মাত্র সকলকেই সমভাবে স্থান দেওয়া হয়?—না তোমরা শুধু তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য জীবনধারণ করতে চাও, যার মধ্যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের কোন অধিকার থাকতে পারে না।" প্রথমটা শান্তি ও মানুষের কল্যাণ-প্রতিষ্ঠা করতে চায়, আর দ্বিতীয়টা যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, অত্যাচার ও নির্যাতনের বহর বাড়ায়। কিন্তু যে-সমস্ত নৃপতির নিকট হজরত তাঁর এই শান্তির বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই তাঁকে উদ্ধত হামবড়া অথবা উন্মত্ত ধর্মান্ধ ব্যক্তি বলে ধারণা করেছিলেন। তাঁর দূতগণের অনেকেই অবমানিত, লাঞ্ছিত—এমন কি নিহত পর্যন্ত হয়েছিলেন। কোরানে আছে, "বল, হে কিতাবি জাতিসকল, তোমরা আমাদের সহিত এই সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হও যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও উপাসনা করব না—তাঁর কোন শরিক স্বীকার করব না—আমাদের কেহই আল্লাহ ভিন্ন অন্য দেবতা মানব না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, বল, আমরাই আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেছি।"

কিতাবি জাতিসকল যদি এ সন্ধি স্বীকার করত, তা হলে তারাও খোদার নিকট আত্মসমর্পণ করে মুসলিম হত। হজরত তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধ করবার জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই ; তাঁর একমাত্র চেষ্টা হয়েছিল—তাঁর বার্তা জগতের সর্বজাতির নিকট পৌছে দেওয়া। তাঁর নিকট একেশ্বরবাদী খ্রিস্টান সম্প্রদায় এবং পৌরোহিত্য-প্রথা ও কুসংস্কার হতে মুক্ত য়িহুদি সম্প্রদায় মুসলিম সম্প্রদায় বলে গণ্য হত।

কিন্তু খ্রিস্টান, য়িহুদিও অগ্নি-উপাসকগণ তাঁর বার্তা উপহাস করে উড়িয়ে দিয়েছিল এবং তাদের নৃপতিগণ তাঁর প্রেরিত বার্তাবাহকদের উপর অকথ্য নির্যাতন ও অত্যাচার বর্ষণ করেছিলেন ;—তবুও আমাদের হজরত বিরক্ত হয়ে বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য তাঁদের প্রতি অনুদার ভাব কখনও পোষণ করেন নাই। সিনাই-এর সন্ন্যাসীদের সহিত যে

চুক্তিপত্র হয়েছিল, তাহাই এ কথার সমর্থন করে। পরবর্তীযুগের মুসলিমগণের মধ্যে কেহ কেহ হজরতের ঔদার্যের আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারে নাই, বরং কখনও কখনও অন্য-ধর্মীদের প্রতি উদ্ধত ব্যবহার দেখিয়েছিল ; তবু তারা য়িহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতি বিশেষ ব্যবহার ব্যবস্থা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে শরিয়তেও সেই বিশেষ ব্যবস্থার আদেশ আছে।

মিসরের কপট জাতি মুসলিম বিজয়ের পর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিমদের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিল—এবং বর্তমানেও সে বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ আছে। সিরিয়ার খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে ও ঠিক এইরূপ বন্ধুত্ব ছিল এবং এখনও আছে। তারা মুসলিম শাসনই বেশি পসন্দ করে।

মুসলিম সাম্রাজ্য সব সময়ই বিশেষত স্পেন, উত্তর আফ্রিকা, সিরিয়া, ইরাক ও পরবর্তীকালে তুরস্কে ঐশ্বর্যশালী য়িহুদি সম্প্রদায় সুখ-শান্তিতে বাস করেছে। তাদের অনেকেই স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, তারা কখনও খ্রিস্টান রাজ্যের তুলনায় নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয় নাই। তুরস্কের য়িহুদি ও মুসলিম সম্প্রদায় একদিল হয়ে গেছে। প্যালেস্টাইন য়িহুদিদের জাতীয় দেশ বলে গৃহীত হওয়ার পরও প্রাচীন পোলাণ্ড ও স্পেন হতে অভ্যাগত তথাকার আরবিভাষা য়িহুদিরা মুসলিম ও খ্রিস্টানদের সহিত একপ্রাণ হয়ে বসত করছে।

খলিফা ওমরের জেরুজালেমে প্রবেশের ইতিহাস নিয়ে খ্রিস্টানগণ খুব উপহাস করেন। কিন্তু তলিয়ে বুঝলে বুঝা যায়, খলিফা ওমর প্রকৃত মুসলিম মনোভাব দেখিয়েছিলেন কিতাবি জাতিদের প্রতি। যে সেনাধ্যক্ষ জেরুজালেম অধিকার করেন, তিনি খলিফাকে পবিত্র নগরীর কুঞ্জি গ্রহণ করবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হতে অনুরোধ করেন। খলিফা মদিনা হতে মাত্র একটী উট ও একটী গোলাম সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে জেরুজালেম উপনীত হয়েছিলেন। তিনি ও গোলাম উভয়েই সেই উষ্ট্রে আরোহণ করেছিলেন একে অন্যের পর। উভয়েই তাকে টেনেছিলেন। প্রভু ও গোলামের মধ্যে কোন পার্থক্যই ছিল না। উভয়ই একই পথের যাত্রী— এই মনোভাবই খলিফা পোষণ করেছিলেন। দাস-পরিবেষ্টিত রোমীয় কর্মচারিদের আশ্চর্যের অবধি ছিল না, যখন তাঁরা এত বড় সাম্রাজ্যের সম্রাটকে এরূপ সামান্য ব্যক্তির্র মত অধিকৃত রাজ্যে প্রবেশ করতে দেখেছিলেন। তাঁরা সসম্ভ্রমে তাঁকে জেরুজালেমের পবিত্র গির্জায় নিয়ে গেলেন। তখন নমাজের সময় হয়েছিল। তাঁরা তাঁকে সেই গির্জাতেই নমাজ আদায় করতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু তিনি তাতে সমতি দিলেন না। তিনি বললেন, আজ আমি যদি এখানে নমাজ আদায় করি, কাল মুসলিমগণ আমাকে দেখিয়ে এই পবিত্র গির্জা মসজিদ বলে মনে করে গির্জার সার্থকতা নষ্ট করতে চাইবে।" তিনি তাঁর জায়নামাজ গির্জার বাইরে নিয়ে যে স্থানে নমাজ আদায় করেন, সে স্থানে এখন একটী মসজিদ দণ্ডায়মান। এইটাই প্রকৃত ওমরের মসজিদ। প্রকৃতপক্ষে, কুবাতুস সাখারা মসজিদ নয়,—পর্যটকগণ ভুল করে মসজিদ মনে করেন ; ওটা একটা কবর।

তদবধি জেরুজালেমের পবিত্র গির্জা বরাবরই খ্রিস্টান উপাসনা গৃহরূপে বিদ্যমান আছে। তবে মুসলিমদের অনুদারতার কাজ এইটুকু হয়েছিল যে, তাঁরা খ্রিস্টানধর্মী সর্বসম্প্রদায়কে উহার একচেটিয়া অধিপতি হতে দেন নাই। বেথেলহেমের গির্জা ও অন্যান্য পবিত্র স্থান সম্বন্ধেও মুসলিমদের ব্যবহার ঠিক ঐ একই প্রকার। খোলাফাই-রাশিদুন ও উমীয় খলিফাদের আমলে মুসলিমদের মনোভাব এইরূপ উদার ছিল। এইভাব স্পেনের উমীয় শাসনকালেও বর্তমান ছিল। সে যুগে প্রায়ই মুসলিম ও খ্রিস্টান একস্থানেই উপাসনা করত। সিরিয়াতে আমি অন্তত বারটা গৃহ দেখাতে পারি, যেখানে উভয় সম্প্রদায়ই উপাসনা করত, এমন প্রবাদ আছে। শারণ উপত্যকাস্থিত লুদ শহরে একই গৃহে মসজিদ ও সেন্টজর্জের গির্জা বিদ্যমান—মাঝে মাত্র একটা পর্দা। পূর্বে এই পর্দাটাও ছিল না। খলিফা ওমরের বাণীই সত্য হয়েছিল। লুদের এই গৃহের অর্ধেক এবং অন্যান্য স্থানের সমস্ত গির্জাই পরবর্তী যুগের মুসলিমগণ মসজিদ বলে দাবি করে বসেছিল এই অজুহতে যে, মুসলিমগণ নমাজ আদায় করত। কিন্তু তবুও খ্রিস্টানগণ অসম্পূর্ণ আত্মিক স্বাধীনতা উপভোগ করত। তারা তাদের প্রধান প্রধান গির্জাগুলি বাঁচিয়ে রেখেছিল এবং অনেক নূতন নূতন গির্জাও নির্মাণ করেছিল। প্রাথমিক যুগের সাম্যকে পরবর্তী যুগের সামাজিক ঔদ্ধত্যই নষ্ট করেছিল। কিন্তু তা-ও ঘটেছিল ক্রুজেডের নৃশংতার পর। মিসরের ফাতিমিয়গণ কর্তৃক দক্ষিণ-সিরিয়া বিজয়কালে অত্যল্প কালের জন্য খ্রিস্টানদের উপর কিছু অত্যাচার হয়েছিল, কিন্তু তা ছাড়া তাদের উপর কখনও এতটুকু নির্যাতন হয়নি।

সওগাত, পৌষ ১৩৩৪.

আবাসীয় খলিফা-শিরোমণি হারুন-অর-রশিদ জেরুজালেমের পবিত্র গির্জার কুঞ্জি ফ্রাঙ্ক-খ্রিস্টানদের অধিপতি সম্রাট শার্লমেলকে উপহার দিয়াছিলেন। এতে সিরিয়াবাসী খ্রিস্টানদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছিল ; কারণ তারা পশ্চিম গির্জার অধীন ছিল না এবং তারা মুসলিম শাসন ভিন্ন অন্য কোন শাসন পসন্দ করত না। রাষ্ট্রতন্ত্রের দিক থেকে এই উপহারটী একটা বিষম ভুল এবং তা পরবর্তী কালে মুসলিম সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের পক্ষে সমূহ বিপদ ও ক্ষতির কারণ হয়েছিল। এই উপহার শার্লমেনের প্রতি সমান দেখাবার জন্যই প্রদত্ত হয়েছিল। খলিফা এই মর্মে উপহারটী দিয়েছিলেন, "আপনি ও আপনার প্রজাগণ এই গির্জা যথেচ্ছ ব্যবহার করুন ; কারণ আমি জানি, ইহা আপনাদের ধর্মের কেন্দ্র এবং তীর্থস্থান।" কিন্তু ফ্রাঙ্ক-খ্রিস্টানগণ এই উপহারের অর্থ গির্জার স্বত্বসমর্পণ বলে মনে করেছিল। তারা তদ্দেশবাসী খ্রিস্টানকে ধর্মদ্রোহী বলে মনে করত।

পরবর্তী যুগে ফ্রান্সের সমস্ত অতিরিক্ত দাবির মূল কারণ হয়ে পড়ল এই উপহারটী। রুশিয়াও পূর্ব-গির্জাকে রোমান ক্যাথলিকদের হাত হতে রক্ষা করতে গিয়ে আরও গুরুতর দাবি উত্থাপন করেছিল। এ-সমস্ত কারণেই ক্রমশ মুসলিম ও তার দেশবাসী খ্রিস্টানের মধ্যে নানা প্রকার মনোমালিন্য ঘণীভূত হয়ে উঠেছিল। যখন ক্রুজেড-সৈন্যগণ জেরুজালেম দখল করে, তখন তারা মুসলিম-খ্রিস্টান নির্বিশেষে সকলকে নিহত করেছিল। তারপর যখন তারা

জেরুজালেম শাসন করতে আরম্ভ করে, তখন যে-সমস্ত প্রাচ্য খ্রিস্টান বেঁচে ছিল, মুসলিম প্রদত্ত সমুদয় স্বার্থ, স্বাধীনতা ও অধিকার হতে তাদিগকে বঞ্চিত করেছিল এবং তারা এক প্রকার হীন পতিত জাতি বলে গণ্য হত। তাদের অনেকে উচ্চশ্রেণীর অধিকার পাওয়ার লোভে রোমান ক্যাথলিক হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানদের পুনর্বিজয়ের পর পূর্বাবস্থা আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় ; সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমদের স্বদেশবাসী খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা জিমি বলে অভিহিত হত, তারা তাদের পূর্ব স্বার্থ ও অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হন। শরিয়তই এই সমান অধিকারের ব্যবস্থা করেছে। খ্রিস্টানদের ধর্মান্ধ অত্যাচারের ফলে মুসলমানদের চিত্ত অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। সে জন্য তারা খ্রিস্টানদের প্রতি একটু ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করেছিল। এর ফল উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে বিষময় হয়েছিল। প্রথানুসারে খ্রিস্টানগণ কতকগুলি সামাজিক বিধি-নিষেধের অধীন ছিল ; কিন্তু সেগুলি তত নৃশংস ও হৃদয়হীন ছিল না, যত ছিল তৎকালীন ফরাসি ক্যাথলিক সম্ভ্রান্তদের অত্যাচার তাদের ক্যাথলিক কৃষকদের উপর, অথবা আয়র্ল্যাণ্ডের ক্যাথলিকদের প্রতি প্রোটেস্ট্যাণ্টদের ব্যবহার। মুসলিমগণ কখনও অধীনস্থ খ্রিস্টান-প্রজাদের ধর্মের উপর হাত দেয় নাই। ফলে, ছোট ছোট খ্রিস্টান সম্প্রদায় যারা—শক্তিমান খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের হাতে পড়লে নিহত ও অগ্নিদগ্ধ হত—এখনও মুসলিম শক্তির অধীনে থেকে নির্বিঘ্নে স্ব স্ব ধর্মমত অনুসারে জীবন যাপন করছে।

অসংখ্য খ্রিস্টান মঠ কোটী কোটী টাকার সম্পদ নিয়ে নির্বিঘ্নে বিরাজ করেছে হজরতের সন্ধির শর্তানুসারে। সাম্রাজ্যের কাউন্সিলে খ্রিস্টানধর্মী বিভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হত ; তদ্রূপ জিলা ও গ্রাম্য কাউন্সিলেও ধর্মযাজকগণের প্রতিনিধি প্রেরিত হত। সেখানে তাদের সম্প্রদায় সম্পর্কে যাবতীয় কথাই বিনা-তর্কে গৃহীত হত।

আমার একটা ঘটনা মনে আছে। সেন্ট জর্জের একটী মঠের অধ্যক্ষ পবিত্র দরগার বিপুল ঐশ্বর্য হতে প্রায় চল্লিশ হাজার পাউন্ড অপহরণ করে ইউরোপে পালিয়ে যাচ্ছিলেন ; তুর্কি কর্মচারী কর্তৃক তিনি জাফা নগরীতে বন্দী হয়ে জেরুজালেমে আনীত হন। বেচারি তখন মুতাশরিফের সমুখে নতমস্তকে তুর্কি-আইনানুসারে বিচার প্রার্থনা করেন। কিন্তু তিনি উত্তর দেন, "মঠের উপর আমাদের কোন হাত নাই? অগত্যা অধ্যক্ষকে মঠের কর্মচারীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হল তাদের দয়ার উপর নির্ভর করে।

কিন্তু ঔদার্যের এই সমস্ত দৃষ্টান্তই অবশেষে মুসলিম-রাষ্ট্র-শত্রু কর্তৃক তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল। তিন শত বৎসর পূর্বে মুসলিম সাম্রাজ্যে ফ্রানসিসপন্থী সন্ন্যাসীগণই একমাত্র খ্রিস্টানধর্মপ্রচারক ছিল। সে-সময় একদা ভীষণ সংক্রামক প্লেগের আবির্ভাব হয়। ঐ সন্ন্যাসীরাই দিনরাত্র পরিশ্রম করে রোগীর পরিচর্যা করেছিলেন। এজন্য পরিতুষ্ট হয়ে তুর্কি শাসন-পরিষদ তাদের সমুদয় সম্পত্তি শুল্কমুক্ত করেছিলেন। পরবর্তীকালে যখন বহুসংখ্যক ধর্মপ্রচারক এসে পৌছল, তখন তারাও ঐ কর-মুক্তির দাবি করে বসল এবং তুর্কি গভর্ণমেণ্ট তাদের দাবিও স্বীকার করলেন। কিন্তু মজা এই যে, তারা এই দাবি অনুগ্রহের ফল হিসাবে নয়—বিজয় বা যুদ্ধের ফল হিসাবে চেয়ে বসল। বস্তুত ইহা সুলতানের অনুগ্রহের দান। তারা ইহা বিজয়ের স্বত্ব বলে তাদের রাষ্ট্রদূতও কনসালদের সাহায্য প্রার্থনা করে ঐ স্বত্ব উদ্ধার

করবার জন্য জোরজবরদস্তির আয়োজন করতে শুরু করল। খ্রিস্টানগণকে তাদের ভাষা ও আচার-অনুষ্ঠান অক্ষুণ্ণ রাখতে দেওয়া হয়েছিল—তারা বিদ্যালয়গুলি নিজেদের ইচ্ছানুসারে পরিচালনা করবার স্বাধীনতা লাভ করেছিল এবং খ্রিস্টানরাজ্য হতে বহুসংখ্যক পাদ্রিকে মুসলিম সাম্রাজ্যের খ্রিস্টানদের সহিত সাক্ষাত করবার জন্য যথেচ্ছ যাতায়াত করবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। এতে স্পষ্ট বুঝা যায়, ইসলামের ঔদার্য সরল ও অনুপম ছিল। এই ঔদার্যই অবশেষে মুসলিম সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছিল।

যে-সমস্ত দেশে জাতীয়তা ও ভাষা এক—যেমন সিরিয়া, মিসর ও মেসোপটেমিয়া—সেখানে আদর্শের সংঘর্ষ নাই; কিন্তু তুরস্কে—যেখানে খ্রিস্টান ও মুসলিমের ভাষা বিভিন্ন-আদর্শে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। জাতীয়তা যতদিন হিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেনি, ততদিন অখণ্ড শান্তি বিরাজ করত। খ্রিস্টান প্রজাগণ সুখে স্বচ্ছন্দে ছিল—যতদিন মুসলিম সাম্রাজ্য সুশাসিতছিল, বিশেষত খ্রিস্টান সাম্রাজ্য অপেক্ষা যতদিন জ্ঞান ও ঐশ্বর্যে অধিকতর উন্নত ছিল। এরূপ বড়জোর সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ছিল। তারপর আশি বৎসর পর্যন্ত তুরস্কে প্রায় অরাজকতাই চলেছিল। ফলে খ্রিস্টানগণ ক্লেশ ভোগ করেছিল,—তাহাও মুসলিম অনুশাসনের জন্য নয়, বরং তার অবহেলা ও পতনের জন্য। এই আশি বৎসর অরাজকতার পর পুনর্গঠন ও সংস্কারের একটা যুগ আরম্ভ হয়। তখন মুসলিম রাজ্যে প্রথম চেষ্টা হল সকল জাতির অবস্থা উন্নত করবার জন্য। কিন্তু অত্যন্ত বিলম্ব হওয়ায় সার্ব, গ্রীক, বুলগার ও রুমান জাতি আর ফিরল না। রুশিয়া হতে প্রবাহিত ধর্মজোশের বিষস্রোত সমস্ত পণ্ড করে ফেলেছিল। গ্রীক গির্জার প্রধান মতলব হল মুসলিমকে ধ্বংস করা। রুশিয়ার গুপ্তচর, পাদ্রি ও সন্ন্যাসী একত্রে এই মতলব ফলবতী করবার জন্য চেষ্টা করতে শুরু করল। এই যুগের ইতিহাস নিয়ে বেশি আলোচনা করা সমীচীন নয়, কারণ এটা অত্যন্ত আধুনিক এবং এতে হয়ত অপর পক্ষ অপ্রিয় সত্য সহ্য করবার মত শক্তি ও ঔদার্য দেখাতে অক্ষম হতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইউরোপের ইতিহাসে মরিয়ার মুসলিম অধিবাসী ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে গ্রীকদের হাতে কিরূপ নৃশংসভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল, সে কথার উল্লেখ নাই। পক্ষান্তরে, তুর্কিদের দুই একটী যুদ্ধের ইতিহাস নানা অসত্যের সঙ্গে অতিরঞ্জিত করে এঁকে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ খুব আমোদ উপভোগ করে থাকেন। বস্তুত মুসলিম কর্তৃক খ্রিস্টান-উৎপীড়নের সংবাদ পাওয়া যায়, তার পশ্চাতে খ্রিস্টান কর্তৃক মুসলিম-হত্যার নিদারুণ সংবাদাদি লুকানো থাকে। আরমেনিয়ানরা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তুর্কির পরম বন্ধু ছিল; তারা তুর্কিশাসনে বেশ সুখেই ছিল। তাদের মুক্তির পর তারা পুনঃপুনঃ তুর্কির শাসনাধীন হতে ইচ্ছুক হয়েছে। মুসলিম সাম্রাজ্যের বহিঃস্থ খ্রিস্টানগণ তুর্কি সাম্রাজ্যের খ্রিস্টানগণের ধর্মান্ধতাকে নানা প্রকার মিথ্যা প্ররোচনা, প্রলোভন ও সংবাদ দ্বারা প্রখর করে তুলেছিল। তাদের পাদ্রীরা প্রচার করেছে যে, 'মুসলিম্‌কে নিহত করা পুণ্যজনক কাজ।" তুর্কিকে ধ্বংস করবার জন্য এর চেয়ে নিষ্ঠুর ও গুপ্ত ষড়যন্ত্র আর কখনও হয় নাই। এই ষড়যন্ত্র তুর্কির বিরুদ্ধে নয়—একেবারে মানুষের কল্যাণের বিরুদ্ধে—তথা খোদার আদেশ ও উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে। কারণ তারা ধর্মগত ঔদার্যকে রাষ্ট্রগত দৌর্বল্য বলে প্রচার করেছিল। তুর্কির শান্তি

দুর্বলতার নামান্তর ও খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের নৃশংস অত্যাচার, পাশবিক উৎপীড়ন, লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড ও অগ্নি-দাহন শক্তির পরিচায়ক বলে ইতিহাসে বর্ণনা করে খ্রিস্টানদের পশুশক্তিকে প্রখর করে সাম্রাজ্যলোলুপতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঔদার্য দৌর্বল্য নয়—বরং পরম শক্তি। অন্যায়-পীড়িতের চেয়ে অন্যায়কারী অধিকার দয়ার পাত্র। মরিসকোদের বহিষ্কৃত করে দেওয়ার তারিখ হতে স্পেনের পতন শুরু হয়েছিল। স্যানফারন্যাণ্ডো সত্যই অধিকতর জ্ঞানী ও দেশপ্রেমিক ছিলেন বিজিত সেভিলি, মার্কিয়া ও টলেডোর প্রতি ঔদার্য প্রদর্শন করে—পরবর্তী নৃপতিদের চেয়ে—যাঁরা ধর্মযুদ্ধের ছদ্মবেশে গ্রানাডা অধিকার করে মুসলিম ও য়িহুদিদের উপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড অবাধে চালিয়েছিলেন। আধুনিক বলকান সাম্রাজ্য ও গ্রীস এক প্রকার অভিশাপের মুহূর্তে উদ্ভব হয়েছে। হতে পারে, যেদিন ইউরোপের সুসভ্য জাতিসকল রুশিয়ার নৃশংস জারের অমানুষিক দুর্নীতি ও তার গির্জার বর্বর ধর্মান্ধতা মেনে নিয়েছিল ও সমর্থন করেছিল, সেদিন হয়ত ইউরোপের অধঃপতনের যুগ শুরু হয়েছে। ইতিহাসের চক্ষে ধর্মগত ঔদার্য জাতির চরম উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। আজ মুসলিম অধঃপতনের চরমসীমায় দাঁড়িয়ে ঐ সমস্ত জাতির ঐতিহাসিকের মিথ্যা ইতিহাস পাঠ করে হতাশ হয়ে পড়েছে—যারা একদিন মুসলিম নৃপতিগণের উদার পতাকার তলে সুখে বাস করেছিল। কিন্তু আমি তাকে বলি, "হে মুসলিম! তুমি কখনও এই ঔদার্যকে দুর্বলতা বলে মনে কর না। এইটাই ইসলামের শ্রেষ্ঠ শক্তি ; কারণ এইটাই সত্যের প্রকৃত স্বরূপ।" খোদা—কি য়িহুদি, কি খ্রিস্টান, কি মুসলিম—কাহারও একচেটিয়া নয়, যেমন সূর্যকিরণ, বরষার বারিধারা কাহারও জন্য একচেটায়া নয়—সকলের জন্যই সমান। তবু কোন কোন সম্প্রদায় বলে, "য়িহুদি কিংবা খ্রিস্টান ব্যতীত কেহই বেহেশতে প্রবেশলাভ করবে না।"

এ কথার উত্তর দাও, হে মুসলিম? তোমার পরম-সম্পদ কোরানের বাণী উদ্ধৃত করে—যার অর্থ হচ্ছে, "যে ব্যক্তি খোদার উদ্দেশে তার উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা উৎসর্গ করবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণের জন্য প্রাণপণ করবে, সেই খোদার অনুগ্রহ লাভ করবে, তাকে আর কিছুরই ভয় করতে হবে না—কিংবা তাকে কোন প্রকার দুঃখ-ক্লেশের অধীন হতে হবে না।"

সওগাত, মাঘ ১৩৩৪

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা

সূচিপত্র

ছোটগল্পের ধারা

১

আজকাল চারিদিকে ছোটগল্পের ছড়াছড়ি। শুধু এই বাংলায় নয়, সমস্ত জগতের প্রতি জাতির সাহিত্যে ইহার প্রভাবটা একটু প্রখর হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। মাসিক, সাপ্তাহিক, ত্রৈমাসিক এমনকি দৈনিকও ইহার হাত এড়াইতে পারে না। ছোটগল্প যেন সর্বময় হইয়া সাহিত্যিক ও লেখকদের প্রাণের জিনিস হইয়া পড়িয়াছে। সকলেই গল্প লিখিবার ও পড়িবার জন্য ব্যস্ত। লেখক লিখিতে বসিয়া কেবলই গল্প খুঁজিতে থাকেন, নূতন গল্প যেন আর মিলিতে চায় না। লেখক ও পাঠক উভয়েই যখন গল্পের মধ্যে এইরূপ ডুবিয়া যান, তখন সে সম্বন্ধে দুএক কথা ব্যক্তিগতভাবে বলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির মধ্যে আমি চারিটি বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা করিতেছি। জানি না, কতদূর কৃতকার্য হইব। প্রথমত, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গল্পের ধারা কিরূপ ; দ্বিতীয়ত, সাহিত্যে গল্পের আবশ্যকতা কতদূর ও কেন ; তৃতীয়ত, বৈদেশিক সাহিত্যে গল্পের প্রাচুর্য ও তাহার কারণ, এবং চতুর্থত, বাংলাদেশে গল্পের ধারা কিরূপ হওয়া উচিত।

অবশ্য একথা সর্বপ্রথম বলিয়া রাখিতেছি যে, গল্প লেখকের প্রাণের ছবি বিকাশ করে ;—সংসারের সুখ-দুঃখ সমানভাবে সকলের উপর সমান ফল প্রদর্শন করে না—বিভিন্ন গল্প লেখক সেই সুখ-দুঃখের ছবিকে বিভিন্নভাবে দেখিয়া বিভিন্ন প্রকারের গল্পে প্রকাশ করেন ; সুতরাং সেই গল্প লেখার একটা বৈজ্ঞানিক নিয়ম করা বাতুলতা। সংসারে কত না ঘটনা ঘটিতেছে—সময় ও মানব-বুদ্ধির ক্রমপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাশক্তিরও গতি পরিবর্তন হইতেছে। এই পরিবর্তনের মধ্যে লেখক যে আনন্দের খেলা উপভোগ করেন সেইটা জগতকে উপভোগ করাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার লেখনী গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু একটি দিক হইতে আমি প্রস্তাব করিব যে, আমাদের গল্পের ধারা কিরূপ হইবে? সে দিকটি হইতেছে গল্প পাঠে সমাজ ও ব্যষ্টির উপকার। আমরা গল্পের মধ্যে ডুবিয়া যাই, কিন্তু তাহা হইতে কি উপকার পাই? সেই উপকার অনুসারেই গল্পটা হওয়া আবশ্যক এবং সেই হিসাবেই আমি বলিতে চাই গল্পটা কিরূপ হওয়া উচিত। তাই বলিয়া ইহাই যে চরম তাহা নহে। এখন আমাদের প্রস্তাবিত বিষয় একে একে আলোচনা করা যাউক।

২

অফিসের কেরানি, স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েরা, রেলের প্যাসেঞ্জার ও কুলমহিলা এ সকলেরই কল্যাণে আজ গল্পের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি হইতেছে, কেহ বা

লিখেন বলিয়া, আর কেহ বা পড়েন বলিয়া। যাঁহারা লেখক তাঁহাদের আর নিদ্রা নাই—এই বাজারে গল্পের পুস্তক একখানা না বাহির করিলে কি চলে? তাঁহাদের এদিকে নূতন গল্প খুঁজিয়া বাহির করা মুশকিল হইয়া পড়িয়াছে। কেহ বা লেখক নামে পরিচিত হওয়ার বাহাদুরির লোভে বহু পুরাতন লেখকের গল্প ছাঁটকাট করিয়া ও নামধান বদলাইয়া বেমালুম নূতন নূতন মাসিকে চালাইয়া দিতেছেন। কেহ বা ইংরাজি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত ও ফরাসি রুশিয়া ভাষা হইতে অনূদিত গল্পের অবিকল অনুবাদ নিজের বলিয়া ছাপাইতেছেন, আর পাঠক সমাজে খুব আনন্দের ও প্রশংসার রোল উঠিয়া যাইতেছে। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে গল্পের উদ্দেশ্য বিফল হইতেছে। বিদেশী হাবভাব বিদেশী আচার-পদ্ধতির ছাপ আমাদের দেশের নামের উপর অঙ্কিত করা হইতেছে। সমাজে প্রকৃত আদর্শ কি হইবে তাহার একটা অনবদ্য গতি ইহাতে রোধপ্রাপ্ত হইতেছে। সমাজের উচ্চ নিম্ন স্তরের অন্তরে উপলব্ধ ভাবকে সজীব করিয়া ফুটাইয়া তোলা—নিজ প্রাণের সহানুভূতি বেদনার রক্তে রাঙাইয়া উঠান গল্প লেখকের কাজ। তাহা না হইলে পাঠকের অন্তরে কোন স্থায়ী ফল প্রসূত হইবে না—পাঠক কেবল বহিরাবরণের উজ্জ্বলতায় মুগ্ধ হইয়াই থাকিবেন। কি চরিত্র, কি ভাব, কি নীতি, কোনটারই চরম বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়িবে না। গল্প-লেখক যাহাতে পাঠককে তাঁহার অন্তরতম দেশে যাইতে বাধ্য করিতে পারেন এমন চেষ্টা করা উচিত।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প লেখকগণের মধ্যে অনেকে যেরূপ লেখকের সুনাম পাইতেছেন তাহাতে অলক্ষ্যে যে অসাধুতা ও গভীর চিন্তায় অক্ষমতা, সাহিত্যিক অসহিষ্ণুতা, প্রাণের অপরিপূর্ণতা ও মস্তিষ্কের অপক্কতা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে তাহার পরিণাম তত সুখের বলিয়া মনে হয় না ;—কেননা এগুলি স্থায়ী সাহিত্য, যাহা ভবিষ্যতে বিশ্বসাহিত্যে স্থানলাভ করিবে, তাহার বিকাশের অন্তরায়। আমাদের ধারণা, আমরা গল্প লিখিয়া সমাজের দোষ ও সমাজের অসারতা সমূলে বিনাশ করিব ; কিন্তু প্রকৃতই কি আমরা সে ফল আহরণ করিতে পারিতেছি? আমার মনে হয়, যে জন্য গল্প লিখিতে হইতেছে তাহার কিঞ্চিত পরিমাণ ফলও ফলিতেছে না। সোজা কথ্য ভাষায় গল্প লেখা হয়, কেননা সকলেই পড়িয়া বুঝিবে এবং তদনুসারে কার্য করিয়া লেখকের উদ্দেশ্য সফল করিবে। পক্ষান্তরে, যাহাদের জন্য গল্প লেখা হইতেছে বাস্তবিক তাহারা পড়িতেছে না। এ কথাগুলি সামাজিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে লিখিত গল্প সম্বন্ধে খাটে। অবশ্য চিত্তবিনোদনের জন্য কলাপূর্ণ গল্পে কেবল প্রাণের খেলা প্রদর্শিত হয়। তাই সাধারণের জন্য হয়ত সাজে না। উপরোক্ত গল্প যাঁহারা পড়েন তাঁহারা কেবল গল্পের বাহ্যসৌন্দর্যটুকু উপভোগ করিয়াই ক্ষান্ত হন। তাঁহারা সে সম্বন্ধে কোন একটা বিচার করিতে পারেন না। সুতরাং ইহাতে গল্পপাঠের সার্থকতা হইল কোথায়?

সাহিত্যে, সমাজে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে যেখানেই তাকাই, দেখিতে পাই দ্রুত ক্রমবিকাশ ও স্ফূর্তির সময়ে সম্মুখে বিরাজমান আদর্শের অনুকরণ করা মানবজাতির স্বভাবগত অন্তরধর্ম, তাহা নিবারণ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। সেই অনুকরণ প্রবৃত্তি নীরবে তাহার কার্য করিয়া চলে—সমাজ তাহার প্রবল স্রোতে অবাধে ভাসিয়া যায়। বাংলা সাহিত্যে সেই অনুকরণ প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে তাহার কর্তব্য করিতেছে। তাহার ফলে আমরা

যাহা লিখি, যাহা পড়ি, যাহা চিন্তা করি, সব কিছুর জন্য পশ্চিমের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। সেখানে যুগ যুগান্তরের শ্রম, বহু সুখ-দুঃখের আলোড়ন ও ঘাত-প্রতিঘাতের এবং অতীত ভ্রান্তির শিক্ষার ফলে যে নূতনত্ব ভাসিয়া উঠিতেছে ও সভ্যতার অঙ্গবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে তাহা আমাদিকেও আবিষ্ট করিয়া তুলিতেছে। আমরা ভাবিতেছি না, বিচার করিতেছি না, দেখিতেছি না,—কেবল উহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়া উহা হুবহু আমাদের মধ্যে ভর্তি করিয়া লইতেছি। অবস্থার দিকে দৃকপাত না করিয়া অনুকরণবৃত্তির প্রভূত অনশীলন করিতেছি বলিয়া আমাদের মৌলিক সাহিত্যের অভাব দেখা যাইতেছে। আর ছোটগল্পটাও অনুকরণবৃত্তির বলে এদেশে এত আমদানি হইতেছে। মুসলমান লেখকগণ এখন ছোটগল্প লিখিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সেটাও সেই অনুকরণস্পৃহার দোষ। সাহিত্যেরও মানুষের ইতিহাসের মত ইতিহাস আছে। ছোটগল্প হইতেছে সাহিত্যের বেশ পাকা বয়সের ফল। সাহিত্য যখন বেশ পুষ্ট হয় তখনই ছোটগল্প বিকাশ লাভ করে। আমি বলি, বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণ পুষ্টিলাভ করিবার পূর্বেই ছোটগল্পের আমদানি হইতেছে। মানুষের ভাব ও কার্যের যথাক্রমে অল্পতা ও প্রাচুর্যের সঙ্গে সঙ্গে ছোটগল্প মানব-মনের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে আসে। ইউরোপ আজ সেই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। সুতরাং সেখানে ছোটগল্পের আবিষ্কার হইয়াছে তাহাদের সামাজিক অবস্থার পীড়নে।

৩

এখন দেখা যাউক, সাহিত্যে ছোটগল্পের আবির্ভাব ও আবশ্যকতা কেন?

জাগতিক জীবের মধ্যে মানব-জাতিরই সাহিত্য আছে। সাহিত্য মানবের চিন্তাপ্রবাহ ও তাহার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে। মানবের মন আছে, চিন্তারাশি আছে, ভূত ভবিষ্যত ও বর্তমান আছে বলিয়া তাহার সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মানব কাজ করিবার পূর্বে চিন্তা করে, এবং কার্যহীন চিন্তাও তাহার আছে। সুতরাং তাহার ঐ চিন্তাসমূহের হিসাব-নিকাশ করিবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষাও আছে। সেই হিসাব-নিকাশই তাহার অন্তরের সাহিত্য। সাহিত্য এই চিন্তা লিপিবদ্ধ করিয়া পরবর্তী মানবজাতির চিন্তাশক্তি আরও বর্ধিত করিতেছে, কারণ মানব-মন নিরন্তর প্রবহমান ও নবচিন্তানুধাবী। আর চিন্তা বর্ধিত হইতেছে বলিয়া, কার্যের পরিমাণও বাড়িয়া চলিয়াছে। এই কার্যের তালিকা রাখা সাহিত্যের অন্যতম কাজ, যাহাকে কেহ কেহ ইতিহাস আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, কার্যের পরিমাণ অতিরিক্ত বাড়িয়াছে বলিয়া বর্তমান মানব কার্য-বিভাগ করিয়া লইয়াছে ও চিন্তা করিবার ভার অন্যের উপর ন্যস্ত করিয়াছে। চিন্তার সংখ্যা যেন কমিতেছে। সেকালে আর্য কবিরা নিরবচ্ছিন্ন নিরালার মধ্যে বসিয়া বসিয়া কত না সূক্ষ্মনুসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ পূর্বক কত কি উদ্ভট গল্প রচনা করিয়াছিলেন—গ্রীকগণ নানা প্রকার Legend বা পরীর গল্প ও আরবগণ স্বপ্নপুরীর দেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিতেন ; কারণ তাঁহাদের হাতে চিন্তা করিবার সময় যথেষ্ট ছিল। আমাদের কালে তাহার বিপরীত দেখিতে পাইতেছি। আমরা সহসা আর সেই দীর্ঘ দীর্ঘ আশ্চর্যকাহিনী দ্বারা ছেলে ভুলাইতে পারি না। এখন যাহা সম্মুখে দেখি তাহারই বিষয়ে দু-

এক কথা লিখি। তাহার কারণ, হয় আমাদের কাজ অনেক বেশি, অথবা আমাদের মানসিক বৃত্তিসমূহের অধিকতর বিকাশ হওয়ায় আমরা যুক্তিতর্কের ও সম্ভব অসম্ভবের গণ্ডীর মধ্যে ফেলিয়া আমাদের কল্পনা-প্রসূত সৃষ্টিকে প্রাকৃতিক জগতের বাস্তবতার কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া লই। যে কারণেই হউক না, আমরা আজ সেইরূপ আর বিস্ময়-বৈচিত্র্যপূর্ণ ছবি আঁকিতে পারি না। আমাদের ছোটগল্পগুলি কেবলমাত্র সাধারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা কিংবা সময় বিশেষে কাহারও মনের ভাব ও সুখ-দুঃখের আবেশে অবিষ্ট প্রাণের বিশিষ্ট খেলা লইয়া লিখিত হইয়া থাকে—যাহা সকলেই জানে কিন্তু প্রকাশ করিতে অক্ষম। সুতরাং গল্প লেখক তাহার প্রাণের ভাষায় সেই বাস্তব ভাববৈচিত্র্য পাঠকের হৃদয়ের উপর নিখুঁতভাবে খুলিয়া ধরে,—তাই পাঠক স্তব্ধ মুগ্ধ হইয়া পড়ে।

বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের যেমন নানা অভাব নূতন নূতন আবিষ্কৃত হইতেছে, তেমনি তাহার কাজও বাড়িয়াছে শুধু ঐ অভাব পূরণের জন্য। মানুষ দিনরাত কাজে লিপ্ত। অন্তরের দিকে তাকাইবার আর তাহার অবকাশ নাই। দেহের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে তাহার সমুদয় সময় ব্যয়িত হইতেছে, তাহাতে সে কি করিয়া বুঝিবে যে, তাহার মনের ও আত্মার ক্ষুধা কি—উহা মিটান ত দূরের কথা! সে বুঝিতে পারিতেছে না, অন্তরের ক্ষুধা না মিটাইলে তাহাকে একদিন তাহার আত্মপ্রাণকে মৃত্যুমুখে তুলিয়া দিতে হইবে। এই আত্মক্ষুধা মিটাইবার জন্য ছোটগল্প আসিয়া জুটিয়াছে, কারণ দেহক্ষুধা নিবৃত্তিকল্পে নিয়োজিত কর্মী-সম্প্রদায়ের সময় কম। স্বল্প সময়ে স্বল্প কথায় সাহিত্য-রস-সুধা পান করা যায় এই ছোটগল্প হইতে। ছোটগল্প তাই নানা প্রকার ভাবকে সরল বিশ্লেষণ করিয়া পৃথক পৃথক প্রকাশ করিতেছে—দুনিয়ার মাঝে মনের শক্তি কাহার কিভাবে খেলিতেছে, মানব সমাজ কি ভাবে নড়িতেছে চলিতেছে—কখনও সংযত, কখনও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া কিভাবে বিশ্ব-সৌন্দর্যের পুষ্টিসাধন করিতেছে ইত্যাকার খণ্ড ভাবের সমষ্টি ভাষার মধ্যে আসিয়া লীন হইয়া ছোটগল্প আকারে প্রকাশিত হয়। সংক্ষেপে অল্প কথায় সোজা ভাষায় এই ভাবের প্রকাশ সাধন করা ছোটগল্পের কাজ, যাহাতে সাধারণ মানব সমাজ সারাদিনের কর্মক্লান্তি দূরীকরণ-কল্পে অল্প সময়ের মধ্যে মনের উপর দিয়া সত্যভাবের শীতল প্রবাহ বহাইয়া স্ব স্ব শ্রান্ত মনে শান্তি আনয়ন করিতে পারে। সমাজের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই যখন কর্মমগ্ন তখন শ্রান্তি নিবারণের সকল উপকরণের মধ্যে আজ ছোটগল্পের স্থান অন্যতম। তাই দেখি, মানবমনের অন্তরানন্দ যোগান ছোটগল্পের একটা প্রধান কাজ। এই হিসাবে আমাদের দেশের লোক কর্মলিপ্ত হইলেও, শিক্ষা অভাবে ক্লান্তি নিবারণের জন্য সাহিত্যকে নিয়োগ করিবার শক্তি এখনও হয় নাই। তাহারা বুঝিতে পারে নাই, দেহের ক্লান্তি মনের ক্লান্তি সমভাবে চলে। দেহের ক্লান্তি নিবারণের জন্য আহার নিদ্রা, কিন্তু মনের ক্লান্তি নিবারণের জন্য সাহিত্য। আমাদের মনের ক্লান্তি কি, তাহাই যখন লোকে বুঝে নাই—তখন তাহার নিবারক ছোটগল্পের উপকারিতা কি বুঝিবে? এইজন্য উপরে বলিয়াছি, আমাদের এখনও ছোটগল্প আমদানি করিবার সময় আসে নাই—তবু যখন ছোটগল্পের এত আমদানি তখন নিশ্চয়ই ইহার অপচয় অবশ্যম্ভাবী। সাধারণে যাহাতে শিক্ষিত হইয়া সাহিত্যকে আনন্দোপকরণ

করিবার জ্ঞান লাভ করিতে শিখে তজ্জন্য লেখকগণের কর্তব্য আরও অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ হওয়া। তাই বলিয়া গল্প লেখার যে একেবারে আবশ্যক নাই তাহা নহে। এখনও সমাজে বহু কর্মলিপ্ত লোক আছেন, তাঁহারা বাস্তবিকই ছোটগল্প পড়িয়া প্রভূত আনন্দ লাভ করেন ও দিবসের দেহক্লান্তি লাঘব করিয়া থাকেন। ইহাতে আমি বলিতে স্পর্দ্ধা করি না যে, এই সীমার এপাশে ছোটগল্প জন্মিবে না—ইহার ওপাশে জন্মিবে—এমনতর একটা জিনিসের এরূপ ধারা নির্দেশ করা যায় না—যাহার আমদানি লোকের অভাব অপেক্ষা বেশি কিংবা যাহার আমদানি অপব্যবহার মাত্র। সাহিত্যে একদিনে একটা জিনিসের প্রতিপত্তি জন্মে না, কি একটা জিনিস হঠাৎ একদিন মিনার্ভার মত সুপুষ্ট সুন্দর হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। সাহিত্য ক্রমপুষ্যমান। তবে এটুকু বলা কঠিন নয় যে, কোন জিনিসটার কতটুকু স্বাভাবিক ও কতটুকু অস্বাভাবিক। আমার প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে খুব প্রচুর ও এই প্রাচুর্যের অনেকটা অস্বাভাবিক—জোর করিয়া করা, স্বাভাবিক পুষ্টি নয়।

৪

এখন দেখাইতে চাই বৈদেশিক অর্থাৎ ইউরোপ ও আমেরিকার সাহিত্যে ছোটগল্পের আবির্ভাব স্বাভাবিক—কারণ তথায় কর্মপরিমাণ অপ্রতুল ও অসাধারণ ; মানুষের শিক্ষা অনেক উচ্চ। তাহারা শিক্ষিত হইয়াছে—মনের ক্ষুধা কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছে—তাহারা পুস্তক পড়িয়া মানসিক অশান্তি নিবারণ করিতে শিখিয়াছে; সুতরাং গল্পের প্রচুর আয়োজন সেখানে আবশ্যক ও অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। তাহাদের মনের ক্ষুধা যেমন তেমনি উপকরণ যোগাইবার মত লেখকও তথায় খুব প্রচুর। বিলাতে অসকার ওয়াইল্ড ও হার্ডি, ফরাসি দেশে মোপাসাঁ, রাশিয়ায় তুর্গনিফ আমেরিকায় মার্ক টোয়েন প্রভৃতি বহু গল্পলেখক কর্মপীড়িত কর্মব্যস্ত ছোটগল্পরূপ ঔষধের আমদানি করিয়া সাহিত্যের একটা উপকার ও মূল্য বর্ধিত করিয়াছেন। ইঁহারা যেরূপ ভাবপ্রণোদিত হইয়া যেভাবে সমাজের অভিযোগ ও অভাব উপলব্ধি করিয়া গল্প লিখিয়াছেন প্রায় তদ্রূপ ভাবাভিভূত হইয়া আমাদের রবিবাবু, মণিবাবু, প্রভাতবাবু, শরৎবাবু ইত্যাদি বহু গল্পলেখক বঙ্গ সাহিত্যকে ছোটগল্পের মোহে মাতাইবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন।

৫

এখন দেখা কর্তব্য আমাদের বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প কিরূপ হওয়া উচিত। বর্তমান বাংলায় যে সমস্ত গল্পের আমদানি দেখিতে পাই তাহার মধ্যে অধিকাংশই অপাঠ্য। না আছে তাহাতে ভাষার পুষ্টি ও কলার সৃষ্টি—না আছে তাহাতে ভাবের ও ঘটনার মৌলিকতা—সবই যেন বৈচিত্র্যবিহীন একঘেঁয়ে রকমের। বৈচিত্র্য সাহিত্যের একটা স্থায়ী গুণ—যে সাহিত্যে বৈচিত্র্য নাই তাহা ক্ষণস্থায়ী—যাহাতে উপকরণের ছায়া বড় বেশি তাহার জীবনও অতি ক্ষীণ। সাধারণত সাহিত্যে তিনটি গুণ থাকা বিশেষ আবশ্যক—বৈচিত্র্য (variety) ও কলা

(Art) ; অনুপ্রাণন (Inspiration) ; ভাবমূর্তি ও ভাবকুঞ্চন ; (expansion of thought in short supression)। এই কটি গুণ না থাকিলে সে সাহিত্য আনন্দবর্ধক হইতে পারে না। তাহাতে সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয় না।

বাংলাদেশের আচার-পদ্ধতি রীতি-নীতি সমাজ-ভিত্তি বৈদেশিকের মত নহে—গল্প বা উপন্যাসে তাহার অপকৃষ্ট অংশ ও ফল বর্ণনা করিয়া বিবেকগর্হিত ও নীতি-বিনিন্দিত কর্মের সংশোধন করা সুকঠিন—কারণ তাহা প্রকৃত শিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে। উপন্যাস ও গল্পবর্ণিত ব্যাপারের তলে গভীরভাবে নিযুক্ত হওয়া গুণটি আমাদের পাঠক সমাজে এখনও সৃষ্টি হয় নাই। তাই বলিতেছি, আমার মনে হয়, বাংলা সাহিত্যে গল্পের স্রোতটা অতি অসময়ে আসিয়া পড়িয়াছে, যখন মানুষ গল্প ও উপন্যাসের উপকার বা উপদেশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। ফাল্গুন মাসের বহু পূর্বে কলিকাতায় বসন্তের হাওয়ার দু-একটা ঝাপটা বহিয়া প্রাণ উধাও করিয়া তোলে—পোষা কোকিল ডাকিয়া হৃদয়ে কি এক অজানা ত্রাস, সংশয় ও পুলকের সৃষ্টি করে, এমনকি কখনও কখনও বেশ অনর্থেরও সৃষ্টি করে—ঠিক তদ্রূপ অনিষ্ট করিয়াছে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প আসিয়া।

আর এক কথা। বাংলা সাহিত্যের ধারা দুইদিকে চলিয়াছে—একটা দিক হিন্দু সমাজের হাতে আর একটা দিক মুসলমান সমাজের। হিন্দু সমাজে যেমন ছোটগল্প প্রচুর তেমনি মুসলমান সমাজে তাহা অল্প। তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, হিন্দভ্রাতৃগণের উন্নতি দেখিয়া আমি হিংসা করিতেছি বা তাঁহাদিগকে থামিতে বলিতেছি। যদি তাহা হয় তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে, আমি বঙ্গ সাহিত্যের শত্রু। মুসলমানগণ এখনও ছোটগল্পের দিকে আকৃষ্ট হইবার মত আয়োজন করিয়া উঠিতে পারে নাই। কারণ তাহারা এখনও সাহিত্যের নিম্নস্তরে। সাহিত্যের যে বয়সে নভেল বা উপন্যাসের একচ্ছত্র আধিপত্য হয় সে বয়স গল্পলেখার বয়সের বহু পূর্বে। স্মরণ রাখা উচিত, পূর্বেই বলিয়াছি, সাহিত্যের ইতিহাসের বয়স উপন্যাস বা গল্প দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায় না। যদি এই যুগে কেবলই উপন্যাস আর পরযুগে কেবলই গল্প রচিত হয় তবে উপকারিতার গুরুত্ব হিসাবে উপন্যাসের যুগ এবং গল্পের যুগ বলিয়া সাহিত্যের ইতিহাস নির্দেশ করা যায়। এক যুগে উপন্যাসের যেরূপ উপকারিতা অন্য যুগে তেমনি গল্পের উপকারিতা—এই হিসাবে পূর্বের যুগটা উপন্যাসের এবং শেষের যুগটা গল্পের বলা যায়। যদিও ইহা শেষ কথা নয়। তাই বলিতেছি, মুসলমান সাহিত্য এখনও উপন্যাসের পালা শেষ করিতে পারে নাই এবং হিন্দু সাহিত্য সে বয়স ছাড়াইতে না ছাড়াইতে ছোটগল্প আরম্ভ করিয়াছে। যে সাহিত্য দুইটি সমাজের হাব-ভাব সুখ-দুঃখের ছবি লইয়া পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে—সে সাহিত্যে একটা সমাজের লেখনী অন্য সমাজের লেখনীকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছে ; কিন্তু ইহাতে বাংলা সাহিত্যকে সুন্দর, সুষ্ঠু, সবল, পূর্ণ বিশ্বসাহিত্যে পরিণত করিতে বহু বিলম্বের দরকার।

এই দুইটি সমাজ যে একে অপরকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছে তাহার একটা কারণ—হিন্দুসমাজ বহুপূর্বে শিক্ষিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে ও তাহাদের অদম্য অনুকরণ-স্পৃহা—মুসলমান সমাজ অতীব দীর্ঘসূত্র, প্রাচীন গৌরবের চর্বিতচর্বণপ্রিয় ও বর্তমান অবস্থায়

নিরতিশয় তুষ্ট। উভয়ের দোষই অমার্জনীয়—অবশ্য হিন্দু সমাজের কেবলমাত্র বেমালুম অনুকরণ-প্রবৃত্তি অতীব দূষণীয়—তাহারা বহু পূর্বে শিক্ষামন্দিরে জ্ঞানার্জনের জন্য নিরত হইয়াছে সে ত আনন্দের কথা।

৬

বঙ্গসমাজ, কি হিন্দু, কি মুসলমান, অত্যন্ত প্রাচীন আচারাবলম্বী। মৃত্যু স্বীকার তবু আচার পরিত্যাগ অসম্ভব। আচার তাহার অভ্যাসগত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে অন্ধের মত আঁকড়িয়া আছে—কেন করিতেছে অনেক সময়েই তাহার উত্তর নিজেরা জানে না। সেই অভ্যাস দূরীভূত করিতে হইলে কেবল বক্তৃতা, গল্প, উপন্যাস বা ধর্মপ্রচারের সাহায্যে হইবে না। তাহার জন্য মনকে চলৎশক্তিযুক্ত করিতে হইবে। মনের সচলতা সমাজকে জাগরিত করিয়া তুলিবে—সেটা শিক্ষাসাপেক্ষ। সুতরাং শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের মধ্যে সমাজের অভ্যস্ত আচারের বিভীষিকাময় ফল দেখাইতে পারিলে যথেষ্ট ফল হইতে পারে। তাহার পর ছোটগল্পের সম্ভার যদি শিক্ষিত সদাকর্মনিরত সমাজের নিকট উপস্থিত করা হয় তাহা হইলে তাহাদের মন গল্পের সাহায্যে ক্ষুধানিবৃত্তি করিবে। সে গল্পগুলি যতদূর সম্ভব বাস্তব ও দৈনন্দিন জীবনব্যাপার লইয়া রচিত হওয়া আবশ্যক। যথা—সুখ কিভাবে কোন মানুষকে চালিত করিতেছে? দুঃখের প্রকৃত লাভ কি? পশুপক্ষী বৃক্ষ-লতার সঙ্গে মানুষের দৈনিক কাজের সম্বন্ধ কিরূপ? বিশ্বের অণুপরমাণু ক্ষুদ্র মহৎ প্রাণী অপ্রাণীর সহিত আমাদের অন্তরগত সম্পর্ক কতটুকু ও কি-প্রকারের? ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান উদ্দেশ্য করিয়া বাস্তব ঘটনার অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া গল্প রচনা করিলে পাঠকের হৃদয়ে সাড়া জাগিয়া ওঠে ও শ্রম করিয়া অর্থান্বেষণ করিতে গিয়া বিশ্বপালকের কথা মনে করে ও মুহূর্তের জন্য সেই দিকে নত হইয়া পড়ে। আত্মা সবল সজাগ হইয়া ওঠে। এই একটা মহালাভ। এই একটা উদ্দেশ্য ছোটগল্পের থাকা উচিত। ধর্মতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশিষ্ট শাখা—যাহা প্রকৃত জীবনের সঙ্গে বিজড়িত—ভিত্তি করিয়া ছোটগল্প রচনা করিলে বাংলা সাহিত্য প্রকৃত সাধনার দিকে অগ্রসর হইবে।*

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৬।

---

* কলিকাতার সিদ্দিকিয়া ছাত্র-সাহিত্য-সমিতিতে পঠিত।

ফ্রেড্রিক লিস্ট ও তৎকালীন জার্মানি

অর্থনীতির ইতিহাস পড়িতে গিয়া লিস্টের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের আদর্শ তদানীন্তন জার্মানির রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক অবস্থার মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তিনি অর্থনীতি সম্পর্কে যে সমস্ত পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন তার অধিকাংশই জার্মানির আর্থনীতিক (Economic) অবস্থাকে পূর্ণভাবে সংস্কার করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত। সমসাময়িক অবস্থা কি-প্রকারে তাঁহার জীবনের গতি ফিরাইয়া দিয়াছিল এবং কি-প্রকারে তাঁহার পর্যবেক্ষণ-রত অন্তরকে স্বকীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিক হইতে ভুলাইয়া লইয়া দেশের মঙ্গলের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিল তাহাই আমাকে অতি নিবিড়ভাবে অভিভূত করিয়াছিল। সেজন্য আজ আমি লিস্টের জীবন লইয়া আলোচনা করিতে বসিয়াছি। বিশেষত তাঁহার লেখনী প্রসূত প্রসিদ্ধ National System-এর প্রভাবে 'পুরাতন জার্মানি' কতদূর অভিনব জার্মানি হওয়ার দিকে অগ্রসর হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য করিবার সময় আমাদের সোনার ভারতের দুঃখ-দৈন্য-দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বর্তমান অবস্থার কথা মনে হয়। তৎকালীন অর্থাৎ বিগত ১৮০০ অব্দের জার্মানি যেরূপ ইকনমিক দুরবস্থায় পড়িয়া দেশ ও জাতি হিসাবে নিজের অস্তিত্ব হারাইতে বসিয়াছিল, তদ্রূপ এমনকি তদপেক্ষা অধিকতর দুরবস্থা ও দুর্দিনের মধ্যে ভারত আজ নিজের জীবন টানিয়া চলিয়াছে। ধন্য ভারতের ধৈর্য ! লিস্ট সেই দুরদৃষ্টের সময় নিজের পূর্ণশক্তি নিয়োগ করিয়া জার্মানির জাতিত্ব ও স্বাধীন স্ফূর্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি বিদেশের দৃষ্টান্ত দ্বারা এবং স্বীয় অভিজ্ঞতা-বলে জার্মানিকে কৃষি হইতে শিল্প-বাণিজ্য একাধারে অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে আমরা দেখিতে পাইয়াছি, তাঁহার সনির্বন্ধ অনুরোধ ও বিরামহীন অক্লান্ত পরিশ্রমের সাফল্য কতদূর জার্মানির সমৃদ্ধিপূর্ণ সুপ্রসন্ন অদৃষ্টমার্গে প্রকটিত হইয়াছিল। যখন সমগ্র জার্মানি ইউরোপের অন্যান্য শক্তি ও আমেরিকার বাণিজ্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল—যখন জার্মানি কেবল কৃষিলব্ধ উৎপন্ন হইতে নিজের অভাব নিবারণ করিতেছিল—আচ্ছাদন ও যাবতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়াছিল—তখনই লিস্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের কি ঈদৃশ অবস্থা নয়? ভারত কৃষিজাত নগণ্য উৎপন্নের উপর নির্ভর করিয়া আজ বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা কবুল করিতেছে। তাই দেখিতে পাই, জাপান চোখে ঠুসি দিয়া কোলের ভাত কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে। ইংলন্ড আসিয়া উদর শূন্য রাখিয়া রুগ্নদেহের ক্ষুব্ধ সৌন্দর্য ফুটাইয়া দিতেছে। আমেরিকার সুযোগও কম নয়। সকলেই দেখুন ভারতের কেমন মজার হিতৈষী ! আমাদেরও এইরূপ লিস্টের আবশ্যক আছে।

এখন লিস্টের জীবন-বৃত্তান্ত কি, দেখা যাউক। লিস্টের জীবন খুব ঘটনাবহুল না হইলেও খুব ঘাতসহ স্বদেশ-হিতৈষী ও সহৃদয়। তিনি একদিকে যেমন রাজনৈতিক নির্যাতন সহজ

নির্বিকারচিত্তে সহ্য করিতে অকুণ্ঠিত ছিলেন অন্যদিকে তেমনি দৃঢ়সঙ্কল্প ও দেশের মানুষকে বৃহৎ মানুষে পরিণত করিবার জন্য সতত উপায়-উদ্ভাবনশীল ছিলেন। দেশের অভাব দূরীকরণ-কল্পে নিজের জন্মভূমিকে শক্তিসম্পন্না করিবার জন্য তিনি কত না প্রয়াসই করিয়াছেন ! সামান্য অভাব হইতে বৃহত্তর অভাব জাগাইয়া তুলিবার জন্য এবং সেই বৃহত্তর অভাবকে নিরাকরণ করিবার মত সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেশের মধ্যে সৃষ্টি করিবার জন্য তাঁহার জীবনকে তিনি পূর্ণরূপেই নিযুক্ত করিয়াছিলেন। জীবনে কোন সুযোগই তিনি নিরর্থক চলিয়া যাইতে দেন নাই। সুদূর আমেরিকায় যখন নির্বাসিত হইয়াছিলেন তখনও সেখানে মার্কিনদের অবিরাম কর্মরত জীবনের মধ্যে অর্থনীতির বাস্তব মূর্তি দেখিতে পাইয়া তিনি স্বীয় জন্মভূমির উন্নতি সাধনার্থে নিজেকে বিশেষরূপে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। নির্বাসনের ক্ষোভ তাঁহাকে একদিনও নিজের আত্মশক্তি ও দৃঢ়সংকল্পকে খর্ব করিতে পারে নাই। তিনি সহজ গতিতে আপনার কাজে আপনাকে অনন্যমনা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ওয়ার্টেম্বার্গের অন্তর্গত রুটলিনগেন নগরে ফ্রেড্রিক লিস্ট জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সে তিনি সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ লাভ করেন। শীঘ্রই স্বীয় পরিশ্রম ও শক্তি বলে একটা সম্মানজনক উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদা টুবিনগেন ইউনির্ভাসিটিতে কতকগুলি প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং ১৮১৮ অব্দে তিনি ঐ ইউনির্ভাসিটিতে রাস্ট্রনীতির অধ্যাপকের পদপ্রাপ্ত হন। ঐ পদে অবস্থানকালে তিনি ওয়ার্টেম্বার্গের আমলাতন্ত্রকে কটাক্ষ করিয়া প্রচলিত শাসন-প্রণালির অনেক অপকারিতা প্রদর্শন করেন। তখন জার্মানিতে বুরোক্র্যাসির কঠোর নিয়ম প্রচলিত ছিল। তিনি বুরোক্র্যাসিকে ধ্বংস করিয়া তাহার পরিবর্তে লোকমত-প্রতিষ্ঠিত রাস্ট্রতন্ত্রের (constiutional monarchy) প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য খুব আলোচনা করেন। ঈদৃশ প্রচলিত তন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট লিস্টের নিকট কৈফিয়ত চাহেন। ইহাতে আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় এবং স্বাধীন মত প্রচারে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় তিনি অধ্যাপক পদ ত্যাগ করেন, এবং ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির বাণিজ্য ও শিল্প সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল প্রাদেশিক শুল্ক বন্ধ করিয়া জার্মান-সীমান্ত শুল্কের প্রচলন। অতঃপর তিনি ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে রুটলিনগেনের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন। তিনি ঐ নগরে এক বক্তৃতায় নানারূপ বিস্ময়কর সংস্কারের কথা বলিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে রোড-সেস, অধিকাংশ রাজকীয় শিল্প, ভূমির কর, বহুবিধ দ্রব্যশুল্ক ইত্যাদি বন্ধ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সর্বসমক্ষে জুরির সাহায্যে বিচারের প্রতিষ্ঠা ও আমলাতন্ত্রে আমলাগণের সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। বুরোক্র্যাসিতে শাসনক্রিয়া নির্বাহ করিতে যে বহুল পরিমাণ ব্যয় আবশ্যক এবং ইহাতে সাধারণ প্রজার উৎপাদনশক্তি কেমন করিয়া যে ক্রমশ কমিয়া যায় তাহা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইয়াছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ট্যাকস প্রচলন করিবার জন্য তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল। সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতার সাহায্যে প্রচার করিয়া দেশের মত দৃঢ় করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমস্ত প্রদেশের গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রচলিত আমলাতন্ত্রের ও শাসনপ্রণালির এবং বিচারালয়ের বিচারকদের নানারূপ অপব্যবহার ও অপক্রিয়া বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়া এক

আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে কর্তৃপক্ষ নিরতিশয় উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে পার্লামেন্ট হইতে বহিষ্কৃত হইয়া দশ মাস কাল কারাবাসের আদেশ প্রচার করেন। অবশেষে কর্তৃপক্ষ দেশ ত্যাগ করিবার শর্তে তাঁহাকে স্বাধীনতা প্রদান করেন। লিস্ট তাঁহার জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া আমেরিকায় চলিয়া যান।

তথায় পেনসিলভ্যানিয়ার অন্তঃপাতী হ্যারিসবার্গে একটা গোলাবাড়ি ক্রয় করিয়া লিস্ট একটি সংবাদপত্র পরিচালনায় মনোযোগ দেন। এই সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় গুরুভার গ্রহণ করিয়াও তিনি নানাপ্রকার ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হন। অতি অল্পকাল মধ্যে কয়লার খনি ও রেলওয়ে সম্পর্কে কিছু ব্যবসায়ের দ্বারা বেশ আর্থিক অবস্থাও সচ্ছল করিয়া লন। অতঃপর রিডিং শহরে তিনি National Zeitung নামক অন্য এক নূতন পত্র প্রচার করেন। ইহাতে অবাধ বাণিজ্য সমর্থন করিয়া তিনি কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি ১৮২৭ অব্দে এই প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন। এই পুস্তক তাঁহাকে খ্যাতনামা আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটনের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিয়াছিল। এই পুস্তকে তাঁহার বিখ্যাত National System-এর সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার অর্থনীতি অনেকাংশে তৎকালীন আমেরিকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও হ্যামিলটনের মত দ্বারা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছিল। প্রধানত বাহিরের যুবক কর্মী প্রবহমান ইকনমিক স্রোত তাঁহাকে প্রবলভাবে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। তিনি এই প্রভাব সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন, "আমেরিকায় থাকিয়া আমি একটা ধারণা খুব স্পষ্টরূপেই পাইয়াছি, কেমন করিয়া প্রতিদিন একটা জাতির ইকনমিক অবস্থা পরিবর্তিত ও বিকশিত হইতে পারে। সেখানে থাকিয়া বুঝিতে পারিয়াছি শিল্পবাণিজ্য-প্রধান দেশের সঙ্গে কৃষি-প্রধান দেশের পার্থক্য কত দূর। আমার সমস্ত বুদ্ধি আলোড়িত হইয়া গিয়াছে।"

১৮৩২ অব্দে তিনি আমেরিকার কনসাল হইয়া লাইপজিগ্ শহরে পদার্পণ করেন। দেশে তাঁহার অভ্যর্থনা অতীব শোচনীয় হইয়াছিল, তবু তিনি পুনরায় আমেরিকায় ফিরিয়া যান নাই। তিনি এবার সমগ্র জার্মান দেশের এক বৃহৎ রেলওয়ে প্রতিষ্ঠা-কল্পে কতকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। অবশেষে ১৮৪১ অব্দে তাঁহার National System প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

১. বহির্বাণিজ্য ও বৈদেশিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সার্থকতা কি?

২. বাণিজ্য ও শিল্পে গভর্ণমেন্টের কর্তব্য কতদূর?

৩. জার্মানির আভ্যন্তরীণ শুল্ক ও তাহার একসমতা কিরূপে হইতে পারে?

এই National System-এ যে সমস্ত নীতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, জার্মানির তদানীন্তন অবস্থা সেগুলিকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল তাহাই দেখিয়া আমরা লিস্টের কয়েকটি আবশ্যকীয় উক্তি দ্বারা বর্তমান প্রস্তাবনার উপসংহার করিব। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আদম স্মিত প্রমুখ অর্থনীতবিদগণের অবাধ বাণিজ্যনীতি ক্রমশ প্রত্যেক দেশে সর্বকালের জন্য একটি পবিত্র সংস্কার-রূপে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার বিরুদ্ধে কাহারও কোন

কথা বলিবার সাহস ছিলনা। কি জার্মানি, কি ইংলন্ড, কি রুশিয়া, কি ফ্রান্স সর্বদেশেই এই নীতির নিদারুন একচ্ছত্রাধিপত্য বিরাজ করিতেছিল। অর্থশাস্ত্রকারগণও এই নীতিকে বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা সত্ত্বেও কিন্তু বস্তুত সকল গভর্ণমেণ্ট তখনও এই নীতির প্রচলন করে নাই। কেবল প্রুশিয়াতে ১৮১৮ অব্দে এবং হাসকিশন কর্তৃক ইংলন্ডে ১৮২৪ অব্দে এই নীতি আংশিকভাবে প্রচলিত হইয়াছিল।

অনন্তর জার্মানিতে এক অভিনব নীতির আবির্ভাব হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জার্মানির ইকনমিক ও পলিটিকাল অবস্থা এই নীতি প্রচারে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছিল। লিস্ট এই নবনীতি নির্ভীকচিত্তে সমর্থন করিয়া National System –এ New Protection (নব বিধিবদ্ধ বাণিজ্য) নামে অভিহিত করিলেন। ইহার মুখবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "এই প্রণয়নের ইতিহাস আমার অর্ধজীবনের ইতিহাস।" তিনি যথার্থই বলিতে পারিতেন যে, ১৮০০ অব্দ হইতে ১৮৪০ অব্দ পর্যন্ত ইহা জার্মানির ইতিহাস। লিস্টের এই পুস্তক জার্মানির পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফল। ইহা ইকনমিক ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্মানির মানসপটে এক অপূর্ব ছবি খুলিয়া ধরে। অধিবাসী লোকসমূহ কৃষিজীবী ছিল এবং বিভিন্ন রাজ্যসমূহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কোন রাজ্যের সঙ্গে কাহারও কোন প্রকার ইকনমিক বা পলিটিকাল সংযোগ বা সংহতি ছিল না। শিল্প নানা প্রকার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। স্ফূর্তি লাভের কোন সুযোগ পাইত না। কৃষি তখনও সেই ফিউডাল যুগের প্রবীণ ও বৃহৎ চাপে নিপীড়িত হইতেছিল। এই সমস্ত বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া জার্মানি বিগত ৩০ বৎসর হইতে ইকনমিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতের সমুদয় শিল্পশক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিয়াছে। ইংলন্ড ও স্কটলন্ডের মধ্যে সখ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গ্রেট বৃটেনের উন্নতির পথ প্রশস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু জার্মান রাজ্যসমূহের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য বশত শিল্প প্রভৃতি বিবিধ প্রকার শুল্ক বহন করিতেছিল। সুতরাং অন্যান্য দেশ যখন শিল্প বাণিজ্য ও বিজ্ঞান আলোচনায় প্রবৃত্ত, জার্মানি তখনও তাহার অভ্যন্তরীণ শত প্রকার শুল্ক নির্ধারণ করিতে ব্যস্ত। এতদ্ব্যতীত সেখানে আমদানি দ্রব্যের উপর কোন শুল্ক না থাকায় অসুবিধা আরও অধিকতর বর্ধিত হইয়াছিল। ইহাতে জার্মানির রাজ্যসমূহের কোন সৌহৃদ্য কিংবা বিশেষ কোন কেন্দ্রশক্তি ছিল না বলিয়া জার্মানি বহির্জাতির জন্য উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

ইংলন্ড তখন সুযোগ পাইয়া জার্মানির সর্বত্র শিল্পজাত দ্রব্যে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। জার্মান বণিক ও শিল্পীগণ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। চতুর্দিক হইতে ইকনমিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষার স্রোত প্রবাহিত হইল। ৬৭ প্রকারের শুল্কের পরিবর্তে এক প্রকার শুল্ক প্রচলন করিবার জন্য সাধারণ লোকমত প্রকাশ পাইল। ইকনমিক সংস্কার না হইলে পলিটিকাল ঐক্য সম্ভবপর হইবে না, ইহা সকল রাজ্যের মধ্যে প্রচারিত হইল। প্রুশিয়া সর্বপ্রকার শুল্ক নিবারণ করিয়া এক ইকনমিক ঐক্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিল ; কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে কোনরূপ সংস্কারের চিহ্ন দেখা গেল না বলিয়া প্রুশিয়ার সংস্কার-আদর্শ কার্যকর হইল না। সংস্কার-চিৎকার ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অতঃপর ১৮১৯ অব্দে

ফ্রাঙ্কফোর্টে শিল্পী ও বণিকগণের একটা সাধারণ সমিতি গঠিত হইল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল গভর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করিয়া সংস্কার আনয়ন করা। ফ্রেড্রিক লিস্ট এই সমিতিতে সর্বান্তকরণে যোগদান করিয়া সমিতিকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। তিনি এই সমিতির যাবতীয় অনুষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। এই সমিতির সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইয়া তিনি কত প্রবন্ধ ও আবেদন-পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বিভিন্ন রাজ্যের গভর্ণমেন্টের নিকট তিনি সমিতির মুখপাত্র হইয়া কত বিষয়ে সুন্দর সুশৃঙ্খল অভিজ্ঞতা প্রচার করিয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু তাঁহার সকল প্রয়াসই অতি নির্দয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের রাজকীয় কেন্দ্রশক্তি লোকমতের আবির্ভাব হইতে দেখিয়া সমস্ত আবেদন নিবেদন অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছিল। তখন নাচার হইয়া লিস্ট অন্য ব্যাপারে মনোনিবেশ করিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, তিনি এই সময়ে রাজদন্ডে দন্ডিত হইয়া মাতৃভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিয়ৎকাল ফ্রান্সে আশ্রয় লইয়া ইংলন্ড, সুইজারল্যান্ড পরিভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরেন। পুনরায় দন্ডিত হইয়া আমেরিকায় নির্বাসিত হন।

১৮৩২ অব্দে আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া লিস্ট দেখিলেন যে, ইকনমিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বেশ একটা তীব্র প্রয়াস চলিতেছে। শীঘ্রই রাজ্যের মধ্যে দুই একটা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। দুই একটা রাজ্য সম্মিলিত হইয়া পরস্পর অবাধ বাণিজ্যের প্রচলন করিল। এইরূপে ১৮৩৪ অব্দে জার্মানির সমুদয় রাজ্য সম্মিলিত হইয়া ইকনমিক ঐক্য দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করিল। এই সাম্রাজ্যব্যাপী ঐক্যের নাম হইল Zollverein (ইকনমিক সংহতি)। এই যোলভারেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহকে একই ইকনমিক স্বার্থে গ্রথিত করিয়া ফেলিল। আভ্যন্তরীণ বাজার প্রশস্ত হইয়া পড়িল এবং শিল্পবাণিজ্য হুবহু বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময়ে আর একটা অভাব অনুভূত হইল। বৈদেশিক প্রতিযোগিতা ক্রমশ প্রবলতর হইতে লাগিল। দেশীয় বণিক ও শিল্পীগণ একচ্ছত্র শুল্কের জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। বৈদেশিক প্রতিযোগিতাকে ধ্বংস করাই তাহাদের উদ্দেশ্য হইয়া পড়িল। লৌহশিল্প ও বস্ত্র-বয়নের উপর বৈদেশিক শিল্পীদের অধিকতর দৃষ্টি ছিল। সুতরাং ঐ শিল্পসমূহ রক্ষা করিবার জন্য একদল দেশীয় ব্যবসায়ী বিধি প্রচলন পক্ষে মত প্রচার করিতে লাগিল। লিস্ট এই উত্তেজনার মধ্যে তাঁহার National System প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি বিধিবদ্ধ সবাধ বাণিজ্য সমর্থন করিয়া যুক্ত জার্মানিকে তদনুযায়ী অবাধ বাণিজ্যের গতিরোধ করিয়া সবাধ বাণিজ্যের প্রচলন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই স্থানেই বেশ বুঝা যাইতেছে, সমসাময়িক জার্মানির অবস্থাই লিস্টের National System প্রণয়নের অন্যতম কারণ। ইংলন্ড তাহার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা, সুবিস্তীর্ণ উৎপাদক যন্ত্র এবং অজস্র উৎপন্ন দ্রব্য লইয়া জার্মানির শিশু শিল্পকে বিষমভাবে আঘাত করিতে লাগিল। এই ব্যাপারই লিস্টকে এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম লইতে দেয় নাই। কি-করিয়া ইংলন্ডের নিদারুণ প্রতিযোগিতার নিষ্ঠুর নিষ্পেষণের আঘাত হইতে জার্মানির শিল্পকে বাঁচাইয়া জার্মানিকে শিল্পশক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবার সুযোগ দিতে পারা যায়, এই চিন্তায় লিস্ট সতত লিপ্ত ছিলেন। তিনি দেখিলেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা ইংলন্ডের বিরুদ্ধে শুল্ক-যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। অতএব তিনিও

সবাধ বাণিজ্য প্রচার করিলেন। আধিপত্যের নৃশংসতা ইংলন্ড আর বেশিদিন প্রচার করিতে পারিল না। জার্মানিও শুল্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজের সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের প্রকৃতির বিপুল দান ও সুবোধ শ্রমশীল জনসঙ্ঘ লইয়া আত্মস্ফূর্তিতে মনোযোগ দিল।

সুবিশাল ভারতবর্ষ এখনও পরমুখাপেক্ষী। অজস্র নৈসর্গিক সমৃদ্ধি, কোটী কোটী নরনারী, দিগন্তব্যাপী বিস্তীর্ণ প্রদেশসমূহ লইয়া ভারত এখনও নিজের এতটুকু অভাবের জন্য পরের নিকট হাত পাতিয়া রহিয়াছে। ভারতের অধিবাসিগণ শ্রমশীল ও সহিষ্ণু, ধীর ও বুদ্ধিমান, তবুও সে আজ তাহার শ্রমলব্ধ ফল ভোগ করিতে পারিতেছে না। তাই বলি, আসিবে কি সেদিন যেদিন দেখিতে পাইব—ভারতে 'যোলভারেন' সৃষ্টি হইয়াছে, বৈদেশিকেরা শোভাযাত্রা করিয়া ভারতের উপকূল ত্যাগ করিতেছে, দেশের শিল্পী-বণিকেরা সমগ্র ভারত শিল্প-বাণিজ্য সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, অন্তর-শিল্প-বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের স্ফূর্তি সাধনার্থে একমত হইয়া বৈদেশিক দ্রব্যের উপর শুল্ক চাপাইয়াছে—আত্মতুষ্টির জন্য আর পরমুখাপেক্ষী হইতেছে না? গভর্নমেন্টের নিকট আবেদন নিবেদনে সমস্তই বিফলে যাইবে। লিস্টের জীবনে আমরা তাহা সুস্পষ্টই দেখিতে পাইয়াছি। আবেদন নিবেদনে অন্তরের দৈন্য কখনও বিদূরীত হয় না। একমাত্র দেশের শিল্পী বণিকদের স্বাধীন প্রয়াসই সেই ভারত যোলভারেন গঠন করিতে পারিবে।

লিস্টের নিম্নলিখিত উক্তিগুলি হইতে আমরা অনেক উপদেশ পাই।

১. ধন অপেক্ষা ধন-সৃজনকারী শক্তি অধিকতর আবশ্যকীয়।

২. সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট শিল্পনৈপুণ্য এবং যুক্ত উৎপাদনের শক্তিসমূহ আয়ত্ত করিতে হইলে বর্তমান ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ পরিত্যাগ ও উৎসর্গ করিতে হয়। কোন জাতির ভবিষ্যত সুখ-সুবিধা বাঁচাইতে হইলে বর্তমান সুখকে উৎসৃজন করিতে হয়। নতুবা জাতির ভবিষ্যত অন্ধকারময় থাকিয়া যায়।

৩. একটা জাতির যত প্রকার উৎপাদিকা শক্তি আছে তন্মধ্যে শিল্পই সর্বপ্রধান; কারণ শিল্প জাতির নৈতিক শক্তিকে প্রচুরতমভাবে প্রখর করিয়া তোলে। যে দেশ শিল্প-বাণিজ্যে রত রহিয়াছে সেখানে দৈহিক ও মানসিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্য একটা অক্লান্ত প্রয়াস, প্রতিযোগিতা ও স্বাধীনতার একটা অনন্ত আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়। আবার যে দেশ কেবলমাত্র নগ্ন কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকে সেখানে মানসিক দৈন্য, অবসাদ ও ঔদাসীন্য, দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা, প্রাচীন সংস্কার, প্রথা, ধারণা ও প্রণালির উপরে দৃঢ় আস্থা, উৎকর্ষ, উন্নতি ও স্বাধীনতার অভাব সম্পূর্ণরূপে বিরাজ করে। শিল্প দেশের উৎপন্ন সুচারুরূপে ব্যবহার করিতে পারে; দেশের জল, বায়ু, অগ্নি ও ধাতু উৎপাদনের সাহায্যে নিযুক্ত হইতে পারে; শিপ থাকিলে কৃষি অতি প্রবলভাবে স্ফূর্তিলাভ করে—ইহা শতমুখী হইতে থাকে—কৃষকেরা নূতন নূতন দ্রব্য উৎপাদনে নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি ব্যয় করিবার সুযোগ পায়। দেশের মধ্যে যদি বিবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠান বর্তমান থাকে তাহা হইলে দেশীয় কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়ার্থে বিদেশে প্রেরণ করিবার প্রয়োজন হয় না। যুদ্ধ কিংবা

বৈদেশিক শত্রুতা কিছুতেই কৃষি ধ্বংস করিতে পারে না। শিল্পের অস্তিত্বে জমির খাজনা বৃদ্ধিলাভ করে, শ্রমজীবিরা অধিক বেতন ভোগ করিতে পায়—ইহাতে কৃষিজাত দ্রব্যের প্রয়োজন অধিক হয়। সুতরাং কৃষি ক্রমশ উন্নতিলাভ করে। কৃষিজাত দ্রব্যের কাটতি বেশি হইলে দেশের ভূমিসকল নানাপ্রকার দ্রব্য উৎপাদন করিবার জন্য প্রযুক্ত হয়। ইহাতে দেশের লোকসংখ্যার শ্রমবিভাগ ঘটে। প্রতি জেলা বা প্রদেশের মধ্যে লোকসংখ্যা সুন্দরভাবে ছড়াইয়া পড়ে। শিল্পের অবর্তমানে কৃষিজীবিরা একই গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকে ; নিজেদের অভাবানুযায়ী সামান্য সামান্য উৎপাদন করিয়া তাহা দ্বারা নিরিবিলি জীবনযাপন করিতে থাকে। ইহাতে ক্রমশ শ্রমস্পৃহা হ্রাস হইয়া যায়—প্রতিযোগিতার তেজ নির্বাপিত হয় এবং অবশেষে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা সমূলে বিনষ্ট হয়। ভারতের কৃষিজীবিরা কি ঈদৃশ অবস্থায় উপনীত হয় নাই? তাহারা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া সকল প্রয়াসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া চিরন্তন প্রথার দাস হইয়া বসিয়া আছে। ইহাদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বারান্তরে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

৪. বিশ্বজনের আঁতাত অর্থাৎ সর্বজাতির মধ্যে ঐক্য ও সখ্য স্থাপন করা একটা মহত উদ্দেশ্য। সকলেরই ইহা সংসাধনের চেষ্টা করা আবশ্যক। কিন্তু সকল দেশ বা সকল জাতি এখনও সম-অবস্থাপন্ন সম-শক্তিশালী হইয়া ওঠে নাই। যতদিন প্রত্যেক জাতি সর্বপ্রকার সাম্যের ক্ষেত্রে আসিয়া না দাঁড়াইবে, ততদিন বিশ্বজনীন একতা বা ভ্রাতৃত্ব সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং প্রত্যেক জাতির নিজেকে পূর্ণরূপে বিকশিত করিবার জন্য যত প্রকার প্রয়াস, যত্ন ও উদ্যমের প্রয়োজন হয় তাহা করা আবশ্যক।

৫. সমস্ত শিল্প সমভাবেই যে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইবে এমন নহে। কেবলমাত্র সর্বপ্রধান শিল্পগুলি বিশেষরূপে রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ সেগুলি অনেক ব্যয়সাপেক্ষ। বহু অর্থ, নৈপুণ্য, টেকনিক্যাল জ্ঞান, বহু অভিজ্ঞতা, বহু যন্ত্র ও বহু শ্রম তজ্জন্য ব্যয় করিতে হয়। প্রতিযোগিতার সম্মুখে পড়িয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইলে জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী। বিশেষত যে সমস্ত শিল্প প্রধান আবশ্যকীয় দ্রব্য উৎপন্ন করে এবং যে সমস্ত দ্রব্যের মূল্য জাতির স্বাধীনতা ও অভাব অনুপাতে অনেক বেশি, যথা—তূলা, পশম ইত্যাদি আচ্ছাদন-সম্পর্কীয় যাবতীয় শিল্পজাত দ্রব্য—দেশের মধ্যে উৎপাদন করা বিশেষ প্রয়োজন। বস্ত্রশিল্প একচ্ছত্রভাবে অবলম্বন না করিলে অচিরেই ভারতবর্ষকে সর্বস্বান্ত হইতে হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কারণ ভারতবর্ষ আজ সেই আচ্ছাদনের জন্য পরের শিল্পের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া আছে।

আর্থনীতিক স্বাধীনতা ফিরাইতে হইলে আচ্ছাদনের জন্য যত প্রকার শিল্প সম্ভবপর, সমস্তই ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। ঈদৃশ আর্থনীতিক দাসত্ব জাতির প্রাণহীনতার পরিচায়ক। ভারতের ব্যুরোক্রাসি আর কত দিন ভারতের শবদেহ পোয়াইতে থাকিবে? ভারতের আর্থনীতিক দৈন্যের রজনী কবে প্রভাত হইবে?

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৭।

ইনডাস্ট্রিয়ালিজম—যন্ত্রশিল্পপ্রবাহ
বা
কলের কারখানা

ইনডাস্ট্রিয়ালিজম-তত্ত্ব বিশ্বব্যাপী এক বিচিত্র মরীচিকাময় জালের সৃষ্টি করিয়াছে। আজ পৃথিবীর সকল মানুষ এই জালে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ এখনও সম্পূর্ণ ইহার মধ্যে আসিয়া পড়ে নাই, কিন্তু আসিবার জন্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীদের ইহা এক বায়ুতে পরিণত হইয়াছে। এই বায়ুগ্রস্ত হইয়া তাহারা কত না দুঃসাধ্য সাধন করিয়া সভ্যতার ডিগ্রী বাড়াইয়া তুলিতেছে। তাহারা এই ইনডাস্ট্রিয়ালিজম-প্রসূত সভ্যতাকে স্কন্ধে করিয়া বহুদিন হইতে আফ্রিকা ও এশিয়ায় প্রবর্তন করিতেছে। এশিয়া চিরচিন্তামগ্না স্থিরপ্রকৃতি বলিয়া অতি ধীরভাবে তাহা গ্রহণ করিতেছে। তাহার সে সভ্যতায় আস্থা জন্মিতেছে না। প্রথম প্রথম একটু প্রলুব্ধ হইয়া স্বীয় নিশ্চেষ্টতার উপর ধিক্কার দিয়া সে ইউরোপের হুবহু অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহার ফলে জাপান আজ ইউরোপের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষ এখনও স্থিরভাবে চলিয়াছে। কিন্তু ইহারই মধ্যে ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের পরিণতি যে আজ মানবের আত্মার পক্ষে স্বাস্থ্যকর ও কল্যাণকর নয়, তাহা আমাদের সাধক কবি ও ঋষি রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ একদিকে অন্তরদৃষ্টির বলে, অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধী স্বীয় কর্মবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সাহায্যে ঘোষণা করিয়াছেন। ইউরোপ এই বায়ুগ্রস্ত হইয়া গোঙ্গাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন সময় এই সার্বভৌম প্রবাহ সম্বন্ধে দু-কথা আলোচনা করা বোধ হয় নিতান্ত অসমীচীন হইবে না।

ক. আবির্ভাব

আজ যে ইনডাস্ট্রিয়ালিজম এক বিপুলশক্তি, সহস্র-শাখাবহুল, পূর্ণ-কলেবর হইয়া সারা দুনিয়া ঘিরিয়াছে তাহার আদি জন্মভূমি ইউরোপ। ইউরোপের ঠিক কোন স্থানে এবং ঠিক কোন সময় ইহার আবির্ভাব হইয়াছে সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা একমত নহেন। কেহ সেই বাল্টিক সাগরের উপকূল দেশসমূহে ইহার জন্মভূমি—খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী ইহার আবির্ভাব-কাল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমি যে ইনডাস্ট্রিয়ালিজম সম্বন্ধে বলিতে ইচ্ছা করিতেছি তাহার জন্মভূমি সাগর-বেষ্টিত ইংলণ্ড-ভূমি এবং খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহার সূত্রপাত হইয়াছে। ঠিক এই সময় কতকগুলি কারণের একত্র সমাবেশ হওয়ায় এই ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের আবির্ভাব অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ সমূহের মধ্যে বাষ্পীয় যন্ত্রের আবির্ভাব সর্বপ্রধান। একদিকে সাগরবক্ষে ধরাপৃষ্ঠে নব নব দেশ আবিষ্কার করিতে ইংলণ্ডের বক্ষ হইতে কত কত অসমসাহসিক পুরুষ জীবনপণ করিল—নানাবিধ যন্ত্র

আবিষ্কার করিতে দিবস-রজনী অদ্ভুত অধ্যবসায় অবলম্বন করিল। রাজপুরুষেরা বৈদেশিক বাণিজ্যের সুপ্রচলন উদ্দেশ্যে সাগরবক্ষে বাষ্পীয় জাহাজের গতি সহজ করিয়া দিল—স্থলদেশে বাষ্পীয় শকটের প্রবর্তন করিল—দেশ-বিদেশে লোক ছুটিল বৈদেশিকদের অভাব জানিতে। অন্যদিকে সকলে গৃহে বসিয়া নিরিবিলি দ্রব্য উৎপাদনে মনোযোগ দিল ও কেহ কেহ তাহা বহন করিয়া বিনিময় করিয়া বিদেশ হইতে খাদ্য আনয়ন করিতে লাগিল। সে সময় ইংলণ্ডে কৃষির অতি অবনতি সাধিত হইয়াছিল। গৃহশিল্প বৈদেশিক শিল্পের আঘাতে ধ্বসিয়া গিয়াছিল। ইংলণ্ড সে সময় বাল্টিক সাগরের উপকূল হইতে স্বকীয় আচ্ছাদন সংগ্রহ করিত। অতঃপর ভারতবর্ষের বাণিজ্য-পথ আবিষ্কৃত হইল। তখন ইংলণ্ড অগ্রণী হইয়া প্রাচ্যাভিমুখে ছুটিল, শিল্পের দিকে মনোযোগ দিল, কৃষির দিকে যত্নবান হইল। বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে শিল্প অধিকতর উন্নতিলাভ করিল। সহস্র গুণ অধিক দ্রব্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। প্রাচ্যের অধিবাসী স্বীয় কৃষিজাত দ্রব্যে জাহাজ পূর্ণ করিল। ইংলণ্ড জাহাজ ভরিয়া তাহার যন্ত্রজ দ্রব্য আনিয়া প্রাচ্যের উপকূল দেশে ঢালিয়া দিল। অমনি ভারতবর্ষ দু-হাত বাড়াইয়া তাহা তুলিয়া লইল—নিজের ঘরের শিল্প শিথিল হইয়া ভাঙ্গিয়া লুপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। কৃষির উপর সকল জুলুম চলিতে লাগিল। সেই অবধি ভারতবর্ষ কৃষির উপর নির্ভর করিয়া সকল অভাব জোগাইতে লাগিল। কৃষিজাত দ্রব্য বিনিময় করিয়া পাশ্চাত্যের হাল্কা বিলাসদ্রব্যে ঘরের শোভাবর্ধন করিয়া সভ্যতার দরজায় পৌঁছিল। তাহার পরিণাম-ফল বর্তমান ভারত খুব উপলব্ধি করিতেছে। ভারত বিদেশী সস্তা দ্রব্য পাইয়া নিজের সুন্দর গৃহশিল্প ছাড়িতে শুরু করিল। দেশীয় শিল্পীরা দ্রব্য তৈরি করিয়া বিদেশীয়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতে লাগিল। দেশের লোক যাহা ক্রয় করিত তাহা সস্তা হইলেই হইল। বিদেশীয়গণ খুব সস্তায় মাল যোগাইয়া দেশীয়দের উচ্চ মূল্যের দ্রব্যকে সরাইয়া দিল। দেশের লোক কৃষিজাত দ্রব্য বিনিময় করিয়া ঐ সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিতে লাগিল। ইহাতে কৃষির উপর চাপ পড়িল বেশি। কিন্তু কৃষির অবস্থাটা হইল এরূপ—মাটির বুক হইতে কৃষির দ্রব্য সংগৃহীত হয়। মাটি আর কুলাইবে কত। তার শক্তি এখন খোয়াইতে লাগিল। তার শক্তি বাড়াইবার জন্য কেহ আর কোন প্রায়সই করিল না। সেও কম যোগাইতে লাগিল। লোকের আবশ্যক হইলে ছুটিয়া মাটির নিকট যাইতে লাগিল, আর ক্রমশ ক্ষীণশক্তি মাটি দেওয়ার-মাত্রা প্রতি বৎসর কমাইতে লাগিল। বিদেশীরা ক্রমে মালের পরিমাণ বাড়াইল। দেশীয়রা নিজের খাদ্য কমাইয়া বিদেশীয়দের জোগান মালের মূল্য পূরণ করিতে গেল। দেশীয়রা ক্রমে শারীরিক শক্তি হারাইল। কোন লাভজনক দ্রব্য সংগ্রহ করিতে গিয়া ওদিকে কৃষকের হাত টানাটানি হইল। ব্যবসায়ীদের নিকট গিয়া ঋণে আবদ্ধ হইল। তার জের এখনও চলিতেছে। এই সমস্ত ইকনমিক স্রোতের মধ্যে ভারত-অদৃষ্টমার্গে এক স্বপ্নাতীত পলিটিক্যাল স্রোত আসিয়া মিশিল। ব্রিটিশেরা ব্যবসা করিতে জাহাজ হইতে উপকূলে নামিয়া বসবাস করিতে লাগিল। এদেশেও তাদের দেশ হইতে কল-কারখানা আনিয়া বসাইল। দেশের চতুর্দিক দেখিতে দেখিতে দেশের অন্তর দেখিতে শুরু করিল। তদানীন্তন রাজপুরুষেরা তাদের প্রতি কোনরূপ সন্দিহান হইল না। সরল মনে তাহাদিগকে অবাধ গতিতে চলিতে অনুমতি দিল।

ব্রিটিশ জাতি অনুসন্ধিৎসু, চিরচঞ্চল, অসাধ্যসাধন-তৎপর, কৌশলপরায়ণ, অপূর্ব অধ্যবসায়ী। সুতরাং সৌভাগ্যক্রমে আশ্চর্য কর্মকুশলতা-বলে ভারতবর্ষ তাদের কবলে আসিয়া গেল। ভারতের 'সোনা' ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। দেশীয়রা তাহা একেবারে বুঝিল না। তাদের মাটির মালের সঙ্গে সোনাও জাহাজে চালান হইয়া যাইতে লাগিল, তাহা দেশের লোক বুঝিয়াও বুঝিল না। এইরূপে প্রায় দুই শতাব্দী কাটিয়া গেল। ভারত এখন স্বর্ণ-গর্ভা হইতে শূন্যগর্ভায় পরিণত হইয়াছে। দেশের লোকের পেটে কিছু নাই, কেবল রহিয়াছে গায়ে বিদেশের দেওয়া সামগ্রী।

খ. স্ফূর্তি

ওদিকে ইউরোপ জাহাজ ভরিতে গিয়া কি অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা দেখা কর্তব্য। ইনডাস্ট্রিয়ালিজম সেখানে পুরা স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে। ইংলণ্ডের বুক হইতে সারা ইউরোপে ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের বীজ ছড়াইয়া গিয়াছে। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষও গজাইয়াছে। তাহার তলায় পড়িয়া সমস্ত ইউরোপ আজ জগতের অভাব যোগাইতেছে। বাষ্পীয় যন্ত্রের বহুল প্রচলনে হাতের কাজ সব কলের সাহায্যে উৎপাদিত হইতে লাগিল। কৃষিও কলের সাহায্যে সমৃদ্ধিলাভ করিল। দেশময় শহর গড়িয়া উঠিল। কিন্তু তাই বলিয়া কলের ভিতর হাতের স্থান একেবারে বিলুপ্ত হইল না, বরং আরও বেশি করিয়া লোকের দরকার হইল। কারণ একটা জিনিস তৈরি করিতে প্রায় একশত প্রকরণ আনয়ন করিতে হয়, তবে জিনিসের ফিনিশ হয়। এই একশতটা প্রকরণে কলের সাহায্য লাগাইতে একশতখানা হাতেরও দরকার। এইরূপে সকল গৃহের হাতের কাজের পরিবর্তে জটিল কলের কাজ আসিয়া ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের গোড়াপত্তন করিল। বস্তুত, সোজা কথায়, এই হাতের বদলে কলের প্রবর্তনই ইনডাস্ট্রিয়ালিজম।

এখন নব ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের ফলে কলের পিছনে হাতের সংখ্যা বেশি করিয়া আবশ্যক হইল। হাত কৃষির হাল ফেলিয়া কলের ভিতর ঢুকিল। কলের আওতায় আশে পাশে বহু হাতের আমদানি হইয়া শহর নগরের সৃষ্টি করিল। নগর ক্রমশ বাড়িয়া চলিল। গ্রাম, পল্লী শূন্য হইল। কলের মালিক কলের মধ্যে কোটি কোটি নরনারী ভর্তি করিয়া ফেলিল। কলের গঞ্জ হইয়া গেল। বাষ্পের অন্ধকারে কল আচ্ছন্ন হইল। আকাশ ছাইয়া গেল। প্রকৃতি চিরদিনের জন্য হতভাগ্যদের অদৃষ্ট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। সূর্যের আলোক ও চন্দ্রের কিরণের পরিবর্তে কলের আগুন আর তার কালো উদগার তাহাদের নিত্য সঙ্গী হইল। প্রাতে প্রকৃতির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে কলের যত নরনারী, বালক-বৃদ্ধ সকলে গৃহ ছাড়িয়া কলে ঢুকিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার হইলে গৃহে ফিরিতে লাগিল। সমস্ত দিন খাটিয়া কোন গতিকে দু-বেলা আহারের সংস্থান হইল। সঙ্গে স্ত্রীও কলের অন্যস্থানে কাজ জুটাইল। কুটিরে ফিরিয়া নিরানন্দ মনে সারাদিনের শ্রমের পর অতি নিষ্ঠুর নিবিড়তার মধ্যে রজনী প্রভাত করিতে অভ্যাস করিল। জীবনটা সমস্তই কলের মধ্যে উৎসর্গ করিয়া দিল শুধু দু-মুঠো আহারের জন্য। পল্লীর মুক্তগৃহ শূন্য করিয়া পল্লীবাসী শহরের কলে চাকরি পাইয়া জীবনটাকে কঠোর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া একেবারে কলের মালিকের নিকট বিক্রয় করিয়া বসিল। স্বাধীনতা

তার জীবন হইতে চিরদিনের তবে অবসর গ্রহণ করিল। শ্রমী স্ত্রী-পুরুষের দাম্পত্যজীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও কোথায় পলায়ন করিল, তাহা আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। একেবারে পশুর জীবনে পরিণত হইল। ইহার ফলে যে সমস্ত সন্তান-সন্ততি হইল তাহারা সেই জঘন্য অস্বাস্থ্যকর কুটিরে জন্মগ্রহণ করিয়া রুগ্ন ক্ষীণপ্রায় হইল। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কত কত প্রাণত্যাগ করিল। আর যাহারা বাঁচিল তাহারা যথেষ্ট আহার পাইল না। জননীর সোহাগ স্নেহ তাহাদের অদৃষ্টে লেখা নাই। তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া জননীকে পেটের আহার জুটাইতে কলে যাইতে হইল। সারাদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া শিশু অনাহারে শুকাইয়া গেল। এইরূপে দিবস রজনী এবং রজনী প্রভাত হইতে হইতে শিশু ৬।৭ বৎসরের হইল। অমনি তার পিতা হাত ধরিয়া তাহাকে কলের এককোণে বসাইয়া দিল দু-পয়সা রোজগারের আশায়। মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা একত্রে এখন রোজগার আরম্ভ করিল। কলের মালিক একেবারে সমস্ত পরিবারটির মালিক হইয়া বসিল। কলের মালিক গোটা মানবটা ও তার বিকাশের ক্ষেত্রটা একেবারে কলের ছায়ায় ঢাকিয়া রাখিল। মানুষটাও কলের এক নির্জীব অংশে পরিণত হইল। মানুষ শ্রমের ফল লইতে গিয়া তার ভিতরের সমস্ত অংশটাকে চাপিয়া রুদ্ধশ্বাস করিয়া মারিয়া ফেলিল। শরীরটাকে বাঁচাইবার জন্য শরীরটাকে খাটানই ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের মূলনীতি হইয়া দাঁড়াইল। তাই দেখিতে পাই পুত্র-কন্যা লইয়া পিতামাতা কতই শ্রম করিতেছে—ছেলেরা মেয়েরা কোন লেখাপড়া শিখিতেছে না—শিখিতেছে শুধু কল চালনার কায়দা। ইউরোপের কোটি কোটি নরনারী, লক্ষ লক্ষ পুত্র-কন্যা অতি শৈশব হইতে কলের মধ্যে ঢুকিয়াছে—পৃথিবীর মুক্ত হাওয়া, মুক্ত আলোক হইতে তাদের জীবন কোন রস উপভোগ করিতে পায় না। ইহাতে তাদের স্রষ্টা বিশাল রাজ্যের মানবের দলকে কেবল দু-মুঠা আহারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে দেখিয়া অপার সন্তোষ কি অনন্ত দুঃখে স্নেহের হাসি কি কৃপার হাসি হাসিতেছেন, তাহা আর কি করিয়া বলিব।

ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের স্ফূর্তি এইরূপে সমস্ত ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ায় ঘটিয়াছে। তাহারা কলের উপর হইতে অন্ধকার সরাইয়া আলোক ঢুকাইবার জন্য কত কত আইন সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু কলের মালিক অনড় অচল হইয়া নির্বিকারচিত্তে কল চালাইয়াছে। আলোক আর ঢুকিতেছে না। যে মানুষটা একেবারে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে তাহাকে উদ্ধার করিতে হইলে আইনের নিগড় সৃষ্টি করিয়া কি হইবে? আইনের খাতায় নিয়মের 'ফরমুলা' জারি করিলে কি ফল হইবে? মানুষকে উদ্ধার করিতে হইলে নূতন করিয়া মানুষ তৈরি করিতে হইবে। কলের মালিক ক্রমশ শক্তিমান হইয়া উঠিয়াছে—কল বড় হইতেছে—আর মানুষের সংখ্যা বাড়িতেছে—এইরূপেই ত ইনডাস্ট্রিয়ালিজম চরম স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে। শ্রমী শ্রেণী আর মালিকশ্রেণীর ভিতর ইনডাস্ট্রিয়ালিজম এক বিরাট পার্থক্যের মনুমেন্ট খাড়া করিয়াছে, এই ত ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের অপূর্ব কীর্তি। এই দুই শ্রেণী ক্রমশ এরূপ আকার ধারণ করিয়াছে—ভাবে এবং স্বার্থে—যে তাদের মধ্যে এখন এক অশান্তিকর বিদ্রোহের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। মালিক শ্রেণী শ্রমীকে চিরকাল কলের সঙ্গে যুক্ত করিয়া রাখিয়া স্বকীয় আধিপত্যের আনন্দ উপভোগ করিতে চায়, কিন্তু শ্রমী শ্রেণী ধৈর্য হারাইয়াছে, বুঝিতে পারিয়াছে তাহারা মানুষ—কল নয়। তাই তাহারা মালিক-শ্রেণীর সহিত সমান অধিকার চায়।

তাহারা বলিতেছে, "আমাদের শ্রম-বল লইয়া মালিক শ্রেণীর অর্থ দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের গৃধ্নুতা অসীম হইয়া উঠিয়াছে—আমরা পরিবার-শুদ্ধ শুকাইতেছি, আমরা জীবনের অবলম্বন হারাইয়া একেবারে কলের এক হাত হইয়া পড়িয়াছি—আমরা মানুষ। মানুষের জীবনযাপন করিতে চাই, আমরা কল হইয়া আর থাকিব না।" বস্তুত, কলের অদ্ভুত স্ফূর্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমীর যে অবনতি—নৈতিক সামাজিক ও পারিবারিক অবনতি, দুর্গতি, দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সহস্র প্রকারে ইউরোপের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রকটমান হইয়াছে। ইনডাস্ট্রিয়ালিজম বিকাশ লাভ করিয়া কৃতী হইয়াছে যতদূর, তদপেক্ষা মানবের অবনতি হইয়াছে অধিক। আধুনিক জগতের মানবের দুর্গতি ও দুরবস্থার জন্য ইনডাস্ট্রিয়ালিজম পুরামাত্রায় দায়ী।

গ. প্রভাব

মানুষ কেবল একটি রক্ত-মাংস-অস্থি-র সমষ্টি মাত্র নহে। তাহা হইলে আজ ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের ব্যবস্থা মানিয়া লওয়া যাইত। কিন্তু মানুষের অস্থি-মাংসের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী অন্তর-মানুষ আছে। তাহাকে উপেক্ষা করিয়া যাওয়ায় ইনডাস্ট্রিয়ালিজম মরণের পথ খুলিয়া বসিয়াছে। অন্তর-মানুষের মধ্যে যে অন্তঃকরণ আছে তাহার কোন স্ফূর্তিলাভের ব্যবস্থা করা ত দূরের কথা, তাহাকে সজোরে চাপিয়া মারিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে ইনডাস্ট্রিয়ালিজম। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, মানুষের অন্তর-মানুষটি এমনি একটা পদার্থ যে, তাহাকে যতই সজোরে মারিতে চাওয়া যাইবে ততই সজোরে সে বাঁচিয়া ভাসিয়া উঠিবার চেষ্টা করিবে। সকল কৃত্রিম শক্তিকে জয় করিয়া বাঁচিয়া ওঠাই মানুষের অন্তর-মানুষটির আসল প্রকৃতি, ইহা আমরা মানবের আদিম কাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি। যত যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিদ্রোহ-বিপ্লব, সমস্তই এই অন্তর-মানুষটিকে নিহত করিবার উদ্দেশ্যে সংঘটিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক স্থলেই ইহার জয়লাভ ও ইহার জীবন-লাভ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে।

বর্তমান জগতে ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের যুগে মালিক শ্রমীর অন্তর-মানুষটিকে কলের মধ্যে লইয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছে—কিন্তু আজ সেই অন্তর-মানুষটির উপরে উঠিবার প্রয়াস ঐ Socialism, Collectivism ও Bolshevism-এ প্রকাশ। ইউরোপে কত বীর পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া কলের মালিকের মালিকতার নিষ্ঠুর অত্যাচার ও আধিপত্যের নিদারুণ বেদনার কালিমা শ্রমীর হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য নানা সংঘ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাহার ফলে ইউরোপ এখন শ্রমী-কল-মুখরিত শ্রমীজনক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রমীরা দিবস-যামিনী ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা এতদিনে ভূমিহীন, গৃহহীন, অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। শুধু কলে খাটিয়া তাহাদের সমস্ত ধ্বংসমুখে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এতদিন তাহারা কেবল মালিকের মালিকতার ইন্ধন যোগাইয়াছে—তাহাদের অধীনতার অতিশয় ব্যবহার করিয়া—মালিকের শরীরে বলবৃদ্ধি করিয়াছে ও মালিকের মালিকতার পোষকতা করিয়াছে। মালিকের কর্তাগিরি মহাসুযোগ পাইয়া ক্রমশ উদ্ধতপ্রকৃতি হইয়াছে। একদিকে মালিকের নৃশংস ঔদ্ধত্য, অন্যদিকে শ্রমীর বাকহীন অসহায়তা ও আত্মহীন, দুঃখপূর্ণ জীবনের মৃত অস্তিত্ব। এই দুই

অসমান দৃশ্য হইতেছে বর্তমান ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের দুইটি যমজ সন্তান। ইহারা দুইজনে বর্তমান সমাজকে ওলটপালট করিয়া দিতেছে। উভয়ের মধ্যে ইনডাস্ট্রিয়ালিজম দুর্ভাগ্যবশত কোন সৌহার্দ্য সংস্থাপনের পরিবর্তে এক বৃহৎ বিরোধের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। এই বিরোধ এখন ইনডাস্ট্রিয়ালিজমকে হয় হত্যা করিবে, না হয় সংস্কার করিয়া নবজীবন দান করিবে।

এখন দেখা যাউক, ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের প্রভাব সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর উপর কিরূপ ফল প্রসব করিয়াছে। সমাজকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাউক—(১) উৎপাদক শ্রেণী, (২) ব্যবহারক ও ভক্ষক শ্রেণী, (৩) শ্রমী শ্রেণী। উৎপাদক শ্রেণী আবার তিনভাগে বিভক্ত হইতে পারে, যথা—(ক) কলের মালিক, (খ) ভূমির মালিক এবং (গ) কলের পরিচালক। কলের সাহায্যে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা সমাজের যাবতীয় শ্রেণীর পক্ষে সমান প্রয়োজনীয় নয়। যন্ত্রজ দ্রব্যের সমস্তই প্রায় বিলাস-সামগ্রী—মানুষের নিতান্ত আবশ্যকীয় সাধারণ গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কলের উপর নির্ভর না করিলেও চলে। বর্তমান জগতে নানাবিধ অভাব নিরাকরণের জন্য বিবিধ দ্রব্য কল সরবরাহ করিতেছে। কল যে সমস্ত দ্রব্য সৃষ্টি করিতেছে তাহা প্রধানত ধনী-শ্রেণীর জন্য। ধনীরা ঐ সমস্ত বিলাস-সামগ্রীতে স্ব স্ব গৃহ পূর্ণ করিতেছে ও স্ব স্ব শারীরিক শোভাবর্ধন করিতেছে। নির্ধন যৎকিঞ্চিত আহার ও যৎসামান্য পরিচ্ছদে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব দূরীকরণ করিতেছে।

সমাজ মোটামুটি ধনী নির্ধন, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, কল ধনীকে সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যসম্পন্ন করিতেছে, আর নির্ধনকে খাটাইয়া তাহাকে যারপর-নাই অপরিচ্ছন্ন অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় নিপতিত করিতেছে। ধনী ক্রমশ অধিকতর ধনী হইতেছে, আর নির্ধন ক্রমশ নিঃস্ব হইতেছে। স্বাস্থ্যহীন নির্ধন কল হইতে বিতাড়িত হইয়া পথের ভিখারি সাজিয়া বেড়াইতেছে। রাজপুরুষেরা অমনি তাহাকে Poor House কিংবা Hospital-এ লইয়া আবদ্ধ করিতেছে। গৃহহীন হইয়া, উলঙ্গ হইয়া কত শত নর-নারী আজ ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের কৃতিত্বকে উপহাস করিতেছে। কলের মালিক কল খাড়া করিয়া কোটি কোটি নর-নারী বালক-বালিকা নিযুক্ত করিতেছে। তাহারা শ্রম করিতেছে। তাহারা শ্রম করিয়া নানা দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে—কলের মালিক আমার বলিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া লইতেছে। তাহারা স্বয়ং উৎপাদক বলিয়া সমস্তই গ্রাস করিতেছে—আর কলের হাত মানবের দল শ্রমী-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া শুধু নির্দিষ্ট নির্ধারিত বেতন ভোগ করিতেছে, তাহাতে তাহাদের দিন চলুক আর নাই চলুক। কলের মালিক যন্ত্রজ সমুদয় সামগ্রী ভক্ষকের দ্বারে উপস্থিত করে। এখন উৎপাদক ও ভক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে আর এক সম্প্রদায় আছে তাহাকে আমরা বাহক বা সরবরাহকারক (middleman) আখ্যা দিতে পারি। তাহারা উৎপাদকের গুদাম হইতে সমস্ত দ্রব্য বহন করিয়া ভক্ষকের নিকট উপস্থিত করিয়া যথেচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে। কলের মালিক ক্রমশ কলের আয়তন ও কলেবর এত বৃদ্ধি করিয়াছে যে, দ্রব্য বিশেষের একমাত্র উৎপাদক হইয়া বাজারে ঐ সমুদয় দ্রব্যের উপর স্বকীয় অধিকার বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। ইহাতে উৎপাদকের নির্ধারিত মূল্য ভক্ষক সম্প্রদায়কে বাধ্য হইয়া প্রদান করিয়া দ্রব্য গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে কলের মালিক উৎপাদক সাজিয়া ভক্ষক সম্প্রদায়ের উপর

যথেচ্ছাচার ও আধিপত্য প্রচার করিতেছে। ভক্ষক সম্প্রদায় ও শ্রমী সম্প্রদায় সমভাবে মালিক সম্প্রদায়ের নিকট কঠোর নিদারুণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ভক্ষককে গ্রহণ করিতেই হইবে—নতুবা বর্তমান ফাইন সূক্ষ্ম চকচকে সভ্যতা যে বজায় রাখিতে পারে না, আবার শ্রমীকে শ্রম করিতে হইবে, তাহা না হইলে সে প্রাণে মরিবে। এমনি সঙ্কট সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে এই বিরাট ইনডাস্ট্রিয়ালিজম, ইহা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফাইন ফাইন ফিনিশওয়ালা সামগ্রী তৈরি করিয়া জগতের হাটে বিক্রয়ার্থে আনিয়াছে—ব্যবহারক ও ভক্ষকের দল ছুটিয়া তাহা ক্রয় করিয়া ঘরে উঠাইতেছে। মানবের নিত্য-ব্যবহার্য ছাড়া এইরূপ কত বিলাস ব্যবহার্য দুনিয়ার মজলিস গুলজার করিতেছে, আর মানুষ খোদাকে ভুলিয়া ঐ মোহেতে ঘুরিতেছে, ছুটিতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। উৎপাদকেরা উৎপাদনের নেশায় দিবারাত্র কলের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত—শ্রমী পেটের দায়ে অহর্নিশ কলে লাগিয়া আছে—ভক্ষক ও ব্যবহারকের দল দ্রব্য সংগ্রহের ধাঁধাঁয় অহরহ ঘুরিতেছে—সরবরাহকারক লাভের লোভে ছুটিয়া ছুটিয়া দ্রব্য আদান-প্রদান করিতেছে ও স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইতেছে। নিশ্চিন্ত দু-বেলা আহার করিতেছে না, কেবল লাভের দুশ্চিন্তা তাহাকে পাগলের মতন ঘুরাইতেছে—কলের মালিক যেমন কল ও শ্রমীকে যথেষ্ট পরিমাণে খাটাইয়া বহুল উৎপন্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অবিরাম উদ্বিগ্নতায় ও নিরন্তর দুরাশার দুরাকর্ষণে জীবন টানিয়া চলিয়াছে তেমনি শ্রমীর দল দিবারাত্র পেটের চিন্তায় শীর্ণ-জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ভূমির মালিক ওদিকে নিরিবিলি ভূমির কর বৃদ্ধি করিয়া যাইতেছে—তাহার কি ! কলের মালিকের উপার্জনের উপর তাহার আয় নির্ভর করে। কলের মালিক কলের উপর কল চালাইতেছে। বিভিন্ন প্রকার শিল্পের আয়োজন করিয়া নিজের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছে। ভূমির মালিক কর বৃদ্ধি করিবার আরও সুযোগ পাইতেছে। কলের মালিকের গৃধ্নুতা ও অর্থলোলুপতা—শ্রমীদিগকে শোষণ করিবার দুষ্প্রবৃত্তি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে—তাহার ধর্ম হইয়াছে অর্থ—জীবন হইয়াছে কল—কল হইয়াছে তাহার চিন্তা, অর্থ হইয়াছে তাহার জীবনের মূল উদ্দেশ্য। তাহার জন্য সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে—সে কলসমূহকে একত্র করিয়া এক বৃহৎ কলের সৃষ্টি করিতেছে—সকল অর্থকে একত্র করিয়া এক বৃহৎ যুক্ত শিল্পের প্রবর্তন করিতেছে—সকল উৎপাদককে সংযুক্ত করিয়া 'উৎপাদক সঙ্ঘের' প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যবহারক ও ভক্ষক সম্প্রদায়ের উপর প্রচুর পরিমাণে আধিপত্য জারি করিয়া অর্থশোষণ করিবার নব নব পথ, নব নব উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। উৎপাদক সম্প্রদায় আজ আমেরিকা, ইউরোপের সর্বত্র ও অস্ট্রেলিয়ায় এক এক বিপুল শক্তিশালী সংঙ্ঘের সংস্থাপন করিয়াছে। ঐ সমস্ত সঙ্ঘ জগতের যাবতীয় যন্ত্রজ দ্রব্যের মালিক হইয়া যখন যে মূল্য নির্ধারণ করিতেছে, তখন তাহাই ব্যবহারকের দলকে মানিয়া লইতে হইতেছে—তাহারা শ্রমীকে যাহা দিতে চাহিতেছে তাহাই লইতে হইতেছে। এইরূপে ইনডাস্ট্রিয়ালিজম মালিকসমূহের সঙ্ঘ ও উৎপাদক শ্রেণীর সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া সংসারের অধিবাসীবৃন্দকে নানারূপে অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছে। এখন দেখিতে পাইতেছি, ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের প্রভাবে সমাজ কতকগুলি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং এক

সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্যের অত্যাচার করিতেছে। মালিক ও উৎপাদক সম্প্রদায় ব্যবহারক ও ভক্ষক সম্প্রদায়ের উপর একচ্ছত্রাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে—রাজচক্রবর্তী হইয়া তাহাদিগকে যাহা বলিতেছে তাহাই হইতেছে। ইনডাস্ট্রিয়ালিজম যে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছে—তাহা ব্যবহার করা আধুনিক জগতে সভ্যতা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সেই সভ্যতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া মানব চিন্তার অবসর, বিশ্রামের অবকাশ, কর্মের স্ফূর্তি ও আনন্দ একেবারে হারাইয়াছে—কি উৎপাদক, কি শ্রমী, কি সরবরাহকারক, কি ব্যবহারক, সকলেরই দশা এক। পারিবারিক বিরামপূর্ণ নির্মল আনন্দ ইনডাস্ট্রিয়ালিজম দুই হাতে অপসারিত করিয়াছে। সারাদিন কাজের পর সন্ধ্যাসঙ্গীত গাহিয়া পুরুষ গৃহে উঠিয়া স্ত্রীর পবিত্র আহ্বান ও হিল্লোলপূর্ণ সেবা আর পাইতেছে না। উভয়েই সারাদিন অন্ধকারাচ্ছন্ন নিরানন্দ কলের আওতায় খাটিয়া খাটিয়া অর্ধমৃতাবস্থায় অপরিচ্ছন্ন স্যেঁতসেঁতে কুটিরে ফিরিয়া অতি দীন স্ফূর্তিহীন জীবনম্মৃতাবস্থায় যামিনী প্রভাত করিয়া দিতেছে। স্ত্রী আর ক্লান্ত স্বামীর অপেক্ষায় কুটিরের দ্বারে বসিয়া নাই। কলের কালিমায় দেহ সাজাইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে দূর হইতে ক্ষুধিত শিশুর ক্রন্দন শুনিতে শুনিতে পিতামাতা ক্লান্তপদে ধীরে ধীরে আলোকহীন গৃহে ফিরিয়া শিশুকে বুকে তুলিয়া অশ্রু ফেলিতেছে। পারিবারিক স্নেহ-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, কিছুরই দিকে আর লক্ষ্য করিবার অবসর তাহাদের মিলিতেছে না। সকলেই যেন একরূপ প্রাণহীন যন্ত্রবৎ হইয়া দুনিয়ার প্রাণকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে। সকলেই অর্থ রোজগারকে জীবনের মূলনীতি করিয়াছে। তাই দেখিতে পাই, সারাদিন শ্রম করিয়া অর্থলাভ করিয়াই মানব শান্তিলাভ করিতেছে—অন্যদিকে আর কোন খেয়াল নাই। এই অর্থলাভের উপায় সহজ করিবার জন্য রাজপুরুষেরা আইন প্রচার করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের প্রভাব বর্তমান সভ্যতার উপকরণ সৃষ্টিতে অদ্ভুত প্রকারে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই সভ্যতার উপরকণ আয়ত্ত করিতে গিয়া সমাজের সকল শ্রেণী, সকল সম্প্রদায় শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রান্ত-ক্লান্ত ও অবনত হইয়াছে শ্রমী সম্প্রদায়। তাহাদেরই অশান্তিতে সমাজের সকল স্তরেই অশান্তি প্রকাশ পাইতেছে। ইউরোপ এখন নানা প্রকারে শ্রমীর অশান্তিতে অশান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিক্ষুব্ধ ইউরোপই ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের প্রত্যক্ষ কৃতিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে।

ঘ. পরিণাম

সমাজের স্তরে স্তরে ইনডাস্ট্রিয়ালিজম এক অপূর্ব অশান্তি, অবনতি, অনাচার, অত্যাচারের লবণাক্ত স্রোত আনিয়া দিয়াছে। এই স্রোতকে প্রতিরোধ করিবার জন্য নানা প্রয়াস ইউরোপ করিতেছে। প্রাজ্ঞ জনগণ মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতেছেন, কত কত থিওরির সৃষ্টি করিতেছেন, কিন্তু কেহই একটা চিরস্থায়ী শান্তির পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। থিওরি অনেকেই নির্ধারণ করিতেছেন, কিন্তু কার্যে পরিণত করিবার জন্য কেহ বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন না। তবে ইউরোপময় যে বিশ্বগ্রাসী Bolshevism-এর আবির্ভাব হইয়াছে, সেটার জন্য ইনড্যাস্ট্রিয়ালিজম কিয়ৎ পরিমাণে দায়ী। ইনডাস্ট্রিয়ালিজম সমাজের মধ্যে যে যে সম্প্রদায়ের

সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল তাহাদের মধ্যে বিশাল অসমতা বিরাজ করিতেছিল। অন্যায় অত্যাচারের সুযোগ খুলিয়া গিয়াছিল—এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে শোষণ করিতে সুযোগ ও উৎসাহ পাইতেছিল। ইনডাস্ট্রিয়ালিজম অত্যাচারের অনায়াস পুলকের অপরূপ লীলায় সমাজকে মথিত করিতেছিল। বিভিন্ন অসমান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া মন্থন করিতে গিয়া ইনডাস্ট্রিয়ালিজম যে Bolshevism-রূপ এক ভয়াবহ ফল প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা অমৃত কি গরল—ইহা দেখিবার ভার ভবিষ্যত সমাজের উপর রহিল। এইটাই হইবে ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের পরিণাম। এক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণী করা নিতান্তই বিপজ্জনক ও কল্পনাপ্রসূত হইবে। তবে এটুকু বুঝা যাইতেছে যে, মানবের আত্মার মুক্তি হইতেছে ভবিষ্যত সমাজের লক্ষ্য ও সাধনা। অধিকতর অবসরই আত্মার মুক্তি দান করিতে পারিবে। ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের নূতন সংস্করণে শ্রমীর অবসর ও অবকাশ প্রচুর মিলিবে—তাহার গৃহাবাস সুন্দর, উজ্জ্বল ও স্বাস্থ্যকর হইবে—তাহার স্ত্রী গৃহের 'রাণী' হইবে, কলের কোন অংশে তাহার প্রবেশাধিকার থাকিবে না, মালিকের উদ্দেশ্য পরিবর্তন হইবে—সে আর অর্থলোলুপ হইবে না—সে শ্রমীকে অন্তরে মারিবে না—সে তাহার মানবতাকে বাঁচাইয়া খাটাইবে—সে ব্যবহারককে স্বাধীনতা দান করিবে—তাহার উপর যথেচ্ছাচার করিবে না—সে বুঝিবে যে সমাজের প্রত্যেক স্তর সুখী ও সমৃদ্ধিশালী না হইলে গোটা সমাজটা দীন হীন দরিদ্র নিঃস্ব অবনত ও দুর্গতিসম্পন্ন হইয়া পড়ে—সে বুঝিবে ব্যবহারকের অপার সন্তোষ—শ্রমীর অসীম শান্তি ও তাহার স্বাধীন স্ফূর্তিময় আত্মাময় ও প্রাণময় জীবনই সমাজের প্রকৃত সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য ও সম্পদ। সে বুঝিবে—সরবরাহকারক সম্প্রদায় একরূপ রক্তশোষণকারী সমাজের ক্রিমিকীট মাত্র। তাহারা নব ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের যুগে সমাজে কোন স্থান পাইবে না। তাহারা ব্যবহারক ও ভক্ষকের উপর প্রভুত্ব করিতে পাইবে না। ভক্ষকের দল স্বয়ং উৎপাদকের সঙ্গে চুক্তি করিবে। মালিক, উৎপাদক ও কল-পরিচালক স্বকীয় স্বার্থকে চরম বলিয়া জ্ঞান করিবে না, সমাজের গোটা স্বার্থের উন্নতি-করে তাহারা জীবন ব্যয় করিবে। যথেষ্ট লাভের আশা আর করিবে না। তাহারা দেখিতে পাইবে যে, যথেষ্ট লাভ অন্য সম্প্রদায়ের শক্তি সম্পদ ও সৌন্দর্য লইয়া কেবল মালিক শ্রেণীর সম্পদ-বৃদ্ধিকল্পে নিয়োজিত হইয়াছে। তাহারা পল্লীর সৌন্দর্য বর্ধন করিতে প্রয়াসী হইবে। শ্রমীদের সন্তান-সন্ততি জ্ঞানার্জন ও স্বাস্থ্যলাভ করিবার সুযোগ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইবে। তাহারা অতি শৈশবে পিতার সাহায্যার্থে সময় কাটাইবে না। তাহারা প্রকৃত মানুষ হইবে। শুধু কল চালাইবার কায়দা শিখাই যে জীবনের মূল উদ্দেশ্য নয়, তখন তাহারা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে। অর্থোপার্জন এবং সভ্যতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বর্ধিত করাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, তাহা নব ইনডাস্ট্রিয়ালিজম মানিয়া চলিবে। ইহা তখন শ্রমীকে মালিককে এক আসনে বসাইবে। একে অপরকে ভালবাসিতে শিখিবে। শ্রমী তখন অনায়াসে সেই সচ্চিদানন্দের চিন্তায় আত্মার সর্বমঙ্গল ও সর্বকল্যাণ সাধন করিবার অবসর পাইবে। তখন মালিক ও শ্রমী একই আনন্দে, একই স্ফূর্তিতে, একই লক্ষ্যে সমাজের সম্পদ অর্জন করিতে মনোযোগী হইবে। শ্রমীর সকল অশান্তি সুস্থ সবল শান্তিতে পরিণত হইবে।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২৮ সন।

নারীর অধিকার

পুরুষ চিরদিনই নারীকে প্রশংসা করিয়া আসিতেছে। তাহাকে প্রশংসা করিবার জন্য যত প্রয়াস, যত পরিশ্রম ও যত ভাষা আবিষ্কার করা প্রয়োজন তাহা একান্ত করিয়া পুরুষ নিঃশেষ করিয়াছে। কবি সাহিত্যভাণ্ডার তাহার প্রশংসা গানে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন, কবির সকল চিন্তা সকল ছন্দ সকল উৎকণ্ঠা নারীকে কেন্দ্র করিয়া পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, কবির শ্রম বিপুল হইয়াছে। কবি জীবন ভরিয়া নারীকে যথেষ্ট করিয়া ভাষার দ্বারা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তবু যেন তিনি নিজেকে বিফলশ্রম মনে করিয়াছেন। নারীকে তিনি কখনও স্বর্গীয়া দেবকন্যা, কখনও অপ্সরা, কখনও বা তাহাকে দেবত্বের সুশোভনা প্রতিমা বলিয়া প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে গিয়াছেন। তবু তাহার হৃদয় হইতে 'আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা' একেবারে চুকিয়া যায় নাই। কিন্তু নারী কবির-ভাষার উপর কখনই বড় করিয়া আস্থা স্থাপন করে নাই। সে বুঝিয়াছে যে, পুরুষ তাহার সমস্ত প্রয়াস সমস্ত শ্রম দ্বারা যতই তাহাকে বর্ণনা করিবার জন্য যত্ন করুক, সে তাহার প্রকৃত মূল্য বুঝে নাই। সে বুঝিয়াছে যে, কবি তাহাকে সে যাহার এতটুকুও নয় তাহাই গাহিয়াছেন ; সে যাহা নয়, কবি তাহাকে তাহাই বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার সম্বন্ধে সামান্য সত্যটুকু বুঝিবার মত এতটুকু শক্তি-ও যে পুরুষের আছে সে তাহা বিশ্বাসই করিতে পারে না। ইহাতে পুরুষের সকল শ্রম পণ্ড হইয়া গিয়াছে। কারণ সে হয় নারীকে খুব বেশি করিয়া দেখাইয়াছে, আর নাহয় তাহাকে অতি নিকৃষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

যুগ-যুগান্তর হইতে জগতে তিন প্রকার মনযুক্ত মানব দেখা গিয়াছে। ইহাদের পরম প্রকাশ সাহিত্যক্ষেত্রে চরম হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমত কবিশ্রেণী, দ্বিতীয়ত গদ্য লেখক, তৃতীয়ত স্তোত্র লেখক। কবি স্বর্গীয় দেবদূতের ছবি সর্বত্র দেখিতে পায় আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মন কবির মত উহা দেখিতে না পাইয়া কল্পনা করিয়া লন। কবি দেখিতে পায় আর ইহারা সৃষ্টি করে। কিন্তু কেহই নারীকে যথেষ্ট ন্যায়ের চক্ষে দেখে নাই। তাহার প্রকৃত মূল্য বুঝে নাই। হয় তাহাকে অতি প্রশংসা ও অতি বড় করিয়া কিংবা তাহাতে অতি হীন করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং কেহই তাহার প্রকৃত স্বরূপ দেখে নাই বা দেখাইতে প্রয়াস পায় নাই। কেহ কেহ তাহাকে অতিমানুষ করিতে গিয়া আরও ছোট করিয়া ফেলিয়াছে। আবার কেহ বা তাহাকে একেবারে আল্লার নিকৃষ্ট জীব শ্রেণী-ভুক্ত করিয়াছে। তাই আমরা পড়িতে পাই মধ্যযুগে খ্রিস্টান পাদ্রীরা নারীর আত্মা আছে কি নাই এই তর্কে জীবন ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। আমার এটা প্রগাঢ় বিশ্বাস যে, আত্মার মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যের গৌরব আল্লার দান—নারী ও পুরুষ উভয়েরই সমভাবে প্রাপ্য—উভয়েই উহার সমতুল্যাংশ ভোগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত

হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই সমান অধিকার পুরুষ কবি ও পুরুষ সাহিত্যিক সত্যভাবে কখনও পৃথিবীতে দেখিয়া ও গাহিয়া যায় নাই।

প্রকৃত কবিগণ নারীর আত্মার এক অমৃত সঞ্চারিণী শক্তি দেখিতে পাইয়াছেন, যেটা পুরুষকে জন্মাবধি মোহমুগ্ধ করিয়া রাখে। সে সম্মোহনকারিণী শক্তির বিরুদ্ধে তাহাদের দাঁড়াইবার শক্তি নাই, কিংবা তাহাকে অস্বীকারও করিতে পারে না।

কিন্তু কবির এই কল্পনা লইয়া আলোচনা করা বিসদৃশ হইবে মনে করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। আমি এই প্রবন্ধে নারীর অধিকার সম্বন্ধে ততটুকুই বলিব যতটুকু আবশ্যক হইতে পারে তাহার পক্ষ হইতে বলিবার জন্য ; কারণ ধরিয়া লইতেছি যে, তাহার প্রকৃতিদত্ত শারীরিক শক্তি বুঝাইবার জন্য তাঁহার বাগ্মিতা নাই, তাহার প্রকৃতি তাহার ইচ্ছা, আনন্দ, প্রবৃত্তি বিকাশ করিতে সে অক্ষম, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য যে যে গুণ থাকা আবশ্যক তাহা যে তাহার আছে একথা জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিবার মত সামর্থ্য তাহার নাই, সে তাহার অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য পুরুষের মত উচ্চরবে চিৎকার করিতে করিতে বাহির হইতে পারে না। সুতরাং আমি বাহিরে থাকিয়া কার্যকারণের দিক দিয়া নারী জাতির অধিকার কতটুকু আবশ্যক, সমাজের সর্বোচ্চ কল্যাণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল লাভের জন্য তাহাই দেখিবার চেষ্টা করিব। তবে সর্বপ্রথম একটা কথা বলিয়া রাখা কর্তব্য মনে করিতেছি। সেটা এই যে, দাম্পত্যপ্রণয় লাভের পথে পুরুষের শারীরিক বিভিন্নতা বশত সে নৈতিক আচার লঙ্ঘন করিবার বিপদে যত সহজে পড়িয়া থাকে, তদপেক্ষা নারীর বিপদাপন্ন হওয়ায় দুর্যোগ অনেক কম। সাধারণত এই নিয়মটা খাঁটি বলিয়া আমার ধারণা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রকৃতপক্ষে যাহা দেখা যায় তাহাতে এই বুঝা যায় যে, দাম্পত্য প্রতিকূলাচরণের দ্বারাই আমাদের নারী অপক্ষো পুরুষ বোধ হয় অপেক্ষাকৃত অধিকতর নির্যাতন ভোগ করে না। এটা কেন হয় এবং কি করিলে ইহার সংস্কার ঘটিতে পারে তাহা বলিবার পূর্বে আমাদের দেখা কর্তব্য নারী-জাতির এমন কি কি অবস্থা আছে যাহাতে তাহাকে দাম্পত্য-জীবনের একটানা মুখচ্ছবিকে অপসারিত করিতে বাধ্য হইতে হয়।

নারী পুরুষের সমান অর্থাৎ পুরুষ নারীর সমান। ইসলাম-ধর্মে বিধান আছে 'হে পুরুষ, তুমি তোমার স্ত্রীকে তোমার সম অবস্থাপন্ন—তোমার স্বীয় ভ্রাতার মত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও স্নেহ করিবে।' উভয়েই সমান অধিকার সমান জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে বটে কিন্তু উভয়ে একই ক্ষেত্রের মধ্যে বিচরণ করে না। নারীর কর্মক্ষেত্র ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন। আমরা ভুলিয়া গেলাম আমাদের পূর্বসংস্কার ; আমরা পুরুষেরা ভুলিয়া গেলাম আমাদের স্বার্থের কথা ; নারীর নিকৃষ্টতা কিংবা পুরুষের প্রকৃষ্টতা তথা তাহার প্রভুত্ব প্রাধান্য, স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি আমরা ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দিলাম ; কিন্তু নারী- পুরুষের মধ্যে মনোগত ও শরীরগত পার্থক্য ও বিসদৃশতা আদিম মানব পিতা-মাতা হইতে বিশ্বপ্রভু সর্বসৃষ্ট চরাচর সজীব প্রাণীর মধ্যে সংসাধন করিয়া দিয়াছেন তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন—তাহা অধিকার প্রলুব্ধ ও অধিকার প্রাপ্তির প্রয়াসোন্মত্ত কোন নারী তুচ্ছ বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারে? সে প্রভেদ একটা বিরাট সত্য। তাহা অস্বীকার করিবার বা উপেক্ষার বস্তু নয়।

পুরুষ নারীর সঙ্গে তুলিত হইলেও সে একান্তই পুরুষ-প্রকৃতিময়—আর নারীকে সহস্রবার তুলনা করিলেও সে নারী-স্বভাবাপন্নই থাকিয়া যাইবে। পুরুষ পুরুষই তাহার ষোল আনা—আর নারী সে আজন্মই নারী। নারীর আত্মা নারীর শরীরে জাগ্রত হয় আর পুরুষের আত্মা পুরুষ পোষণ করে। প্রত্যেকেই একটা পৃথক সৃষ্টি—দুনিয়াতে পৃথক হইয়া দাঁড়াইয়া বিশ্বস্রষ্টার বিপুল লীলা বিকাশ করিতেছে। তবু সেই ব্যক্তি পৃথক জীবনের পরিবর্তনটার অভিজ্ঞতা-লাভ মানসে উভয়ে দাম্পত্য-জীবনে আসিয়া মিলিত হইয়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের আত্মার আদান প্রদান করিবার জন্য সতত উদ্বিগ্ন। এই উদ্বিগ্নতা বস্তুত এক বিরাট নৈসর্গিকতার ঘোষণা করে ; এবং এই নৈসর্গিকতাকে সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল সাধনের নিয়োগ করিবার জন্য বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে মানুষ (নারী-পুরুষ) বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই জন্য আদিম কাল হইতে—সভ্যতার বহু যুগ পূর্ব হইতে মনুষ্য-সমাজে বিবাহ-প্রথা চলিয়া আসিতেছে। কারণ মানুষ সেই মিলনাকাঙ্ক্ষার মধ্যে যে নৈসর্গিকতা লুক্কায়িত আছে তাহা উপলব্ধি করিবার শক্তি লাভ করিয়াছে। সুতরাং সে বিবাহ-প্রথাকে সমাজের বহু আলোড়নের মধ্যে এখনও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

নারী পুরুষ দুইজন যেন একটা সুগোল পদার্থের দুই অর্ধ—যেন দক্ষিণ গোলার্ধ ও উত্তর গোলার্ধ। দুই জনেই জীবনে জীবনে মিলিত হইয়া, একত্র একাত্ম হইয়া ; একই গঠনে পরিবর্তিত হইয়া বিশ্বরচনার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা স্বত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে এক চিরন্তন প্রকৃতিগত মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের বিভিন্নতা বিরাজ করিতেছে। পুরুষ হয়ত দৈবক্রমে নারীকে প্রাচীনকাল হইতে স্বীয় অক্ষগত ও অধীন করিয়া লইয়া স্বীয় প্রতিপত্তি ও প্রভুত্বের বিলাসিতায় মগ্ন হইয়া আছে। সে কথা আমরা অস্বীকার করিলাম। ধরা গেল, পুরুষ আর প্রথাগত প্রভুত্ব নারীর উপর জারি করিতে পারিবে না, কিন্তু তাহা হইলেই কি নারী পুরুষের সমকক্ষ হইয়া গেল? তাহাকে সমাজে বিভিন্ন পদলাভের সুযোগ পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে দেওয়া গেল—পুরুষের যে কার্য নারীও সেই কার্যে নিযুক্তা হইল—ইহাতেও কি উভয়ের বিসদৃশতা গেল? আমেরিকা হইতে চীন পর্যন্ত সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত যাবতীয় জাতির মধ্যে নারী ও পুরুষের পার্থক্য সমান। তাহার অস্থিগুলি পুরুষের অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। তাহার মাংশ ও পেশীগুলি অধিকতর কোমল ও অল্প সহিষ্ণু, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি অধিকতর সৌষ্ঠবশালী কিন্তু অধিকতর শ্রমকাতর অর্থাৎ শ্রমাধিক্যের অনুপযোগী। যদিও কোন কোন দেশে নারীজাতি শারীরিক পরিশ্রমের জন্য জীবিকা লাভার্থে পুরুষাপেক্ষা কোন অংশে অল্পপরিশ্রমী ও অল্প কর্মী ও অল্প সহিষ্ণু নহে।

সুতরাং দেখা গেল যে, বস্তুত নারী পুরুষাপেক্ষা দুর্বলআকৃতি, গঠনেও সে ক্ষীণাকার, তজ্জন্য সে কানন কান্তার নদীপ্রান্তরের কঠোর কর্ম করিতে নিতান্তই অপারগ। এই জন্যই বিশেষত সর্বত্র সর্বকালে তাহাকে ধর্মশাস্ত্রের এই এক নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে যে, 'শক্তিই অধিকার আনয়ন করে'। এই শাস্ত্রীয় মন্ত্রের বলে পুরুষ চিরদিনই নির্বিবাদে অবাধগতিতে নারীর উপর পুরুষকার চাপাইয়া আসিয়াছে—নারীও নির্বিকার, কি বিকার চিত্তে মূকের মত সকল কর্তৃত্ব সকল প্রভুত্ব ও সকল শক্তির অধীন হইয়া পুরুষকে

সেবা করিয়া আসিতেছে। সেই স্মৃতির অতীত যুগের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার নারী-প্রকৃতির উপর যে কি এক নিদারুণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। নারী পুরুষের সেবায় চিরদিনের জন্য নিযুক্তা হইয়া আছে—নারী-প্রকৃতিকে পুরুষ এরূপে অবমাননা ও পদদলিত, অবজ্ঞার পাত্র করিয়া আসিয়াছে—তাহাও শুধু ধর্মের দোহাই দিয়া, কি ভয়ানক কথা! মনুষ্য সমাজে যত প্রকার ক্ষুদ্র-বৃহৎ অন্যায় অবিচার থাকিতে পারে ও হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটাই নারীজাতি নিষ্ঠুর ও কঠোরভাবে ভোগ করিয়াছে—কেবল ঐ এক অবশ্য ধর্মসূত্রের প্রভাবে যে "দুর্বলের উপর অত্যাচার ও দুর্বলকে নিপীড়িত করিবার সকল শক্তি বলবানের আছে—ইহা ধর্মশাস্ত্রের কঠোর নিয়ম।

"যাহা আসে তাহা ছাড়িও না, আর যত পার গ্রহণ কর"—ইহা সকল রাজার, সকল নির্যাতকের মূলমন্ত্র হইয়াছে। পুরুষ নিজে বলবান—তাই সে নিজের সুযোগ ও সুবিধা, সুখ ও স্বার্থের জন্য, নারীর জন্য আইন সৃষ্টি করিয়াছে, নারীকে শাসন করিবার জন্য! এটা একটা সামান্য দৃষ্টান্ত হইতে বেশ প্রতিপন্ন হইবে। কোন কোন দেশে কোন কোন ধর্মে এইরূপ নিয়ম বা বিধান দেখা যায় যে, এক জন পুরুষ ইচ্ছানুসারে কয়েক জন নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু পক্ষান্তরে একজন নারী কয়েক জন পুরুষকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিবার শক্তি প্রাপ্ত হয় নাই। ইহা পুরুষ কর্তৃক রচিত আইন। কিন্তু বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত দুঃখ ও দাসত্ব নারীর শক্তি ঘোষণা করিবার জন্য সমাজে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে; এবং প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে—নারী কত শক্তি সম্পন্না—নারী কত কর্মঠ এবং তাহার যুগযুগান্তরের সঞ্চিত দুঃখের উৎস কোথায়! তাহার আত্মশক্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা কত বেশি, তাহা সে বুঝিয়াছে—সুখান্বেষণে যে তাহার সমান অধিকার আছে, পুরুষের সঙ্গে ইহা সে বেশ বড় করিয়াই জগতের সমক্ষে ও প্রভুর বিচারাসনের সম্মুখে স্থাপন করিতে পারিয়াছে।

এমনকি বিপদসঙ্কুল দুর্ধর্ষ জীবন-বহুল যুদ্ধক্ষেত্রে কত কত নারী বিস্ময়কর শৌর্য বীর্য ও অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়া—বহু পুরুষাপেক্ষা জগতকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছে। বিবি আয়েশা (রা) নিজে অবিশ্বাসীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া বহু সৈন্যের অধিনায়িকা রূপে জয়যুক্তা হইয়া অশেষ প্রশংসাভাজন হইয়া গিয়াছেন। এইরূপ বিভিন্ন জাতির মধ্য হইতে বিভিন্ন সময়ের নারী-যোদ্ধার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। রণক্ষেত্রে ভীষণ লোমহর্ষব্দ দৃশ্যের মধ্যে নির্ভীকচিত্তে নারী বিস্ময়কর বীরত্বের তেজস্বিতা, পুরুষাপেক্ষা অধিকতর সাহসের সহিত ও তদপেক্ষা অধিকতর নিঃস্বার্থভাবে দেখাইয়া গিয়াছে। ইতিহাসে ইহার জলজীবন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। সচরাচর ইহা দেখা গিয়াছে পুরুষ যুদ্ধ করিয়াছে স্বকীয় সম্মান গৌরব অথবা সম্পদ লাভের আশায়, কিন্তু নারী পক্ষান্তরে যুদ্ধক্ষেত্রের যাবতীয় ক্লেশ সঙ্কট ও নির্যাতন অন্তরের সহিত বরণ করিয়া তাহার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে—এক অপূর্ব মহৎ আত্মবিস্মৃতির মধ্য দিয়া—কখনও বা মাতৃরূপে কখনও বা সহধর্মিণী কখনও বা প্রেমময়ী রূপে। কোথায় তাহার স্বার্থ, কোথায় যে সুখ কিছুই তাহার উদ্দেশ্য হয় নাই। সেই অপরূপ স্বার্থবিস্মৃতি ও মনোরম আত্মত্যাগ পুরুষের দ্বারা কোথায় ঘটিয়াছে? কখনও তাহারা জল-বিম্ব-সদৃশ ক্ষণস্থায়ী প্রশংসার জন্য লালায়িত হয় নাই। প্রতিদানের আশা না করিয়া

জীবনকে, স্বার্থকে, সুখকে জলাঞ্জলি দিতে বিন্দুমাত্র নারী কুণ্ঠা, সঙ্কোচ বা দ্বিধা বোধ করে নাই। কিংবা কোন কঠোর প্রণয়ের জন্য প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থে নির্দয় স্বামীর বিরুদ্ধে আহত হৃদয়ে সান্ত্বনা আনয়নের জন্য সে কখনও যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই ; কিংবা জয়যুক্তা হইয়া ইতিহাসে ঘোষিত হইবার প্রশংসার জন্য সে কখনও ক্ষুধিত হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা দুই একজন নারীর কীর্তি স্মরণ করিতে পারি।

ইংলণ্ডের ষষ্ঠ হেনরির পত্নী দশবার রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন শুধু তাঁহার দুর্ভাগা স্বামীর মুক্তির জন্য। তাঁহার অসাধারণ ও অদ্বিতীয় শৌর্যের কথা কে না জানে? তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায় ও সু-ধীর বিচক্ষণতা নারী-ইতিহাসে অনুপম জাজ্বল্যমান হইয়া বিরাজ করিতেছে। থাম্মিডনের "আমাজনদের" অসাধরণ বীরত্ব ও যুদ্ধ-প্রিয়তার কথা অলীক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আমাদের দেশেও প্রাচীন কালের ইতিহাসে অসংখ্য যুদ্ধে নারীর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়,—গল্প বলিয়া মনে হইলেও তাহা বাস্তবিক সত্য।

প্রগাঢ় বিশ্বাসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া জগতের ইতিহাসে যদি কেহ চরিত্রের শক্তি ও নারী-বীর্যের চরম বিকাশ করিয়া গিয়া থাকে, তবে সে ফরাসী কন্যা "জোয়ান অব আর্ক"। অরলিয়ানস অবরোধকালে জোয়ান যেরূপ অসাধরণ রণকুশলতা ও অস্ত্র-ব্যবহারে সুনিপুণতা দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা নারীর পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মালুম হইবে।

তার পর জিয়ান হ্যাচেটির কথা বলি। তিনি বোঁভয়কে রক্ষা করিতে গিয়া নানাবিধ অসাধরণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। শত্রুপক্ষকে হটাইয়া দিয়া অবরোধকারিগণের নেতৃবর্গকে খাতের মধ্যে সজোরে বলপ্রয়োগে নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে রাজকীয় সৈন্যগণ আসিয়া বোঁভয় শহরকে রক্ষা করিল।

অবশেষে নারী-বীর্যের দৃষ্টান্ত কাউন্টেস-ডি-মণ্টফোর্টের কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব। কাউন্টেস জলে ও স্থলে সমান ভাবে বীরত্ব ও সাহসের ছবি খুলিয়াছিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কিরূপ রণকুশলতা দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা চিরদিনই শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী যোদ্ধার আদর্শ হইয়া থাকিবে। তৎকালীন যাবতীয় সর্বাপেক্ষা অসম সাহসিকদের সঙ্গে তিনি সম্মুখ-যুদ্ধ করিয়া জয়মালা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। নারীর আগ্রহপূর্ণ, সবল, সাহসান্বিত, গভীর আত্মার এতাদৃশ শতশত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

আমরা একবার আরবদেশের ইতিহাসখানি খুলি। দেখিতে পাই কি? সেই বেদনাদায়ক ক্রুসেডের দিনে কি হইয়াছিল? কত কত নারী জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল—রণক্ষেত্রে আসিয়া তাহারা দলে দলে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, সে কথা ইতিহাস আর মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। নারী কখন নিজের সুখস্বার্থের জন্য তরবারি ও অস্ত্র গ্রহণ করে নাই। ইহাই সাধারণত ইতিহাসের সাক্ষ্য। যাক সে পুরাতন কথা। বর্তমানেও নারীর বীর্য কম নয়। তবে প্রাচীন কালের মত অবস্থা আর নাই, তখন নারীকে গৃহকোণ ত্যাগ করিয়া দিগন্তব্যাপী রণক্ষেত্রের মাঝখানে আসিতে হইত। তবে মোটকথা, সাহস, শক্তি ও বীর্যের পরিচয় দিতে গিয়া ভীষণ ভীষণ ক্লেশ ভোগ করিয়া নারী জগতের যথেষ্ট কল্যাণের কারণ হইয়াছে।

যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া এখন আমরা সাহিত্যমন্দিরে প্রবেশ করিব—দেখা যাউক সেখানে নারীর স্থান কতটুকু। যুদ্ধ-কার্যেও পুরুষের পুরুষকারই প্রবল, কিন্তু সেখানেও নারী তদীয় পুরুষকার প্রকট করিয়াছে। তবে তাহাকে রণক্ষেত্রে পুরুষের ন্যূন বলা চলে না। এই সাহিত্যক্ষেত্রেও নারীর জয় একাধারে ঘোষিত। নৈপুণ্য ও চিন্তার ঔদার্যে নারী সর্বত্রই তাহার সম্মান প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছে। আমরা পোলাণ্ড, জার্মানি ও ইটালি হইতে আরম্ভ করিয়া সভ্যজগতের বহুদূর পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিলে অসংখ্য বিদূষী নারীর সাক্ষাত পাইব।

এমন বিদূষী নারী দেখা যায়, যাহাদের রচনার মধ্যে বেকন, বার্ক, শেক্সপীয়রের রচনার সঙ্গে তুলনা করিবার মত ভাব ও ভাষার নমুনা পাওয়া যায়। নারীর সাহিত্যক্ষেত্রের প্রয়াস অতি সামান্য প্রথমে ছিল—ঠিক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর কুলু-কুলু নাদের মত শুনা যাইত। তাহার স্বর অতি ক্ষীণ ক্ষুদ্র, কিন্তু মধুর ছিল। এখন আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে নারীর স্বরে একটা শক্তির চিহ্ন পাইতেছি। মহাচিন্তার মহাসাগরের ডাক বলিয়া বোধ হইতেছে। নারীর নিকট হইতে জ্ঞানপ্রসূত শুভসংবাদের আকাঙ্ক্ষায় জগত নিরন্তর প্রতীক্ষা করিতেছে। কারণ নারী ইতোমধ্যে জগতকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য করিয়াছে যে, নারী শক্তিমতী, বুদ্ধিসম্পন্না ও পুরুষকর্মোপযোগিনী। ইউরোপের কথা ছাড়িয়া দিলে বর্তমান ভারতে আমরা সরোজিনী নাইডু প্রমুখ নারীগণের অপূর্ব সাহিত্য সাধনার গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারি। আরবদের ইতিহাসে আয়েশা (রা) প্রমুখ বহু বিদূষী নারীর উজ্জল দৃষ্টান্ত দেখানো যায়। ভারতের মুসলমান রাজত্বে জেবুন্নেসা প্রমুখ কত কত বিদূষী নারীর চরিত্র-মাহাত্ম্য ও সাহিত্য-গৌরব পাঠ করিয়া আনন্দরসে আপ্লুত হওয়া যায়। ইহা সত্ত্বেও আমাদের দেশে অল্পবয়স্কা কন্যাগণকে গৃহকোণে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া পিতামাতা আভিজাত্যের গৌরবে সমাজের উচ্চস্তরে বিচরণ, আরোহণ করিবার প্রয়াস পান। বাস্তবিক, ইহারা কৃপার পাত্র ক্ষমার পাত্র না হইলেও আইনত নারীর অধিকার—কতখানি তাহাও আমাদের দেখা কর্তব্য। যুগে যুগে জগতের সমস্ত জাতি—কি গ্রীক কি খ্রিস্টান, কি হিন্দু, কি মুসলমান—সকলেরই মধ্যে পুরুষ চিরদিনই তাহার স্বকীয় অসংযত প্রবৃত্তি ও স্বার্থপরায়ণতার বলে আইন সৃষ্টি করিয়া—নারীকে নিরবচ্ছিন্ন নির্মম অধীনতার পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সে তাহাকে মানুষ না বলিয়া নিকৃষ্ট পদার্থের মধ্যে গণ্য করিয়াছে। নারীর অসহায় অবস্থা দেখিয়া, তাহাকে অসংখ্য অবিচারগ্রস্ত দেখিয়া ইসলাম তাহার সাম্য বিধান করিয়াছে, তাহাকে পুরুষের অর্ধাঙ্গ বলিয়া তাহার সমান অধিকার দিয়াছে, কিন্তু বাস্তবজগতে পুরুষ কতটুকু নারীর অধিকার দিতেছে। হিন্দুধর্মেও নারীর অবস্থা অতি শোচনীয় করিয়া রাখিয়াছে। নারীকে পদানতা রাখিবার জন্য হিন্দুধর্মে নারীর কোন অধিকারই দেওয়া হয় নাই। ধর্মও পুরুষের দ্বারা পরিচালিত। ধর্মের নামে পুরুষ কত না অবিচার নারীর প্রতি করিতেছে। সাম্যনীতির প্রচার করিয়া ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান করিয়াছে। কিন্তু কয় জন মুসলমান তাহার সমান অধিকার দিতেছে? তাহার সেই আদিম বর্বর-স্বভাব এখনও যায় নাই। খ্রিস্টান ধর্মে নাকি নারীর উন্নত হইবার আশা দেওয়া আছে। কিন্তু ধর্মসূত্র ও ধর্মনীতি নারীকে উন্নত করে নাই, যত করিয়াছে বিগত

শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ও মানব-সেবা-ধর্মের নীতি প্রচারে। একলাটী পুরুষসেবার উপরও যে জগতসেবার অধিকার নারীর আছে তাহা জোর গলায় সে ঘোষণা করিতে পারিয়াছে।

ইহুদিযুগে যেরূপ ছিল, নিউটেস্টামেন্টের যুগেও নারীপ্রকৃতিকে তদপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধা কেহই করে নাই। পুরুষ নারীকে স্বীয় ভোগতৃপ্তির সামগ্রী ও বিলাসের উপযোগী করিয়া লইয়াছে। নারীর সকল কর্ম শুধু পুরুযের সফল প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনে পর্যবসিত হইয়া যায়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূঢ়তা ও সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার বশবর্তী হইয়া পুরুষ আইনের দ্বারা নারীকে সবলে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছে। পুরুষ তাহার ভ্রাতৃস্বরূপ, কিন্তু সেই ভ্রাতাই তাহার উপর কি কঠোর সংস্কারের জাল-বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। ইহাতে নারী কি রুদ্ধশ্বাস হইবার উপক্রম করে নাই? তাহার স্বাস্থ্য, সম্পদ, সৌন্দর্য সমস্তই ধ্বংসমুখে বিলীন হইতেছে। সে সংসারের ভার আর বহন করিতে পারে না। সভ্যতা শতমুখী হইয়া বিকাশলাভ করিতেছে কিন্তু তবু নারীর রাজ্য পুরুষের করতলগত হইয়াই রহিয়াছে। পুরুষ রাস্ট্রীয় শাসনের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য কত বিপ্লব, কত বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়া জগত মন্থন করিতেছে, আকাশ, পাতাল, জল-স্থল, সমস্ত আলোড়িত হইতেছে—কিন্তু কৈ নারী জগত ত পুরুষের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিতেছে না? আসিবে কি সে সুদিন যে দিন দেখিতে পাইব নারী তাহার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া সবল স্ফূর্তিময় স্বাধীনতার হাওয়ায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুরুষের রাজ্যের পার্শ্বে অবস্থান করিতেছে ও সমাজের সর্বোচ্চ-কল্যাণ আহরণে পুরুষের সঙ্গে সমতুল্যাংশে তাহার নিজশক্তি নিঃশেষিত করিয়া ফেলিয়াছে, স্বাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার করিতে যাইয়া তাহার সফল বুদ্ধি সফল প্রতিভা উজাড় করিয়া দিয়াছে? ধর্মের সূত্র আর ধর্মের নীতির দোহাই দিয়া পুরুষ আর নারীর কণ্ঠে অধীনতার উদূখল ঝুলাইতে পারিতেছে না—পুরুষের কাপুরুষতা, দুর্বলতা পাশবিকতার অধীন হইয়া মূকের ন্যায় তাহাকে জীবন যাপন করিতে আর হইতেছে না, এবং পুরুষের চরিত্র সংশোধনার্থ নারী কঠোর শাসনের নিয়ম জারি করিতে সমর্থা হইতেছে।

এযাবৎ দেখা গিয়াছে ও এখনও দেখিতেছি আমরা (পুরুষেরা) নারীকে আমাদের প্রিয়-বস্তুটী করিয়া রাখিয়াছি। তাহাকে দুর্বল, অসহায় অথচ অত্যাবশ্যকীয় সঙ্গিনী বলিয়া আখ্যা দিয়াছি। কত প্রশংসাও করিয়া থাকি—সে প্রয়োজনীয়, সুন্দর সৃষ্ট উপকরণ আমাদের পরিতুষ্টি সাধনের জন্য। তাহাকে আমাদের অতি জঘন্য সংকীর্ণ নিকৃষ্ট স্বার্থের ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। তাহাকে আমাদের অবসর সময়ের ক্রীড়নক বা ক্রীড়াপুত্তলি করিয়া তুলিয়াছি—যে সময় পশু-প্রবৃত্তি বিবেককে দূরে ঠেলিয়া দিয়া আত্মাকে মোহ-কামাচ্ছন্ন করিয়া রাখে—সে সময় জিতেন্দ্রিয়তা, দেবত্ব, মানবত্ব পলায়ন করে, আর ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, পশুত্ব তাহাদের স্থান অধিকার করে। কি সর্বনাশ! নারী কি জগতে শুধু পশুত্বের দাবি পূরণ করিতেই আসিয়াছে? তাহার কি মানবত্বের অংশ নাই? সে কি দেবত্ব বা

মানবত্বের অধিকার লাভ করিতে পারে না? যদি না পারে তবে তাহাকে মানুষ না বলিয়া পশু বলিলেই চলিতে পারে। ইহাতে কি রবিল আলামিন খোদাকে অপমানিত করা হইতেছে না? তিনি তাহাকে মানুষ করিয়া পাঠাইয়াছেন আর তাহাকে পুরুষ ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির উপকরণমাত্র করিয়া রাখিয়াছে—কবে তবে সে মানুষের মনুষ্যত্ব লাভের সুযোগ পাইবে? তাহার আত্মা নাই? তাহার কি ধর্ম নাই? শুধু পুরুষই তাহার সর্বমঙ্গলাধার। কি বীভৎস সংস্কার। (ক্রমশ)*

সাধনা, ৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩২৮

* সাধনা পত্রিকার পরবর্তী কোনো সংখ্যা না পাওয়ার ফলে এই লেখার অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করা যায়নি—সম্পাদক

অহমিকা

[তরুণ তপস্বীর প্রতি]

হজরত মুহম্মদ (সা) বলেছেন, আমি মানুষ, আমার বাক্য ও কার্য-অনুসারে চল, তোমরা অন্ধকারে ঘুরবে না ; তোমরা অতিমানুষ হতে পারবে। অতএব আমরা যদি সত্যই অন্তরের সকল দৈন্য ঘুচিয়ে দিয়ে মুক্তির পথ চাই, জ্ঞানভক্তির আলোকে আলোকিত হতে চাই, তবে আমরা সেই মহাজীবন অনুসরণ করতে লেগে যাই। আমাদের প্রধানতম প্রয়াস তাঁর বিচিত্র জীবন লয়ে ধ্যান করতে নিযুক্ত হোক, তাঁর পূণ্যবাণী সততই আমাদের আত্মাকে উদ্বোধিত করুক।

গৃহে গৃহে তাঁর নাম কীর্তিত হচ্ছে, কিন্তু আমরা 'যে তিমিরে সে তিমিরে'ই আছি। তাঁর পবিত্র জীবন আমাদের আত্মার উপর কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারছে না ; তার কারণ, আমাদের অহমিকা আমাদের উন্নতির পথ রোধ করে রেখেছে। অহমিকা উন্নত-শির হলে তাঁর পূণ্য প্রভাব দূরে সরে যায়।

ইহা নিশ্চয়ই জেনো, বড় বড় কথায় তোমার জীবন পবিত্র ও ন্যায়নিষ্ঠ হবে না। শুধু ভক্তি ও ধর্মনিষ্ঠাই তোমার জীবনকে খোদার নিকট প্রিয় করে তুলবে। লক্ষ লক্ষ বার তসবিহ খট খট করলে তোমার জীবন পবিত্র হবে না, তুমি কোরান ও হাদিস সমগ্র কণ্ঠস্থ করে ফেল, তা তোমার কাজে লাগবে না, যদি তোমার খোদা-ভক্তি না থাকে। সমস্তই তোমার বৃথা অহমিকার পরিচয় দেবে। চাই খোদা-ভক্তি ও তাঁর উপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এ দুনিয়ার প্রতি তোমার কোন আসক্তি থাকবে না—সকল আকর্ষণ ত্যাগ করে পার্থিব লাভকে ঘৃণা ও তুচ্ছ জ্ঞান করতে হবে, তবে বিহেশতের দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত হবে।

নশ্বর ধনের জন্য তৃষিত ও ব্যগ্র হয়ো, তার উপর আস্থা স্থাপন কর, তোমার অহমিকা প্রমত্ত হয়ে উঠবে ও তোমার বিনাশের পথ সহজ হবে। "অহমিকা সর্বপ্রকারে তোমার পূণ্য পথের কন্টক"—একথা ভুলো না। উপ-পদমর্যাদা ও পার্থিব সম্মান ও প্রশংসা আকাঙ্ক্ষা করা অহমিকা। শারীরিক সুখ অর্থাৎ রক্ত-মাংসের কামনা তৃপ্তির জন্য ব্যাকুল হওয়া অহমিকা। দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও জীবনকে সুপথে (সিরাতুল মুসতাক্বিম) পরিচালনা করতে অবহেলা করা অহমিকা। বর্তমান জীবনকে সার মনে করে পর-জীবনকে তুচ্ছ করা অহমিকা। ক্ষণস্থায়ী পদার্থে আসক্ত হওয়া ও অনিত্য সুখের সন্ধানে নিরত থাকা অহমিকা। এই অহমিকা ত্যাগ করতে পারবে কি? যদি না পার, তবে শুধু অনুষ্ঠান তোমাকে সাধু করবে না।

বাইরের চোখ সব দেখতে পায় না, বাইরের কর্ণ সব শুনতে পায় না। এ কথা বিশ্বাস করবে কি? যদি কর, তবে সকল অন্তর অনিত্য বস্তু হতে বিমুক্ত করে নিত্যের খোঁজে লাগাও। কারণ, ভোগলিপ্সা বিবেক কলুষিত করে, অন্তর মলিন করে এবং খোদার করুণা হতে বঞ্চিত করে।

তোমার জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু খোদাকে ভয় না করলে সে জ্ঞান তোমার কি কাজে লাগবে? নিশ্চয় জেন, গর্বিত দার্শনিক ও দাম্ভিক বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা খোদা-ভক্ত কড়ার ভিখারিও শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

যে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করেছে ও নিজেকে সেই অসীম করুণার মালিকের সম্মুখে তুচ্ছ জ্ঞান করে সংসারের নিন্দা-প্রশংসায় বিচলিত হয় না, সে সততই নম্র। তার অহমিকা বা আত্মম্ভরিতা নাই। সে আপনার মধ্যে আপনাকে লুকিয়ে ক্রমশ ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হতে চায়। কিন্তু খোদা তাকে মানুষের সভায় উঁচু করে তোলেন।

তুমি জগত সংসারের আদ্যন্ত বিচারে পারদর্শী হওয়ার জন্য নানা জ্ঞানে ভূষিত হয়েছ। কিন্তু তোমার গর্বের সীমা নাই, তোমার বদান্যতা নাই—সে জ্ঞান খোদার চোখে কি মূল্য অর্জন করবে? খোদা তোমার জ্ঞান দ্বারা বিচার করবেন না। তিনি চান তোমরা শুধু জ্ঞানের পশ্চাতে নিরন্তর ছুটো না। অবশেষে অনেক প্রবঞ্চনা ও অনেক আক্ষেপের সঙ্গে সাক্ষাত হবে। রাশি রাশি পুস্তক হতে লব্ধ জ্ঞান তোমাকে প্রাজ্ঞ করবে না। তাতে তোমার আত্মার কল্যাণ এতটুকু আনবে না, তোমার মুক্তির পথ উন্মুক্ত করবে না। বহু বাক্য, বক্তৃতা আত্মাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। সাধু জীবনই মনকে সান্ত্বনা দিতে পারে। খোদার নিকট আশ্বাস পেতে হলে পবিত্র অন্তর ও নম্র বিবেক প্রয়োজন।

ভূরি ভূরি জ্ঞান সঞ্চয় করতে পার, দুনিয়ার সকল বিষয় তোমার নখাগ্রে হতে পারে, যাবতীয় বিষয় তোমার বোধগম্য সহজে হতে পারে—কিন্তু কঠোরতর বিচারের সম্মুখীন একদিন হতেই হবে। তখন তোমার নির্মল সাধু জীবন ও সুন্দর উজ্জ্বল অন্তর তোমাকে জয়যুক্ত করতে সমর্থ হবে। সুতরাং শিল্পে কিংবা বিজ্ঞানে কৃতী হয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করো না, আত্মবিহ্বল হও না। তোমাকে ক্রমেই নত হতে হবে। মস্তক উগ্র হয়ে না ওঠে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকবে। ফলভরে অবনত বৃক্ষের মত বিনম্র হবে।

যদি তোমার কখনও কখনও এরূপ ধারণা জন্মে যে, তুমি অনেক শিখেছ, অনেক জ্ঞানলাভ করেছ, তখন তুমি দেখতে চেষ্টা করবে তুমি এখনও কত জানতে পার নাই—এখনও তোমার ঢের শিখবার বাকি আছে।

জ্ঞানী হওয়ার ভাণ ত্যাগ করবে। নিজের অজ্ঞতা সর্বত্র স্বীকার করবে। জ্ঞানমদে মত্ত হয়ে জয়াকাঙ্ক্ষী হয়ো না। তোমার চেয়ে কত কত জ্ঞানী আছেন, কত কত পুণ্যচরিত্র মহাপুরুষ জন্মে গেছেন—তুমি তাঁদের কথা স্মরণ করলে তোমার নিজ ক্ষুদ্রতা দেখে তুমি নিশ্চয়ই ম্রিয়মাণ হবে—লজ্জায় আর মাথা তুলতে চাইবে না। নিজের হীনতা, দীনতা, ক্ষুদ্রতা কখনও বিস্মৃত হয়ো না।

"অবনত-শির ভক্তের জন্য স্বর্গের দ্বার অবারিত"—এ কথা জান না কি? তুমি যদি কোন এক বিষয়ে নূতন তথ্য আবিষ্কার করে থাক, তা প্রচার করার জন্য মত্ত হয়ো না—তখন একেবারে অজ্ঞাত থাকবার চেষ্টা করবে। এ বড় বিষম প্রলোভন। নামের লোভ সংবরণ করতে অসাধারণ সংযম আবশ্যক। মর্যাদার লোভে নিজেকে আকৃষ্ট হতে দিও না।

যে শিক্ষা ও জ্ঞান তোমার নিজের জীবনকে জানবার সুযোগ দেয়, সেই শিক্ষা ও জ্ঞান লাভজনক।

"নিজেকে সতত ক্ষুদ্র তুচ্ছ নগণ্য মনে করে পরকে প্রশংসা করা" প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভের উপায়। যদি কেউ জঘন্য পাপকার্য করে, তা দেখে তুমি নিজেকে ওর থেকে শ্রেষ্ঠ মনে কর না ; কারণ তুমি জান না তোমার মধ্যে এর চেয়ে গুরুতর পাপের প্রকৃতি কোথায় লুপ্ত হয়ে আছে, এবং কখন সে ফাঁক পেয়ে সুপ্তোত্থিত সিংহের হত গর্জন করে উঠবে ও তোমাকে পাপে নিজ্জিত করবে।

"আত্মার প্রত্যয় বড় প্রবঞ্চনা করে।"

আমরা সকলেই দুর্বল, কিন্তু তুমি অন্য কাকেও তোমার চেয়ে দুর্বল মনে করো না।

তরুণ পত্র, বৈশাখ ১৩৩২

হিতবাণী

[হজরত আলী হইতে]

এ-জগতে বন্ধুগণ আমাদের একরূপ গুপ্তচর মাত্র।

নৈরাশ্য আত্মার মৃত্যু।

দুঃখ-শোক লুকানোই সাহসের মহত্তম লক্ষণ।

পরস্পর শ্রদ্ধাই বন্ধুত্বের বন্ধন।

মানুষকে ধ্বংস করে : গর্ব, লোভ, ভোগস্পৃহা।

ঈমানের তিন স্তম্ভ : জ্ঞান, বিনয়, বদান্যতা।

অজ্ঞ কুসংস্কারের ও বিজ্ঞ ন্যায়পরতার উপাসক।

মানুষের সাধারণ কাজকর্ম তার অন্তর-রহস্য উদঘাটন করে।

দুর্বলের অস্ত্র শুধু অভিযোগ।

গর্ব করিয়া জ্ঞানকে অবমানিত করিও না।

ধনীর লোভ আপনিই পায় শাস্তি।

রজনীর উপাসনা দিবসের ঐশ্বর্য বর্ধিত করে।

বন্ধুর আঘাত শত্রুর আঘাত অপেক্ষা মর্মান্তিক।

খোদার উপর যে নির্ভর করে, সে সর্বদাই সন্তুষ্ট।

তোমার শত্রু তোমার মধ্যেই লুকাইয়া আছে।

ধর্ম কথায় নয়, কাজে।

বন্ধুর সাহচর্য আনন্দের আকর।

বিদ্বানের সভা বেহেশতের তুল্য।*

---

* মরহুম আবুল হুসেন 'দীওয়ান-ই-আলী' থেকে কিছু ভাবানুবাদ 'হিতবাণী' শিরোনামে মাসিক 'তরুণপত্রে' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করেছিলেন। এই অংশটি ১৩৩২ বৈশাখে প্রথম সংখ্যা 'তরুণপত্রে' প্রকাশিত হয়েছিল। —আবদুল কাদির

রবীন্দ্রনাথ*

কবিসম্রাট আচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঢাকায় আগমন উপলক্ষে মুসলিম হল ছাত্রবৃন্দের অভিনন্দন

হে বরেণ্য, বিপুলপ্রাণ বিশ্বকবি!

যাঁহার অসীম করুণায় আজ আমরা তোমাকে আহ্বান করিতে সমর্থ হইয়াছি, সর্বপ্রথম সেই অনন্ত চিরজাগ্রত বিশ্বস্রষ্টা রহমানুর-রহিমের উদ্দেশে শত প্রশংসা, শত ধন্যবাদ! বুদ্ধি আমাদের অসাড়, চিত্ত আমাদের দুর্বল, নিরানন্দ, প্রাণ আমাদের নির্জীব ; কিরূপে তোমাকে অভ্যর্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না। তাই আমাদের এই ক্ষুদ্র আয়োজন শত ত্রুটিতে পূর্ণ। কিন্তু জানি, তোমার বৈচিত্র্য-বিপুল হৃদয়ে সে ত্রুটি ক্ষোভের কারণ হইবে না। সেই ভরসায় হে কবীন্দ্র! আজ আমাদের এই ক্ষুদ্র আয়তনে গভীর আনন্দে আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

হে মুক্তপ্রাণ বিশ্বপ্রেমিক!

তোমার ছন্দে ও গানে, কাব্যে ও বিচিত্র রচনাসম্পদে, তুমি উদার বুদ্ধিতে বিশ্বরূপ, বিশ্বতান ফলাইয়া তুলিতে কার্পণ্য কর নাই। তোমার সমস্ত প্রাণ, সমস্ত সাধনার রক্ত দিয়া সৃষ্ট এই অমর সম্পদ শুধু বাঙ্গালীর নয়, শুধু হিন্দুর নয়, শুধু ভারতবাসীর নয়—বিশ্বমানবের। সত্যই, ইহা বিশ্বমানবের অন্তরে নিত্য অফুরন্ত আনন্দের সঞ্চার ও অপরূপ প্রেরণার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে। অনন্ত বিশ্বের প্রতি জীবনকণার সঙ্গে তুমি এক নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করিয়াছ। তোমার প্রতি সুরে, প্রতি ছন্দে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। তাই, সর্ব দেশ, সর্ব জাতি তোমাকে গ্রহণ করিতে একটুকুও দ্বিধা বোধ করে না। অনন্ত কাল তোমার এই সাধনার জ্যোতি অম্লান থাকিবে।

বিধাতা বড় দয়া করিয়া, প্রাণহীন ভারতের দুর্দিনে, তোমার মত বিরাটপ্রাণ মহাপুরুষকে দান করিয়াছেন। তোমার প্রাণ মুক্ত, বিশ্বময়। সেখানে হিন্দু নাই, মুসলমান নাই, খ্রিস্টান নাই—আছে মানুষ। তজ্জন্য আজ আমরা তোমার স্নেহ ও আশীর্বাদের অধিকারী হইয়া তোমার অমূল্য সময়ের কিঞ্চিত দাবি করিতে সাহসী হইয়াছি। জানি, তোমার প্রেমপ্রবণ কবিহৃদয়ে আমাদের এই দাবি কত মধুর হইয়া বাজিয়াছে।

---

* এই অভিনন্দনপত্রটি মরহুম আবুল হুসেন সাহেবের রচনা। — আবদুল কাদির

তুমি আশীর্বাদ কর, যেন তোমার অপূর্ব সৃষ্টির আনন্দ আমাদের উষর-শুষ্ক চিত্তে পৌঁছিতে পারে ; চিরন্তন মানবের অধিকারে আমরা তাহাকে গ্রহণ করিতে পারি—আপনার করিতে পারি এবং তাহার দ্বারা আমাদের রস-বিমুখ, শ্রীহীন এই জীবন সরস-সুন্দর করিয়া তুলিতে পারি। এই আশীর্বাদের লোভে আমরা আজ তোমাকে 'আমাদেরই একজন' করিতে চাই। ইহাতে তোমার সম্মতি পাইয়া আমরা আজ আমাদিগকে কত সৌভাগ্যবান, কত গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।

হে মুক্তির বাণী প্রচারক !

তন্দ্রাহত ভারতের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে, আচারপীড়িত ভারতবাসীর মর্মে মর্মে ও মোহাচ্ছন্ন বাঙ্গালী জীবনের পরতে পরতে যে বজ্রকঠোর মুক্তির বাণী প্রচার করিয়াছ, তাহাতে বর্তমান বাংলায় তথা বর্তমান ভারতে এক শুভ নবপর্যায়ের সূত্রপাত হইয়াছে। ইহাতে যে নূতন মন ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, সে মন নিশ্চয় একদিন বিশ্বশক্তির অধিকারী হইবে ও তোমার চিরদিনের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করিবে। ভারতের 'মহামানব' জগতে এক নূতন দিন আনিবে এবং মানুষের অধিকারকে শতদিকে সাফল্যমণ্ডিত ও সার্থক করিয়া তুলিবে।

হে জাতীয়তার বীর-পুরোহিত !

আমাদের জাতীয়তার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য কি, তাহা তুমিই প্রথম আধুনিক জগতের নিকট পরিচিত করিয়া তুলিয়াছ। তোমার 'প্রতীচ্যচিত্ত-জয়' ভারতবাসীর জন্য বিশ্বের দরবারে কতখানি মর্যাদা, কত বড় আসন অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার পরিচয় প্রবাসী যাঁহারা তাঁহারা অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, 'একা রবীন্দ্রনাথ যে কি-করিয়া দুঃস্থ ভারতকে জগতের শ্রদ্ধার পাত্র করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা আমরা ব্যক্ত করিতে পারি না।' ভারতের বাহিরে প্রত্যেক দেশে ভারতীয় পর্যটকগণ, ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করেন। এই শ্রদ্ধার মূলে—তোমার সাধনার সাফল্য, তোমার বিশ্ব-বিশাল বুদ্ধির প্রাখর্য ও কঠোর-কঠিন সাধনার 'নব-নবোন্মেষশালিনী' প্রতিভার সার্থকতা ও চরিতার্থতা। তাই আজ তুমি বিদেশীয় পরাক্রান্ত, ঐশ্বর্যমণ্ডিত জাতিসমূহের নিকট 'শতছিন্ন-মলিন-বসনা' পরাধীন ভারতকে একটা বিশিষ্ট জাতি বলিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে ও জাতীয়তার দাবি করিতে সক্ষম করিয়াছ। আমাদের জাতীয়তার তুমিই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছ। আমাদিগকে তাহার মূল্য বুঝিতে সমর্থ করিয়াছ।

জালিয়ানওয়ালা-বাগের লোমহর্ষণ ব্যাপারে যখন ভারতবাসীর মনুষ্যত্ব ও জাতীয়তা অবমানিত, লাঞ্ছিত হইয়াছিল, তখন তোমার অন্তরাত্মা মর্মাহত হইয়া 'রাজকীয় সম্মান' প্রত্যাখ্যান করিয়া যে উত্তর দিয়াছিল, তাহাতে জগত বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে, শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তোমার জাতীয়তার প্রবল শক্তি অনুভব করিয়াছিল। সে শক্তি, বিধাতার ইচ্ছায়, ভারতবাসীকে স্বাধীনতার প্রচেষ্টায় যে জ্ঞান ও যে শক্তির আবশ্যক তাহা অর্জন করিতে অনেকখানি প্রবুদ্ধ করিয়াছে। তাই বলি, তুমি শুধু জাতীয়তার পুরোহিত নও, বীরও বটে।

তোমার সেই পৌরোহিত্য, সেই বীরত্ব যুগে যুগে ভারতকে তাহার আদর্শকে মহীয়ান, গরীয়ান করিতে সতত সচেষ্ট রাখিবে, সন্দেহ নাই।

হে বিশ্বজ্ঞান-সঞ্চয়ী!

'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' এ কথা তুমি প্রাণ দিয়া অনুভব করিয়া বিশ্বজ্ঞানকে দুই হাতে আহরণ করিবার জন্য এক জাগ্রত অনুষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছ—তোমার শান্তিনিকেতনে। এই অনুষ্ঠান সর্বজ্ঞান, সর্বরুচির ভাণ্ডারী হইয়া ভারতের বুকে এক মহামানবতার সার্থকতা মূর্ত করিয়া তুলিবে। তোমার এই জ্ঞানসঞ্চয়ীর আদর্শ আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করুক। আমরা যেন শাস্ত্র ও কাল, জাতি ও দেশের ক্ষুদ্র সীমার বাহিরে গিয়া মানুষের দানকে নির্বিকারচিত্তে আপনার করিয়া গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হই। 'জ্ঞানের রাজ্যে অসহযোগ (non-co-operation) মৃত্যু'—তোমার এই অমর উপদেশ যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই।

হে পুণ্যচিত্ত, অনন্ত-রূপপিয়াসী সাধক!

আমাদর আদর্শ কর্মপ্রাণ, স্নেহপ্রবণ, ভক্তবীর হজরত মুহম্মদ (স)-এর জীবনের মূল মন্ত্রটি তোমার একটি ছন্দে বেশ সুন্দর অভিব্যক্ত হইয়াছে—

> 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
> অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তির স্বাদ।'

তোমার এই ছন্দটি সেই পুরুষ-সিংহের প্রতি আমাদের ভক্তি অধিকতর প্রগাঢ় করিয়া তোলে এবং নব নব ভাবে সেই মরুর যোগীকে দেখিবার ইচ্ছা জাগায়। অনন্ত বেদনার মাঝে, মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে যুঝিতে যুঝিতে সেই বিরাট-পুরুষ আত্মার মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তামসিক ভারতে তুমিই নূতন করিয়া এই 'কর্মের মধ্যে মুক্তি'র বার্তা ঘোষণা করিয়া নব নব কর্মধারায় ভারতবাসীকে জাগ্রত করিয়াছ।

বিশ্বের নানা বর্ণ, নানা গন্ধ, নানা ছন্দ, তোমার অনন্ত রূপ-পিয়াসী অন্তরকে রঞ্জিত, আমোদিত, ঝঙ্কৃত-মুখরিত করিয়াছে; তুমি আনন্দের সহিত তাহা উপভোগ করিয়াছ এবং তাহারই মাঝে সেই 'অনন্ত-বিশ্বরূপ-স্রষ্টা'র সাক্ষাতকার লাভ করিয়াছ। একদিকে তুমি মানুষকে নানা কর্মধারায় জাগ্রত করিয়াছ; অন্যদিকে সেই অসীম স্রষ্টার দিকে মনকে আকৃষ্ট করিয়াছ। 'কর্ম ও ধ্যান' উভয়ের সামঞ্জস্য সাধনই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ইসলামের এই অমর বার্তা তোমার ছন্দে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। তোমার এই ছন্দ আমাদিগকে প্রতিদিন বিশ্বের কল্যাণ-সাধনে ও মানুষের সেবায় উদ্বোধিত করুক।

হে চিরনবীন, প্রেমের মূর্তরূপ!

তুমি তোমার সংসর্গ লাভের যে অধিকার এবং তোমাকে আহ্বান করিবার যে সুযোগ আমাদিগকে দিয়াছ, আমরা জানি, তাহার যথোচিত মর্যাদা আমরা রক্ষা করিতে পারি নাই।

ফলত, তোমার স্নেহ-করুণ অনুগ্রহে আমরা কৃতজ্ঞ। তজ্জন্য সেই করুণাময়ের উদ্দেশে পুনরায় শত প্রশংসা ও শত ধন্যবাদ !

আশীর্বাদ কর—তোমার স্মৃতি যেন তরুণ এই মুসলিম হলের অন্তরে চিরদিন রস ও নব নব কর্মপ্রেরণা সঞ্চার করে ; আমরা যেন অচিরে বর্তমানের সঙ্কীর্ণতা, স্বাতন্ত্র্যকে অতিক্রম করিয়া জ্ঞানরাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্বস্রষ্টার অপরূপ দান এই মহামূল্য মানব-জীবনের ও সমগ্র ভারতের গৌরব বর্ধনের জন্য সত্যকার সাধনায় ব্রতী হইতে পারি। ইতি—

মুসলিম হল ইউনিয়ন
২৭শে মাঘ, বুধবার, ১৩৩২

তোমার স্নেহপ্রার্থী
শ্রদ্ধাবনত
মুসলিম হল ছাত্রবৃন্দ

সত্য

শাস্ত্রের শব্দার্থ-জ্ঞান তোমাকে সত্যের সন্ধান দিতে পারে, কিন্তু সত্য তোমার হাতে তুলে দেয় না। তোমার আত্মা সেজন্য নিয়ত ধ্যানরত না হলে সত্যের সন্ধান মিলবে না। সত্য সাধনার ফল। সে সাধনা কঠোর। তাকে স্বীকার করতে চাও কি? শুধু মুখে 'সত্য' 'সত্য' করে শোরগোল করে লোকসমাজকে ব্যাকুল ক'র না।

সাধনায় জীবন উৎসর্গ কর; সত্য আপনি ধরা দেবে, তোমার অন্তর আলোকিত করবে। শাস্ত্রবাক্য সাঁঝ-সকালে আবৃত্তি করলেই তোমার সাধনা সম্পূর্ণ হল, এ কদাপি বিশ্বাস করো না। তাল-লয়-মান ঠিক করে সঙ্গীত দ্বারা সাধনার চর্চা তোমাকে কৃত্রিম সত্যের মধ্যে ফেলবে। তোমার অন্তর শূন্য হ'য়ে থাকবে, সত্য তোমার প্রাণের মধ্যে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারবে না।

হাদিস কোরান এলহান দুরস্ত করে ক্বিরাত ঠিক করে আবৃত্তি কর, তোমার অন্তর খা খা করবে। তাতে তোমার জিহ্বা ও কান তুষ্ট হবে, কিন্তু অন্তর ভুখা থাকবে। শুধু আবৃত্তিতে আত্মার ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় না, সত্য প্রতিভাত হয় না; কেবল সত্যের ভাণ করতে ইচ্ছা বেড়ে ওঠে এবং খুব ধার্মিক হয়েছি বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে লোকসমাজে নিজের খ্যাতির ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করবার সুযোগ করে তুলি।

শুধু অনুষ্ঠান পালনই আবার সাধনার চরম বলে মনে ক'র না। অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রাণ না থাকলে সেটা একটা অভ্যস্ত আচারে পরিণত হয়। তাতে তোমার শরীরের ক্লেশ বাড়ে, কিন্তু সত্যের পথে তুমি আগুয়ান হতে পার না। শরীরের ক্লেশ বৃদ্ধিকে সাধনা বলে ভ্রম করো না। সেটা একটা পথ বটে।

মসজিদে কি মীলাদের মজলিসে অনেককে তন্দ্রালু হতে দেখ নাই কি? তারা তাদের তন্দ্রা খোদার রহমতের ফল মনে করে বাগবাগ খুশী হয় এবং উহা দূর করবার চেষ্টা করে না। এরূপ করে কি আমরা সত্য লাভ করতে পারব?

আমাদের স্বকীয় অভিমত ও সংস্কার ধারণা আমাদিগকে প্রবঞ্চনা করে; সেজন্য আমরা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারি না। যা তুমি জান না, তা লয়ে তর্ক করতে যেও না। তর্ক মানুষকে বিপথে লয়ে যায়। তর্কে রক্ত উত্তেজিত ও শরীর ক্ষিপ্ত হয়। অবশেষে পশুত্বের চরম স্ফূর্তি আকাশ-বাতাসকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। তোমার জ্ঞান যা তোমাকে দেয় না, তা তুমি তর্কে লাভ করতে আশা করো না। তোমার চক্ষু আছে—তার সদ্ব্যবহার করতে চেষ্টা কর। যা তোমার চোখে ঠেকে না, তা তুমি অপরের চোখ দিয়ে দেখতে যেও না। তাতে তোমার

ক্ষতিই হবে—তোমার সকল শ্রম পন্ড হবে। তোমার সাধনার পাথেয় সংগ্রহ করতে তোমার যা আবশ্যক, তাই তুমি খোঁজ। সেটা অবহেলা করে রক্ত-মাংসের জিদ বজায় করতে যেও না। তার চেয়ে বিপুল অসারতা ও মূঢ়তা আর কিছু হতে পারে না।

বর্তমান জগত কি ভুলই না করছে! কি বিরাট ব্যর্থতার পশ্চাত নিয়ত ছুটে চলেছে। একের সুখকে ছোট করে অপরের সুখকে বেশি করবার কায়দাকানুন শিখে কি ফল হবে?

বিশ্ব-সংসারের অন্তরে এক সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হচ্ছে। সেই সঙ্গীতের সুরে সুর মিলাতে চেষ্টা কর। তোমার সকল গান সকল কথা থেমে যাবে। বিশ্বব্যাপী অনন্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে সেই এক সুর তোমার অন্তর পূর্ণ করবে—অখণ্ড শান্তির মধ্যে তোমার আত্মার শাশ্বত আনন্দ চরম হয়ে উঠবে। তোমার দর্শন-গণিত-বিজ্ঞান গলে সেই সুরে সুর মিলাবে—তখন তোমার সাধনার ফল সত্য সুস্পষ্ট হয়ে প্রকট হবে।

যে অনন্তশক্তি খোদা সেই সঙ্গীতের বীণা অবিরাম ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত করছেন, তা সকল প্রাণী-অপ্রাণীর মর্ম-দোলায় দোল দিচ্ছে; কিন্তু কেউ তা বুঝতে পারে না। তা বুঝতে হবে, তবে তোমার অন্তরে শান্তি-সম্পদ জমে উঠবে। খোদার শান্তিতে তুমি ভরপুর হয়ে উঠবে।

"ইয়া রব! সত্য কি? আমাকে সত্যের মুখ দেখাও। তোমার অপার অনুগ্রহ আমাকে অভয় দান করুক। আমি সত্যের সন্ধানে ছুটি।"

"ইয়া গফুর! মানুষের লেখা পড়তে পড়তে, মানুষের বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আর পারি না। এখন তোমার গান আমাকে শুনাও। আমি তোমাতেই আমার বাসনা কামনা উজাড় করে দিতে সমর্থ হব কবে? আমি ধনী হয়ে অকিঞ্চনের মতো তোমার পথে দাঁড়াতে পারব কবে? সত্য-পথ (সিরাতুল মুসতাক্বিম) দেখব না কি? জ্ঞানের ডাক্তার সব মুখ বন্ধ করুক—তোমার সঙ্গে সকল প্রাণী নির্বাক স্তব্ধ হউক—আমি তোমার বীণার মধুর সুরে পাগল হই।"

আমার বিশ্বাস, যে যত আত্মসমাহিত এবং অন্তরে সরল ও নির্মল, সে তত সহজে উচ্চ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। উপর হতে তার মধ্যে জ্ঞানালোক অবতীর্ণ হয়। হজরত মুহম্মদের জীবন তার প্রমাণ। হিরার যোগী হজরত বিদ্যালয়ে না পড়ে কিরূপে জ্ঞানলাভ করলেন? একবার ভেবে দেখ। 'খোদার অনুগ্রহে' বলেই চুপ করে থেক না। তার জন্যে তাঁকে অপার সাধনা করতে হয়েছে। নির্জন গিরিগুহায় আত্মার সন্ধানে তিনি দিনের পর দিন কাটিয়ে দিয়েছেন। তোমার উপর সেইরূপ খোদার অনুগ্রহ নাই, এ কথা মনে ঠাঁই দিও না, কিংবা তাই বলে চেষ্টার ত্রুটি করো না—নিরাশ হয়ো না। সাধনার দ্বারা তুমি মুহম্মদের মত কেন, তাঁর চেয়েও বড় হতে পার। কারণ, খোদা আলিউল আযিম, তা ভুলো না। মুহম্মদ মানুষের বিপুল বিকাশের একটা চমৎকার আদর্শ মাত্র। তিনি যে একান্ত করে বড় হয়েছেন এবং তাঁর মত কেউ হতে পারে না, এ কথা স্বীকার করলে তোমার আত্মা চিরকালই ছোট হয়ে থাকবে। ব্রাউনিং বলেছেন, 'যে সূর্যকে লক্ষ্য করে সেই বড়, আর যে গাছের মাথা লক্ষ্য করে সে ছোট।' এ কথা সত্য বলে মানি।

আমরা খোদার গুণ লাভ করতে প্রয়াসী হব, তবে বড় হব। হজরত বলেছেন, "তাখালা ক্কুহু বি-আখলাক্কিল্লাহু", অর্থাৎ তোমার মধ্যে খোদার গুণ সৃষ্টি কর। এতে বুঝা যাচ্ছে হজরত নিজেই বলছেন, "তোমরা আমার চেয়েও বড় হওয়ার চেষ্টা কর। তোমরা আমার মত ত হবেই—তার চেয়েও বড় হও।"

পবিত্র সরল অচঞ্চল চিত্ত কখনও বিহ্বল হয় না। সকল কাজের মধ্যে তার আনন্দ বিরাজ করে। সে জানে, তার সকল কর্মই বিশ্ব-নিয়ন্তার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়েছে। সুতরাং বাহিরে তার আনন্দ সন্ধান করতে হয় না।

তোমার অন্তরের মধ্যেই তোমার সকল অশান্তি। শুদ্ধচিত্ত ভক্তের কাজ তার অন্তরের আনন্দকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। অবাধ স্ফূর্তির মধ্যে সে তার কাজ করে চলে। বাহিরের কোলাহল তার চিত্তের শান্তি নষ্ট করতে পারে না। বাহিরের বিষয় এসে তার ধ্যানকে বিকৃত করতে সাহস করে না। সে বাহিরকে দূরে রাখে, কিন্তু বাহিরের কাজ করে যায়। সে সংসারের সুখ-দুঃখ দেখে ভয় করে না—সে ঐগুলিকে জয় করে। সংসারের ধন জন প্রতিপত্তির জন্য তার এতটুকু উদ্বেগ আকাঙ্ক্ষা থাকে না। নিষ্কাম হয়ে সত্য প্রেরণার ইঙ্গিতে সে কাজই করে চলে। সত্যের অনুসন্ধান করতে হলে শুধু কাজই করে চল। বসে বিশ্রাম করলে তোমার নিকট হতে সত্য সরে যাবে। অবশেষে তোমার মৃত্যু অনিবার্য।

কাজকে নিজের দাস কর, কাজের দাস হয়ো না। তা হলে অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত বোধ করে ছায়ার সন্ধানে ফিরবে। সত্য পিছনে পড়ে থাকবে। নিজেকে জয়ী করবার জন্য যে যুদ্ধ করতে হয় তার মহাযুদ্ধ আর কি হতে পারে?

আমাদের সকল প্রয়াস আমাদের আত্মশক্তিকে জয়ী করবার জন্য—পবিত্রতার পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য নিযুক্ত হউক। দিন দিন আমরা যাতে শক্তিলাভ করতে পারি—পবিত্র হতে পারি—উগ্র কামনাকে দমন করতে পারি—তজ্জন্য আমাদের শ্রম যেন তিলেক বিরাম লাভ না করে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের শ্রেষ্ঠ নির্ভুলতার মধ্যেও কিছু ভুল মিশ্রিত আছে, আমাদের কোন জ্ঞানই সম্পূর্ণ নয়। জ্ঞানালোকের মধ্যেও অন্ধকার নিহিত আছে। অতএব গভীর জ্ঞানার্জনের চেয়ে সর্বাগ্রে নিজের জ্ঞানলাভ করা শ্রেয়। তাই বলে জ্ঞানলাভ করতে শৈথিল্য করতে হবে না। জ্ঞান নিশ্চয়ই সত্য সন্ধানে সহায়তা করে। জ্ঞান খোদার অনুপম দান।

কিন্তু সর্বপ্রথম চাই সুবিবেক, সজ্জীবন ও সংযম। এই তিনটি সত্য সন্ধানের পথ সুগম করে তোলে।

আজকাল দেখতে পাই, সজ্জীবনের চেয়ে জ্ঞানকে বড় মনে করে সকলে জ্ঞানলাভে ব্যগ্র হয়। তারা তাতে প্রবঞ্চিত হচ্ছে।

আহা! মানুষ শুষ্ক পাণ্ডিত্য লাভ করতে গিয়ে তর্কাতর্কি করে যে শ্রম ব্যর্থ করে—যে সময় ক্ষেপণ করে—তার শতাংশের একাংশ যদি দুনিয়ার ও নিজেদের পাপ দূরীভূত করতে

ব্যয় করত, তাহলে দুনিয়ায় এত দুঃখ-দৈন্যের হুড়মুড়ি দেখা যেত না—ইতিহাস এত কলঙ্কিত হত না—মন্দির মসজিদ এত শৈথিল্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের আড়ম্বরে ভরে উঠত না।

সত্যই, শেষদিনে আমরা কি পড়েছি তার বিচার হবে না—কি করেছি তারই হিসাব দিতে হবে। ধার্মিকের পোষাক, ধর্মের চিহ্ন পরে কেমন করে বক্তৃতা করেছি, তার হিসাব হবেনা। তাই কোরানে স্পষ্ট আছে, "ফামান কানা য়্যারযু লিক্কায়া রাব্বিহি ফালয়্যা মাল আমালান সালেহা", অর্থাৎ খোদার সাক্ষাত যে পেতে চায় তাকে সুকাজ করতে হবে।

জ্ঞানমদে মত্ত ডাক্তার শিক্ষকগণ আজ কোথায়? তাঁদের কথা লোপ হয়েছে। তাঁদের জ্ঞানচর্চা কি কাজে এসেছে? কত কত লোক শুধু জ্ঞানকেই সেবা করেছেন—খোদাকে সেবা করা পছন্দ করেননি। তাঁরা জ্ঞানের গর্বে গর্বিত ছিলেন। এরূপ জ্ঞান তোমাকে সত্যের পথ দেখাতে পারবে না।

জ্ঞানের সহিত খোদার প্রতি ভক্তি মিলিত হওয়া চাই। সত্য সন্ধানের পথ সহজ হয় বদান্যতায়। খোদার ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা বিলীন করে দাও—তুমি মানুষের সমাজে থেকেই সত্যপথ সহজে বের করে নিতে পারবে। সংসার ছেড়ে যেতে হবে না।

সংসারে থেকে যে সত্য লাভ করে, সেই ত প্রকৃত মহৎ। ইসলাম তোমাকে সংসারকে জয় করে মানুষ হতে সহায়তা করে। তার অনুষ্ঠান সত্যের পথ দেখিয়ে দেয়।

তরুণ পত্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

আজ্ঞানুবর্তিতা

হজরত মুহম্মদ (সা) বলেছেন, "আজ্ঞানুবর্তিতা খোদার দিদার লাভের প্রথম সোপান।" কথাটা আজ ভেবে দেখবার সময় এসেছে। তিনি যে যুগে উচ্ছৃঙ্খল মরুজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন তখন এই বাণীর অর্থ অনেকে বুঝতে পারেননি। খোদার দিদার লক্ষ্য— জিতেন্দ্রিয়তা বাহন, আর আজ্ঞানুবর্তিতা জিতেন্দ্রিয়তা লাভের উপায়। এজন্য সাত বৎসর বয়স হতে খোদার উপাসনায় লেগে যেতে হবে। সাত বৎসর হতে পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত খোদার বাণী অনুসারে চলে ইন্দ্রিয় জয় করতে হবে। তখন চাই শুধু আদেশ পালনে উদ্যত প্রকৃতি। বিপ্লব, বিদ্রোহ সে প্রকৃতিকে বিপথেই ঠেলে দেয় ও জিতেন্দ্রিয়তা লাভের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

এই হল প্রত্যেক মুসলিমের শিক্ষার প্রকৃষ্ট সময়। এ সময় নিজে স্বাধীন থাকার চেয়ে গুরুজনের অধীন থাকা শ্রেয়। শাসন করার সম্পদ ও সৌভাগ্য হতে মেনে চলবার বিপদ ও দুর্ভাগ্য অনেকগুণে সুখের ও শান্তিপ্রদ।

নেহায়েত না থাকলে নয় এই ভেবে যারা মনে গিড়মিড় করতে করতে একজনের অধীনে জীবন টেনে চলে, তারা অসুখী অধীর হয়ে ক্রমে শুকিয়ে যায় ও অবশেষে উদ্ধত-প্রকৃতি হয়ে ওঠে। অন্তরের সঙ্গে স্বেচ্ছায় খোদার জন্য তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করলে মনের স্বাধীনতা জন্মে।

নিজের মতকে জয়ী করবার জন্য আমাদের একটা অদম্য স্পৃহা আছে। সে স্পৃহাকে বিনাশ করতে হবে। খোদা তাহলে আমাদের মধ্যে বিরাজ করবেন ও অখণ্ড শান্তি অনিবার্য হয়ে উঠবে।

কেউই কোন বিষয় একান্ত করে জানতে পারে না, সুতরাং নিজের জানার উপর অত বেশি দৃঢ়বিশ্বাস কর না। বরং অন্যের মতটাও শুনবার বুঝবার ধৈর্যটা আয়ত্ত কর। নিজের মতটা অকাট্য মনে ভেবেও যদি খোদার জন্য অন্যের মতটা গ্রহণ করতে হয় সেটা তোমার পক্ষে মঙ্গলকর।

পরামর্শ দেওয়ার চেয়ে গ্রহণ করাই অধিকতর নিরাপদ। এমনও হতে পারে উভয় পক্ষের মতই সাধু, কিন্তু সত্য ও বিবেকের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও যদি তুমি একটা মতকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়ো তাহলে সেটা তোমরার নিছক অভিমান, গর্ব ও গোঁয়ার্তুমিকেই প্রশ্রয় দেবে।

আজ্ঞানুবর্তী হওয়া বড় কঠিন। গুরু হতে সবাই পারে, কিন্তু শিষ্য হওয়া সোজা নয়। কিন্তু কোন মুসলিমই শিষ্য না হয়ে প্রকৃত মুসলিম হতে পারে এত বড় বিশ্বাস আমার নেই।

পিতামাতার খেয়াল ও মতলব সিদ্ধি করতে যা ইচ্ছা তা করাকে আজ্ঞানুবর্তী হওয়া বলে না। পিতামাতা সাময়িক উপদেষ্টা হতে পারেন। কিন্তু নিজের নিকট নিজেকে আজ্ঞানুবর্তী করে চিরজীবন রাখতে হবে, তবে জিতেন্দ্রিয় হওয়া যাবে। প্রত্যেকের মধ্যে 'কু' ও 'সুর একটা চিরন্তন দ্বন্দ্ব চলেছে। 'কুকে সরিয়ে দিয়ে 'সুর আজ্ঞানুবর্তী হতে হবে। এইটাই সবচেয়ে মুশকিল। কারণ 'কু' ও 'সু' চিনে নেওয়া বড় শক্ত। অনেক সময় আজ্ঞাই কুপথে চালিত করে। তেমন আজ্ঞাকে অবহেলা করা যেতে পারে। আবার বুঝবার জন্য তর্ক করতে গেলে অনেক গুরু চটে ওঠেন। তিনি মনে করেন শিষ্য তাঁর পাণ্ডিত্যে সন্দিহান হচ্ছে। এমন গুরুর শিষ্য হয়ে কোন উপকার পাওয়া যায় না। যে গুরু শিষ্যকে ফুটিয়ে তুলতে তার সকল উচ্ছৃঙ্খলতা, ঔদ্ধত্য ও অপরাধ হাসিমুখে সহ্য করে সরল সত্য-পথ দেখিয়ে দেন, তিনিই প্রকৃত গুরু।

অনেক গুরু দেখতে পাওয়া যায়, বুঝবার জন্য শিষ্যকে কোন প্রশ্ন করতে দেন না। তাঁরা বলেন, "শুনে যাও, করে যাও, পরে বুঝবে, প্রশ্ন করতে নেই।" এই বলে শিষ্যকে থামিয়ে দিয়ে তাঁরা বিষম সর্বনাশ করেন। আজকাল ধর্ম-প্রচারক পীর-অলীদের মত এইরূপ। তাঁরা বুদ্ধিকে ঢেকে রেখে শুধু অন্ধ বিশ্বাসকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। ফলে শিষ্য প্রায় প্রথম প্রথম আজ্ঞানুবর্তী হয়ে থাকে, পরে এমন করে যে গুরুর উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয়ে যায়। এরূপ গুরুকে বর্জন করা অনেক সময় বিশেষ প্রয়োজন।

আজ্ঞানুবর্তী হতে হবে বুঝে সুঝে, কিন্তু মাত্র অন্ধ বিশ্বাসই যেন সম্বল না হয়। তাহলে কোন ফল পাওয়া যাবে না। আদেশের অর্থ বুঝবার আগে জবরদস্তি করে আদেশ পালনে প্রবৃত্ত করা অন্যায়। সেইজন্য ইসলাম এমন আদর্শ সৃষ্টি করেছে যার অনুযায়ী চললে যে সে গুরুর আবশ্যক হতে না পারে। সে আদর্শ বুঝতে হবে। সেই আদর্শের উপর বাহ্যভক্তি অন্তরকে প্রকৃতভাবে আজ্ঞানুবর্তী করতে পারবে না। তাকে হৃদয়ঙ্গম করাই সর্বপ্রথম কর্তব্য। তাহলে ভক্তি অজ্ঞাতসারে উছলে পড়বে।

তবে বুদ্ধি পেকে উঠবার পূর্বে সুকুমার শিশুদের সুকোমল হৃদয়ে শ্রদ্ধার বীজ বপন করা দরকার। তাহলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ও বুদ্ধির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভক্তি বেড়ে চলবে। কিন্তু যদি সেই ভক্তিটাই বেশি করে আদায় করতে চেষ্টা করা হয় তার বুদ্ধির সাহায্য হতে বঞ্চিত করে, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবেই।

হজরতের বাণী, মহাপুরুষদের জীবনী ও অন্যান্য সদগ্রন্থ হতে অনেক কিছু পাওয়া যায়, যা পালন করাকেই আজ্ঞানুবর্তী হওয়া বলে। কোন প্রশ্ন না করে খোদা-গুণ অনুকরণ করবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সুকাজ ও সুচিন্তা করে চললে খোদা নিশ্চয়ই সোজা পথ বের করে দেন।

তরুণপত্র, আষাঢ় ১৩৩২

ইতিহাসের ভৌগোলিক ভিত্তি

ভৌগোলিক অবস্থা মানুষের ইতিহাস-সৃষ্টির মূল কারণ, এ কথা আজও ইতিহাসরসিকগণ পুরোপুরি স্বীকার করতে চান না। জগতের সর্বত্র যদি ভৌগোলিক অবস্থা একই প্রকার হত তাহলে বোধ হয় বিভিন্ন ইতিহাস বা বিভিন্ন জাতির আবির্ভাব হত না। ভৌগোলিক অবস্থা বিভিন্ন হয়েছে বলেই আজ আমরা নানা ইতিহাস দেখছি, নানা জাতির সংঘর্ষ দেখছি এবং সেজন্য কোন কোন জাতিকে বাহবা দিচ্ছি আবার কোন কোন জাতিকে ঘৃণা করছি। এই অহঙ্কার ও ঘৃণা সমাধিলাভ করবে যদি আমরা স্বীকার করতে পারি যে, ভৌগোলিক অবস্থা জাতির উন্নতি ও অবনতির কারণ। জাতি উন্নতি ও অবনতি, উত্থান ও পতনের ইতিহাসকাহিনী লইয়া সৃষ্টি হয়েছে।

একটা জাতির উত্থান কেন হল? তার পতনই বা কেন হল? এই প্রশ্নের সমাধান করতে গেলে আমরা কতকগুলি কারণ দেখতে পাই। এই কারণের মধ্যে ভৌগোলিক কারণটি আসল বলে আধুনিক এক শ্রেণীর ইতিহাসজ্ঞগণ স্বীকার করতে ব্যস্ত হয়েছেন। বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন, যদি ভৌগোলিক অবস্থাই কারণ হবে তবে একটা জাতির উত্থান হলে তার পতন হত না। তার উত্তরে বলতে হবে, "না, ভৌগোলিক অবস্থা একেবারে চিরন্তন অপরিবর্তনীয় নয়। এই অবস্থাও পরিবর্তনশীল। ভৌগোলিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতির উত্থান-পতন হয়েছে।" ভৌগোলিক অবস্থা জাতির চরিত্র ও দৈনন্দিন কার্যের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের বিকাশের গতি নির্ধারণ করতে গেলে আমাদের দেখা উচিত ভৌগোলিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না। অর্থাৎ একটা জাতি প্রথমত যেরূপ আবহাওয়ায় উন্নতি লাভ করেছে তার পতনের সময় সেই আবহাওয়ায় কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না। যদি হয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে, আবহাওয়া সেই জাতির ইতিহাস গঠন করতে অনেকখানি শক্তি প্রয়োগ করেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মধ্য-এশিয়া ধরা যেতে পারে। মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন অবস্থা আর নাই। এখন তার রুদ্র আবহাওয়ায় রুদ্র সভ্যতা বিকশিত হয়েছে। এইরূপে উত্তর-আফ্রিকা, পশ্চিম-এশিয়া এবং ইউরোপে আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার পরিবর্ত্তন ঘটেছে, সুতরাং ইতিহাসও বদলে গেছে।

ইতিহাসের ভৌগোলিক ভিত্তি কতকগুলি অপরিবর্তনীয় ও কতকগুলি পরিবর্তনশীল উপকরণের দ্বারা গঠিত। অপরিবর্তনীয় উপকরণের মধ্যে ক্ষিত্যপতেজমরুৎ অর্থাৎ দেশের আকৃতি, জলরাশি, সূর্যকিরণ ও বায়ু এই চারিটি সর্বপ্রধান ; এবং পরিবর্তনশীল ঘটনার মধ্যে ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, নদীর গতি-পরিবর্তন, ঝটিকা এবং ঋতু-পরিবর্তন বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। এই উপকরণগুলি ও প্রাকৃতিক ঘটনা বা দুর্ঘটনার কখনও একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হয় না। একাধিক উপকরণের আধিক্য বা অল্পতা ভৌগোলিক অবস্থা নির্ণয় করে, যেমন ইংলন্ড ও মিসর। ইংলন্ডের উপর সমুদ্রের প্রভাব কত বেশি, কিন্তু মিসরের উপর মরুভূমির প্রভাব প্রচন্ড। ইংলন্ডে জলরাশির আধিক্য এবং মিসরে সূর্যকিরণের আধিক্য। সুতরাং ইংলন্ডের সভ্যতা ও মিসরের সভ্যতা পৃথক হয়েছে। এইরূপে ভৌগোলিক অবস্থা মানুষের মন ও শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহার কার্য নিয়ন্ত্রিত করে। জলহীন মরুর উপর মানুষ সতত আহারের অন্বেষণে ব্যস্ত। তার শরীর ক্লান্তিতে পরিপূর্ণ, মূর্তি রুদ্র, হৃদয় আতিথ্যে দ্রব। আবার 'সুজল সুফল শস্যশ্যামল' দেশের মানুষ কত আয়েশ-আরামপ্রিয়, অলস, অমিতাচারী, অপরিণামদর্শী, অদৃষ্টবাদী! সুতরাং মরু-সন্তানের ইতিহাস তার জীবনযাত্রার এমন ঘটনায় পরিপূর্ণ, যার সহিত শস্য-শ্যামল দেশের ইতিহাসের কোন মিল দেখা যায় না। এখন একটা কথা আমাদের নিকট সত্য হয়ে উঠেছে যে, আবহাওয়ার প্রভাব মানব-চরিত্রের উপর অত্যন্ত বেশি এবং তারই ফলে ইতিহাস ক্রমে বিকাশলাভ করেছে।

ইউরোপ ও এশিয়া ভূখণ্ডের উপর মানুষ পূর্ব হতে পশ্চিম অভিমুখে আহারান্বেষণে চলেছিল, কারণ উত্তরে পর্বতমালা ও মরুভূমি এবং দক্ষিণে তুষারাবৃত চির-শুভ্র মেরুপ্রদেশ মানুষের গতি রোধ করেছে। ইংলন্ডের বাণিজ্য-প্রাধান্য তার সামুদ্রিক আবহাওয়া এবং সন্নিহিত লৌহ ও কয়লার একত্র সমাবেশের ফল। পো নদীর উপত্যকায় ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়াকে প্রায়ই যুদ্ধ করতে দেখা গেছে। তার কারণ আল্প্‌সের উভয় প্রান্তের সঙ্কীর্ণ পথ উভয় দেশের আগমন সহজ করেছে এবং একাধিক যুদ্ধে তারাই জয়লাভ করতে পেরেছিল যারা আল্পসপ্রসূত দক্ষিণমুখী পো-র এক উপনদীর পশ্চাতে সৈন্য সংঘবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিল। নেপোলিয়নও বলেছিলেন, রুশিয়ার হিম ও সিরিয়ার গরমি সবচেয়ে অজেয় শত্রু। এ-সমস্ত ইতিহাসের উপর ভৌগোলিক প্রভাবের দৃষ্টান্ত ; কিন্তু মানুষের চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব আরও বেশি। মধ্যএশিয়ার মরুভূমি ও পর্বত প্রান্তর খিরগীয় জাতির যাযাবর-জীবনকে সহজ করে প্রকৃতি সহিষ্ণু, স্নেহশীল, অলস, আতিথ্যপূর্ণ ও সুনীতিপ্রিয় করেছে। আবার ঐ মরুর বুকে শ্যামল দ্বীপমালার সরস ভূমিতে চ্যান্টস জাতি কৃষি-জীবনে স্ফূর্তিলাভ করেছে। এইরূপে তাদের জীবন নিরাপদ ও সহজ হওয়ায় তারা দুর্বলচিত্ত, কাপুরুষ ও পারিবারিক স্নেহে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। অবশ্য ধর্মবিশ্বাস ও অন্যান্য কারণেও তাদের চরিত্র এইরূপ হয়ে থাকবে। কিন্তু তবু ভৌগোলিক অবস্থা যে তাদের প্রকৃতি অনেকখানি এইরূপ করেছে তাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবত এ-কথা প্রত্যেক জাতির পক্ষে খাটে। প্রত্যেক জাতির স্বভাব, প্রকৃতি, চরিত্র অধিকাংশই ভৌগোলিক অবস্থার প্রভাবের ফল।

ভৌগোলিক অবস্থাই যে সমস্ত মানুষটিকে গঠন করে তা বলা শক্ত। মানুষ অনেক কিছু উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হয়। বর্তমান মানুষ অতীত মানুষের সাধনার ফল বিনা আয়াসে প্রাপ্ত হয়। তার শিক্ষা অতীতের শিক্ষার ফল হতে প্রাপ্ত। বস্তুত উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত যা কিছু, সমস্তই অতীত শিক্ষার সমষ্টি মাত্র। সাধারণ মানুষের শিক্ষা সামাজিক বিধি-বিধানের উপর নির্ভর করে। সামাজিক প্রকৃতি আবার সমুদ্র, সমতলভূমি, অরণ্য, পর্বত ও নদীর প্রভাবে

গঠিত। ঐ সমস্ত প্রাকৃতিক উপকরণগুলি মানুষের পেশা নির্ধারণ করে। পেশা হতে ইতিহাস জন্মলাভ করে। অরণ্যপ্রধান দেশে মানুষ আরণ্যক পেশা অবলম্বন করে। সমুদ্রের উপকূলে মৎস্যজীবীর প্রাধান্য। নদী–ধৌত সমতলভূমিতে কৃষিজীবীর সংখ্যা বেশি। পেশা–অনুসারে মানুষের কার্য ও চিন্তার ধারা গঠিত হয় এবং উহাই ইতিহাসের স্বরূপ নির্ণয় করে।

তত্ত্বজ্ঞ ঐতিহাসিক বলেন, কার্যে প্রতিফলিত মানব–চরিত্রই ইতিহাস। মানুষের বাস–পরিবর্তনের মূলে একটা তীব্র অসন্তোষ আছে। বর্তমান অবস্থা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার অন্তরায় হলে মানুষ স্থান পরিবর্তন করতে ব্যস্ত হয় এবং অবস্থান্তর খুঁজে বেড়ায়। কোন ইতিহাস সাক্ষ্য দিতে বোধ হয় পারবে না যে, কোন শক্তিমান নায়ক কোন পরিতুষ্ট জাতিকে স্থানান্তরিত করতে পেরেছিলেন। রোমের ইতিহাস আমাদের সমক্ষে এক বিরাট জাতির চরিত্র খুলে ধরেছে। রোমীয়দের চরিত্র তাদের কার্যে বিকশিত হয়েছে। তারা বলবান, বুদ্ধিমান, সাহসী ও মিতাচারী ছিল বলে রোমকে অজেয় করে তুলেছিল, কিন্তু যেই তারা কাপুরুষ, ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে পড়ল তখনই রোমের পতন হল। আমেরিকাবাসী ইংরেজি ভাষা বলে ; কারণ ইংরেজ জাতি আমেরিকার উপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছে যে অন্যান্য জাতি আমেরিকার নিকটবর্তী হয়েও আমেরিকার উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। ইংরেজ চরিত্রের এমনি তিতিক্ষা, দৃঢ়তা ও পরিণামদর্শিতা। ইংলন্ডের ভৌগোলিক অবস্থা ইংরেজকে এইরূপ গুণে ভূষিত করেছে বলে আজ ইংরেজ পৃথিবীর শত শত জাতির উপর কর্তৃত্ব করতে সমর্থ হয়েছে। অতএব দেখা গেল, ভৌগোলিক অবস্থা যে শুধু ইতিহাসের বাহ্য বিবরণের ব্যাখ্যা করে তা নয় ; উহা প্রসিদ্ধ ঘটনার কারণ সরবরাহ করে। এই সমস্ত ঘটনায় জাতির চরিত্র প্রকাশিত হয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, যদি চরিত্র ভৌগোলিক অবস্থার উপর নির্ভর করে, তবে অতীতের ন্যায় রোম আজও কেন শক্তিশালী থাকে নাই? অথবা পারস্য পূর্বের ন্যায় কেন সভ্য রইল না? রোম ও পারস্যের পতনের মূলে তার ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য তার বাণিজ্যের ফল। বাণিজ্য ভৌগোলিক অবস্থার ফল। তাছাড়া, রোমের পতনের কারণ বর্বরদিগের আক্রমণ। বর্বরগণ আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে খুঁজতে খুঁজতে রোমের ঐশ্বর্য দেখে আকৃষ্ট হয়ে রোমের ধ্বংস অনিবার্য করে তুলেছিল। পারস্যের পতন তার আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফল। ম্যাকম একটা গল্প বলেছেন, তা থেকে বেশ বুঝা যাবে, আবহাওয়া মানুষের মস্তিষ্ক ও সুপ্রবৃত্তির উপর কতখানি শক্তি প্রয়োগ করে! গল্পটি এই—

একজন ইংরেজ জনৈক পারসির সহিত কথোপকথন করতে করতে বললেন, "মিথ্যা কথা বলা বড় পাপ।" উত্তরে পারসি বলল "ইংরেজের পক্ষে এটা বলা বড় সহজ। এসব আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে।" ইংরেজ বললেন, "কেন, প্রাচীন পারসিগণ ত সত্য ভিন্ন মিথ্যা কথা বলত না।" পারসী উত্তরে বলল, "কে জানে আবহাওয়া এক হাজার বৎসরের মধ্যে বদলে যায়নি?"

গল্পটি কৌতুকপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু এর মধ্যে একটা সত্য প্রকাশিত হয়েছে। ডেকসটার তাঁর 'আবহাওয়ার প্রভাব' নামক পুস্তকে আবহাওয়ার বিভিন্ন অবস্থার প্রভাবে

মানুষের অন্যায় করবার প্রবৃত্তি কিরূপে কম-বেশি হয়; ছাত্রগণের স্বভাব কিরূপ পরিবর্তন হয়, কেরানিদের কিরূপ ভুল-ভ্রান্তি ঘটে, তা নানা স্থান হতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন। তিনি বলেন, হিমপ্রধান আবহাওয়ায় মানুষের মস্তিষ্ক স্ফূর্তিলাভ করে ও কর্মস্পৃহা বর্ধিত হয়। শুষ্ক আবহাওয়ায় মানুষের জীবনীশক্তি প্রখর হয়ে ওঠে, কখন কখন উত্তেজিত হয়। সেজন্য উষ্ণ-প্রধান আবহাওয়ার মানুষ ভাবপ্রবণ, প্রবৃত্তি দমনে অক্ষম, ক্রোধী, হিংসাপরায়ণ, লোভ সংবরণে অসমর্থ। সুতরাং সে জাতির ইতিহাস নানা কুকাজে কলঙ্কিত। নরহত্যা, নারীহত্যা, চৌর্যবৃত্তি প্রভৃতি অদম্য উত্তেজনার কাজ সাধারণত ঘটিয়া থাকে উষ্ণপ্রধান আবহাওয়ায়। পারস্য, তুর্কিস্থান ও পশ্চিমচীনে বাতাস প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তোলে, সেজন্য পার্শী, তাতার ও চীন একটু খিটখিটে, ভাবপ্রবণ ও আত্মসংযমে অক্ষম। আত্মসংযম নাই বলে পার্শী মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সত্য বলার অভ্যাস হয় ভয়, লোভ ইত্যাদি রিপুর বিরুদ্ধে সতত যুযুৎসু দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ফলে। আবহাওয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শিথিল করে দেয়, আর ঐ সমস্ত রিপুর বশবর্তী হতে হয়। কাজেই চরিত্র-গঠনে আবহাওয়ার প্রভাব অনেক। পার্শিদের বর্তমান চরিত্র হতে বুঝা যায়, বর্তমান পারস্যে প্রাচীন পারস্যের আবহাওয়া আর নাই।

পৃথিবীর আবহাওয়া তার ও সৌরজগতের আবর্তনের ফলে যে পরিবর্তিত হয় তা বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করেছেন। ব্রুকনার ও ক্লাফ বলেন, সারা পৃথিবী ৩৬ বৎসর অন্তর একবার করে আবহাওয়ার চক্র পরিবর্তন করে। তার ফলে উষ্ণ আবহাওয়ায় কয়েক বৎসর যাবৎ হিম, ঝড় ও বর্ষার প্রাদুর্ভাব হয়। ক্লাফ ৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আবহাওয়ার পরিবর্তন পরীক্ষা করে এইরূপ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন।

আবহাওয়ার পরিবর্তন সমৃদ্ধিশালী প্যালেস্টাইনকে শুষ্ক করে ঊষর ভূমিতে পরিণত করেছে। ৭৫ খ্রিস্টাব্দে জোসেফাস বলেছিলেন, "জুডিয়া ও সামারিয়ায় প্রচুর বর্ষা হয় ও কৃষিকার্য উন্নতি লাভ করেছে। এখানে নানা প্রকার ফল আছে, নদী নাই; তবে বর্ষার জলের অভাব নাই।" কিন্তু আজ সামারিয়া জলহীন মরু। মিসরে আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়েছে। সেইস, আনগার প্রমুখ ব্যক্তিরা সিদ্ধান্ত করেছেন, গত ৩০০০ বৎসরের মধ্যে মিসরে কৃষির উপযোগী জমি কমে গেছে, একপ্রকার স্থলপদ্ম আর জন্মে না—এই পদ্ম প্রাচীন মিসরীয়দের একটা প্রধান খাদ্য ছিল। শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে মনুষ্যবাসের ধ্বংসাবশেষ নীল নদের অনেক পশ্চিমে বিস্তৃত হয়ে আছে। এ সমস্ত বেশ স্পষ্ট করে প্রমাণ করে যে, মিসরে হাওয়া পরিবর্তিত হয়েছে। ফ্রাস আরও বলেন, "প্রাচীন গ্রীসের মস্তিষ্ক-চর্চা যেরূপ আবহাওয়ায় সম্ভবপর হয়েছিল, সেরূপ আবহাওয়া গ্রীসে আজ নাই। যে আবহাওয়া আলেকজান্দ্রিয়াকে জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পবাণিজ্যকেন্দ্র ও জ্ঞান-চর্চায় প্রসিদ্ধ করে তুলেছিল, সে আবহাওয়া মিসরে আর নাই। আলেকজান্দ্রিয়ায় আর পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত হবে না।" সাহারার তপ্ত হাওয়া ভূমধ্যসাগরতীরস্থ দেশসমূহকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। কার্থেজের যুগ হতে এ পর্যন্ত উত্তর-আফ্রিকায় যে ধ্বংসের চিহ্ন প্রকটিত হয়েছে, তা সকলের জানা আছে। ইতিহাসখ্যাত নেপোলিয়নের তৃতীয় বাহিনী সাহারার রুদ্র মরুর মধ্যে বহুদূর অগ্রসর হতে

পেরেছিল, কারণ তখন উত্তর-আফ্রিকার আবহাওয়া তাদের গতি সহজ করেছিল। মধ্য-এশিয়ার মরুর বুকে আলেকজাণ্ডারের প্রবেশও তখনকার আবহাওয়ায় সম্ভবপর হয়েছিল। সিজারের কথা পড়তে গেলে আমাদের মনে হয় ইউরোপ তখন কত হিমপ্রধান ও জলমগ্ন ছিল। গল-বিজয়ী তুষার প্রভৃতি নানাপ্রকার আবহাওয়ায় কষ্টভোগ করেছিল। গিবনও বলেন, রোমীয় সম্রাটগণের যুগ হতে ইউরোপে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাচীন ইংলন্ড ও জার্মানির অবস্থার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তুলনা করলে সহজেই ধরা পড়বে যে, অসভ্য ইংলন্ড ও অভাবগ্রস্ত জার্মানির আবহাওয়া কিরূপ খারাপ ছিল। দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি দেওয়া যায়। আমাদের ভারতবর্ষেও আবহাওয়া বদলে গেছে। বৈদিক যুগে যে আবহাওয়া আর্য সভ্যতাকে বিকশিত করেছিল, সে আবহাওয়া আর নাই। থাকলেও স্থান পরিবর্তন করেছে। যুগে যুগে সভ্যতা স্থান পরিবর্তন করছে। এশিয়ার হৃদপিণ্ডে আবহাওয়া যে সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল তা ক্রমশ পশ্চিমাভিমুখে সরে গেছে।

প্রাচীন ব্যাবিলন, গ্রিস, ইটালি, মিসর, ভূমধ্যসাগর বেড়ে সভ্যতা বিকাশলাভ করেছিল। কিন্তু ভূমধ্যসাগর-তীরে সাহারার প্রচণ্ড প্রভাব পড়ল, আর সভ্যতা পশ্চিমে সরে গিয়ে আটলান্টিক পারে আসন পাতল। আবার হয়ত আটলান্টিকের আবহাওয়া বদলে যাবে এবং প্রশান্ত মহাসাগর তীরে সভ্যতা স্থান গ্রহণ করবে। তাহলে অসভ্য চীন, জাপান, দক্ষিণ-আমেরিকা আবার সভ্য হয়ে ওঠবে। ভারতবর্ষও তার প্রভাবে উপকৃত হবে ও তার অতীত গৌরব লাভ করবার চেষ্টা করবে।

খলিফাদের যুগে ইসলাম পারস্য, সিরিয়া ও মধ্য-এশিয়ায় কিছুদিনের জন্য স্ফূর্তিলাভ করেছিল, কিন্তু শীঘ্রই আবহাওয়া অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল—খলিফাদের চরিত্র খারাপ হল এবং আরব-সভ্যতায় ভাটা পড়তে আরম্ভ হল। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের অবনতির সঙ্গে বাগদাদের পতন শুরু হয়েছিল।

তরুণ পত্র, আষাঢ় ১৩৩২

আমাদের কর্তব্য কি ?

আজ দেখছি চারদিকে অন্যান্য জাতির জীবনের গতি, সাধনা ও জ্ঞানার্জনে তীব্র পিপাসা। অতীত গৌরবের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য তাদের কি প্রাণপণ প্রয়াস এবং জাতীয় আদর্শকে অক্ষুন্ন রাখবার জন্য কি অনন্যসাধারণ ত্যাগ। তারা পর্বত-প্রমাণ বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ জ্ঞান করে ক্রমাগত সম্মুখে চলছে। সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বার খুলে দিয়ে জগতের রহস্য, বিবিধ জাতির ইতিহাস, অতীতের সাধনাকে উদঘাটন করতে প্রাণ ঢেলে দিয়েছে। আকাশ বাতাস কেঁপে উঠছে তাদের অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও অসীম অধ্যবসায় দেখে। বিশ্বমানবের ইতিহাসে যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু সত্য, যা কিছু পবিত্র, সবই আপনার বুকের সামগ্রী করে তুলবার জন্য তাদের নিদ্রা, বিশ্রাম, ধন, জন সমস্তই উৎসর্গ করে দিচ্ছে। সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হব, সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট হব, সকলের চেয়ে সুন্দর হব, এই হয়েছে তাদের স্বপ্ন। শুধু স্বপ্ন নয়! তারা সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্য সে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছে তা দেখে অতীত ইতিহাসের সাধকগণেরও পরমাত্মা শিউরে উঠেছে। তারই পাশে দেখছি বাঙলার মুসলমানগণ জীবন্মৃত, পরের কৃপা-ভিখারি, পদদলিত, লাঞ্ছিত, অচল ও স্পন্দনহীন হয়ে জগতের পৃষ্ঠে বিচরণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কি করবার আছে; তাই তারা যেন জানে না। মাঝে মাঝে ঐ আকাশের দিকে তাকায় আর চুপ করে বসে থাকে; ধর্মগুরু পীর এসে শুনিয়ে যান, "ভয় কি, তোদের জন্য ঐ নীল আকাশে সবুজ বেহেশত খোলা রয়েছে।" তারা সান্ত্বনা পেয়ে শান্ত হয়ে থাকে এবং দু-একবার বলে, "কাফেরাই পৃথিবীতে সুখ ভোগ করবে।"

তারা দলে দলে কুকাজ করে রাজার দেউড়িতে ঢুকেছে। দেনার দায়ে দেউলে হয়ে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ফেলে 'ইল্লাল্লা' সার করে দ্বারে দ্বারে ফিরছে। পীরে পীরে ঠোকাঠুকি করছে, আর মুরিদের দল কাটাকাটি করে তাদের গুরুভক্তি দেখাচ্ছে। পীরের কবর হয়েছে তাদের পূজার সামগ্রী ও বাসনা-পূরণের একমাত্র স্থান। অন্তরের দৈন্য তাদের দিন দিন বেড়ে চলেছে। খোদা তাদের অন্তর থেকে অপসারিত হয়েছেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখি মুসলমান ছাত্র কত উদাসীন, আয়েস-আরাম-প্রিয়, পরিশ্রম-বিমুখ, অসহিষ্ণু, আপাত-সুখকামী, জ্ঞানার্জন-কাতর, পরমুখাপেক্ষী, দায়িত্ব-জ্ঞানহীন, উদ্ধত, বিনয়বিহীন। আর কত বলব। চেষ্টা করে সকলের চেয়ে ভালো হব, এ তাদের ধাতে এখনও আসে নি। ফলে তারা আজ জ্ঞান ও শিক্ষায় কত ছোট হয়ে রয়েছে।

চাকরির ক্ষেত্রে দেখি বি.এ., এম. এ. পাস করে সব চাকরি নিয়ে জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে; কিন্তু তাদের মধ্যে না আছে জ্ঞানের চর্চা, না আছে সমাজসেবার জন্য প্রাণ, না

আছে ভবিষ্যতের জন্য ভাবনা। মাসে মাসে টাকা পাচ্ছে, আর দুনিয়ার স্ফূর্তিতে তা ব্যয় করে দিচ্ছে। প্রায়ই মৃত্যুর পরই, দেখতে পাই, তাদের ছেলেমেয়ে পরের আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ধর্ম-প্রচারকদের কথা আর কি বলব। কলকাতার মাদ্রাসা হতে শত শত আলেম পাস করে পাগড়ি পরে পল্লীর অলি-গলি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু তাঁরা নিরীহ মুসলমানের কাছে কি বার্তা নিয়ে যাচ্ছেন? তাঁদের সম্মুখে যে ভীষণ ক্ষুধা মুখব্যাদান করে বসে আছে, তা নিবৃত্তির জন্য কি কোন কথা কোরান হাদিস থেকে তাঁরা বের করে দিচ্ছেন?

তাই প্রতিবেশীকে উন্নতশির হয়ে ফলাফল বিচার না করে কেবল সম্মুখে চলতে দেখে ও আমাদের নিস্পন্দ সমাজের অসাড়তা দেখে এই প্রশ্ন মনে হয় : 'এখন আমাদের কর্তব্য কি?'

আমরা কি শিক্ষাক্ষেত্রে যাব শুধু চাকরির যোগ্যতা অর্জন করতে? আমাদের নেতারাও কি আমাদের কেবলমাত্র সেই যোগ্যতা দেখেই সন্তুষ্ট থাকবেন? আমরা কি বিশ্ব-জগতের জ্ঞানের উৎসবে আমাদের বাতিটি জ্বালাব না? সকলে ছুটে আসছে জ্ঞান-বাতির দেয়ালি-উৎসবে নিজ নিজ বাতি নিয়ে। কিন্তু কই—মুসলমানকে ত দেখছি না? সে ত ঘুমের ঘোরে কেবল 'স্যারাসেন' 'স্যারাসেন' করেই মরল। তার নিজের সাধনা কই? বর্তমানে তার বাতি কই? হজরত মুহম্মদ (সা) বলেছেন, "যে মন জ্ঞান-মার্জিত নয় সেটা আত্মাহীন শুষ্ক দুর্বল শরীরের মত। মানুষের গৌরব ধনে নয়—জ্ঞানে।" স্কট (Scot) বলেন, "জগতের সাহিত্যে এর চেয়ে উন্নত ও মহত আদর্শ আর কেহই দিতে পারেন নি।" মরুভূমির অজ্ঞতার মধ্যে লালিত পালিত নিরক্ষর নবী আরও বলেছেন, "জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কর ও বিতরণ কর। যে উহা শিক্ষা দেয়, সে খোদাকে ভয় করে; যে উহা কামনা করে, সে তার আরাধনা করে; যে উহার আলোচনা করে, সে তাঁকে প্রশাংসা করে; যে উহা প্রচার করে, সে ধন বিতরণ করে; যে উহা আয়ত্ত করে, সে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়। জ্ঞান আমাদিগকে ভ্রম ও পাপ হতে রক্ষা করে, স্বর্গের পথ আলোকিত করে। পর্যটনে ইহা আমাদের সহায়, মরুভূমিতে আমাদের চালক ও বিজনে আমাদের সঙ্গী। জীবনে সুখ-দুঃখে ইহা আমাদের একমাত্র পরামর্শ-দাতা। বন্ধু-সমাজে ইহা আমাদের ভূষণ ও শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের বর্ম। খোদা জ্ঞানীর সাহায্যে জগতের সত্য ও সুন্দরকে প্রকাশ করেন। জ্ঞানচর্চায় যাঁরা জীবন ব্যয় করেন তাঁদেরই স্মৃতি সর্বসংহারী কালের হাত হতে উদ্ধার পাবে। তাঁদের মহত সাধনার ফল যুগে যুগে মহত্তর মানুষের সৃষ্টি করতে থাকবে। জ্ঞানচর্চা অজ্ঞতার ও দুর্বলতার একটা অমোঘ ঔষধ, এবং অন্যায়ের আঁধারে একটি উজ্জ্বল বাতি। সাহিত্য-সাধনা রোজার মতই পূণ্যজনক। উহার প্রচার নামাজের চেয়ে কম পুণ্যজনক নয়। অন্তরে ইহা অতি উচ্চ ভাবের সঞ্চার করে, দুষ্টকে সুপথে ফিরায় এবং পাপাসক্ত দুর্বৃত্তকে মনুষ্যোচিত গুণে ভূষিত করে।।" *

এই অমর অমৃত-বাণী যে মহাপুরুষ শুষ্ক বালুরাশির মধ্য হতে মধ্যাহ্ন-সূর্যের মত জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাঁরই 'উম্মত' বলে আমরা আজ কেমন করে পরিচয়

---

* স্কটের 'মূর সাম্রাজ্যের ইতিহাস' হইতে উদ্ধৃত।

দিতে চাই, সেইটাই আশ্চর্যের বিষয়! আমরা কি করেছি, কি করছি, কি করতে চাই? কি আমাদের বর্তমান আদর্শ? হজরত মুহম্মদের আদর্শ কি আমাদের জীবনে কোন কাজে লাগবে না?

বাঙলার মুসলমান এখনও হজরত মুহম্মদের মহা-জীবনের পরিচয় ভালোরূপে পায় নি। তাঁর জন্মদিনের উৎসবেই তাদের সব খতম হয়ে গেছে। তিনি যে কি করেছেন, কি করতে বলেছেন, তা তারা এখনও পুরাপুরি বুঝতে পায় নি। আমাদের কর্তব্য, তাঁর জীবনের সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচয় লাভ করে তাঁরই আদর্শ-অনুসারে কার্য করা।

আজ জগত যে পথে চলেছে, সেইটাই যে চরম সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ পথ, তা বলা শক্ত। মানুষ আজ যে আদর্শ বলে মর্ত্যে সুখের নীড় রচনা করতে ব্যস্ত, সে আদর্শ যে সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা, কাম্য, ত বলতে পারব না। সে আদর্শকে সংস্কার করতে হলে হজরত মুহম্মদের বাণী শুনতে হবে। সে বিরাট পুরুষকে ডুবিয়ে দিলে চলবে না। জগতের দুঃখ-সমস্যার সমাধান করতে তাঁর পরামর্শ দরকার হবে। এ বিশ্বাস আমাদের ফিরাতে হবে। পদে পদে হতাশ হয়ে হাত পা ছেড়ে দিলে ইসলাম নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে। আজ আমাদের সব ফেলে জ্ঞানচর্চায় ধন-জন-প্রাণ বিসর্জন করতে হবে। সেই আদর্শ-পুরুষের অন্তরের আদর্শকে জ্বল-জীবন্ত করে তুলতে হবে। আমরা জ্ঞানী হব, এই হবে আমাদের একমাত্র আদর্শ। শুধু জ্ঞান অর্জন কর, জ্ঞান চর্চা কর, মুসলমান! তুমি আবার জয়যুক্ত হবে।

বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে এই বার্তা শুনিয়ে দিতে হবে,—"আমরা কারো কৃপা চাই না, আমরা কোন ভিক্ষা চাই না, আমরা অর্থ চাই না, আমরা চাই জ্ঞান।" মনে রাখতে হবে, পুরুষ-প্রধান হজরত মুহম্মদের শিষ্যগণ তরমুজের খোসা ও শুকনো খেজুর খেয়ে বিশ্ব-সভায় আসন লাভ করেছিলেন। কেমন করে? তাঁদের টাকা ছিল না, লোকও ছিল না। তাই ভাবতে হবে আর আমাদের কাজ করতে হবে। আজ আমাদের টাকা নাই ; সকলেই আমাদের ঘৃণা করে, অবজ্ঞা করে, তুচ্ছ করে, গালি দেয়, তাড়িয়ে দিতে চায়। আজ আমরা পাপাসক্ত, দুরাচার, নরকের কৃমিকীট বলে অভিহিত। আজ আমরা অন্তরের দৈন্য মুখের জোরে ঢেকে রাখতে যাচ্ছি, সে দৈন্যকে দূর করতে কোন চেষ্টা করছি না। আজ আমরা অর্থশালী বলবান কর্তৃক বিতাড়িত, বিদূরীত ও নিষ্পেষিত হতে চলেছি। আমাদের অবস্থা দেখে সবাই সমস্বরে বলে উঠছে, "মুসলমান! তুই মূর্খ, তোর সবই মিথ্যে।" তাই শুনে সেও ভাবছে, তার বুঝি সবই খারাপ। তার প্রাণ দুরু দুরু করছে। ভাণ্ডার তার শূন্য। কি জবাব সে দিবে তার? এই যে শূন্য হয়ে রয়েছে তার ভাণ্ডারটা, এর জবাবদিহি কে করবে? তার পরাণে কি ভরসা আছে? দিন আর বেশি বাকি নাই। বুঝি বা তার বল ফুরিয়ে যায়! একটা টোকাতেই বুঝি বা সে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়!

এখন আমাদের কি কর্তব্য তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। মুসলমানের অন্তর জ্ঞানের ভরসায় পূর্ণ করে তুলতে হবে। অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠলে তার অর্থের দৈন্য প্রাতঃসূর্যের সম্মুখে কুয়াশার মতো পলায়ন করবে। মুসলমানকে এমন শিক্ষা দিতে হবে, সে যেন বলতে পারে, "আমি চাই না অর্থ, চাই না সাম্রাজ্য, আমি চাই সত্য, আমি দুর্বলতা ও দৈন্যকে দূর করতে জগতে এসেছি।"

সওগাত, ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৩৩

সুফী হাশিম

ক্ষণজন্মা নরনারীর মধ্যে যাঁহারা ব্যাপকভাবে তাঁহাদের কার্যাবলী জগতের সমক্ষে ধরিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা সর্বত্র পরিচিত এবং তাঁহাদের জীবনকাহিনী আমরা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করি। কিন্তু এমন অনেক নরনারী পরলোকগমন করিয়াছেন, যাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না ; অথচ তাঁহারা প্রকৃতই চরিত্রবান, প্রতিভাশালী, পরোপকারব্রতী ও ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন এবং মানুষের অনেক কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। সুফী হাশিম এই শ্রেণীর একজন পূতচরিত্রের মুমিন মুসলিম ছিলেন।

সুফী হাশিম তাঁহার কার্যক্ষেত্রের পরিসর বিস্তৃত করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি সাধারণ লোক-সমাজে পরিচিত হইতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার জীবন-আখ্যায়িকা হইতে আমরা বর্তমান সময়ে অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারি।

হাশিম অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। জীবনে তিনি কখনও ইসলাম-গর্হিত কাজ করেন নাই। "বিসমিল্লাহ আমানতুবিল্লাহ তাওয়াককালতু আল্লাহ" এই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। বাল্যকাল হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি স্বকীয় জীবন এই মন্ত্রের বলে গঠিত করিয়াছিলেন। যে বালস্বভাবসুলভ চাপল্য, যৌবনসুলভ ঔদ্ধত্য ও উদ্দাম প্রকৃতি, আলস্য ও কুঅভ্যাস পাপ-পিচ্ছিল পথে আকৃষ্ট করে, তাহার প্রভাব হাশিমকে স্পর্শও করিতে পারে নাই ; বাল্যাবধি এমনি সংযম ও শাসনের মধ্যে তিনি লালিত-পালিত হয়েছিলেন। তাঁহার নির্মল চরিত্র, সৎসাহস, হৃদয়ের তেজ ও জ্ঞান-পিপাসা দেশ-কাল-নির্বিশেষে অনুকরণীয়।

যে দুর্দিনে বাঙলার বুকে নিদারুণ অশান্তির প্রবল ঝঞ্ঝা তুমুলভাবে বহিতেছিল, মুঘল রাজত্বের ধ্বংসাবশেষ আমূল উৎপাটিত হইতেছিল, পাশ্চাত্যের নবস্রোতে প্রাচ্যের স্থিতিশীলতা ভাসিয়া যাইতেছিল, ধর্মভীরু মুসলিমগণ আহত, ম্রিয়মান ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ব্রিটিশের হুকুম ও উপদেশ গ্রহণ করিতে ইতস্তত করিতেছিলেন, সেই সময় হাশিম ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে যশোহর জিলার অন্তঃপাতী কাউরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ফারসিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি একেবারে সেকালের লোক ছিলেন। অধুনাতন সভ্যতা-ব্যঞ্জক চতুর সূক্ষ্মবুদ্ধি তাঁহার ছিল না। 'সাদা ভাত মোটা কাপড়' সংগ্রহ করিয়াই তিনি পরম পরিতুষ্ট থাকিয়া ধর্মশিক্ষায় সময় ব্যয় করিতেন। হাশিমও বাল্যকাল হইতেই পিতার ঈদৃশ আদর্শ অনুকরণ করিতে চেষ্টা করেন। তিনি পিতার নিকট আরবি ও ফারসি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল হাশিমকে ধর্মশিক্ষায় পারদর্শী করিয়া তাঁহারই কার্যে নিযুক্ত করিবেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা তত সচ্ছল ছিল না। আর্থিক অনটনের জন্য

বিশেষত তিনি হাশিমকে দূরদেশে বা কলিকাতায় রাখিয়া শিক্ষিত করিতে ইচ্ছুক হন নাই ; কিন্তু খোদার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। হাশিম মেধাবি ও বিদ্যাশিক্ষায় অনুরক্ত ছিলেন। 'আলিফ', 'বে', 'তে' পাঠ করিবার সময়ই তিনি পিতার নিকট ইহার প্রত্যেকটির অর্থ জানিতে চাহিয়াছিলেন। তিনিও আলিফ অর্থ 'খোদা এক' ইত্যাদি বলিয়া দিতেন। পবিত্র কোরান তিনি অতি অল্পকাল মধ্যে আয়ত্ত করিয়া তাহার অনেক অর্থ জানিয়া লইলেন। প্রখর স্মৃতিশক্তি বলে তিনি সমস্তই মনে রাখিতে পারিতেন। কোরানের আদেশবাণী শুনিয়া সুকুমারমতি হাশিম শৈশবেই ধর্মভীরু হইয়া ওঠেন এবং নামাজ, রোজা রীতিমত পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জীবনে তিনি আর নামাজ, রোজা কখনও তরক করেন নাই।

তখন তাঁহার বয়স দশ বৎসর মাত্র। একদিন কোরানের ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে তিনি পিতার নিকট জানিলেন যে, কোরান হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পূর্ণ দশ বৎসর জবরদস্ত ওস্তাদের নিকট অধ্যয়ন করা কর্তব্য এবং কলিকাতা নগরীতে এরূপ উপযুক্ত ওস্তাদ পাওয়া যায়। ইহা শুনিয়া হাশিম কলিকাতায় যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া ওঠেন। পিতার ইচ্ছা ও সামর্থ্য ছিল না ; কাজেই তিনি পিতার নিকট তাঁহার আকাঙ্ক্ষা বিবৃত করিতে সাহসী হইলেন না। কলিকাতা হাশিমের জন্মভূমি হইতে ৬৬ মাইল দূরে অবস্থিত। যাতায়াতের বড় অসুবিধা। বর্তমান রেল বা সদর রাজপথ তখন ছিল না। সুতরাং লোকে পদব্রজেই নানা কষ্টভোগ করিয়া কলিকাতায় যাইত। পথ অতি দুর্গম ও বিপদ-সঙ্কুল ছিল। এমতাবস্থায় কেহ একাকি পথ চলিতে সাহস করিত না। হাশিম এই অন্তরায়ের কথা পরস্পর শুনিয়া ভগ্নোৎসাহ না হইয়া বরং আরও দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। তিনি সুযোগ ও সঙ্গী খুঁজিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তিনি আরও অনেকগুলি ফারসি ও আরবি গ্রন্থ শেষ করিয়া ফেলিলেন। ইসলামের মূলনীতিসমূহ দস্তুর-মত আয়ত্ত করিয়া সেই অনুসারে কার্য করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ তাহার ব্যতিক্রম করিলেই তিনি তেজোময় গাম্ভীর্যের সহিত তাহার প্রতিবাদ করিতেন।

একদা তাঁহার দাদীজান গল্প করিলেন, "দেখ হাশিম ! তোমার জন্য আমরা কত কি-না করিয়াছি। কত পীরের নিকট মানত দিয়াছি।" এই 'মানতের' কথা শুনিয়া হাশিম লাফাইয়া উঠিয়া তাঁহার দাদীজানকে তিরস্কার করিয়া তাঁহাকে তওবা করিতে বাধ্য করিলেন। তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "খোদা যদি আমার ইচ্ছা পূর্ণ করেন তবে আমি বাংলার মুমিন সম্প্রদায়ের মধ্যে পীরের 'শির্নি মানত' প্রভৃতি শিরেক যাহাতে আমূল উৎপাটিত হয় তাহার জন্য জান ফিদা করিয়া দিব।" উত্তরকালে হাশিম এই কার্যে তাঁহার অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতেন এবং তাহার ফলে তিনি বর্তমান যশোহর, খুলনা ও নদীয়া জিলার শত শত গ্রাম হইতে শিরেক, বেদাত দূরীভূত করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। তিনি মুসলমান সম্প্রদায়কে জ্ঞানী ও শিক্ষিত করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিবার চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার হস্তলিখিত একখানা ফারসি গ্রন্থে এই সমস্ত উপায় লিপিবদ্ধ ছিল। মুসলমানকে কিরূপে শিক্ষিত করিলে তাহারা প্রকৃত মুসলিম ও চরিত্রবান মানুষ হইতে পারিবে, এই ছিল তাঁহার চিন্তার বিষয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহার এই গ্রন্থখানি উঁইপোকায় নষ্ট করিয়াছে। উহার

কতকগুলি টুকরা হইতে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, ব্রিটিশ অধীনে মুসলিম শিক্ষার সমস্যা সমাধান করিবার জন্য তিনি তাঁহার চিন্তার ফল ঐ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকখানি যদি তিনি মুদ্রিত করিতে পারিতেন, তবে হয়ত তাঁহার নামটি বাংলার মুসলিম শিক্ষার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইত।

অনন্তর বিদ্যা শিক্ষার জলন্ত আকাঙ্ক্ষা হাশিমকে জনক-জননীর ক্রোড় হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল। একদিন নিশীথে তিনি পাড়ার একটি পড়শির সহিত কলিকাতায় রওনা হইলেন। তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও যখন তাঁহাকে পাওয়া গেল না, তখন তদীয় মাতাপিতা খোদার হাতে তাঁহাকে সোপর্দ করিয়া শুকরানা নামাজ আদায় করিলেন। একমাস পরে সেই পড়শিটি গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া হাশিমের সংবাদ দিলে তাঁহারা আবার শুকরানা আদায় করিলেন। এইরূপ খোদাপরায়ণ মাতাপিতার সন্তান ছিলেন বালক হাশিম। .

হাশিম কলিকাতায় পৌঁছিয়া টালিগঞ্জের প্রসিদ্ধ ফারসিজ্ঞ সুপণ্ডিত মৌলানা শাহ জউয়াদুল জউয়াদ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। শাহ সাহেব হাশিমের আখলাক ও খাসলাত অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে খুব স্নেহ ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনিও স্বহস্তে কিতাব নকল করিয়া লইয়া তাহা পাঠ করিতেন। শাহ সাহেবের অন্যান্য শিষ্যের মধ্যে হাশিম সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেন। তজ্জন্য শাহ সাহেব তাঁহাকে 'শাগরিদে রশিদ' উপাধি দিয়াছিলেন। তিন চারি বৎসর হাশিম তাঁহার নিকট পড়িয়া আরবি ও ফারসি সাহিত্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করিলেন। তাঁহার ব্যুৎপত্তি দর্শন করিয়া একদিন শাহ সাহেব হাশিমকে বলেন, "হাশিম! আজকাল তোমার সহিত আলোচনা করিতে আমারও ভয় হয়।" শাহ সাহেবের এইরূপ প্রশংসাপত্র পাইয়া তিনি আরও চারি পাঁচ বৎসর কলিকাতার বিখ্যাত আলেমগণের নিকট হাদিস, ফিকাহ ও কোরানের ব্যাখ্যা শিক্ষা করিলেন। এই আট নয় বৎসরকাল হাশিম অনন্যমনে সর্বচিন্তা ত্যাগ করিয়া জ্ঞানার্জনে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বাড়ি যান নাই কিংবা বাড়ির কোন পত্র পাঠ করেন নাই, পাছে উহাতে এমন কোন কুখবর থাকে যাহাতে চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিতে পারে। এমনি তাঁহার একাগ্রতা, অভিনিবেশ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল।

কলিকাতায় দশ বৎসরকাল এইরূপ অধ্যবসায়ের সহিত কোরান, হাদিস, আরবি ও ফারসি সাহিত্যে পারদর্শিতা লাভ করিয়া হাশিম দেশে আসিয়া সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইলেন। বিভিন্ন আলেমদের সংসর্গে থাকিয়া হাশিম একদিকে যেমন জ্ঞানী হইয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি কঠোর সংযম শিক্ষা ও মধুর চরিত্র গঠন করিয়া জ্ঞানের ভূষণে আরও ভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি বালকের ন্যায় সরল হৃদয়, বীরের মত নির্ভীক, ধার্মিকের মত তেজোময়, জ্ঞানীর মত বলীয়ান, সমুদ্রের মত উদার-প্রশান্ত এবং পাষাণ-সম অন্যায়ের প্রতি বিমুখ হইয়া একজন পূর্ণ মানুষ হইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র আদর্শের যোগ্য।

অতঃপর জিতেন্দ্রিয়, স্বাস্থ্যবান হাশিম সাতাশ বৎসর বয়সের এক শিক্ষিতা পুণ্যময়ী নারীর পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। সংসারী হইয়া তিনি মাত্র দুইখানি খড়ের ঘর ও কয়েক বিঘা নিষ্কর জমি প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহার অভাব পূরণ হইত না।

কিন্তু তিনি জমি বৃদ্ধি করিবার জন্য কোন চেষ্টা করিলেন না। তিনি বলিতেন, "জমি ক্রয় করিলে মোকদ্দমা করিতে হয় এবং তজ্জন্য নানা মিথ্যা কথা বলিতে হয়।" সুতরাং তিনি জমিজমা না করিয়া নলডাঙ্গার রাজা ইন্দুভূষণের শিক্ষকতা করিতে নিযুক্ত হইলেন। তিনি এই রাজসরকারে নানাবিধ কাজ করিয়া যে অর্থ উপার্জন করিতেন তাহা দ্বারাই সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। রাজ-সেরেস্তার কাজ সম্পন্ন করিয়া যে অবসর পাইতেন, তাহা তিনি কেতাব পড়িতে ব্যয় করিতেন। কেতাব পাঠ তাঁহার একরূপ স্বভাব হইয়া গিয়াছিল। কেহ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর জানা সত্ত্বেও তিনি কেতাব দেখিয়া বলিতেন। ইহাতে লোকে তাঁহার পাণ্ডিত্যে সন্দিহান হইতে পারে এমন চিন্তা করিয়া তিনি লজ্জিত হইতেন না। তিনি বলিতেন, "আমি কিছুই শিখি নাই, কেবল শিখিবার পথ দেখিয়াছি। কেতাব না দেখিয়া বলিলে যদি আমার ভুল হয়, তবে দায়ী হইবে?" তাঁহার এইরূপ বিনয় আজ অতুলনীয়। লোক-সমাজে নিজের বাহাদুরি লইবার জন্য তিনি এতটুকু ব্যগ্র হইতেন না। জ্ঞানান্বেষণ-প্রবৃতি তাঁহার প্রবল ছিল। তাঁহার মত জ্ঞানী অথচ বিনয়ী আলেম বর্তমান যুগে অতি বিরল। এখন 'নিজের ঢাক নিজে না বাজাইলে' কেহ জিজ্ঞাসাও করে না। বাহ্যাড়ম্বর আজকাল বিদ্বৎমণ্ডলীর এক নিদর্শন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রাজ-সেরেস্তার কাজ করা ব্যতীত ধর্মপ্রচার করা তাঁহার পারিবারিক জীবনের অন্যতম কার্য ছিল। ইসলামের নীতিগুলি পুরাপুরি আয়ত্ত করিয়া নিজের জীবন আদর্শস্থানীয় করিয়া তুলিবার জন্য তিনি যে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন, তাহা তাঁহার দৈনন্দিন কার্যতালিকা হইতে বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ধর্ম প্রচার সার্থক করিতে হইলে, লোকশিক্ষায় সাফল্য লাভ করিতে হইলে, মানুষকে ঠিক সিরাতুল মুসতাকিম বা সত্যপথে আনিতে হইলে, প্রচারককে সর্বপ্রথম আদর্শ চরিত্র হইতে হইবে, নতুবা তাঁহার উপদেশ কার্যকরি হইবে না, প্রেরণা দান করিবে না—এইরূপ তাহার ধারণা ছিল। এইজন্য তিনি নিজেকে সর্বপ্রথম প্রকৃত মুসলিম করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

অজু, গোসল, পাক-পাকিজা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত পরহিজগার ছিলেন। চলিবার পথে তিনি কোন নাপাক দ্রব্য দেখিলে তৎক্ষণাৎ উহা দূর করিয়া সেই স্থান ধুইয়া ফেলিতেন। অজু করিবার পানি অনেক পরীক্ষা করিয়া ব্যবহার করিতেন। অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া পাক হইয়া মসজিদে প্রবেশ করিয়া বেলা আটটা পর্যন্ত নামাজ, অজিফা, কোরান তেলাওয়াত ও হাদিস পাঠ প্রভৃতিতে নিমগ্ন থাকিতেন। বাহিরের কাজ-কর্মের জন্য তিনি কখনও দ্রুত নামাজ পড়িতেন না। খোদার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার উপাসনা প্রাণমন ঢালিয়া সম্পন্ন করিতে তিনি এইটুকু শৈথিল্য করিতেন না। আটটার সময় তিনি উপাসনায় বলীয়ান হইয়া দুনিয়ার কার্যে লিপ্ত হইতেন। বেলা এগারটার সময় আহার করিতেন। আহার খুব সাদাসিদে ছিল। আহারের পর দস্তরখানা প্রতি অক্তে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিতেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন, একই দস্তরখানা দশ পনের দিন ব্যবহার করেন, কিন্তু একবার ধুইবার নামও করেন না। এমনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা-জ্ঞান আমাদের !

এশার নামাজ শেষ করিতে রাত্রি ১টা ২টা পর্যন্ত তিনি মসজিদে থাকিতেন। শেষ জীবনে রাত্রিতে দুই তিন ঘণ্টার বেশি তিনি নিদ্রামগ্ন থাকিতেন না। অবশিষ্ট কাল নামাজ ও নানাবিধ উপাসনায় তিনি ব্যয় করিতেন। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বেশ বুঝা যায় ইসলামের অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার কিরূপ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল এবং কিরূপ কঠোর সাধনায় তাহা পালন করিতে যত্নবান ছিলেন। এইজন্য লোকে তাঁহাকে 'সুফী' উপাধি দিয়াছিল।

অনুষ্ঠান পালনে যেমন তিনি সুফী ছিলেন, লোকের সহিত আচার-ব্যবহারে তেমনি মুত্তাকি ছিলেন। আহারের পূর্বে তিনি দুঃস্থ প্রতিবেশীর সংবাদ লইতেন। যদি তাহাদের আহার না হইত তিনি তাঁহার দস্তরখান হইতে আহার্য পাঠাইতেন। প্রতি অক্তেই তিনি এইরূপ করিতেন। কর্মস্থলেও তিনি দরিদ্র অল্প-বেতনভোগী চাকর-নওকরদিগকে এইরূপ খাওয়াইতেন। আহারের অক্তে কোন ভিক্ষুক বা মুসাফির আসিলে নিজের খাদ্য তাহাকে দিয়া তিনি অনাহারে থাকিতেন। ইহা তাঁহার জীবনের সাধনার একটা অঙ্গ ছিল। প্রতিবেশীর মধ্যে কেহ রোগগ্রস্ত থাকিলে তাহাকে শুশ্রূষা করিতে তিনি অনেক সময় ব্যয় করিতেন এবং নামাজে বসিয়া তাহার মুক্তি ও আসানের জন্য খোদার রহমত প্রার্থনা করিতেন। পরের দুঃখ দেখিলে তিনি অশ্রুবর্ষণ করিয়া তাহার দুঃখ মোচনের জন্য কায়মনোবাক্যে প্রয়াস পাইতেন।

একদা আহারের পূর্বে তিনি প্রতিবেশীদের কাহার খাওয়া-দাওয়া করিতে বাকি আছে দেখিতে গিয়া দেখিলেন, একটি বিধবা তাঁহার একমাত্র পুত্রের শিয়রে বসিয়া কাঁদিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলে বিধবা বলিলেন, "আজ সাত আট দিন হইল ছেলেটি বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু কেহই আমার সাহায্য করিতে আসে নাই বা ইহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে নাই।" হাশিম ইহা শুনিয়া অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে আহারের কথা ভুলিয়া গিয়া বিধবার পুত্রের শুশ্রূষায় বসিয়া গেলেন ও অবিলম্বে চিকিৎসক ডাকিয়া আনিয়া বিধবার পুত্রের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিয়া কিছু আহার করিয়া তিনি পুনরায় বালকের সেবায় আসিলেন এবং তথায় রাত্রি যাপন করিলেন। এইরূপে সাত-আট দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বালককে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। এই একটি ঘটনা হইতে উপলব্ধি করিতে পারা যায়—সুফী হাশিম কত বড় মহাপ্রাণ, করুণ হৃদয় ও প্রেমময় ছিলেন।

আর একটি ঘটনা এস্থলে উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি। অন্য একদিন কর্মস্থল নলডাঙ্গায় যাওয়ার সময় কোন প্রতিবেশীর লাউয়ের মাঁচার নিচ দিয়া তিনি যাইতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার ছাতার সংঘর্ষে একটা লাউয়ের ডগা ছিঁড়িয়া যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ ডগাটি লইয়া অপরাধীর মত প্রতিবেশীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া স্বীয় দোষ বর্ণনা করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। প্রতিবেশী তাঁহার এইরূপভাবে আগমনে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া ইতস্তত করিতেছেন, এমন সময় সুফী সাহেব পুনরায় অতি কাতরস্বরে বলিলেন, "মাফ করুন, আপনি মাফ না করিলে আমি যাইব না।" অগত্যা তিনি মাফ করিলেন। তখন সুফী সাহেব গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেলেন। ঘটনাটি অতি সামান্য এবং অনেকটা হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা হইতে সুফী সাহেবের সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতা কতখানি ছিল তাহা বুঝা যায়। তিনি পরের অন্যায় বা ক্ষতি

করিতে যেমন সতত কুণ্ঠিত ও ব্যথিত হইতেন, তেমনি কাহারও উপর কোন অন্যায় ও ক্ষতি হইতে থাকিলে তাহাও সহ্য করিতে পারিতেন না।

নামাজ, রোজা দ্বারা তিনি অন্তরকে খোদাপ্রেমে পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহার অমিত তেজ, সকল বিঘ্নের সম্মুখে ইসলামকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে তাঁহার অনন্ত সৎসাহস, কুসংস্কার ও শিরেকি কার্যের মূলোচ্ছেদ করিতে তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও সাধনা, অন্যায় অপনোদন করিতে তাঁহার অকুণ্ঠিত বীর্য, তাঁহাকে একজন পুণ্যবান পূর্ণ মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার মহাপ্রাণ, অক্লান্ত অধ্যবসায়, পরদুঃখকাতরতা নিস্পৃহতা, করুণ-কোমল হৃদয়, সাধনায় পুষ্ট চরিত্র যদি অর্থ ও সুযোগ লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে তিনি হয়ত কত শিক্ষালয়, কত চিকিৎসাগার, কত অসহায়ের সাহায্য-ভাণ্ডার, কত ক্লান্ত পথহারা পথিকের বিশ্রামস্থান প্রতিষ্ঠিত করিয়া অক্ষয় কীর্তি লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু হাশিম অর্থোপার্জনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন নাই ; যাহা আয় করিতেন তাহা দৈনিক সুখ-দুঃখের মধ্যেই ব্যয় করিতেন। ভবিষ্যতের জন্য কোন ভাবনা তিনি করিতেন না। পুত্রকন্যার ভরণ-পোষণের জন্য জমাজমি বৃদ্ধি করিতে বলিলে, তিনি কোরানের বাণী উদ্ধৃত করিয়া বলিতেন, "খোদা যখন মুখ দিয়াছেন, তখন আহার দিবেন। আমি নিমিত্ত মাত্র, তাঁহার উপর সব সঁপিয়া দিলাম।" আজকাল এরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস ও নির্ভরতা কয়জনের আছে ?

হাশিমের জীবনের আর একটা বিশেষ ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তিনি পীরের দরগাহ বা অন্য কোন স্থানে যাইয়া মানত করা বড় পছন্দ করিতেন না। ইহাকে তিনি পৌত্তলিকতা বা শিরেকি বলিয়া জানিতেন। তিনি পীরের দরগা যাহাতে পূজার বস্তু হইয়া না পড়ে তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন এবং লোকদিগকে অন্ধবিশ্বাস হইতে উদ্ধার করিতে ধনপ্রাণ নিয়োগ করিতেন। তিনি জিলায় জিলায় ঘুরিয়া দেখিলেন, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত ইসলাম জারি হয় নাই, এবং পীর-পরস্তি তাহার স্থানে স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে। তিনি এইজন্য পীর-পূজার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতেন এবং স্থানে স্থানে অর্থলোলুপ ভণ্ড পীরের সহিত তর্ক করিয়া লোক-সমক্ষে তাহাদের মতলব ও দুষ্ট চরিত্র প্রকাশ করিয়া ধরিতেন।

সুফী সাহেবের গ্রাম হইতে ছয় সাত মাইল দূরে চাঁদ ফকির নামক একজন লোক একটা আস্তানা প্রতিষ্ঠা করিল। এই সংবাদ তাঁহার কানে পৌঁছিল। তিনি জনৈক শিষ্য সঙ্গে লইয়া চাঁদের আস্তানা অভিমুখে চলিলেন। তখন জ্যৈষ্ঠমাস। ক্লান্তকলেবরে সুফী সাহেব দ্বিপ্রহরের সময় আস্তানায় উপনীত হইলেন। তিনি দেখিলেন চাঁদ নির্ভয়ে নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছে এবং অদূরে একটি বৃক্ষতলে একটা মিথ্যা কবর কোলে করিয়া কতকগুলি পীরের তোয়াজ্জো প্রার্থী লোক নীরবে বসিয়া আছে। হাশিম কালবিলম্ব না করিয়া ফকিরকে আহবান করিলেন ও মিথ্যা কবর সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন। ফকির ত অবাক ! তাহার শিষ্যরে সম্মুখে পাছে অপদস্থ হইতে হয়, এই ভয়ে যে আতঙ্কে শোরগোল তুলিল। হাশিম দেখিলেন, চাঁদের ভণ্ডামি কেবল গোমরাহ লোকদিগকে আরও গোমরাহ করিতে বসিয়াছে। বলিষ্ঠকায়, নির্ভীক ও ধর্মপ্রাণ সুফী তৎক্ষণাৎ কবরটি বন্ধ করিয়া চাঁদের হুজরা ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে ও

সমবেত সকলকে পুনরায় তওবা করিতে বাধ্য করিলেন। এই ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যায়, তিনি যদি অল্প বয়সে পরলোকগমন না করিতেন, তবে কালক্রমে বাংলার গোমরাহ পীরপরস্ত মুসলমান সমাজে ধর্ম-সংস্কারের একটা প্রবল স্রোত আনিতে পারিতেন।

উদ্ধৃত কয়েকটি ঘটনা হইতে সুফী হাশিম কিরূপ বিপুল পৌরুষ অর্জন করিয়াছিলেন তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। আজ বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের দুর্দিনে এইরূপ জ্ঞানদীপ্ত, উপাসনাপুষ্ট ও সত্যনিষ্ঠ, প্রাণবান পুরুষের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।

বার্ষিক সওগাত, ১ম বর্ষ, ১৩৩৩

নিষেধের বিড়ম্বনা

ধর্মশাস্ত্রসমূহ আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রত্যেক ধর্মই কতকগুলি 'নিষেধ'-এর সমষ্টি মাত্র। শাস্ত্রকার এই নিষেধের প্রয়োজন বোধ করেছেন মানব-প্রকৃতির স্বেচ্ছাচারিতার নিগ্রহ হতে মানুষকে বাঁচাবার জন্য—তাঁর ভিতরকার উচ্ছৃঙ্খল জন্তুর হাত হতে তাঁকে রেহাই দেওয়ার জন্য। মানুষ নিতান্তই জন্তুধর্মী এবং এই জন্তুর প্রবৃত্তি মানুষের পৈত্রিক মূলধন। সে প্রবৃত্তি কোনো বিধিনিষেধের বন্ধন মানতে চায় না—চায় শুধু যা খুশী তা-ই করতে। জন্তু যেমন আপনার ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের জন্য ব্যস্ত, মানুষও তেমনি সেই আদিম প্রবৃত্তির তাড়নায় অস্থির। পার্থক্য এই, জন্তুর কোন বন্ধন নাই, কারণ তার কোন কিছুর দায়িত্ব নাই, কিন্তু মানুষ জন্তুর চেয়ে অনেকখানি দায়িত্বের বন্ধনে জড়িত। জন্তুর অন্যের জন্য ভাববার কিছু নাই, কিন্তু মানুষের ভাবতে হয় অনেকের জন্য। এ চিন্তার কারণ তার সমাজলিপ্সা। সে একদিকে নিছক স্বার্থপর জন্তুধর্মী—জন্তুর প্রবৃত্তি তাকে নিয়ত বন্ধন কাটতে প্রবৃত্ত করছে ; অন্যদিকে সে পরহিতকাতর সমাজধর্মী—সমাজকে বাঁচাতে নিজেকে অকাতরে ব্যয় করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হচ্ছে না। সমাজকে তার ভিতরকার জন্তুর উচ্ছৃঙ্খলতা, উৎপীড়ন, অনাচার, অত্যাচার হতে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে বিধাতা মাঝে মাঝে সমাজপতি, পয়গাম্বর, অবতার পাঠিয়ে দেন। তাঁরা এসে জন্তুটিকে বাঁধবার জন্য নিষেধের বেড়াজাল সৃষ্টি করেন এবং তার গতি রুদ্ধ করবার জন্য নিষেধের সীমারেখা টেনে দেন। কিন্তু নিষেধের এমনি বিড়ম্বনা, জন্তুধর্মী মানুষ তা চিরদিন মেনে চলতে চায় না এবং চলেও না। নিষেধ তাকে আবদ্ধ রাখতে পারে না। যে নিষেধ তার প্রবৃত্তির পথ রোধ করে রাখতে চায়, সে নিষেধ সে অবাধে লঙ্ঘন করে—সমাজপতির রক্তচক্ষু সমাজের ক্রম-সঞ্চিত সংস্কারের বিভীষিকা তাকে ক্ষণকালের জন্য হয়ত ক্ষান্ত করতে পারে, কিন্তু চিরকাল পারে না। বরং সেই বিভীষিকা তাকে লুকিয়ে তার প্রবৃত্তির প্রশ্রয় বাড়িয়ে চলে। এদিকে সমাজধর্মী মানুষ নিষেধকে আঁকড়ে ধরে নানাপ্রকার আইন-কানুনের সৃষ্টি করে চলে ; কিন্তু জন্তুধর্মী মানুষ যে নিষেধকে লঙ্ঘন করে চলেছে, তা সাহস করে স্বীকার করতে যায় না। এইরূপে নিষেধের বিপুল ব্যর্থতা মানুষকে সমাজের আদর্শ হতে প্রতিদিন দূরে সরিয়ে দেয়—একথা সমাজধর্মী মানুষ মানতে পারে না, কারণ তা হলে তার সব বুজরুকি খতম হয়ে যায়। সত্য বলতে, কোন শাস্ত্রকারের নিষেধের রাশি সমাজকে জন্তুধর্মী মানুষের প্রবৃতির অনাচার হতে কখনও মুক্ত করতে পারে নাই। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলি।

বিরাটপ্রাণ হজরত মুহম্মদ তাঁর সমাজকে তৎকালীন জন্তুধর্মী মানুষের অনাচার, ব্যভিচার, অত্যাচার হতে মুক্ত করবার জন্য প্রাণপণ সাধনার দ্বারা কতকগুলি নিষেধের

অস্ত্র দিয়ে গেলেন তাঁর পরবর্তী সমাজপ্রাণ কর্মীদের হাতে। সেই নিষেধ মেনে যে চলে, সে তাঁর উম্মত বা শিষ্য বলে পরিচিত হয়। তাঁর আশা ছিল, মানুষ যদি তাঁর নিষেধগুলি মেনে চলে তবে সমাজ জন্তুধর্মীর উচ্ছৃঙ্খলতা হতে মুক্তি লাভ করতে পারবে। কিন্তু আজ যাঁরা তাঁর উম্মত বলে পরিচিত, তাঁদের দেখলে ত মনে হয় না তাঁরা নিষেধ মেনে চলেছেন। তাঁর নিষেধ মানেন না, অথচ সমাজ তাঁদেরকে বুকে ধরে রেখেছে। কারণ তা না করলে সমাজের রূপ বদলে যায়। সমাজ যদি বৈচিত্র্য-বুভুক্ষু চঞ্চল প্রবৃত্তির অধীন জন্তুধর্মীর অনুসরণ করে, তাহলে সমাজ তার আদিরূপ হারাতে বাধ্য। প্রথম প্রথম নিষেধ একটা সংস্কার সৃষ্টি করে, সেই সংস্কারই সমাজকে বাঁচিয়ে রাখে ; আর সমাজধর্মী মানুষ ঐ সংস্কারের দাস হয়ে পড়ে। ফলত, মানুষের আসল প্রকাশ ঐ জন্তুধর্মীর প্রবৃত্তির লীলাখেলায়, যেটা দেশ-কাল আর্থিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু সমাজ যুগবিশেষের ব্যক্তিবিশেষের উদভাবিত নিষেধ দ্বারা নিগড়িত—যে নিষেধ পরবর্তী যুগের জন্য হয়ত অনেকখানি অপ্রযোজ্য। সমাজ তা স্বীকার করে না—সে সর্বকাল ও সর্বযুগে ঐ নিষেধকে জারি রাখতে চেষ্টা করে। তাই সমাজধর্মীর সহিত জন্তুধর্মীর বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। পরে এই বিরোধ প্রচণ্ড হয়ে উঠলে সমাজকে আমূল পরিবর্তনের জন্য সংস্কারক বেদনা ও অনুভূতি নিয়ে জন্তুধর্মীর সঙ্গে রফা করতে আবির্ভূত হন। এইরূপে যুগে যুগে সমাজধর্মী জন্তুধর্মীকে একটু একটু প্রাধান্য দিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে, অর্থাৎ সমাজ জন্তুধর্মীর প্রবৃত্তিকে ক্রমশ স্বীকার করে এসেছে।

দৃষ্টান্তের কথা, বর্তমান মুসলমান সমাজ ধরা যাক। হজরত মুহম্মদের নিষেধের মধ্যে কতকগুলি এই : খোদা ছাড়া আর কাহারও নিকট মাথা নত করো না। জেনা (পরস্ত্রী-স্পর্শ) করো না। মদ খেও না। নাবালক ও স্ত্রীলোকের প্রতি দুর্ব্যবহার করো না এবং তাদের স্বত্ব ও অধিকার হতে তাদিগকে বঞ্চিত করো না। প্রতিবেশীর প্রতি রূঢ় ব্যবহার করো না। পুত্রকন্যাকে মূর্খ রেখো না। ভিক্ষা করো না। শূকরের মাংস খেও না। ধর্মের জন্য জুলুম করো না। অন্যের অধিকার নষ্ট করো না। সৎপরিশ্রম-লব্ধ আয় ভিন্ন অন্য আয়ের চেষ্টা করো না। সুদ দিও না।

এই সমস্ত নিষেধ লঙ্ঘন করা হারাম—তার শাস্তি পরকালে অনন্ত দোজখ ভোগ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান মুসলমান সমাজের জন্তুধর্মী মানুষগুলিকে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, তারা দোজখের ভয়ে আদৌ ভীত সন্ত্রস্ত না হয়ে নির্বিকারচিত্তে ঐ নিষেধের প্রত্যেকটি লঙ্ঘন করে চলেছে। নিষেধ মাত্র হাদিস কোরানেই লিপিবদ্ধ আছে। এখন একটা একটা করে ধরি।

মুসলমান আজ ঘোর পৌত্তলিক। সে খোদাকে চিনে না—সে চিনে তার পীর এবং তার দাদাপীরের কবর। কবর আজ মুসলমানের সর্বশ্রেষ্ঠ দরগা হয়েছে—তার সর্ব কামনার আখড়া সেখানে। দরগাকে শ্রদ্ধা করতে গিয়ে সে মানুষকে শ্রদ্ধা করতে হয় কেমন করে তা ভুলে গেছে। সে দরগায় পূজা করতে গিয়ে নিজের সেবায় উদাসীন হয়েছে এবং নিজেকে অন্যের শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলতে হয় কি করে সে জ্ঞান হারিয়েছে। নিজে অবজ্ঞার পাত্র হলে যে ধর্মের অবমাননা আপনিই ঘটে, তা সে বুঝে না। নিজের অক্ষমতা দূর করার একমাত্র

উপায় হয়েছে তার দরগায় মানত। তার দূরভিসন্ধি হাসিল করতে হলে সে দৌড়ায় দরগায় ; স্ত্রীপুত্রের অসুখের জন্য ঔষধ ও পরিচর্যা ফেলে সে আনে দরগার মাটি কিম্বা দরগা-সেবকের তাম্বুল-তাম্বাকু-বিমিশ্র সুগন্ধি ফুৎকার। দরগায় মাথা ঠুকে সেলাম দিয়ে সে যায় জুয়াখেলায় ও ঘোড়দৌড়ে। খোদার নাম মুখে করে সে আরম্ভ করে মদ খেতে—আল্লার নাম নিয়ে যে যায় পরের স্ত্রী অপহরণ করতে। খোদার নামের কি চমৎকার ব্যবহার ! সে নিঃস্ব হয়ে বারাঙ্গনার পদলেহন করে ফিরছে। কোথায় গেল সে নিষেধ?

মুসলমান আজ ব্যভিচারের চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। পরস্ত্রী স্পর্শ করা হারাম। এ বিধান যে ইসলামের, তার কার্য দেখে তাতে সন্দেহ জন্মে। মাঝে মাঝে কাগজে হিন্দু নারীর প্রতি মুসলমানের অত্যাচারের কথা পড়ে লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে যাই—তার নির্লজ্জ লোমহর্ষক ব্যভিচারের সংবাদ নিদারুণ মর্মব্যথার সৃষ্টি করে। বিশ্বপ্রভু করুণাময় খোদার নিকট প্রার্থনা করি, হজরত মুহম্মদের মত বিপুলশক্তি একজন মহাপুরুষ আসুক আবার আমাদের চোখ ফুটাতে। ঐ সংবাদের প্রতিবাদও পড়েছি আমার স্বধর্মী-পরিচালিত কাগজে—সে প্রতিবাদে লজ্জা নাই, নম্রতা নাই, আছে শুধু আস্ফালন ও অহঙ্কার। তাতে আরও আত্মধিক্কার জন্মে, কিন্তু ওটা জন্তুধর্মী ব্যভিচারকে অস্বীকার করে সমাজকে সাচ্চা করবার চেষ্টা। তাই সে প্রতিবাদ হয়। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, হয়ত সংবাদ কখন কখন অতিরঞ্জিত হয়। কিন্তু আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে একথা গলা ছেড়ে বলব যে, আজ মুসলমান নির্লজ্জ, কুরুচিপূর্ণ, ব্যভিচারী হয়ে পড়েছে। কতদিন চোখের সামনে মুসলমানকে দল বেঁধে মুসলমান নারীর উপর যেরূপ পশুর মত ব্যবহার করতে দেখেছি দিন-দুপুরে, তাতে আমি একটুও অবিশ্বাস করতে পারি না যে, এরা হিন্দু নারীর উপর অত্যাচার করতে পারে না। কিন্তু কেন এ ব্যভিচার? নিষেধ ত মুসলমানকে ঠেকাতে পারেনি। কারণ অনুসন্ধান করলে কোন বিশেষ এক কারণের খোঁজ পাওয়া শক্ত। তবে আমার মনে হয়, মুসলমান আজ কর্মহীন, পরিশ্রমবিমুখ হয়ে পড়েছে বলে এরূপ পশু-প্রবৃত্তিপরায়ণ হয়ে উঠেছে। আরও একটা কারণ এই হতে পারে যে মুসলমান সমাজ এত কঠোর বিধিনিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যে, এর মধ্যে জন্তুধর্মীর চিত্তের বিবিধ ক্ষুধা নিবারণ করবার মত বেশি উপকরণ নাই, সেজন্য মুসলমানের চিত্ত আজ অন্য সমাজের রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছে। সহস্র বিধি-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও ধর্মবিধি-পীড়িত মুসলমানের শুষ্ক নীরস চিত্ত আজ প্রতিবেশীর আনন্দের পানে উন্মুখ হয়ে উঠেছে—সেটা চিত্তের স্বভাব-ধর্ম। সে আনন্দ ও রুচির বৈচিত্র্যেই স্ফূর্তিলাভ করে—নিষেধ তাকে বিড়ম্বিত করে মাত্র। মুসলমানের গৃহ নিরানন্দ—বিশেষত মুসলমানের নারী-সমাজ নিতান্ত হতশ্রী—তার কারণ শিক্ষা ও পর্দার কঠোর সংস্কার—যাতে করে মুসলমান নারী আনন্দ কি তার আস্বাদ পেতে পারে না। এই চিত্তহারা নিরানন্দ গৃহে অধিকতর নিরানন্দ জীবনানন্দে-বঞ্চিত, হীনস্বাস্থ্য, বৈচিত্র্য-জ্ঞানশূন্য, গর্হিত-রুচি নারীকে দেখে জন্তুধর্মী পুরুষ—বৈচিত্র্য-তৃষ্ণায় যার চিত্ত নিরন্তর কাতর—অন্য সমাজের শ্রী-আনন্দ দেখে যার চিত্তে অপূর্ব উল্লাস জমে উঠেছে—কি করে নিষেধের বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত হতে চায়? নিষেধ তার নিকট মৃত্যু—নিষেধ তখন লঙ্ঘন

করাই তার নিকট জীবন, সেইটাই তার নিকট অতি সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। এই থেকে এই কথাটা বলতে চাই, মুসলমান হিন্দুনারীর দিকে আকৃষ্ট হয়, তার কারণ, স্বধর্মী নারীর সঙ্গে হিন্দু নারীর এই অপরূপ পার্থক্য সে অনুভব করে এবং ঐ কঠোর বন্ধন-কাতর নিরানন্দ নারী হতে বিতৃষ্ণতায় চিত্ত আপনা থেকে রুচি-বিলাসী হিন্দুনারীর মধ্যে আপনার খাদ্য অনুসন্ধান করতে ছুটে। সুতরাং আমার মনে হয়, দুটি জিনিস মুসলমানকে হিন্দু নারীর প্রতি প্রতিদিন আকৃষ্ট করে তুলছে—তার কর্মহীন অবকাশ ও বৈচিত্র্যবঞ্চিত নিরানন্দ চিত্ত। এর উপায় লাঠি বা জেল নয়। এর উপায় হচ্ছে তার কর্ম জুগিয়ে দেওয়া ও মুসলমান সমাজে রুচির সৃষ্টি করা ও মুসলমান নারীকে জীবনানন্দের উৎসবে প্রকাশ করে ধরা। তার জন্য হয়ত হিন্দুসমাজের পক্ষে কোন কর্তব্য না থাকতে পারে, কিন্তু মুসলমানের কর্তব্য যে অত্যন্ত গুরুতর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কর্মের অভাবে যে মুসলমান দুর্বৃত্তিনিপুণ হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ, বাঙলাদেশের যে যে অঞ্চলে মুসলমানের কাজ কম সেই সেই অঞ্চলে নারী-নির্যাতনের দুর্ঘটনা বেশি করে ঘটে থাকে। এ কারণটি অবশ্য অনেকখানি হিন্দু মুসলমানের পরস্পর সহযোগিতায় দূরীভূত হতে পারে। দেশের শিরায় শিরায় রেলপথ ও নানা প্রকার শিল্প বিস্তার করতে পারলে পল্লীবাসী মুসলমানদের জীবনে বৈচিত্র্য আসত, তাদের অবসর-চিন্তা কর্মলিপ্ত হত, রুচিও ফিরত বলে আশা করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের খোরাক তারা নিজেরাই জুটিয়ে নিতে শিখত। চিত্তবিনোদনের জন্য যে সমস্ত স্বাস্থ্যপ্রদ উপকরণের প্রয়োজন তার অধিকাংশ নারী হতে মিলতে পারে। এজন্য নারীকে রুচি-বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করতে ক্ষমতাপন্ন করে তুলতে হবে। তার জন্য বর্তমান বাঙলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্র অনেকখানি এক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহলে পরস্পর জ্ঞানের আদান-প্রদানে বাঙলাদেশে সুদৃঢ় মেরুদণ্ড-সমন্বিত একটা নারী-সমাজ গড়ে উঠতে পারে। সেই নারী-সমাজের নৈতিক তেজ সহজেই পুরুষের প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমন করতে সমর্থ হবে, এই আমার বিশ্বাস।

মুসলমান আজ মদ্যপানে আসক্ত, সে কথা বলা বাহুল্য। পথে ঘাটে, অন্ধকার গলিতে, ঘোড়দৌড় ও জুয়ার মজলিসে গাতা করে যারা মদ্যপানে রত থাকে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান, সে কথা লজ্জায় মাথা নত করে স্বীকার করতে হবে। এর কারণও ঐ কঠোর নিষেধ-পীড়িত নিরানন্দ চিত্তের বৈচিত্র্য-লালায়িত স্বাভাবিক পিপাসা—মদ্যপান তার অভিব্যক্তি মাত্র।

নাবালককে ফাঁকি দিয়ে, বিধবা নারীকে উৎপীড়িত করে তাদের স্বত্ব বিনা পয়সায় খরিদ করবার চেষ্টা বেশি করে মুসলমানই করে থাকে। পল্লীসমাজের অভিজ্ঞতা যাঁর আছে—দুই একজন গ্রাম্য টর্ণি বা পাটোয়ার-বাজ মাতবরের জীবন-ইতিহাসের সহিত যাঁর পরিচয় ঘটেছে তিনিই অন্ধকারের এই নীরব অত্যাচারের পরিমাণটি কতখানি তার সাক্ষ্য দিতে সমর্থ হবেন। মুসলমান নারী আজ আইন হতে বঞ্চিত, স্বত্ব অধিকার ভোগ করতে অক্ষম। এজন্য অপোগণ্ড শিশু নিয়ে মুসলমান বিধবা যে নীরবে কত করুণ অশ্রু ফেলেছে তা কি আমরা কেউ দেখেছি? আমরা বাইরে বলেছি, ইসলাম নারীকে জগতের অধিকার সর্বপ্রথমেই

দিয়েছে—পুরুষের সমান করেছে। এ ত সমাজী কথা। তলিয়ে গিয়ে পর্দা উন্মোচন করে দেখুন কী কুৎসিৎ বীভৎস ব্যবহার দ্বারা বিধবা নারী নির্যাতিত হচ্ছে। পথের কাঙ্গালের মধ্যে মুসলমান নারীর সংখ্যা বেশি। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, কেন তারা ভিটামাটি ছেড়ে ছেলে-পুলে কাঁধে ও কাঁখে করে বের হয়েছে, আর কিরূপে তারা জীবন কাটাচ্ছে। কোথায় তাদের নীতি? এ সমাজের তাদের কাছ থেকে নীতির দাবি করবার কোন অধিকার নাই। যা দিয়ে নীতি পালন করবে, তা কেড়ে নিয়ে আবার বলে কি না, 'নীতি পালন কর।' তারা অনায়াসে বলতে পারে, নীতি পালন করব না—করতে পারি না, আমরা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। হে মুসলমান সমাজ ! এর কি উত্তর দিবে?

মুসলমান নিরক্ষর, এ ত প্রবাদ হয়ে পড়েছে। অথচ হজরত বলেছেন, সন্তানকে মূর্খ রাখা হারাম। কৈ, কোন চেষ্টাই ত সমাজ পুরোপুরি করছে না তাদের শিক্ষিত করতে। তাদের নিজেদের ত নাই-ই।

মুসলমান ভিক্ষুকের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। আদম-শুমারি ঘেঁটে দেখলে এর সত্যতা প্রমাণ করতে কষ্ট হবে না। ভিক্ষা করতে নিষেধ করা হয়েছে—এই বিপুল ভিক্ষাবৃত্তি কি তারই প্রতিশোধ? ভিক্ষা করবে না ত কি করবে? অসহায় পিতৃহারা শিশুরা পৈত্রিক স্বত্ব হতে বঞ্চিত হয়ে মায়ের আঁচল ধরে বের হতে বাধ্য হয়, অবশেষে নিরুপায় হয়ে পথে উঠে অন্য-ধর্মীদের বিরক্তি ও নিদারুণ অভিশাপের পাত্র হয়ে সমাজের কাঁটা আবর্জনা স্বরূপ ঘুরে ঘুরে সেই শক্তিমান ধর্মপ্রবর্তকের ধর্মনীতির কলঙ্ক ও অপমান বাড়িয়ে তুলছে। এর প্রতিকার কি কিছু নেই?

খানসামা বাবুর্চি হতে মুসলমানই ওস্তাদ, এ কথা না বললেও চলে। সে গৌরব হতে আমাদিগকে হঠাৎ কেউ বঞ্চিত করতে পারছে না। কিন্তু জানেন, শূকরের মাংস ও চর্বি হচ্ছে এদের আসল উপকরণ। তাই দিয়েই তাদের বাবুর্চিগিরির বাহাদুরি বজায় করতে হয়। কেন তারা করে? উত্তর, পেটের দায়। এ সম্পর্কে একটা মজার গল্প বলি। নিষেধ সেই পেটের দায় হতে তাকে উদ্ধার করতে পারে না। একদিন আমার এক বন্ধু, জনৈক মুসলমান অধ্যাপক, তাঁর ইংরেজ প্রভুর গৃহে আমন্ত্রিত হন এবং দস্তুরমত ডিনারে পরিতুষ্ট হয়ে বাড়ি ফেরেন। কয়েকদিন পরে সেই প্রভুর বাবুর্চির সঙ্গে আমার দেখা। সে ত এসে আমার বন্ধুর আকৃতি-প্রকৃতির বর্ণনা আরম্ভ করল। উদ্দেশ্য, সে আমাকে বন্ধুটিকে চিনাতে চায়। আমি তার উদ্বিগ্নতা দেখে তখন না চিনলেও বললাম, "হ্যাঁ, চিনলাম। এখন বল তোমার কি বলবার আছে।" সে তখন সে-দিনকার ডিনারের কথা বলল এবং আরও বলল যে, বন্ধুটি আমার ঐ নিষিদ্ধ পশুর চর্বির দ্বারা পাকান সমস্ত জিনিসই অতি লজ্জতের সঙ্গে খেয়েছিলেন, বিশেষত সেই হ্যাম তিনি কি করে আরও চেয়ে খেয়েছিলেন তাহাও সে বলল। শেষে সে দুঃখ করল, "দেখুন সাহেব, আমরা না হয় পেটের জ্বালায় ও-সব নাড়ি চাড়ি, কিন্তু উনি ও-খানা না খেলে পারতেন।" বলা বাহুল্য, ঐ 'চাড়ি'র তাৎপর্য যে গলাধঃকরণ তা যত উহ্য থাকে ততই সমাজের মুখ রক্ষা হয়। বন্ধুর সঙ্গে পরে আলাপ হয়েছিল। তিনি আমার নিকট শুনে চর্বি ছিল কি না সেটা ভালো করে সন্দেহশূন্য করবার জন্য বাবুর্চির বাড়ি গিয়ে জেরা করে তার প্রাণান্ত

করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি কোন এক পীর সাহেবের নিকট গিয়ে তওবা করে তাঁর মনের অনুতাপ দূর করতে ছাড়েননি। অবশ্য এখানে আমার কথা, বাবুর্চিদের—তাঁর নয়—ভুল হলে আর কি হবে। এই ত নিষেধের অবস্থা।

তারপর ধর্মের জন্য জুলুম করা অনেকটা মুসলমানদের স্বভাবগত হয়ে গেছে, সে কথা বললে সমাজ অতি মাত্রায় চটে উঠবেন ; কিন্তু আমি যেটা অনুভব করি সেটা ত না বলে পারি না। পরধর্মীদের উপর জুলুম করার কথা বাদ দিলেও স্বধর্মীদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের অন্ত নাই। এই দেখুন, মোহাম্মদী ও হানিফীদের পরস্পর হিংসাহিংসি। 'হানিফী' 'মোহাম্মদী'-কে পারে ত গঙ্গা পার করে দেয়—অথচ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য মাত্র সামান্য দুই একটি ধর্মাচারের প্রণালি ও দুই একটি হাদিসে আস্থাহীনতা। এই সামান্য মতের পার্থক্যের জন্য হানিফীদের যে চরম নৃশংসতা সময় সময় লক্ষ্য করবার দুর্ভাগ্য আমার ঘটেছে এবং মোহাম্মদীদের উপর হানিফী মৌলানাদের ফতুয়ার ফলে যে পাশবিক অনাচার ঘটেছে এবং প্রতিনিয়ত ঘটছে তা বাস্তবিকই লজ্জাকর। হানিফীরা মোহাম্মদীদের সঙ্গে নামাজ পড়ে না—তাদের এমামতি গ্রহণ করে না—বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ হারাম বলে মনে করে। এ সমস্ত ধর্মের জুলুম ভিন্ন আর কি? অন্য মতের প্রতি অসহিষ্ণুতাই এই জুলুমের ভিত্তি। আজ মুসলমান সমাজে এই অসহিষ্ণুতা চরম হয়ে উঠেছে। মুসলমান-ইতিহাস যে ব্যর্থতার ইতিহাসে পূর্ণ, তার কারণে অনেকখানি এই অসহিষ্ণুতা—যার জুলুম মুসলমান সমাজে প্রতিভার সৃষ্টির পথে বিরাট বিঘ্ন ঘটিয়েছে। ইবন রোশদ, ইবন সিনা, ইবন খলদুন, আবু হানিফা, খলিফা আল হাকেম, কবি আবুল আতাহিয়া কিরূপ নির্যাতিত হয়েছিলেন, তা কি মনে পড়ে না? কেন? তাঁদের মত সমসাময়িক সমাজ সহ্য করতে পারেনি। এই অসহিষ্ণুতার জুলুম চিরদিন আমাদের স্বাধীন চিন্তাকে প্রতিরোধ করেছে। তাই মুসলমান আজ যুগধর্মের সমস্যায় বিব্রত হয়ে সমস্ত নিষেধকে লঙ্ঘন করেও প্রশস্ত পথ খুঁজে বের করতে পারছে না।

আজ আমরা নিজের চিন্তায় এত সঙ্কীর্ণচিত্ত হয়ে পড়েছি যে, যখন আমরা আমাদের অধিকার ভোগ করতে চাই তখন অন্যের অধিকারের কথা মনে থাকে না। তার প্রমাণ অনেকটা গরু ও বাজনা উপলক্ষ্য করে যে দ্বন্দ্ব আমাদের অহর্নিশ চলছে তা থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে। বাজনা দ্বারা মসজিদের অপমান হয় এই চিন্তাটাই জুলুমের অবলম্বন বললে অত্যুক্তি হয় না। নিঃস্ব অকিঞ্চন যে, নিজের অন্তর ও মস্তিষ্কের অভাব যার প্রচণ্ড, যে নিরালম্ব, যার আঁকড়ে ধরবার বেশি কিছু নেই, সে-ই অন্যের অধিকারবহির্ভূত একটা ক্ষুদ্র সামগ্রীর প্রতি কপট মমতাকে উপলক্ষ্য করে নিজের সমস্ত দৈন্যের ক্ষতিপূরণের দাবি করতে এতটুকু লজ্জা বোধ করে না বা সঙ্কুচিত হয় না। আজ মসজিদ উপলক্ষ্য করে মুসলমান তার অন্য দিককার বিপুল দৈন্যের ক্ষতিপূরণ করতে চায়। কিন্তু বুঝতে পারে না যে, চিত্ত থেকে মসজিদের প্রতি সত্যকার শ্রদ্ধা যতটুকু উৎসারিত হতে পারে, শুধু সেই পরিমাণ দাবি করলে হিন্দুরা খুশিতে আরো শ্রদ্ধা করে বাজনা বন্ধ করত। কারও কোন জিনিসের প্রতি শ্রদ্ধা করতে জোর করা নিতান্ত মূঢ়তা। হিন্দু যদি মসজিদের প্রতি শ্রদ্ধা না করে, তবে তার উপর

জোর করবার কি অধিকার আমাদের আছে? মসজিদ যাদের জন্য, তারা যদি শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারে, তবে আপনিই মসজিদ সকলের শ্রদ্ধেয় হবে, এ কথা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে। দাবি বেশি করলে, যার কাছে দাবি করা হয় তার চিত্ত ঐ দাবির অন্যায়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। মানুষের নৈতিক স্বভাব শুধু দিতে চায়, কিন্তু যেটুকু দেওয়াই তার স্বভাব—তার বেশি চাইলেই সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মুসলমান কি এ কথা বুঝবে? বাজনা চব্বিশ ঘণ্টার জন্য বন্ধ করতে হবে, এত বড় দাবিতে যে হিন্দুর অধিকারকে একেবারে অস্বীকার করা হচ্ছে, তা আমরা যেন বুঝছি না। অন্যের অধিকার নষ্ট করা হারাম। নিষেধ মেনে চলবার শক্তি ও শুভ বুদ্ধি আমাদের বিলুপ্ত হয়েছে—অন্যের অধিকারকে শ্রদ্ধা করবার গৌরব হতে আজ আমরা অতি নির্মমভাবে বঞ্চিত। ক্ষুদ্র স্বার্থের অংশ নিয়ে যারা নিরবধি ভ্রাতৃবিরোধে অভ্যস্ত, তারা কেমন করে অন্যের অধিকারকে সুনজরে দেখবে? সে অধিকার স্বার্থদ্বন্দ্ব, অধিকার-বিদ্বেষ দ্বারা লাঞ্ছিত আমাদের অন্তর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে একেবারে কুণ্ঠিত। এ অবস্থায় আমাদের চাওয়াই ক্ষুদ্র বলে মনে করি এবং অন্যের দাবি ন্যায়সঙ্গত নয় বলে চীৎকার করে উঠি।

আজ আমরা অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসের পাত্র হয়েছি। অতি নিকট অতীতে যারা সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিল, আজ তারা একেবারে নিঃস্ব। ধর্মপ্রদত্ত 'চুলচেরা' স্বার্থজ্ঞান লাভ করে আমরা ক্রমশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করতে গিয়ে বৃহৎ স্বার্থ ও সম্পদ আমাদের মুষ্টির ভিতর হতে সরে যাচ্ছে। পরস্পর-বিরোধই প্রবল হয়ে আমাদের সমাজকে শত ফেরকায় (অংশে) বিভক্ত করে ফেলেছে। ফলে, আজ মুসলমানের সম্পদ ফুরিয়ে গেছে—শহর নগরের পূতিগন্ধময়, অতীব অস্বাস্থ্যকর, অন্ধকার কোণই হয়েছে তার বাসস্থান। এমন একজন বন্ধু তার নাই যে, দয়া করেও সে একটু আলো ও বাতাস তার জীর্ণ কুটীরের দুয়ারে পৌছে দেয়। এমন অবস্থায় চিত্তের প্রকাশ হয় শুধু কান্নাকাটি, হিংসা, জিদ ও ভিক্ষায়। আমাদের চিত্তের প্রকাশও ঠিক এইরূপেই হচ্ছে। যে প্রশস্ত চিত্তে থাকলে মানুষ শত্রু-মিত্র, স্বধর্মী-অন্যধর্মী, ধনী-নির্ধন সকলকে সমভাবে বুকে তুলে নিতে পারে, সে সুবিশাল চিত্ত আমাদের নাই ; কিম্বা উহা লাভ করবার জন্য যে আয়োজন দরকার তাই বা আমাদের কৈ? আজ হিন্দুর সকল আচরণই আমাদের নিকট অপ্রিয় বলে মালুম হচ্ছে ; তার কারণ আমাদের চিত্ত নিতান্ত ক্ষুদ্র হয়ে গেছে—ধর্মের জ্যোতি সে চিত্তে নাই—যে ধর্মজ্ঞান থাকলে মানুষের প্রতি দরদ বাড়ে, সে জ্ঞানও আমাদের অন্তর্হিত হয়েছে। যে সত্যকার ধর্মজীবন মানুষের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা বাড়ায়, সহানুভূতি ও বেদনা জাগায়—তাহা বিকৃত হয়ে গেছে ; তার পরিবর্তে ধর্মজীবনের ভাণ ও তার বাড়াবাড়ি প্রবল হয়ে আমাদের চিত্ত-প্রকাশের স্বাস্থ্যকর পথগুলি সমস্ত একে একে রুদ্ধ করে ফেলেছে। আমাদের নিকট অন্তঃসারশূন্য নির্মম আচার-অনুষ্ঠানগুলির দৌরাত্ম্যই একমাত্র ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দৌরাত্ম্য দেহ ও মন উভয়কেই নিষ্পেষিত করে ফেলছে। সেই দেহ ও মনে জন্তুধর্মীর প্রভাবই বেশি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রতিবেশীর প্রতি সুব্যবহার করবার ব্যবস্থা করে সমাজধর্মী। আজ মুসলমান সমাজে জন্তুধর্মীরই প্রভাব যখন বেশি, তখন হিন্দু প্রতিবেশীর সহিত যে দ্বন্দ্ব, তার সমাধান

সন্তোষজনক হতে পারে না—যতদিন মুসলমানের মধ্যে সমাজধর্মী প্রবল হয়ে না ওঠে। তার জন্য চাই, আমাদের চোখে যে ১০০০ বৎসরের পুরাতন ধর্মের ঠুলি লাগানো আছে, সেটা খুলে ফেলে, খোদার দেওয়া চক্ষু দিয়ে সমস্ত দুনিয়াটাকে একবার ভালো করে দেখা।

যত গর্হিত পেশা, তাহাই আজ মুসলমানের হাতে। তার কারণ বহু। তবে একটা কথা মনে হয়। অতীতের মোহে ক্ষুব্ধ হয়ে মুসলমান অন্যের জ্ঞানগুণ গ্রহণ করতে পরাঙমুখ হয়েছে এবং অন্য জাতি যখন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে শক্তি অর্জন করতে প্রস্তুত হল, মুসলমান তখন অতীতের নেশায় নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল। ফলে, নিশ্চেষ্ট বা অল্প চেষ্টায় কাতর হওয়াটা তার ধাত হয়ে গেল। আজ নানা জাতির সংঘর্ষে জীবনসমস্যা যখন বিপুল হয়ে উঠেছে এবং সে সমস্যার সমাধান যখন অধিকতর পরিশ্রম ও অক্লান্ত সাধনা দাবি করে বসেছে, তখন মুসলমান সে পরিমাণ পরিশ্রম ও ঐকান্তিক সাধনায় অনভ্যস্ত বলে বৃহৎ কল্যাণের অধিকার হতে ধীরে ধীরে বঞ্চিত হয়েছে। সেজন্য তাকে আজ ঐ কল্যাণের অধিকার অর্জন করার জন্য, অন্যের সাহায্য ভিক্ষা করতে ব্যাকুল হতে হয়েছে। যুগযুগান্তরের সাধনা, অল্প চেষ্টার মহিমা ও বৃহৎ প্রয়াসের ব্যর্থতা আজ যে গৌরব মণ্ডিত হয়েছে, মুসলমানের চক্ষে সেই গৌরবই বেশি করে ধরেছে, কিন্তু সে সাধনার দিকে, সে পরিশ্রমের দিকে তার দৃষ্টি পড়ছে না। সে সেই সাধনার ফলটি অতি অল্প আয়াসেই পেতে চাচ্ছে, কারণ কঠোর সাধনার অভ্যাস ও শক্তি তার নাই। অল্প পরিশ্রমে বেশি পুরস্কার লাভ করবার জন্য সে ব্যগ্র হয়েছে। সেজন্য সাধারণত যে সমস্ত পেশা বা ব্যবসায়ে অল্পত্যাগে অতি-লাভের সম্ভাবনা, সেই সমস্ত পেশায় মুসলমানের সংখ্যা বেশি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, জুয়াখেলা, ঘোড়দৌড়ে বাজি, চুরি, গাঁটকাটা, কোকেন প্রভৃতি বিনা লাইসেনসে বিক্রয় (smuggling), পাপ ব্যবসায়ের জন্য নারী সংগ্রহ (procuring) প্রভৃতি সমাজ-সংহারক ব্যবসায় ধরা যেতে পারে। পুলিশের অত্যাচার ও আইনের কঠোর শাস্তি তাহাদিগকে এ সমস্ত ব্যবসায় হতে সরিয়ে দিতে পারছে না। মুসলমান সমাজ এই সমস্ত দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত নয়, কেননা এই সমাজে এদের বিরুদ্ধে কোন অনুষ্ঠান আজও সৃষ্টি হয়নি। এখন প্রধান কাজ হচ্ছে মুসলমানকে বিপুল পরিশ্রম ও অল্প লাভের ধৈর্যে অভ্যস্ত করে তোলা। কেমন করে তা করা যেতে পারে তার জন্য ভাবতে চিন্তে হবে।

তারপর, সুদ দিতে দিতে যে মুসলমানের রক্ত শুকিয়ে গেল, তা কি বলতে হবে? কিন্তু হজরত বেদুইনকে য়িহুদি জোঁকগুলির হাত হতে রক্ষা করবার জন্য 'সুদে'র ফতোয়া জারি করেছিলেন। আজ মুসলমানকে মহাজন-জোঁকের হাত হতে রক্ষা করবার জন্য কি চেষ্টা হচ্ছে? ধর্মযাজকগণ কি ব্যবস্থা করছেন? শুধু নিষেধের ফতোয়া শুনিয়ে গেলে ত হবে না—তার ক্ষুধা নিবারণ করবার পথ করতে হবে। নতুবা একদিন এই সুদ-জর্জরিত মুসলমান হয় ধ্বসে যাবে, নয় নৃশংস বিপ্লবের আগুন জ্বালাবে। এক্ষেত্রে হিন্দুর কর্তব্য কিছু আছে। যৌথ উৎপাদন সমিতি, যৌথ ক্রয়-বিক্রয় সমিতি, যৌথ শিল্পসমিতি দ্বারা ঋণ-জর্জরিত মুসলমানকে, তার শক্তি-সামর্থ্যকে, কাজে লাগাবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। তাকে সমাজধর্মী করে তুলতে হবে—পরের জন্য পরিশ্রমও করতে শেখাতে হবে—অধ্যবসায় ও অল্প যত্নের

পরিণামে বিশ্বাস জন্মাতে হবে—মানুষের প্রতি তার শ্রদ্ধা যাতে বাড়ে তার চেষ্টা করতে হবে। নতুবা শুধু জন্তুধর্মী হয়ে থাকলে সে সমাজের এমন এক কাঁটা হয়ে থাকবে যার জন্য সমাজধর্মীকে সতত ত্রস্ত হয়ে ফিরতে হবে।

উপসংহারে এই বলতে চাই, মুসলমান সমস্ত নিষেধের সীমা অতিক্রম করেও এখনও মুসলমান বলে পরিচিত। এতে মুসলমান সমাজের গৌরব কমছে বৈ বাড়ছে না। এই সমস্ত নিষেধের দ্বারা বিড়ম্বিত মুসলমান সকলের ঘৃণা ও হিংসার উদ্রেক করে নিজকে ক্রমশ বিপন্ন করে তুলছে—সকলের সহানুভূতি স্নেহ তার থেকে বিদূরিত হচ্ছে। আজ তাকে সে স্নেহ-শ্রদ্ধা ফিরাবার জন্য ব্যগ্র হওয়া দরকার। তার জন্য নিষেধগুলি কতখানি বর্তমান অবস্থায় কার্যকরি হতে পারে তার বিচার করতে হবে ; এবং সেই কার্যকরি নিষেধগুলি পুরোপুরি যাতে পালিত হয় অর্থাৎ যাতে সেগুলি পালন করবার ক্ষমতা প্রত্যেকেই লাভ করতে পারে, তারও ব্যবস্থা করতে হবে। মুসলমান সমাজকে আর একপেশে হয়ে ধর্মের সারশূন্য অনুষ্ঠানগুলির পূজা করলে চলবে না ; তাকে সর্বজ্ঞান, সর্বরুচির বৈচিত্র্য-বিপুল ভাণ্ডারী হতে হবে—জন্তুধর্মী মুসলমানের চিত্তের ক্ষুধা মিটাবার জন্য সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। অন্য ধর্ম ও অন্য সমাজের প্রতি তার শত্রুতা করলে চলবে না—তাদের প্রয়োজনও, আবশ্যক হলে, নিবারণ করবার মত শক্তি তার লাভ করতে হবে। ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ দান 'তৌহিদে'র গৌরব উদ্ধার করতে হবে। তার জন্য কবর-পূজা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৌত্তলিক আচারকে সমূলে বিনষ্ট করতে হবে এবং ঐ 'তৌহিদে'র উৎস হতে সকল মানুষের প্রতি অফুরন্ত শ্রদ্ধা ও স্নেহ অর্জন করতে হবে। তবে আবার মুসলমান জয়যুক্ত হবে—এবার তরবারি দ্বারা নয়, শ্রদ্ধা দ্বারা ; জুলুম দ্বারা নয়, প্রীতি দ্বারা ; শারীরিক বল দ্বারা নয়, চিত্তের আনন্দ ও মনের বল দ্বারা। তখনই নব-মুসলিমের জন্মলাভ হবে—যে হবে স্থিরবুদ্ধি, বিশাল-চিত্ত, সংস্কার-মুক্ত, বিপুল-স্নেহ এবং অন্যের অধিকার দানে মুক্তহস্ত।

তাই আজ আর একবার প্রার্থনা করি, নিতান্ত দুঃখ ও লজ্জার সহিত,—

মুসলমান শক্তি লাভ করুক
তার চিত্ত বিকশিত হোক,
তার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হোক,
তার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও দরদ বর্ধিত হোক,
সে সকলকে বুকে ধরতে শিখুক।

অভিযান, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ভাদ্র, ১৩৩৩

তরুণ মুসলিম

তরুণই বর্তমানের উত্তরাধিকারী। তরুণ অতীতের বোঝা মাথায় নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে আগুয়ান হয়। তরুণ অতীতের মাল-মসলা দিয়ে বর্তমানের ভিত্তি গঠন করে--আর তার আপন মৌলিক শক্তি ও জ্ঞান প্রয়োগ করে সেই ভিত্তির উপর ভবিষ্যতের সৌধ খাড়া করে। সৃষ্টি করাই তার বর্তমানের কাজ। মাবন-জীবনের সোনার ভবিষ্যত কোন অজ্ঞেয় কালের বুকে নিহিত। সেই ভবিষ্যতকে ফুটিয়ে তুলতে তরুণের প্রয়োজন। বর্তমানের নব নব সৃষ্টি, নব নব সাধনা, নব নব জ্ঞান সেই ভবিষ্যতের পথের আলোক। তরুণ সেই আলোকের বাহক। তাই আমরা তরুণের সঙ্গ চাই। কারণ আমরা সব ভবিষ্যতের যাত্রাপথের পথিক।

কিন্তু যদি তরুণ অতীতের সৃষ্টির বোঝা খুলে তার সৃষ্টির মোহে অভিভূত হয়ে সম্মোহিত হয়ে বসে, তা হলে সে তার বর্তমানকে একেবারে ভুলে যায়। সে তার আপন শক্তির বলে ভবিষ্যতের সৌধ গড়তে সক্ষম হয় না। মানব-সমাজের বুকে অতীতের মোহগ্রস্ত তরুণের দল কিছুমাত্র কম নয়। অতীতকে তারা বর্তমানের টেলিসকোপ দিয়ে দেখে, আর বর্তমানকে অস্বীকার করে। বর্তমানের দুঃখ-দৈন্য-বেদনার সমস্যা তাদের শক্তির স্রোতে কিছুমাত্র প্রেরণা দেয় না। তারা বর্তমানের বুকে বসে অতীতের মৃত কঙ্কালকে পূজা করে তাদের জীবন সার্থক করতে চায়। এই অতীতের পূজা মানব-ইতিহাসের একটি মারাত্মক উপাদান। এতে বর্তমানের দৃষ্টি ঘুলিয়ে যায়—ভবিষ্যতের পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

তরুণ বিশ্ব-শক্তির অধিকারী,—অনন্ত সম্ভাবনা-পূর্ণ তার জীবন। সে যদি শুধু ঘরের কোণে বসে পূর্বপুরুষের লিখিত পুঁথি ঘেঁটে তার অমূল্য মানব-জীবনকে সার্থক করতে চায় এবং মনে করে, বর্তমানের সব কিছু অতীতে সৃষ্ট হয়েছিল, তা হলে সে যে শুধু তার অনন্ত শক্তিকে অপব্যয় করে তা নয়, তার সেই শক্তিদাতাকেও অবমাননা করে। অতীত-সৃষ্টির জন্মদাতা অতীতের ঘটনা ও অতীতের পরিবেষ্টন। বর্তমান ঘটনা ও বর্তমান পরিবেষ্টন চিরকালই নূতন। বর্তমান অতীতের কুঁড়ি বৈ আর কিছু নয়। বর্তমানের আপন শক্তিতে সেই কুঁড়ি ফুটে নব-পুষ্পে পরিণত হয়। সুতরাং তার ফলও নূতন হওয়া চাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানব-মন অতীতের মোহ ছাড়তে পারে না। সে এই বর্তমানের পরিবর্তিত নব-পরিবেষ্টনেও সেই অতীতের ইতিহাসকে হুবহু বজায় করতে চায়—বর্তমানের নব প্রসব-বেদনাকে উপেক্ষা করে। তাই মানব-ইতিহাসের স্তরে স্তরে দেখতে পাই—কত দ্বন্দ্ব, কত সংঘর্ষ, কত বিগ্রহ-বিপ্লব, কত রক্ত-বন্যা। এর মূল কারণ হচ্ছে, অতীতের সৃষ্টিকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য মানব-মনের স্বাভাবিক দুর্জয় প্রবৃত্তি। চিরকালই তরুণ এই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অভিযান

করেছে—বর্তমান বেদনার অনুভূতিতে চঞ্চল হয়ে ভবিষ্যতের আদর্শকে সার্থক করবার জন্য।

আজও আমরা দেখছি, আমাদের এই সুন্দর জন্মভূমিতে অতীতের মোহগ্রস্ত সম্প্রদায়গণ পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করছেন—বর্তমানের দুঃখ-সমস্যাকে ভুলে গিয়ে। এক সম্প্রদায় চান—বৈদিক যুগের সৃষ্টিকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে ; আর এক সম্প্রদায় চান—খোরমা-খেজুরের মরুভূমির আদর্শকে হুবহু প্রতিষ্ঠিত করতে। এই উভয় সম্প্রদায়ই অত্যন্ত মারাত্মকভাবে অতীতের মোহগ্রস্ত। তাঁরা বর্তমানকে দেখছেন না, ভবিষ্যতের খেয়ালও তাদের নেই। তাঁদের কাছে ভূত-ভবিষ্যত-বর্তমান সবই একাকার। তাঁরা কিছুতেই বুঝতে চান না—কি রাষ্ট্রনীতি, কি অর্থনীতি, সমস্তই বিশিষ্ট কাল ও পরিবেষ্টনের বুকে প্রস্ফুটিত মানব-মনের বেদনা ও সাধনার ফল। যুগে যুগে নব পরিবেষ্টনের বুকে এইরূপ ফলের উদ্ভব হয়েছে। এই সমস্ত অতীত ফলের প্রভাবে প্রভাবান্বিত আমাদের বর্তমান মন ও নব সমাজ-পদ্ধতি, নব রাষ্ট্রনীতি-রূপ নব নব ফল প্রসব করতে সক্ষম, এ কথা আমাদের বুদ্ধি ও প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে এবং এও বিশ্বাস করতে হবে যে, অনন্ত অজ্ঞেয় ভবিষ্যতের বুকেও ক্রমবিকাশোন্মুখ মানব-মন-রূপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হবে—যার সৌরভে পূতি-গন্ধময় অতীত ও বর্তমান উড়ে যাবে,—আর মানব-ইতিহাস মহান গরীয়ান হয়ে বিশ্ব-স্রষ্টার দরবারে সাক্ষ্য দিবে, "তোমার সৃষ্ট মানবকে তুমি কত অনন্ত শক্তি, অনন্ত রূপ ও অনন্ত প্রকাশের ভাণ্ডারী করেছ।"

আজ আমাদের সব কথা তরুণদের লক্ষ্য করে বলতে হবে। প্রবীণের উদ্দেশে বলবার মত কথা থাকলেও তা অপ্রীতিকর হতে পারে, কারণ তাঁদেরকে ভবিষ্যতে কথা বলতে গেলে তাঁরা তা বুঝবেন না,—আর বর্তমানও তাঁদের ভুল-ভ্রান্তির ফলে জটিল হয়ে উঠেছে। তাই হয়ত তাঁদের সে ভুল-ভ্রান্তির দিকে তরুণদের দৃষ্টি ফিরাতে গিয়ে খানিকটা তাঁদের আঘাত দিতে হতে পারে। কিন্তু আমি আশা করি, তাঁরা মনে করবেন না যে, আমি তাঁদের অশ্রদ্ধা করি এবং তরুণকে তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে বলছি। বস্তুত, তরুণদের মূল প্রবীণের বুকে। তবে তরুণ ভবিষ্যতের অগ্রদূত—অনাগত যুগের সারথি। সেজন্য অনেক সময় তরুণদের সঙ্গে প্রবীণের দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রবীণ চান দাঁড়িয়ে থাকতে—যা কিছু হয়েছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে ; আর তরুণ চায় ছুটতে—যা কিছু হয়নি, তার জন্য প্রাণপণ করতে।

এ স্থলে আমি আমার মুসলিম তরুণগণকে লক্ষ্য করে কতকগুলি কথা বলব। বন্ধুগণ ! তোমাদের হয়ত ধারণা জন্মেছে, আশে-পাশের চঞ্চল আবহাওয়ার প্রভাবের ফলে হিন্দুরা আমাদিগকে ঘৃণা করে, আমাদের উপর অত্যাচার করে, আমাদের স্বার্থ অপহরণ করে, আমাদের উন্নতির পথে নানা প্রকার বাধা জন্মায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমাদের অনুরোধ করি এ ধারণা বিশেষ করে পোষণ করতে যে, যে অত্যাচার করে, তার অপরাধের চেয়ে যার উপর অত্যাচার হয়, তার অপরাধ আদৌ কম নয়, বরং বেশি। এই যে ইংরেজগণ আমাদের উপর প্রভুত্ব করছেন, সেই প্রভুত্ব অনেকখানি হৃদয়হীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত—যাতে করে

দেশবাসী উৎপীড়িত ও নির্যাতিত হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁদের অপরাধের চেয়ে আমাদের অপরাধ কিছুমাত্র কম নয়। আমাদের অপরাধ বেশি বলেই তাঁদের এই প্রভুত্ব এরূপ চেহারা নিয়েছে, যার সম্বন্ধে অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশের যুবকগণ লম্বা গলায় বক্তৃতা করে বেড়িয়ে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে আজ দেশপূজ্য হয়েছে। তারা তখন ইংরেজকে গালি দিতে পারলেই বড় বক্তা বলে গণ্য হত। এই গালি দেওয়াটি তখন নৈতিক বলের পরিচায়ক বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। এটা বিদেশীর অপরাধকেই বড় করে দেখতে আর নিজের অপরাধকে ঢাকতে শিখিয়েছে। এর চেয়ে বড় অশিক্ষা আর কিছু হতে পারে না। এজন্য এর ফলও অত্যন্ত মারাত্মক হয়েছে। এতে বরং যুবককে জ্ঞানের তপস্যা হতে অনেকখানি বিরত করেছে। সেইরূপ, আজ যদি তোমরা—আমার সম্প্রদায়ের যুবকগণ—হিন্দুর ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাতে চাও, এবং চাপিয়ে দিয়েই নিষ্কৃতি লাভ করতে চাও, তাহলে তোমাদের চরম আহাম্মকি হবে। আমাদের অপরাধ বেশি বলে অন্যে আমাদের সেই অপরাধের সুযোগ নেয়। শক্তিমান দুর্বলের উপর শক্তি প্রকাশ করে, সেই প্রকাশের অন্য নাম অত্যাচার। এই হল স্বভাবের নিয়ম। তার ব্যতিক্রম যদি তোমরা দেখতে চাও, তাহলে তোমাদের দুর্বলতা দূর কর, তোমাদের অপরাধ মোচন কর।

আমাদের অপরাধের অন্ত নেই। আমাদের পূর্বপুরুষ ধর্ম-জোশে মত্ত হয়ে গুণকে গ্রহণ না করে অতীতের পুঁথিতেই মশগুল থাকলেন ; আর আমাদের পড়শি হিন্দু ভ্রাতা দুই হাতে করে বুকে জড়িয়ে মাথা পেতে সে জ্ঞান-গুণ গ্রহণ করতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ-শক্তির বিজয়-পতাকা দৃঢ়ভাবে বাঙলার বুকে প্রোথিত হল। হিন্দু ভ্রাতা প্রথম আরম্ভের সমস্ত সুযোগ পেয়ে বসলেন, ফলে তাঁর ঐশ্বর্যের দীপ্তি ও ইংরাজের দুন্দুভি যখন আমাদের ক্ষুব্ধ পূর্বপুরুষের হৃদয়-দ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাত করতে লাগল, তখন তিনি চোখ খুলে দেখলেন, নিরন্তর ঘূর্ণ্যমান এই দুনিয়া-রথচক্র অনেক দূরে চলে গেছে—তখন তাঁর 'হায় ! হায় !' শুরু হল। সেই অবধি মুসলমান ভিক্ষুকের মত 'এটা দাও', 'ওটা দাও' এই করে কাতর-ধ্বনি করে বেড়াচ্ছে। সেই কাতরোক্তি শুনে হিন্দু ও ইংরেজ উভয়ই যেন আজ কৃপা-পরবশ না হয়ে বরং ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। সেই কাতরোক্তির পশ্চাতে হয়ত আমাদের যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, কিন্তু ঐশ্বর্য-মদ-মত্ত হিন্দু ও ইংরেজ বেশি দূর তলিয়ে দেখছেন না। যতটুকুই তাঁদের ঐশ্বর্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য আবশ্যক, ততটুকুই তাঁরা দেখছেন। সুতরাং আমরা আজ যা চাচ্ছি তা সমস্তই তাঁদের নিকট আবদার বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের শক্তি সঞ্চয় করে আমাদের পথ কেটে বের করে প্রমাণ করতে হবে যে, আমরা ভিক্ষুক নই, আমরা এদেশের অঙ্গ, আমাদের কথা না শুনলে দেশের সত্যিকার মঙ্গল কখনও হবে না। দেশের কল্যাণে আমাদের হাতের পরশ না লাগলে সে কল্যাণ সার্থক শ্রীসম্পন্ন ও স্থায়ী হবে না। আমাদের তপস্যা দ্বারা আমাদিগকে সে কল্যাণের যোগ্য অধিকারী হতে হবে। আমি তোমাদিগকে এই দরখাস্ত করবার লজ্জাটা ভালো করে উপলব্ধি করতে বলি। আর অনুরোধ করি, তোমরা এমন শক্তি-সাধনায় মনোনিবেশ কর, যাতে অচিরে তোমরা শক্তিমান হয়ে যোগ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বিশ্বের আদরণীর হয়ে আমাদের বর্তমান মুসলমান সমাজকে এই দরখাস্ত করবার লজ্জা হতে মুক্ত করতে পার।

আমাদের এই মুসলমান সমাজ আজ একরূপ ভিক্ষুকের সমাজে পরিণত হয়েছে। সহস্র সহস্র নর-নারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু কোলে করে পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে,—শুধু স্বল্পবিত্ত মুসলমানের দরজায় ঘুরে তাদের পেট ভরছে না—অ-মুসলমানের দরজায় তাদের যেতে হচ্ছে আর তিরস্কার খেতে হচ্ছে। তাদের জীবনের দিকে একবার তোমরা তাকাও। তাদের দেখে যদি অন্য-ধর্মাবলম্বী মুসলমানকে গালি দেয়, তাহলে কি তার বেশি দোষ দেওয়া যায়? লোকের শ্রদ্ধা পেতে হলে নিজেকে শ্রদ্ধার যোগ্য করতে হয়। এ কথাটি আমি তোমাদিগকে বেশ জোর করেই বলতে চাই। মসজিদের প্রতি অন্যের শ্রদ্ধা জন্মাতে হলে মসজিদের মুসল্লিদের সর্বাগ্রে শ্রদ্ধেয় হওয়া চাই। কিন্তু সে মুসল্লিদের জীবন যদি কুৎসিত হয়, তার পেশা যদি হীন হয়, তার রুচি যদি গর্হিত হয়, তার ব্যবহার যদি অভদ্র হয়, তাহলে তার প্রতি কেমন করে অন্যের শ্রদ্ধা বাড়তে পারে? তাই বলি, তোমরা হিন্দু ও ইংরাজকে দোষ দেওয়ার আগে নিজের চরিত্র সুন্দর কর, ব্যবহার ভদ্র কর, রুচি মার্জিত কর, প্রকৃতি নম্র কর, জ্ঞান প্রখর কর, শিক্ষা উন্নত কর।

তোমরা একবার বাঙলাদেশের জেলখানাগুলির দিকে তাকাও। জেলের অধিবাসীর মধ্যে কোন সম্প্রদায়ের লোক বেশি, তা তোমরা জান? মুসলমান। তাদের শতকরা ৯০ জনেরও বেশি মুসলমান। মুসলমান এত কারা-নিগৃহীত কেন? সে উত্তর তোমরা খুঁজে বের করতে চেষ্টা কর। এদের কারামুক্তির ভার তোমাদের গ্রহণ করতে হবে। এতগুলি লোক জেলে আছে, অথচ তাদের জন্য আমরা কিছুই করি না, কেবল ইসলামের ফজিলত বয়ানেই সময় নষ্ট করি,—এতে লজ্জা হওয়া উচিৎ নয় কি? তোমরা এ লজ্জা হতে মুসলমান সমাজকে মুক্ত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও বদ্ধপরিকর হও। সেজন্য সাধনা করতে, ত্যাগ করতে, পল্লীবাসীর জীবনে জ্ঞান ও শিক্ষার আলোক পৌছে দিতে যে শক্তির প্রয়োজন, সেই শক্তি সঞ্চয় করবার জন্য এখন হতে একাগ্রচিত্তে তপস্যা-রত হও। এরা যে জেলে যায়, তার কারণ অনেকটা তাদের আর্থিক দৈন্য ও অশিক্ষা-কুশিক্ষা। অর্থ ও শিক্ষা উভয়ই তাদের কারার পথ রুদ্ধ করতে পারে। সুতরাং এই দুটির ব্যবস্থা যদি আমরা সত্বর না করি, তা হলে আমাদের সমাজ একেবারে রসাতলে যাবে। এদের অশিক্ষা ও দৈন্যের সুযোগ বুদ্ধিমান যাঁরা, তাঁরা নিয়তই নিচ্ছেন। সেই বুদ্ধিমানের সংখ্যায় অবশ্য হিন্দুই বেশি ; কারণ তাঁরা বহু পূর্ব হতেই বুদ্ধির চর্চা করতে আরম্ভ করেছেন। তাতে এরা আরো বেশি করে দরিদ্র ও নিরুপায় হয়ে পড়ছে। অবস্থার চাপে পড়ে তারা অপরাধ করে—আর সে অপরাধের শাস্তি হতে মুক্তিলাভ করতে গিয়ে মহাজন, মাতবর, মোক্তার, মুহুরি ও উকিলের পেট ভরাতে বাধ্য হয়। ফলে সর্বস্বান্ত হয়ে তারা হয় ভিক্ষার ঝুলি, নয় কুলি-মজুরের ঝুড়ি কাঁধে করে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ে। এ-অবস্থার পরিবর্তন করবার জন্য আমাদের সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায় কোন চেষ্টাই করছেন না। তাঁরা শিক্ষালাভ করেই সরকারি নওকরির ইজ্জতের লোভে পৈত্রিক ভিটার মমতা ত্যাগ করে দরখাস্ত হাতে করে ঘুরে ঘুরে চাকরি গ্রহণ করেই জীবনের সমস্ত শক্তি বন্ধক নয় বিক্রি করে বসেন। তাঁরা কি করে এই বিপুল জন-সমাজের দুঃস্থ অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারেন?

আমাদের অশিক্ষার চেয়ে কুশিক্ষার ফল আরও মারাত্মক! আমাদের সমাজের অতি অল্প লোকেই তা বোঝেন। ১৭৮৪ সাল হতে আমাদের বাঙলার মুসলমান মাদ্রাসা-শিক্ষা লাভ করে আসছেন ; কিন্তু তাঁদের মধ্যে আজ পর্যন্ত একজনও বিশ্বের জ্ঞানী বা শিক্ষিতের মজলিশে আসন গ্রহণ করার যোগ্য হননি। তাঁদের মধ্যে আজ পর্যন্ত দুই একজন কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ হওয়া ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ বা বৈজ্ঞানিক হতে পারেননি। কারণ তাঁরা পুরাতন যুগের পুঁথি কণ্ঠস্থ করেই শিক্ষিত হন ; কিন্তু আজকার দুনিয়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্যের খবর রাখাকে তাঁরা অনাবশ্যক মনে করেন। ফলে তারা বর্তমান জগতের শিক্ষিতের দরবারে যোগদান করবার অযোগ্য ;—সুতরাং আমাদের সমাজের চিন্তা ও কর্মধারায়ও তাঁরা কোন পরিবর্তন আনতে পারেননি। তাঁদের শিক্ষায় বাঙলার মুসলমানের ধর্মজীবনও সুন্দর হয়নি,—তাহলে দিন দিন ভিক্ষুক, কারা-নিগৃহীতের সংখ্যা এত বেড়ে চলত না। এই দেড় শত বৎসরের মাদ্রাসা-শিক্ষা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেছে। এর জন্য দায়ী কে? আমরা, না হিন্দু, না ইংরাজ? আমরা বর্তমান পুঁথির জ্ঞান গ্রহণ না করে প্রাচীন পুঁথির জ্ঞান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছি ; মাদ্রাসার পর মাদ্রাসা নির্মাণ করতে সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করেছি ; ফলে আজ ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরছি, দরখাস্তের পর দরখাস্ত করছি—এখানে মুসলমানের স্থান কর, ওখানে শিক্ষার ব্যবস্থা কর বলে চীৎকার করে বেড়াচ্ছি। সরকার এই ভিক্ষার দরখাস্ত দেখে মনে মনে হাসছেন, আর হিন্দু একে 'আবদার' বলে গালি দিচ্ছেন। দেবেন না কেন? দোষ ত আমাদের। আমরা জ্ঞানলাভ করিনি কেন? স্বার্থ অধিকার করেছেন হিন্দু তাঁর সাধনা দ্বারা। সে স্বার্থ তিনি ছাড়বেন কেন? ছাড়া ত স্বাভাবিক নয়। প্রথম সুযোগের ফল হিন্দুরা এখন ভোগ করছেন, আর আমরা এখন পিছনে পড়ে থাকার দূরদৃষ্ট ভোগ করছি। এখন সকল দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের আত্মধিক্কার কথঞ্চিত লাঘব করেই সন্তুষ্ট থাকছি। আমাদের মধ্যে বড় ডাক্তার নেই, বড় উকিল নেই, বড় বড় পুরস্কারভূষিত ব্যক্তি নেই। এই বলে অন্য সম্প্রদায় আমাদের গালি দিয়ে থাকেন, তাতে আমাদের চৈতন্য হচ্ছে কি? আমাদের দৈন্য দিন দিনই বেড়ে চলেছে। এই দীর্ঘ দেড় শত বৎসরের মধ্যে বাঙলার মাদ্রাসা এমন একজনও বৈজ্ঞানিক, একজনও ঐতিহাসিক, একজনও সাহিত্যিক, একজনও শিল্পী তৈরি করতে পারেনি—বিশ্বের দরবারে যার কদর হয়েছে। জাতির ইতিহাসে এর চেয়ে লজ্জাকর ব্যাপার আর কি হতে পারে? এই দেড় শত বৎসর একেবারে ফাঁকা। এর মধ্যে শিক্ষার চেয়ে কুশিক্ষাই বেশি হয়েছে, তাই আজ আমাদের এই দুর্গতি! নূতন পদ্ধতির মাদ্রাসার জন্য আমরা পাগল হয়ে উঠেছি। সে মাদ্রাসার শিক্ষা-প্রণালি ও শিক্ষণীয় বিষয়গুলি আলোচনা করলে বর্তমান জগতের জ্ঞানদীপ্ত আদনা ব্যক্তিও বলতে পারবেন, এতে মুসলিম-বাঙলা আবার নিচের দিকে চলছে। এতদিন ধরে হিন্দু-বাঙলা যখন বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, শিল্পী প্রভৃতি নানা গুণী সৃষ্টি করেছে, তখন মুসলিম বাঙলা শুধু মুন্সি-মোল্লা তৈরি করেছে। দু-একজন যাঁরা কাফেরের ফতোয়া অমান্য করে ইংরেজি শিক্ষা বরণ করেছিলেন, তাঁরাই আজ মুস্লিম-বাঙলার মুখ রক্ষা করছেন ও তার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যুদ্ধ করছেন। মোল্লা-

মৌলবির খোঁজ ত আজ সেখানে পাওয়া যাচ্ছে না—যেখানে তাঁদের থাকা উচিত ছিল। তাঁরা এখনও সেই দুইশত বৎসর পূর্বের লিখিত কেতাব তালিবুল-এলেমের কাঁধে চাপিয়ে পল্লীর অলি-গলি ঘুরে পানি পড়ে, তাবিজ লিখে, মূর্খের মূর্খতাকে আরো পাকা করে, তাকে আরও খানিক গোঁয়ার করে নিজেদের জীবিকার সংস্থান করে ফিরছেন। যে শিক্ষা এরূপ ফল প্রসব করেছে, সে-শিক্ষাকে আমি কুশিক্ষা বৈ আর কিছু বলতে পারি না। তাই বলি, মুসলিম-বাঙলাকে এই কুশিক্ষার হাত হতে মুক্ত করবার ভার তোমাদের উপর। বর্তমান জগতের জ্ঞান লাভ করে মানুষ কেমন করে বেশি ধার্মিক হতে পারে—সত্যবাদী, বিশ্বাসী, ভদ্র, সম্পদশালী হতে পারে তোমাদের নিজেদের আদর্শ দ্বারা মুসলিম-বাঙলাকে তা বুঝাতে হবে। মাদ্রাসার ভিতর বর্তমান জগতের জ্ঞান ও বিদ্যাকে ঢুকাতে হবে,—তবে মাদ্রাসার শিক্ষা সার্থক হবে। সে ভার তোমাদের উপর। প্রবীণদের তরফ থেকে আমি জানি, এ বিষয়ে তোমাদের উপর শক্ত জুলুম পড়বে। কিন্তু সে জুলুমকে ভয় করলে চলবে না। তোমাদের ধ্যান হোক-"আমরা অতীতের কুঁড়ি, বর্তমানের রস হজম করে প্রস্ফুটিত হয়ে আমরা ভবিষ্যতের পুষ্প হতে চাই। সুতরাং বর্তমানের সব বিদ্যা, সব জ্ঞানের হাওয়া আমাদের গায়ে এসে লাগুক, আমরা দ্রুত ফুটে উঠি।"

তারপর, আর একটি বিষয়ের প্রতি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—যেখানে আমাদের হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর স্বার্থ ছন্দোবদ্ধ হয়ে আছে। সেটি হচ্ছে, আমাদের এই দেশের শ্রী ও আর্থিক অবস্থা। তোমরা জান, বাঙলার ধান পাট আজ জগতের পণ্যের হাটে বড় স্থান অধিকার করেছে। কারা এসব তৈরি করে, তা জান? তারা তোমাদেরই পিতামাতা। তোমাদের হাতে এত বড় সম্পদ রয়েছে, তা তোমরা বুঝতে পারছ না। তাই আজ শিক্ষায়তনে বসে তোমরা শুধু চাকরির স্বপ্নই দেখছ। ফলে এম. এ. পর্যন্ত উঠতে সর্বস্বান্ত হয়ে অবশেষে ৪০।৫০ টাকা বেতনের চাকরির জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে ব্যর্থতার পর ব্যর্থতার আঘাত খেতে খেতে দুনিয়ার সকল আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেকে একেবারে অকর্মণ্য মনে করে তোমরা জীবন-যাপন করবে। মানব-জীবনের এমনতর অপচয় আমাদের দেশেই সম্ভব। সহস্র সহস্র শিক্ষিত যুবক কেরানির জীবনকে বরণ করে দিব্যি নিশ্চিন্ত থাকে, কিন্তু তাদের শক্তি ও জ্ঞান এই বিপুলা ধরণীর বুকে প্রয়োগ করলে যে তারা অচিরে সম্পদশালী হতে পারে, তা তারা খেয়ালও করে না। চাকরি-জীবনের চাকচিক্য ও একঘেঁয়ে জীবনের প্রতি কি সাংঘাতিক সমোহন! স্থিতিশীল চাকরি-রূপ মরীচিকার পশ্চাতে আমাদের অসংখ্য শিক্ষিত যুবক ছুটে নৈরাশ্যের মরু-বালুকায় জীবন বিসর্জন দিচ্ছে! তারা আমাদের জন্মভূমির শ্রী ও সম্পদের এক কণাও বৃদ্ধি করতে সহায়ক হচ্ছে না! এই যে বিপুল অপচয়, এ নিবারণ করবার উপায় কি?

এই বাঙলা দেশেই আমাদের শক্তি ও জ্ঞান প্রয়োগ করবার অসংখ্য উপায় আছে। আমরা যে কাঁচা মাল তৈরি করি, যা বিদেশে গিয়ে পাকা মাল হয়ে এদেশে আসলে আমরা দশগুণ কুড়িগুণ মূল্যে খরিদ করি, বিশেষত আমাদের চাকুরিজীবিদের আয়ের অধিকাংশ সেই পাকা মাল খরিদ করতেই ব্যয়িত হয়—সে কাঁচা মাল আমরা পাকা মালে পরিণত করতে পারি।

আমাদের দেশের লোক দেড়শত বৎসর পূর্বে কাঁচা মাল পাকা করত নানাপ্রকার শিল্প-চর্চার দ্বারা। এই বিক্রমপুর এক সময় সুন্দর তূলার চাযের জন্য বিখ্যাত ছিল। সেই তূলা হতে এই বিক্রমপুরের তাঁতী-জোলারাই কাপড় তৈরি করত যে কাপড় জগতের হাটে বেশ উচ্চ মূল্যে বিক্রি হত। হান্টার সাহেব বলেন, কাপাসিয়ার কার্পাস তূলা বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ আমেরিকার তূলার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। সেই তূলা হতে জগদ্বিখ্যাত মসলিন তৈরি হত। আজ তূলার চাষও নেই, সে মসলিনও নেই। আমরা তার পরিবর্তে পাট তৈরি করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ জীবনকে কলেরা-কালাজ্বরের হাতে তুলে দিচ্ছি আর ম্যানচেস্টারের কাপড় দশগুণ মূল্যে খরিদ করছি। এর কি কোন উপায় আমরা উদ্ভাবন করতে পারি না? চাকরী-প্রিয় বাঙালী যুবকের মস্তিষ্ক কি এর উপায় বিধান করতে একেবারে অনুর্বর? আমরা কি আবার তূলার চায করতে পারি না? আমাদের লক্ষ লক্ষ নারীকে পাটের চাষের ভিতর দিয়ে মৃত্যুর হাত হতে উদ্ধার করে তূলার চাষের ভিতর দিয়ে সম্পদশালী করে তুলতে পারি না? এ ছাড়া আমাদের অন্যান্য সম্পদের উৎস আমাদের গাফিলতিতে ক্রমে শুকিয়ে যাচ্ছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলতে চাই, আমরা মাছ খাই, কিন্তু মাছের চর্চা করি না—প্রকৃতির উপর ভরসা করে বসে থাকি। প্রকৃতি আর কত দিবে? আমাদের মস্তিষ্ক ও পরিশ্রম যুক্ত না হলে প্রকৃতি দেয় না। পাশ্চত্যদেশে মাছের চর্চা হয়, নদ-নদী সরকারের ব্যয়ে সংস্কার করা হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য বিক্রয়ার্থে বাজারে নীত হলে মৎস্যজীবির অর্থদণ্ড দিতে হয়। আমাদের দেশের জেলেরা অবাধে রুই, কাতলা, ইলিশ মৎস্যের ছানা বিক্রয় করে মাছের নির্বংশ করে থাকে ; কিন্তু বিলাতে এরূপ ছোট ছোট মৎস্য বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। আমাদের পল্লীতে পল্লীতে যে শত সহস্র পুষ্করিণী এঁদো হয়ে পড়ে আছে, সেগুলি সরকার বা দেশের জমিদার যদি সংস্কার করে সেগুলিতে মাছের চর্চা করেন, তাহলে দেশে মাছের এত অভাব হত না।

আমরা মুরগি খাই, ডিম খাই,—কিন্তু তার চর্চা করি না—মুরগির চাষ আমরা বুঝি না। ছাগলের গোশত খাই, কিন্তু ছাগলের চর্চা করি না। গরুর দুগ্ধ খাই, কিন্তু দুধের চর্চা করি না। সমস্ত প্রকৃতির উপর ভরসা করে বসে থাকি। তাই দিন দিন এ-সমস্ত জিনিস অত্যন্ত মহার্ঘ্য হয়ে ওঠছে। আমাদের যুবকগণ যদি এদিকে তাঁদের শক্তি ও মস্তিষ্ক প্রয়োগ করতে লেগে যান, তাহলে অচিরে যথেষ্ট অর্থসঞ্চয় করতে সমর্থ হবেন এবং দেশের লোক মাছ, মাংস, ডিম, দুগ্ধ প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে খেতে পারবে। এতে দেশের শ্রী, স্বাস্থ্য ও রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করবার শক্তি দিন দিন বাড়তে থাকবে। এদিকে আমি মুসলমান যুবকদের দৃষ্টি ও মনোযোগ বিশেষ করে আকর্ষণ করছি। তারা যদি উদাসীন হয়ে এ-সমস্ত জিনিসের অভাব দূর করবার চেষ্টা ত্যাগ করে শুধু হা-হুতাশ করে, তাহলে তাদের কর্তব্য সমাপ্ত হবে না। এ-বিষয়ে তাদের প্রকৃতই সৃষ্টি করবার সুযোগ রয়েছে।

মুসলমান দিন দিন ভিটামাটি ছাড়া হয়ে যাচ্ছে! তাকে ভিটামাটিতে স্থায়ী করতে হলে তোমাদেরই শিক্ষিত হয়ে গ্রামে আসতে হবে—মহাজন, গোমশতা ও জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তোমাদের শিক্ষা ও জ্ঞান প্রয়োগ করতে হবে। তবেই বাঙলার চাষী আপনার সত্তা অনুভব করতে পারবে,—সে দায়িত্ব তোমাদের উপর। তোমারা যদি তোমাদের জ্ঞান ও শিক্ষা

বিক্রয় করে চাকরীর জন্য দেশ-বিদেশে শেওলার মত ঘুরে বেড়াও, তাহলে সে-দায়িত্ব পূর্ণ হবে না। চাষীর জীবনে তোমাদের জ্ঞান ও অনুভূতির পরশ লাগাতে হবে,—তবে সে চাঙ্গা হয়ে ওঠবে। যদি সে একবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে, তবে তোমাদের মাটির অধিকার কেউ নষ্ট করতে সাহস করবে না। আসবে কি সে সুদিন—যে দিন বাঙালি চাষী মুসলমানদের সন্তান-সন্ততি তাদের জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জন করে মাটির শ্রী ফুটিয়ে তুলবার জন্য বদ্ধপরিকর হবে?

এখন আমি আমার হিন্দু যুবক বন্ধুগণের প্রতি দু-একটা কথা বলে আমার কথার উপসংহার করব। হে আমার বন্ধুগণ, তোমরা যেমন এদেশের মাটি হতে উদ্ভূত, তেমনই আমরাও উদ্ভূত। তোমাদের এই মাটিতে যে স্বত্ব-অধিকার, আমাদেরও তেমনি অধিকার। আজ তোমরা যদি প্রাচীন হিন্দু-প্রাধান্যের স্বপ্ন দেখে মুসলমানদের অধিকারকে বিষচক্ষে দেখ, তবে তোমাদের দেশপ্রেম সার্থক হবে না। আজ তোমাদের নব দৃষ্টিতে বাঙলার বর্তমান অধিবাসীকে দেখতে হবে। তারা এই বাঙলার পরিবেষ্টনে মানুষ হয়েছে—হিন্দু-মুসলমান একই বৃক্ষের দুইটি পুষ্পের মত একই জলবায়ু উপভোগ করে বেড়ে ওঠেছে। পূর্বে বলেছি, দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে দেশপ্রেম হয় না। মাটিকে স্বাধীন করার আগে মানুষকে স্বাধীন করতে হবে। আমাদের উভয় সমাজের গলদ অনেক। উভয় সম্প্রদায়ের যুবকগণের সমবেত চেষ্টাই সে গলদ শোধরাতে পারে। তোমাদের সমাজ শতধা-বিভক্ত। মুসলমান এ অপরাধ হতে মুক্ত নয়, তার ভিতরও শত ফেরকা (দল) রয়েছে—পরস্পরের ভিতর হিংসা-দ্বেষ-শত্রুতাও যথেষ্ট। মুসলমানকে যতটা ঐক্য ও সাম্যের অধিকারী মনে কর, তারা ততটা নয়। তাদের মধ্যে একতা নাই, তাদের মধ্যেও জাতিবিচার আছে, বিবাহাদি ক্রিয়া-কলাপে সমাজ নিয়ে তাদের মধ্যেও বিষম হট্টগোল বিবাদ-বিসম্বাদ হয়। এর একটি প্রধান কারণ, হয়ত তোমাদের সঙ্গে পাশাপাশি মিলে বাস করার ফলে আমরা ঐ খারাপটাই বেশি করে পেয়ে বসেছি। উভয় সম্প্রদায়ের কেহই সাক্ষাতভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে পরস্পরের প্রভাব হতে মুক্তি লাভ করতে পারে না। আমাদের সঙ্গে বাস করার ফলে হয়ত তোমাদের মধ্যে জাতি-বিচার, অস্পৃশ্যতা, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি আন্দোলন দিন দিন বিপুল হতে বিপুলতর আকার ধারণ করেছে।

বহুকাল ধরে হিন্দু-মুসলমান এই বাঙলা দেশে বাস করছে। উভয়ের মধ্যে পড়শি-প্রীতি যে বেশ গভীর ছিল, আজও তা পল্লীগ্রামের রামদাদা ও করিম চাচার জীবন ঘেঁটে দেখলে বেশ বুঝা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এই রামদাদা ও করিম চাচা ক্রমশ বিরল হয়ে পড়েছে। তার কারণ রামদাদা ও করিম চাচার স্বার্থের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না—তারা বুঝতো গ্রাম্য শান্তি আর মাটির শ্রী তাদের উভয়ের কল্যাণের জন্য একান্ত আবশ্যক। তাই তারা উভয়েই ঐ উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য ভোর হতে দুপুর, দুপুর হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত রৌদ্র-বৃষ্টির দুঃখ সমভাবে সহ্য করে পরস্পরের প্রীতি প্রগাঢ় করে তুলত। তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল না, ছিল সহযোগিতা। কিন্তু আজ আমরা পরস্পর হিংসায় জ্বলে মরছি, একে অপরের স্বার্থ বিষচক্ষে দেখছি,—প্রতিযোগিতায় অসহিষ্ণুতা, অশান্তি ও চাঞ্চল্য এসে আমাদের সকল শান্তি ও কল্যাণের পথ কন্টকাকীর্ণ করে তুলছে।

আমরা সহযোগিতার কথা ভুলে গেছি। তাই আজ আমি তোমাদের অনুরোধ করি, তোমরা আবার নূতন করে রামদাদা ও করিম চাচার পত্তন কর, তাদের মৈত্রীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর, মুসলিম যুবকগণকে সহযোগী করে তোল—তোমাদের জ্ঞান ও শিক্ষা দ্বারা।

তোমরা মুসলিম যুবকগণের অগ্রজ। তোমাদের পরিবেষ্টন আমাদের চেয়ে ঢের উন্নত ও প্রেরণাদায়ক। তোমাদের পূর্বপুরুষগণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা বর্তমান যুগের জ্ঞান-গুণ অর্জন করবার জন্য প্রথম সুযোগ নিয়ে শিক্ষা ও জ্ঞানের পরিবেষ্টন ও আয়তন অনেক উন্নত করেছেন,—তার মধ্যেই তোমাদের জন্ম হয়েছে। আর মুসলিম যুবকগণের পরিবেষ্টন কি? তারা এই প্রথম শিক্ষায় মন দিয়েছে। তারা কত পিছনে। তোমরা আট বৎসরে যা শিখবে—তোমাদের বাপ-দাদা-আত্মীয়-স্বজনের চর্চা ও কালচার দেখে, মুসলমান ছেলের তা আয়ত্ত করতে অন্তত চৌদ্দ বৎসর লাগবে। তা ছাড়া, দারিদ্র্যের জন্য তাদের মনে স্ফূর্তি না থাকায় তারা তোমাদের মত সহজে স্বচ্ছন্দ-গতিতে ফুটতে পারে না। এটি তোমাদের অগ্রজের সহানুভূতি ও দরদ দিয়ে বুঝতে হবে এবং সেই অনুসারে তাদের প্রতি ব্যবহার করতে হবে। তা হলেই তোমরা তাদের সঙ্গে করে নিতে পারবে, তা হলেই তোমাদের অগ্রজের মত কাজ করা হবে। কিন্তু যদি তোমরা তোমাদের শিক্ষা ও জ্ঞান, পরিবেষ্টন ও মার্জিত রুচি ও সভ্যতার অহঙ্কার ব্যবহার কর, তাহলে তারা মনে অত্যন্ত চোট পাবে। সেটা হয়ত তারা প্রকাশ করতে পারবে না। কিন্তু জাতির বিকাশের ইতিহাসে তা লেখা থাকবে। সেই ব্যথা দেওয়ার ফল হয়ত বিশ্বপ্রভু একদিন একটি না একটি উপায়ে ফলিয়ে তুলবেন। জগতের ইতিহাস উত্থান-পতনের ইতিহাস। অহঙ্কার, মানুষের প্রতি দুর্ব্যবহার সেই বিশ্বস্রষ্টার দরবারে লেখা থাকে। তিনি সমানভাবে মুচি-মেথর হতে আরম্ভ করে গৌরকান্তি ব্রাহ্মণ পর্যন্ত সকলকেই তাঁর অপার স্নেহের অধিকারী করেছেন। আমাদের সকলকেই সেই ভগবানের গুণকে অনুকরণ করবার চেষ্টা করতে হবে। মুসলিম ভগবানকে রহমানুর রহিম বলে—অর্থাৎ 'তিনি দয়ার সাগর, তিনি তাঁর দয়া দিয়ে মানুষকে ফলিয়ে তোলেন।' আমাদের ধর্মের আদেশ—আমাদেরকে সর্বদাই ঐ করুণার attitude (ভাব) করতে হবে ; তা হলে কারও প্রতি ঘৃণা হবে না। তোমাদেরও আমি ঐ attitude অবলম্বন করতে অনুরোধ করি। তোমাদের কর্তব্য—অগ্রজের মত কনিষ্ঠ মুসলমান ভাইকে হাত ধরে টেনে তোলা।

তোমরা নানা পুস্তক, বক্তৃতা ও আলোচনার ভিতর দিয়ে মুসলমান সম্বন্ধে অনেক অতিরঞ্জিত মিথ্যা সংবাদ পেয়ে থাক। সেজন্য অনেক সময় মুসলমানের প্রতি তোমাদের মনের মধ্যে একটি বিজাতীয় বিদ্বেষ জমে ওঠে। এ-ধারণা নিতান্ত মারাত্মক। তোমরা মুসলমানের সঙ্গে মিশতে চেষ্টা কর ; তাদের ধর্ম শাস্ত্র বা ইতিহাসের মর্ম কিছু কিছু অবগত হয়ে সে-ধারণা সত্য কি মিথ্যা, তা পরীক্ষা করবার চেষ্টা করবে। সত্যকে উদ্ধার করবার জন্য তোমাদের আকাঙ্ক্ষা যেন দিন দিন প্রখর হয়। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের মত, প্রকৃত বিচারকের মত সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করে সত্যকে উদ্ধার করবে। তা হলেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি জমে ওঠবে।

মুসলিম যুবকগণের প্রতিও আমার এই উপদেশ। তোমরা যেন অনর্থক মৌলবি-মৌলানাদের বক্তৃতা শুনে হিন্দুকে কাফের বলে তার মনে আঘাত দিও না। তাদের ইতিহাস ও কালচারের প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধা হোক—এই প্রার্থনা করি। হিন্দুর ইতিহাস, জ্ঞান, তপস্যা ভারতের মানুষের সৃষ্টি বলে তোমাদেরও গৌরবের বস্তু। সে ইতিহাসে হিন্দু যেমন গর্বিত, তোমরাও হতে তেমনি গর্বিত। কারণ সে ইতিহাসও আমাদের বিশ্বপ্রভু খোদার সৃষ্ট মানুষের সৃষ্টি। মানুষ মাত্রই আমার ভাই। সুতরাং হিন্দুর সঙ্গে তার সৃষ্টিরও আমি সমান উত্তরাধিকারী। তাকে শ্রদ্ধা না করলে তোমরা নিজেদের শ্রদ্ধা বাড়াতে পারবে না। পুনরায় বলি, হিন্দু তোমাদের ঘৃণা করেন, তার কারণ তোমরা এমন কিছু করছ না—যাতে তাঁরা তোমাদের শ্রদ্ধা করতে পারেন। তোমাদের ইতিহাস তোমরা লিখছ না, তোমাদের ধর্মজীবন ধর্মাদেশ-মোতাবেক সুন্দর করছ না, তোমরা জ্ঞানর্চচা করছ না, তোমরা তোমাদের স্বাস্থ্য ও সম্পদ বৃদ্ধি করবার জন্য কোন চেষ্টা করছ না, তোমাদের ব্যবহার ও শ্রী সন্তোষজনক ও ভদ্র করছ না,—তবে কেমন করে হিন্দু বা ইংরেজ তোমাদিগকে শ্রদ্ধা করবেন?

এস্থলে হয়ত শিক্ষক ও অভিভাবকগণের প্রতি দু-একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমাদের দেশের রাষ্ট্রসমস্যাই আজ দেশের নায়কগণকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। কিন্তু রাষ্ট্রসমস্যার পূর্বে আমাদের সমাজ-সমস্যার মীমাংসা হওয়া চাই। সমাজ-সমস্যা মীমাংসা করতে হলে প্রথমে 'একমন' তৈরি করা চাই। হিন্দু-মুসলিম যুবকগণের মন এক করতে হবে। এই এক করার ভার শিক্ষকদের উপর। উভয়কে সংস্কারমুক্ত করে উভয়কে দেশের স্বাধীনতা ও স্বার্থের জন্য অনুপ্রাণিত করবার দায়িত্ব শিক্ষকগণকে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা-আয়তনের মধ্যে নানাপ্রকার খেলাধূলা, সমাজসেবা, শিল্প ও কাজের ভিতর দিয়ে হিন্দু-মুসলিমকে সমানভাবে চালিত করতে হবে—তবে তারা সহজেই 'একদিল' ও সহযোগী হয়ে ওঠবে। শিক্ষক ও অভিভাবকগণকে এ বিষয়ে মন খুলে যুবকগণকে নিঃসঙ্কোচে সেবা ও জ্ঞানর্চচার ভিতর দিয়ে মিশতে দিতে হবে।

শেষ কথা আমার যুবক বন্ধুগণের প্রতি। বন্ধুগণ। তোমরা এই সোনার বাঙলার সুকুমার সন্তান। এই বাঙলার সম্পদ বিদেশীর হাতে,—আর আমরা তাদের গদিতে দাসখত লিখে বসেছি। আমাদের বাঙলার বুকের রক্ত দিয়েই লিপটন, হোয়াইটওয়ে, র‍্যালি ব্রাদার্স, জহরমল, ম্যাদান। আর কতকাল আমরা দাস হয়ে, চিনির বলদ হয়ে থাকব? আর এদিকে গদি গেল, জমি গেল, অন্যান্য সম্পদের ভাণ্ডার সব ফুরিয়ে উঠল—তার আর পূরণ হচ্ছে না। এই পূরণ করবার ভার তোমাদের উপর।

হিন্দু-মুসলমান মারামারি কাটাকাটি করে মরছে; কিন্তু সে মারামারি কাটাকাটি কমাবার ভার তোমাদের উপর। তোমরা যদি আজ নূতন সমাজ গড়বার জন্য বদ্ধপরিকর না হয়ে ধর্মান্ধ সংস্কার-পীড়িত ব্যক্তির প্ররোচনায় একেবারে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে বস, তা হলে অচিরে আমরা সেই স্কটল্যাণ্ডের কেলক্যানি বিড়ালের মত পরস্পর উদরসাৎ করে সর্বস্বান্ত হব। হিন্দু মুসলমানকে মেরে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করবে, এ ধারণা যেমন মিথ্যা, হিন্দুকে মেরে মুসলিম রাজত্বের পুনরুদ্ধার করতে হবে, সে ধারণাও তেমনি মিথ্যা। এই

ধারণার বিড়ম্বনা হতে উদ্ধার পেতে হলে তোমাদের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তোমরা প্রতিজ্ঞা কর—আমরা এ দেশের মানুষ, আমরা মানুষের কল্যাণ চাই। ধর্মের নামে অধর্মের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করছি। হিন্দু ও মুসলিম উভয়কে মিলে আমাদের সোনার বাঙলার শ্রী ফিরাতে হবে। আমরা সেবা, প্রীতি ও জ্ঞানের ভিতর দিয়ে একদিল হব। মানুষের সৃষ্টি ও দান আমাদের গৌরবের বস্তু। দিকে দিকে দেশে দেশে মানুষ যে যেখানে যা করেছে, তার উত্তরাধিকারী আমরা। আমরা ভবিষ্যতের জন্য আমাদের সৃষ্টি ও প্রীতি দিয়ে নব সমাজের ভিত্তি গড়তে চাই। আমরা চাই মানুষের মুক্তি—তারপর মাটির মুক্তি। "বিশ্বপ্রভু! আমাদের জ্ঞান ও মনের মুক্তি দাও—আমাদের দৃষ্টি পরিষ্কার কর—আমাদের জ্ঞানকে প্রখর করে তোল।"

প্রার্থনা করি, হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠফল হিন্দু-যুবক ও মুসলিম সমাজের শ্রেষ্ঠ ফল মুসলিম-যুবক এসে মিলিত হয়ে অচিরে বাঙলার তীর্থক্ষেত্রকে সার্থক, সফল ও গৌরবময় ক'রে তুলুক।

বার্ষিক সওগাত, দ্বিতীয় বর্ষ, ১৩৩৪

‘মতিচূর’

[গ্রন্থ–সমালোচনা]

[প্রথম খণ্ড]

মিসেস আর. এস. হোসেন প্রণীত। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান—সাখাওয়াত মেমোরিয়েল গার্লস স্কুল, ৮৬/এ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উওম, ১০১ পৃষ্ঠা, মূল্য : এক টাকা চার আনা।

আমাদের দুর্গতির আরম্ভ যে কোথায়, তাহাই লেখিকা তাঁহার প্রাঞ্জল সুরুচিসদ্ভাবপূর্ণ, দৃষ্টান্তবহুল সরল অকপট মাধুর্যময় রচনা দ্বারা দেখাইতে যাইয়া স্বকীয় বেদনার অনুভূতিকে প্রতি ছত্রে ছত্রে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। লেখিকা বঙ্গীয় মোসলেম নারী সমাজের আদর্শ। তাঁহার অবরুদ্ধা ভগিনীগণের দুরবস্থা দেখিয়া তাহাদিগকে জ্ঞান, শিক্ষা, নীতি, কর্ম ও স্বাধীনতায় প্রবুদ্ধ করিবার জন্য তিনি এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। পুরুষের নিদারুণ স্বার্থপরতা শাসন-নীতি ও কঠোর পশুশক্তির বলে নারীকে যে কিরূপ জঘন্য জীবন বহন করিতে হইতেছে, আর তাহাতে যে সমাজ ও দেশের কত অকল্যাণ ও অমঙ্গল ঘটিতেছে তাহাই অতি সংযত ভাষা ও কোমল শ্রদ্ধার সহিত লেখিকা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। পুরুষ প্রকৃত সৌভাগ্য–সম্পদ ও সুখ চাহিলে, তাহার মন মস্তিষ্ক ও জ্ঞানকে মঙ্গলের পথে চালিত করিতে হইলে, নারীকেও সমভাবে জ্ঞান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য অর্জন করিতে হইবে। লেখিকা নারীসুলভ সঙ্কোচের সহিত পুরুষের দোষ দেখাইয়াছেন।

পুস্তকে তিনি পুরুষের বিরুদ্ধে এমন কিছুই বলেন নাই যাহাতে পুরুষেরা আপত্তি করিতে পারে। আমার মনে হয় পুরুষের অপরাধের তুলনায় তাহাদিগকে তদপেক্ষা আরও অধিক কশাঘাত করা উচিত ছিল। কিন্তু লেখিকার মাহাত্ম্য ঐ স্থলে প্রকাশ পাইয়াছে বেশি, তিনি ভগিনীগণের ত্রুটিই বেশি করিয়া দেখাইয়াছেন, পুরুষকে কেবল অঙ্গুলি দ্বারা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন মাত্র। আজ ভারতের নারীসমাজ এত অবনতির অতলতলে পড়িয়া গিয়াছে কেন? তাহার একমাত্র কারণ পুরুষ। পুরুষ নিজের সুখ-স্বার্থের ষোল আনা পুরামাত্রায় আদায় করিয়া লইয়া, নারীর ঘর শূন্য করিয়া দিয়াছে। ইহা পশুশক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন। নারীকে অজ্ঞ, মূর্খ, প্রিয়বস্তুটি করিতে গিয়া পুরুষ যে কি বিষম ফল লাভ করিয়াছে ও করিতেছে তাহা আজও তাহার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।

নারী মাতৃরূপিণী। এক জননী একশত শিক্ষকের অপেক্ষা অনেক বড়। জননী গৃহের সর্বময় কর্ত্রী। তিনি গৃহের রানী, আর গৃহই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রথম শিক্ষাক্ষেত্র ; এই গৃহে শিশু যে আদর্শ, শিক্ষা, সংস্কার, ধারণা ও কল্পনা প্রাপ্ত হয়, তাহা যাবজ্জীবন তাহার চরিত্র,

মন, কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। ইহাতে আর দ্বিমত হইতে পারে না। এমতাবস্থায় গৃহজননী জ্ঞানে গুণে বিভূষিতা না হইলে শিশু তথা ভবিষ্যত মানুষকে কে গঠন করিবে? স্বাস্থ্য, শরীর ও মন প্রাপ্ত হইতে হইলে সু-নারী আবশ্যক। এই সরল কথাটি যে আজও কেহ বুঝিতে চাহিতেছেন না কেন, মাননীয়া মিসেস হোসেন সেই চিন্তায় আকুল হইয়া এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তিনি নারীর সুখ-স্বার্থ ফিরাইতে চাহিয়া যে, পুরুষের কত উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিতে যাইতেছেন সেজন্য তাঁহার নিকট ভবিষ্যতে পুরুষ সমাজ বিশেষত বঙ্গীয় মোসলেম পুরুষ সমাজ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে। পুস্তকখানি নারীকে তাহার ক্ষতস্থান চোখে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিবে, তাহার আত্মশক্তিকে জাগ্রত করিবে, শৃঙ্খলা ও জ্ঞানের মর্যাদা বুঝাইয়া দিবে, স্বামীকে প্রভু বলিতে ভুলাইবে, স্বাধীনতা দ্বারা দাম্পত্যজীবনের মাধুরী ও আনন্দ যে কত গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা অজ্ঞ নারীকে বুঝাইয়া দিবে ও অষ্টম বর্ষ বয়স হইতে নারী যে সংস্কার জ্ঞান পুতুলঘরের মধ্য হইতে বহন করিয়া আনে, স্বামীকে দেবতা-জ্ঞানে অন্ধ পূজার উপহার দিতে শিখে, তাহা ভুলইয়া দিয়া মার্জিত জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক ও আত্মার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা কাহাকে বলে তাহা শিখাইয়া দিবে। মিসেস হোসেন "সু-গৃহিণী", "গৃহ", "অর্ধাঙ্গী" ও "স্ত্রীজাতির অবনতি" প্রবন্ধে নারীর সুজ্ঞান কিরূপে জন্মিতে পারে, তাহা দেখাইতে গিয়া চমৎকার সফলতা লাভ করিয়াছেন।

অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলির মধ্যে "বোরকা" ও "নিরীহ বাঙ্গালী" পড়িতে বেশ আমোদ পাওয়া যায়। "বোরকা" নূতন অর্থ বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিয়া লেখিকা আমাদের অনেক কৌতূহলের তুষ্টি সাধন করিয়াছেন। হয়ত আমি তাঁহার সকল কথায় সায় দিতে পারি না, তবে তাঁহার নূতন অর্থ বেশ লাগিয়াছে। "পিপাসা" প্রবন্ধে ব্রহ্মাণ্ডের অণুপরমাণু চরাচর জীবাণু জীবের মধ্যে খোদাপ্রাপ্তির পিপাসা বিদ্যমান দেখিতে পাইয়া লেখিকা অসীমের জন্য স্বীয় তৃষ্ণার পরিচয় দিয়াছেন। সে অত্যন্ত আধ্যাত্মিক কথা। আমরা প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩২৮

শেখ আন্দু

[গ্রন্থ-সমালোচনা]

শ্রদ্ধেয় ঘোষজায়ার "শেখ আন্দু" পাঠ করিতে করিতে কামনা-বাসনা-নির্লিপ্ত প্রবৃত্তি-চরিতার্থ জনিত ভোগসুখে বিগতস্পৃহ আন্দুর জীবনের প্রতি তন্ত্রীর বিচিত্র খেলার ভূমি যখন ত্যাগ করিলাম, তখন আত্মস্থ হইয়া দেখি পুস্তকখানি শেষ হইয়া গিয়াছে। আন্দুর অফুরন্ত শক্তিকে নানাবিধ দুর্বলতার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া জয়ের গৌরবে মণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে লেখিকা একান্ত করিয়া শুধু তাহারই লক্ষ্যহীন জীবনকে প্রথমে মানুষের কল্যাণে ব্যয় করিয়া অবশেষে অসীমের সন্ধানে বাসনা-তৃষিত দুনিয়া হইতে ছুটি দিয়া সোয়াস্তি লাভ করিয়াছেন। স্নেহের আন্দুকে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় ইন্দ্রিয়-আসক্তি জনিত পাপ-বিড়ম্বনার কালিমায় কলঙ্কিত হইতে দেখা যে, তাঁহার পক্ষে ভয়ানক সাঙ্ঘাতিক! তিনি আন্দুকে জটিল সংসার সমস্যার মধ্যে লইয়া দুর্জয় প্রবৃত্তির আপাতমধুর 'সরু মোটা'য় জড়াইয়া যাইতে না দিয়া নিবৃত্তিলুব্ধ নিষ্ঠুর তৃষ্ণায় শুষ্কতালু করিয়া তুলিয়া একেবারে নিদারুণ মমতা হইতে ছিনাইয়া দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন। প্রবৃত্তিকে দমন করিবার কি কঠোর নিয়ম! বুভুক্ষু প্রবৃত্তিকে ক্ষুধার তীব্রানলে পুড়াইয়া খাক করিয়া আন্দুকে ভীষণ সংযম-তপস্যা ও ধর্মব্রত সাধন করিতে হইয়াছে শুধু কর্মের মধ্য দিয়া। নিবৃত্তির পথ চিন্তা কবিবার জন্য সে জীবনের এক মুহূর্তও ব্যয় করিতে চায় নাই। আজীবন স্বকীয় শক্তিকে মানুষের অভাব মোচনে নিষ্কামভাবে নিয়োজিত করিয়া সে সকল তৃপ্তি ও সকল আনন্দ লাভ করিয়াছে। প্রতিদান, প্রত্যুপকার, পুরস্কার, উপহার ও প্রশংসার কণামাত্র সে প্রত্যাশা করে নাই। জীবন ব্যাপিয়া সে কত না প্রশংসার্হ কাজ করিয়াছে, কিন্তু সকল পুরস্কারকে সে নম্রমেদুর সংযমমধুর সন্তোষের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। মেমসাহেবের পুরস্কার-প্রস্তাব ও পুলিশ সাহেবের প্রাণরক্ষা আন্দুর জীবনের নিষ্কাম কর্মপ্রেরণা ও কর্মসাধনার জলজীবন্ত দৃষ্টান্ত। ঈদৃশ ক্ষুদ্র-বৃহৎ কর্ম ও সাফল্যের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আন্দুর জীবনকে বাস্তবিকই প্রবৃত্তির সহিত যুযুৎসুমান নিবৃত্তিকামী যুবকগণের পক্ষে বৃহৎ আদর্শ করিয়া তুলিয়াছে।

প্রবৃত্তির পেলব পরশ আন্দুর হৃদয়কে আলস্য আবেশে ঘিরিবার উপক্রম করিতেই আন্দু তাহার শরীরের সকল শক্তিকে একত্রিত করিয়া সবল স্ফূর্তির সহিত সংসারের তুচ্ছ মায়া, মমতা, স্নেহার্দ্র বেদনাকে উপেক্ষা করিয়া দিব্য আনন্দের উৎসাহে ক্ষুদ্র নিকৃষ্ট দুর্বলতার মস্তকে পদাঘাত করিয়া জীবনের নির্মল কর্ম-প্রচেষ্টা ও অসীম আত্মবলকে সতত অক্ষুণ্ণ ও নিরন্তর সজাগ রাখিবার জন্য ক্ষণেকের অবহেলাকে দূরে সরাইয়া দিয়া অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের অজানা অচেনা অন্ধকারে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। আত্মীয় বন্ধু গৃহস্থিতিবিহীন আন্দুর পরিণাম

নিয়ত আল্লার হাতে ছাড়িয়া দিয়া সে তাহার আত্মাকে সযত্নে সকল চৌর্যবৃত্তির হস্ত হইতে অর্গলরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। পাছে কোন কলুষ কোন অশুচিতা ছিদ্র পাইয়া অন্তরের মধ্যে অলক্ষ্যে প্রবেশ করিয়া নির্মল আত্মাকে রহিয়া রহিয়া তুষের আগুনের মত খাইয়া ফেলে, এই ভয়ে আন্দু বিপদের ইঙ্গিত পাইয়াই নিজেকে দূরে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। আপনার সকল শক্তি ও সকল সংযমব্রতে বিশ্বাসপরায়ণ হইলেও সে কখনও প্রবৃতি লইয়া খেলা করিয়া সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার প্রলোভনে মুগ্ধ হয় নাই, কিংবা উদ্দাম প্রবৃতিকে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে দিয়া নিজেকে তাহার মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া 'বাহাদুরি' লইতে চায় নাই। তাহার জীবনের উপর একটা সরল বিশ্বাস অপ্রতিহতভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, "প্রবৃতি ও আসক্তি অতি ক্ষুদ্র সরল হইলেও তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। প্রবৃতির সঙ্গে যুঝিয়া বীর চরিত্রের খেতাব লইবার আকাঙ্ক্ষা করা নিতান্তই মূঢ়তা। প্রবৃতির অগ্নি একবার জ্বলিলে কয়জন তাহা হইতে অক্ষত শরীরে ফিরিতে পারে!" এই মন্ত্রে দীক্ষিত আন্দু যেখানেই উতেজনার সূত্রপাত শুরু হইতে দেখিয়াছে, প্রবৃতির লেলিহান জিহ্বা অতর্কিতভাবে মেলিয়া যাইতে চাহিয়াছে ও নিবৃতি উন্মুখী সকল উদ্যম ও প্রফুল্ল কর্ম স্ফূর্তিকে বিবশ হইতে দেখিয়াছে, সেখান হইতে তন্মুহূর্তেই সবেগে সমস্ত স্নেহ, মমতা ও কর্মসাফল্যের সুযোগ সুবিধাকে পায়ে দলিত করিয়া একেবারে মুক্তির পথের পথিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন স্থানেই তাহার স্থির লক্ষ্যের সাধনা ও সিদ্ধিলাভের এতটুকু আশার ক্ষীণালোক পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। দুনিয়াতে নিঃসহায় আন্দু স্বাধীনতাকে চরম করিয়া নিয়োগ করিবার জন্য সতত উদ্বিগ্ন। যখনই যেখানে আন্দু তাহার স্বাধীনতাকে খর্ব হইতে দেখিয়াছে, তখনই সে সেখানকার যাবতীয় সম্বন্ধ চুকাইয়া দিয়া বিভিন্ন পথে তাহার প্রাণের স্বাধীনতার পূর্ণ ব্যবহার-মানসে নিশ্চিন্ত মনে অগ্রপশ্চাত চিন্তা না করিয়া স্বাবলম্বনকেই সার করিয়া দুনিয়ার বুকে নিজেকে ছড়াইয়া দিয়াছে। দুনিয়ার কোন সম্পদ সুখ, স্বার্থ আশার কুহেলিকা ও নিবৃতির মরীচিকা তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই।

যাহা সুলভ তাহার জন্য আন্দু কোন চেষ্টা করে নাই। দুর্লভের পশ্চাতে নিজেকে ছুটাইয়া সে তৃপ্তি পাইত। দরিদ্র দর্জি পিতার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া পুরাতনের নূতন সংস্করণ করিতে তাহার অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। বাল্যকালে সাধু পিতার আদর্শে ও তাঁহার প্রদত স্বাধীনতাকে সুচারুরূপে ব্যবহার করিয়া সে নানা শিক্ষালাভ করিয়াছিল। লেখাপড়া, চিত্রবিদ্যা, মটরগাড়ি চালনা ইত্যাদি বিচিত্র শিক্ষা দ্বারা সে নিজেকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার উপর পিতার চরিত্র-মাধুর্য ও হৃদয়ের গুণ সবটুকুই সে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সে সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিয়া ফারসি ও চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়াছিল, কিন্তু গুরুর প্রশংসা তাহাকে শিক্ষার মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। ভবিষ্যতে মস্ত নামজাদা হইবার আশার ইঙ্গিত পাইয়া সে যেন নিজের অবনতির সূচনা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। আরাম আয়েশের জন্য বিদ্যাশিক্ষা সে করিতে চায় নাই। অমিত শক্তি শৈশব হইতে তাহার শরীরে বিদ্যমান। এই শক্তিকে বৃথা আয়েশের জন্য নিষ্ফল করিয়া রাখা তাহার স্বভাবের বিরুদ্ধে।

ইহার সুব্যবহার করাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য—ইহাই তাহার মনে হইল। পিতার অনাবশ্যক কঠোর শাসনের মুখ আন্দু কখনও দেখে নাই। মাতৃহীন আন্দু স্বভাব-নির্মল কোমল-হৃদয় পিতার স্নিগ্ধ স্নেহে সিক্ত হইয়া ন্যায়ের পথে শৈশব হইতেই চালিত হইয়াছিল। বাধা বিঘ্ন না পাইলেও আন্দু স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল হইতে পায় নাই। পিতার আদর্শ তাহাকে এমনই সুপথে তুলিয়াছিল। অতি অল্প বয়সেই সে খোদা-সান্নিধ্য লাভের পথের সন্ধান পাইয়াছিল। সেই অবধি সে নিজেকে সেই দিকেই দুনিয়ার পৃষ্ঠে কোন সম্পর্ক না রাখিয়া ভাসাইয়া দিবে, এরূপ সঙ্কল্প করিয়া বসিয়া ছিল বলিয়া মনে হয়। সারাটি জীবন সে ঐ লক্ষ্যের পানে হৃদয়কে উন্মুক্ত ও জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছিল। যখনই লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার উপক্রম করিয়াছে তখনই সে নিষ্ঠুর আঘাতে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। অচিরেই পিতৃহীন হইয়া পিতৃব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবনের কটা দিন কাটাইতে বসিবে এমন সময় চৌধুরী সাহেবের বাড়ির মটরচালক হইয়া ঢুকিল।

বড় সাধের চৌধুরী সাহেবের বাড়ি। দরিদ্র মুসলমান ভৃত্যরূপে প্রবেশ করিয়া হিন্দুর ঘরে স্নেহ সমাদরের মধ্যে পরাধীনতার বিড়ম্বনা কোনদিনই বুঝিতে পারে নাই। আন্দু সামান্য ভৃত্য হইলেও সে মানুষ ছিল ; মানুষের আত্মায় সে ভরপুর ছিল—চৌধুরী সাহেবও মনুষ্যত্বের সাক্ষাত প্রতিমূর্তি ছিলেন। কাজেই মনুষ্যত্বের মহামিলনক্ষেত্রে আন্দু ও চৌধুরী সাহেব গলাগলি হইয়া দাঁড়াইয়া মানবতার প্রেমে ও সৌন্দর্যে উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া জাতি-ধর্মের সঙ্কীর্ণতাকে উপহাস করিতেছেন। আন্দু আর যবন ম্লেচ্ছ নয়—চৌধুরী সাহেবও সঙ্কীর্ণচেতা হিন্দুর নিষ্ঠাগর্বে স্ফীত উদ্ধত নন। চৌধুরী সাহেবের উদার মাহাত্ম্য-কিরণে তাঁহার সারা বাড়িটা উদ্ভাসিত।

আন্দুও তাহার স্বভাবসুলভ করুণা, স্নেহ, ভক্তি, কর্মস্পৃহাকে সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে সংহত করিয়া মোসলেম অন্তঃকরণের অমিয় ধারায় সিঞ্চিত করিয়া চৌধুরী সাহেবের সব কিছুকে আপনার করিয়া তুলিয়াছিল। সেখানে ঘৃণা-বিদ্বেষ ও দৈন্যপীড়িত করুণ প্রার্থনা স্থান পায় নাই। তুচ্ছ সংস্কারের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করিয়া চৌধুরী সাহেব স্বর্গীয় মহা ঔদার্যের পূর্ণ হিন্দুত্বের পরিচয় দিয়া আন্দুকে আপনার গভীর গোপন-রাজ্যের নিতান্ত আত্মীয় বুঝিতে পারিয়া তাহাকে সকল স্নেহে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রচলিত হিন্দুত্বের নিষ্ঠুর সংস্কারের নিদারুণতায় মোসলেম সম্প্রদায় হিন্দুর নিকট চিরদিনই ক্ষুদ্র নোংরা ম্লেচ্ছ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, তাহার নিছক ভ্রম লেখিকা চৌধুরী সাহেবের আদর্শ দ্বারা বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। হিন্দুর অন্তরে মোসলেমের স্থান দিয়া তিনি কি মনোরম চিত্র না অঙ্কিত করিয়াছেন ! শত কলহবিদীর্ণ দীন ভারতে হিন্দু মোসলেম কতদিনকার প্রতিবেশী, কিন্তু তবু উভয় সম্প্রদায় পরস্পর কত অনাত্মীয় কত বিদেশীর মত আচরণ করিতেছে, ইহা যে কোন ভবিষ্যতের সুপ্রভাতে মুছিয়া যাইবে তাহা খোদাই জানেন। ধর্মের নামে অনুষ্ঠানের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া কেহই কাহারও স্বরূপ চিনিতে পারিতেছে না। মনুষ্যত্বের মিলন-ক্ষেত্রে যে উভয় জাতি বন্ধুত্ব ও প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া মনোরম সুষমাময় স্বর্গীয় পারিজাত কানন রচনা করিয়া ভারত-ভূমিকে শান্তি-সম্পদের আকর করিয়া তুলিতে পারে, তাহা মহীয়সী

ঘোষজায়া আন্দু, চৌধুরী সাহেব ও নৈষ্ঠিক দাদাজীর সম্মিলনের আদর্শ দ্বারা বাঙ্গালিকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। লেখিকার উদ্দেশ্য সফল হউক।

চৌধুরী সাহেবের বাচ্চা-কাচ্চা হইতে আরম্ভ করিয়া দাস-দাসী ভৃত্য সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই আন্দুর চরিত্র ও মহাপ্রাণের সংস্পর্শে যেন এক অভিনব আনন্দ স্ফূর্তিলাভ করিয়াছিল। আন্দুর নিয়ত কর্মলিপ্ত জীবন সকলকেই কর্মকুশল ও সৎস্বভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও পবিত্রতায় স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যে চৌধুরী সাহেবের বাড়ি ভরিয়া গিয়াছিল। শুধু চৌধুরী সাহেবের বাড়ি নয়, সারা ভাগলপুরের অলি-গলি আন্দুর জীবন-প্রবাহ অনুভব করিয়াছিল। আন্দু নিকৃষ্ট জীবে দয়া দেখাইতে পারিয়া ইসলামকে জয়যুক্ত করিয়াছিল। দুঃখীর দুঃখমোচন, অভাবগ্রস্তের অভাব নিরাকরণ, আর্তকে সান্ত্বনা দান আন্দু অহর্নিশি অযাচিতভাবেই সম্পন্ন করিয়াছিল। কিন্তু প্রিয় ভাগলপুর হইতে আন্দুর নির্লিপ্ত চিতে সকল হিসাব-নিকাশের দিন কবে হঠাৎ পৌছিয়া গেল, তাহা আন্দু ঠিক করিতে পারে নাই।

সেই নিশায় নীরব কক্ষে আন্দু ললিতার প্রস্তাবে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। ললিতার মানুষের হৃদয়, আন্দুও মানুষ—চরিত্রবান, স্বাস্থ্যবান, সুন্দর, গৌরকান্তি, প্রশান্ত, উজ্জ্বল, গম্ভীর-আকৃতি ও বিমল প্রকৃতি বিশিষ্ট। ললিতার তৃষিত জীবনের উচ্ছ্বাস কতদিকে কে জানে ঘনীভূত হইয়া সেই নিষ্ঠুর নিশীথে ক্ষুদ্র একটি প্রশ্নোতর-রূপে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। কে বলিবে ললিতা অপরাধী? এতদিনে অঋণী স্বাধীন সদাপ্রস্তুত জীবনকে এইবার ঋণ ও কঠোর হিসাবের দায়ে রুদ্ধশ্বাস হইয়া মরিবার আশঙ্কায় চমকিত ত্রস্ত আন্দু নিমেষের মধ্যে ইতিকর্তব্য স্থির করিয়া চৌধুরী বাড়ি হইতে তল্পি গুটাইতে বসিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সকল কর্তব্য সমাপ্ত করিয়া মুক্ত হালকা জীবনটাকে টানিয়া বাঁধিয়া স্নেহমমতার কঠোর বেদনাকে দু'হাতে চাপিয়া সে চৌধুরী-বাড়ির সকল ঋণ সেই নিঝুম নিশার মাত্র একটা তপ্ত নিঃশ্বাসের দ্বারা পরিশোধ করিয়া স্মৃতির সহিত দ্বন্দ্ব করিতে করিতে একটানা স্টেশনে আসিয়া উঠিল। এমনি একদিন দ্বিপ্রহরে ললিতার সখী জ্যোৎস্নার বৈধব্যমলিন স্থির গম্ভীর শুভ্রস্নাত মূর্তিকে হৃদয়ের কেন্দ্রস্থল হইতে অপসারিত করিবার জন্য আন্দু রমানাথের শ্মশানভূমি হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, সেকেন্দ্রাবাদের একটি প্রাণীও তাহা জানে নাই। চৌধুরী বাড়ি হইতে গুপ্ত বিদায় লইয়া সেকেন্দ্রাবাদের নিষ্ঠাবান সাধু জ্ঞানী উদার দাদাজীর চরণে আন্দু নিজেকে ঢালিয়া দিল। সে সংস্কৃত লিখিয়া সেই 'জাল্লাজালালুহু'র সন্ধান-পথ খুঁজিতে প্রবৃত হইবে—মক্কায় হজ্জ করিতে যাইবে, এই সমস্ত সঙ্কল্প লইয়া দাদাজীর আশ্রয়ে আন্দু পুনরায় কর্মের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিল।

সে পুলিশের কার্যে প্রবেশ করিল। স্বাবলম্বী হইয়া জীবন যাপন করিবার জন্য সে এই জঘন্য চাকুরী লইতে বাধ্য হইয়াছিল। দাদাজী আন্দুর পার্শ্বে প্রবল পর্বতের মত দণ্ডায়মান ছিলেন—আন্দুকে সকল দুর্বলতা, পাশবিকতার বাত্যা হইতে তিনি রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আন্দু স্বীয় কর্মতৃপ্তির মধ্যে নীচ কামনা যাহাতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে না পারে, তজ্জন্য, প্রাণপণ করিত। তাহার অনাহত অযাচিত পরোপকার-ব্রত

সেকেন্দ্রাবাদকেও ভাগলপুরের মত প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল। পুলিশের অত্যাচার, অবিচার, অনাচার ও ব্যভিচার দেখিয়া আন্দুর আত্মা অবিলম্বে ত্যাগপত্র প্রদান করিয়া শান্ত নিবিড় জীবনের উদ্দেশ্যে দাদাজীর স্নেহাশীর্বাদে ধৌত স্নাত হইয়া দাঁড়াইল। সে চিত্রকর হইল। শৈশবের চিত্রবিদ্যাশিক্ষা এইবার তাহার যথেষ্ট কাজে আসিল। চিত্রাঙ্কনে আপনাকে নিয়োগ করিতে গিয়া আন্দু জ্যোৎস্নার সঙ্গে পরিচিত হইল। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে আন্দু জ্যোৎস্নার মধ্যে ধমনী কম্পিত করিয়া যে কি অনির্বচনীয় প্রবৃত্তির প্রবল স্রোত বহিয়া গিয়াছিল, তাহা আলেমুল গায়েব বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু কেহ কাহাকেও মনোভাব ও চিতভৃষ্ণা বুঝিতে দেয় নাই। আন্দুর অনভ্যস্ত চিত একেবারে ভাঙ্গিবার উপক্রম করিল। দাদাজীর উপদেশে সে "ভাঙ্গাকে" যে আর রক্ষা করিতে পারে না। আন্দু তীর্থ যাইবার জন্য উদ্যত হইল। কিন্তু দাদাজীর অনুরোধে সে রমানাথের রোগে শুশ্রূষা ও শবদাহ দ্বারা সেকেন্দ্রাবাদের পর্ব শেষ করিয়া একেবারে জাহাজের সারেং হইয়া বসিল। সে আশ্বস্ত হইল। এইবার বুঝি দুনিয়ার সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়া অনন্ত নীলিমা জলরাশির বক্ষের তুফানে সে নিজকে ছাড়িয়া দিয়া সটান সেই "গফুরর-রহিমে"র চরণে গিয়া ঠেকিতে পারিবে। জ্যোৎস্নার চিন্তা যে মহাপাপ!

এদিকে জ্যোৎস্না অতীতের কত স্মৃতি খুলিয়া দেখিতে বসিল। চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে ললিতার ব্যাপার সে জানিত। আন্দুর ক্রিয়াকলাপ সে দেখিয়াছিল, বৈধব্যক্লিষ্টা নিরাভরণা জ্যোৎস্না মটরচালক আন্দু ও চিত্রকর আন্দুকে খুব ভিন্ন করিয়া দেখিল, দেখিল তাহার চিতের মধ্যে আন্দু মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আন্দু দেবীর মত তাহাকে শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে। তবু কোন গ্রহবৈলক্ষণ্যে এমন ধারা ঘটিয়া গেল। জ্যোৎস্না আন্দুকে অবজ্ঞা অবহেলার পাত্র করিয়া ঠেলিয়া দিতে পারিল না। সে যে মানুষ! আর আন্দু ছুটিয়া ভুলিতে গেল। তাহার নিষ্কলঙ্ক চিতের মাঝে কামনা-প্রবৃত্তির শয়তানকে সে কিছুতেই প্রবেশলাভ করিতে দিল না, ললিতার কথা ভুলিয়া আন্দু শান্ত হইয়াছিল—তাহার বিবাহিত ও অপত্যময় জীবনের মাধুরীতে আন্দু নির্ভাবনায় প্রগাঢ় শান্তি অনুভব করিয়াছিল।

আন্দু জ্যোৎস্নার বিদায় সম্ভাষণ করিতে পারে নাই। জাহাজের কর্মে নিযুক্ত সমুদ্রের মুক্ত হাওয়াতে আন্দু স্বাস্থ্য হারাইয়া বসিল। জ্যোৎস্নার স্মৃতি কি সে মুছিয়া ফেলিতে পারিয়াছিল? তবে কেন এই হৃদরোগ? আন্দু ফিরিয়া আসিল। লেখিকা এইবার আন্দুর শেষ ঋণটুকু আদায় করিয়া আন্দুকে এইবার দুনিয়া হইতে বিদায় দিবেন, জ্যোৎস্নার নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষা আন্দু জানিতে পারিল। তীর্থযাত্রী জ্যোৎস্না সেই অসীমের উদ্দেশ্যে সকল ব্যর্থতার বেদনা সহ্য করিয়া আন্দুর নিকর হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। আন্দুও দাদাজীর স্নেহাশীর্বাদ মাথায় করিয়া মক্কায় পথে ভাসিয়া গেল। বড় করুণ! বড় বেদনাময়!

আন্দুর জীবনে সাফল্য কোথায়? জীবন আরম্ভ করিয়াই পরের জন্য জীবন ব্যয় করিয়া নিজের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে জলাঞ্জলি দিয়া আন্দু মানব-চরিত্রের বিশিষ্ট দুর্বলতাকে জয় করিয়া সেই জাবারউল কাহহারের পথে সম্পূর্ণরূপে যাত্রা করাই তাহার উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিলেও সে ইসলামানুমোদিত পথে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে নাই। ইসলামের শরিয়ত

আব্দুর জীবনকে সমর্থন করিতে পারে না। আব্দুর জীবনের গৌরব কতখানি উচ্চ তাহা দেখিয়াছি কিন্তু ইসলামের দিক দিয়া ঈদৃশ জীবনের সার্থকতা কতদূর, তাহা দেখা বিশেষ প্রয়োজন। আব্দুকে প্রবৃত্তির প্রবল স্রোতের সমুখীন করিয়া যুঝিতে দিতে লেখিকা অত্যন্ত ভীত সঙ্কুচিত হইয়াছেন। পাছে আব্দু হারিয়া যায়। সংসারের নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বিবিধ দুর্বলতার সঙ্গে আব্দুকে যুঝিতে হয় নাই। সে স্বাবলম্বী। নিজ শিক্ষা ও শক্তি ব্যয় করিয়া আব্দু নিজের জীবন নির্বাহ করিয়াছে। তাহাকে সংসারী বলা যায় না। সংসার-লিপ্ততা যাহাতে জন্মে, তাহার কোনটিই স্থায়ীভাবে আব্দুর জীবনে দেখিতে পাই না। সে সংসারে গুটিকতক অভাবের সঙ্গে যুঝিয়াছে। সংসারের উপকরণ লইয়া খেলিতে খেলিতে আব্দু যদি এবংবিধ নির্লিপ্ততার পরিচয় দিতে পারিত—প্রবৃত্তির ঝঞ্ঝা হুঙ্কার গর্জনে আসিয়া যদি আব্দু ধীর স্থির থাকিতে পারিত—যদি সে প্রবৃত্তি-শয়তানের ভয়ে কাপুরুষের মত পলায়ন না করিত, তবে বুঝিতাম আব্দুর জীবন প্রকৃতই সফলতায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। যদি সে তাহার সকল শক্তি ও শিক্ষাকে পূর্ণরূপে নিয়োগ করিয়া অফুরন্ত সৌভাগ্যের মধ্যে নিজেকে রিক্ত করিয়া দিতে পারিত, তবে সে প্রকৃত মোসলেম হইত। প্রকৃত ইসলাম প্রবৃত্তিকে কঠোর কশাঘাতে দলিত মথিত করিয়া নিষ্পেষিত করিয়া দিতে বলিতেছে না। প্রবৃত্তির সমুখীন হইয়া মহাপুরুষ মুহম্মদ (দ)-এর পূণ্য নীতির অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ও খোদার আদেশ-রূপ বর্ম পরিবৃত হইয়া সংগ্রামের নিবৃতির মধ্য দিয়া প্রবৃত্তিকে পরাজিত করিয়া শরিয়তকে রাখিতে পারিলে প্রকৃত মোসলেম হওয়া যাইবে। কিন্তু প্রবৃত্তির ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়া দুর্বৃত্ত ইন্দ্রিয়কে নিষ্ঠুর সংযমব্রত দ্বারা দমন করিবার জন্য সংসার ত্যাগ করিতে ইসলাম কোনমতেই রাজি হইতে পারে না। সে ত সহজ ব্যাপার। ত্যাগী সন্ন্যাসীর ব্রত ইসলামের কঠোর কর্মতৎপরতার মধ্যে স্থান পায় না। আব্দুর সবল কর্ম্মস্পৃহা ও প্রতি মুহূর্তে পরের জন্য অর্থ, স্বার্থ, সুখকে অকুণ্ঠিতচিতে নিয়োগ করিতে সতত উদ্বিগ্নতা সম্পূর্ণ ঐসলামিক। কিন্তু ইহাকে সংসারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত না করিয়া সে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া ছুটিয়া বেড়াইয়াছে, ইহাতে আব্দুর মোসলেম-জীবন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারের মধ্য দিয়া আব্দু নিজেকে সুন্দররূপে গঠিত করিয়া তুলিতেছিল, হঠাৎ তাহাকে সংসারবিতৃষ্ণ করিয়া তুলিয়া প্রবৃত্তির প্রচণ্ডতার আশঙ্কায় সরাইয়া দিয়া লেখিকা আব্দুকে বিজয়-গৌরবে মণ্ডিত করিতে যাইয়া আব্দুর আন্তরিক দুর্বলতাকে হয়ত অজ্ঞাতসারে এমনি করিয়া বিকশিত করিয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে আমার বাস্তবিক অন্তরে কষ্ট বাজে। তাহার অনুপম অনন্যসাধারণ শক্তি উৎসাহ কর্ম্মস্পৃহা সমাজের বৃহৎ মঙ্গলে ব্যয়িত হইতে দেখিতে পাইলে প্রাণটা নিষ্ফল জীবনের কারুণ্যে এতখানি মুসড়িয়া না পড়িয়া যেন পরিপূর্ণ সাফল্যের খুশীতে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিত। জ্যোৎস্নার কামনা-লালসাপূর্ণ জীবনকে তীর্থের মন্ত্রপূত জলে বিধৌত করিবার আশা যে কতখানি ফলবতী হইয়াছিল বলিতে পারি না। তবে ইসলামের নীতি অনুসারে ক্ষুধানির্জীব ক্লান্ত সুপ্ত ক্ষিণ্ন আঘাতপ্রাপ্ত কামনাকে বুকের মধ্যে রাখিয়া অক্লান্তশ্রমী পরোপকারব্রতপরায়ণ যুবক আব্দুর তীর্থ যে একেবারে বিফল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইসলামের শরিয়তই বড়। স্থির লক্ষ্যে মানব-সেবা ও মানব-মঙ্গলই জীবনের

মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহারই স্নিগ্ধ শীতল সমীরণের আবর্তনের মধ্যে মানব-জীবন-তরীকে পরিচালিত করিতে হইবে। দুঃখ-শোক, মর্মপীড়া, দুর্বৃতি, ইন্দ্রিয়াসক্তি একাধারে স্থির জীবনের চক্রের তলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিনষ্ট হইয়া যাইবে, আর মানব স্বর্গীয় জ্যোতি শীর্ষে পরিধান করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে, তবেই মোসলিম জীবন ধন্য !

গ্রন্থের বিশেষত্বের মধ্যে স্বার্থ প্রথম চোখে পড়ে। তাহার রচনার মাধুর্য ও প্রাঞ্জলতা, গাম্ভীর্য এবং ভাবের ঔদার্য ও প্রসারতা—সুরচনা ও সুনীতির সৌরভে পুস্তকখানি ভুর ভুর করিতেছে। আন্দুর কথা লেখিকা কোন পৃষ্ঠাতেই ভুলিতে পারেন নাই। স্নেহের পুত্তলি, নয়নের মণি ও আদরের ননি আন্দুকে এক নিমিষের জন্য ছাড়িয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। আন্দুর চরিত্রকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহার এমন মমতা, কঠোর উদ্বিগ্নতা। আন্দুর চরিত্রের মধ্যে কৃষ্ণ তুলিকার দাগ দিতে দিতে উঠাইয়া লইয়াছেন। বোধ হয় ভুল করিয়াই দুর্ভাগা তুলিটা হাতে উঠিয়া গিয়াছিল। আন্দুর উপর তীক্ষ্ণ নিবিড় দৃষ্টি নিপতিত, ওদিকে তুলির ক্ষীণ আঁচড় পড়িতেই চিত্রকরের চৈতন্য হইয়াছে—ভয়চকিতে সরাইয়া দিয়াছেন। শুধু শুভ্র রঙে চিত্রিত আন্দু দর্শকের নয়নে বড়ই জ্বলজ্বল করিতেছে।

আর একটা বিশেষত্ব এই যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা-বৈচিত্র্য উপলক্ষ্য করিয়া লেখিকা যে কতকগুলি কঠোর সত্য ও সরল নীতি প্রচার করিয়াছেন, তন্মধ্যে দু-একটা উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিলাম না। আন্দুর জীবনের রহস্য পাঠ করিতে বসিয়া পাঠক তন্ময়চিত হইয়া যে কতকগুলি নিছক সত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিবেন, সেইটা একটা মস্ত লাভ। পুস্তকের এইটুকুই সকল সাফল্যের উৎস হইয়াছে। লেখিকা লিখিতেছেন :

"শুধু মরণের ভয়ে সমস্ত জীবনটা বাবু করে রাখা ঠিক নয়।"

"অভাব যে মানুষের শুধু অবনতি করে, তাহা নহে, উন্নতিও করে।"

"বই মুখস্থ করলেই মানুষ হয় না, মুনষ্যত্ব আলদা জিনিস।"

"কেবল মাত্র মুখের তোড়ে কি হাতের জোরে যে সাহস নামক বস্তুটা পৃথিবীর বাজারে সস্তাদরে বিকায় না এবং সহিষ্ণুতা জিনিসটাও যে সময়-বিশেষে ভীরুতার নামান্তর রূপে প্রতিপন্ন, আন্দু তাহা ভাল রকম জানিত।"

"জগতের অপকারের ভয় বাঁচাইতে গিয়া উপকারের শক্তিটাও সত্য সত্য হারাইয়া বসিল। যাক, পরিতাপের মধ্যেও পরিতোষ আছে—ভগবান, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।"

"পূজার মাঝে কামনাই পাপ। আসক্তিই অপরাধ। কিন্তু ত্যাগের ব্রতে উৎকর্ষের অর্চনা, সে যে আমরণের সান্ত্বনার সামগ্রী। তাহাতে ক্ষমা নাই। ক্ষান্তি নাই। শেষ নাই।"

উপসংহারে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে অথচ অতি শ্রদ্ধার সহিত কয়েকটি তুচ্ছ ত্রুটির উল্লেখ করিতে হইতেছে। প্রথমত, মোসলম আন্দুর মুখে অনৈসলামিক শব্দ শোভা পায় নাই—বিশেষত সে যখন আরবি ফারসি শিখিয়াছিল, পিতার আদর্শে ইসলামের অনুষ্ঠান নিয়ম-মত পালন করিতে শিখিয়াছিল তখন তাহার ভগবানের পরিবর্তে আল্লাহ করা আবশ্যক। পুনরায়

একস্থলে তাহার দ্বারা পূর্বজন্মের উল্লেখ করাইয়াছেন। মোসলেম নরনারী পূর্বজন্ম ও কর্মফল বিশ্বাস করে না। দ্বিতীয়ত, আন্দু কখনও ভাঙ্গা ভাঙ্গা অশুদ্ধ উর্দু বলিতেছে পরক্ষণেই সাধু বাংলা বলিতেছে, শ্রোতা একই ব্যক্তি। এস্থলে ভাষা চলনসই বিশেষ যুক্তিসঙ্গত হইত। উপন্যাসে আমার মতে, যে যে-রকম লোক তাহার মুখ হইতে সেই রকম ভাষা বাহির করানো উচিত। একটা গণ্ডমূর্খের মুখে সাধু ভাষা শোভা পায় না এবং তাহার মনোভাব হয়ত অনুবাদ করিতে যাইয়া অনেকস্থলে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সরসী ও জ্যোৎস্নার আলাপের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সরসী যদি তাহার সদা সর্বদা কথিত ভাষায় কথাটা বলিত, তাহা হইলে আলাপটা যেন আরও সজীব হইয়া উঠিত। ইসলাম-নীতিভক্ত আন্দু যে নামাজের সময় কমাইয়া চিত্রবিদ্যা অভ্যাস করিতে বসিল, ইহা অত্যন্ত বিসদৃশ্য মালুম হইয়াছে। কেন? নামাজ অপেক্ষা কি চিত্রবিদ্যা তাহার নিকট বড়? এটা কি তাহার আসক্তির পরিচায়ক নহে?

সেই রহমানুর রহিমকে পাওয়াই যদি তাহার উদ্দেশ্য ছিল, তবে নামাজ কমাইল কেন? মোসলিম ত শত কার্যকে শত লোকসানকে উপেক্ষা করিয়া সময় হইলেই নামাজে খাড়া হইয়া যাইবে। কৈ, আন্দু ত তাহা করিতে পারে নাই। মোসলিম-জীবন আন্দুর এই স্থলে অনেকখানি ছোট হইয়া পড়িয়াছে! ঠাকুর সুদের কথা উঠাইতে আন্দু যদি বলিত — "সুদ ত মুসলমানের নিতে নেই"—তাহা হইলে আন্দুর কথাটা সার্থক হইত। সে যেভাবে "সুদ আবার কি" বলিয়া উঠিল, তাহাতে যেন বোধ হয় আন্দু ইসলামের সুদনীতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ।

তারপর আর একটি কথায় বিশেষ আপত্তি উঠিয়াছে। "ভাগলপুরের মাটি যে সে (আন্দু) মক্কার চেয়ে পবিত্র বলিয়া জানে"—এটা হইতেই পারে না। উপমা উৎপ্রেক্ষা কোনো কিছুরই দোহাই দিয়া এরূপ ভাবকে ইসলাম সমর্থন করিতে পারে না। মক্কা তীর্থস্থান। সেস্থান প্রত্যেক মোসলেমের প্রাণের গভীর অন্তঃস্থলের পবিত্রতার রশ্মিতে উদ্ভাসিত হইয়া মর্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। তাহাকে দুনিয়ার কোন স্থানের সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে ইসলাম মক্কাতীর্থের দ্বারা যে মহা আদর্শের প্রচার করিতে চায়, সেই মহা আদর্শকে নির্মূল করা হয়। সেই জন্য কোন মোসলিম দেশ-কাল-পাত্র বিশেষকে দেবতার মত শ্রদ্ধাভক্তি দ্বারা অর্চনা করিতে পারে না। জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় মানুষের ধর্ম পালন করিবার জন্য সে দেশবিদেশে কল্যাণ কামনা করিতে পারে, তজ্জন্য জীবনপাত করিতে পারে, কিন্তু সর্বপ্রথম সে ইসলামের পবিত্র নীতিকে অবলম্বন করিবে। আশা করি লেখিকা পরবর্তী সংস্করণে এই কথাটা তুলিয়া ফেলিবেন।

লেখিকা অনেক ইসলামি শব্দ প্রয়োগ করিয়া বঙ্গীয় মোসলেম সম্প্রদায়কে ঋণী করিয়াছেন। তবে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমি কতকগুলি শব্দের উল্লেখ করিতেছি যেগুলির বানান শুদ্ধ হয় নাই, কিংবা উচ্চারণানুসারে বর্ণযোজনা যথার্থ হয় নাই। ইহা হয়ত আমার অনধিকারচর্চা হইতেছে, কেননা ভাষাতত্ত্ববিদগণেরই উপর ইহা ন্যস্ত রহিয়াছে।

'নিয়তি'র পরিবর্তে	'নসীব' লেখা
'বহুৎ খুব' না লিখিয়া	'বহুৎ আচ্ছা'
রহিমের মুখে 'চান টান' না বলিয়া	'গোসল' বলা উচিত ছিল।

'শ্রী শ্রীহক পাক নবিজী রসুল' এই ইসলামগর্হিত শীর্ষপাঠের পরিবর্তে একেবারে কিছুনা লেখাই ভাল ছিল। 'শ্রীচরণে বহুৎ বহুৎ তসলিম' না লিখিয়া 'মেহেরবানেষু' লেখা, 'আজ্ঞানুবর্তী'র পরিবর্তে 'বান্দা খাকসার' লেখা উচিত ছিল।

ঘোষজায়ার বানান ও শব্দ	আমাদের বানান ও শব্দ
মুস্কিল	মুশকিল
খামকা	খানাখাহ্
সেখ	শেখ
আপশোষ	আপসোস
রেকা	রেকাত
কোরাণের বয়েদ	কোরানের আয়েত (আয়াত)
তসরুপাতে	তসরফ
ফার্শী	ফারসি
সমীহ	সমঝ
কাচ্চাপচ্চা	বাচ্চাকাচ্চা
শগরেদ	(শার্গেদ) শাগরেদ।

ঘোষজায়া যে শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করিয়া যে বানান করিয়াছেন, সেই শব্দ সেই অর্থ আমরা কিরূপভাবে বানান করিয়া বাংলা সাহিত্যের বুকে ছাপাইয়া রাখিতে চাই, তাহাই প্রতি শব্দের পার্শ্বে লিখিয়া দেখাইলাম। আশা—ঘোষজায়া পরবর্তী সংস্করণে আমাদের ইচ্ছামত বানানগুলি শুদ্ধ করিয়া দিবেন।

অবশেষে, পূজনীয়া ঘোষজায়ার স্নেহের আন্দুকে লইয়া খুব নাড়াচাড়া করিয়াছি, তাহাতে ভয় হইতেছে ঘোষজায়ার পাছে বেদনা লাগে। কিন্তু আন্দুর সঙ্গে সঙ্গে ভাগলপুর, রেলযাত্রা, সেকেন্দ্রাবাদ, জাহাজ প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া আন্দুর কার্যকলাপ দেখিতে দেখিতে যে অপরিসীম তৃপ্তিলাভ করিয়াছি ও সুমার্জিত অথচ সংযত করুণ রসে যে সাহিত্য-আনন্দ লাভ করিয়াছি, সেজন্য কৃতজ্ঞতার ক্ষুদ্র নিদর্শন স্বরূপ ভক্তিভাজন ঘোষজায়ার উদ্দেশ্যে শত সালাম প্রেরণ করিতেছি। আশা করি লেখিকার লেখনী খোদাতালা অমর করিয়া তুলিবেন।

সহচর, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩২৮

ইংরেজি গ্রন্থ

THE GANDHI-IRWIN TRUCE AND THE MUSLIMS

The Gandhi-Irwin Truce and the Muslims*

Since the announcement of the Gandhi-Irwin agreement much has been said about it by the Hindus and Muslims for and against. On the whole it has been welcomed, though on different grounds, by all and whoever has spoken about it has expressed general satisfaction and congratulated Mahatma Gandhi and Lord Irwin, since it has given a great relief to the political struggle of our motherland.

Personally, I am not much enthusiastic about it. I welcome it, however, because it marks an epoch and promises to create an atmosphere in which we will have the great opportunity of being malted into a mighty nation with one common outlook and one goal to strive for, I congratulate both Mahatma Gandhi and Lord Irwin, because both of them combined their human touch with their office. Mahatma Gandhi, the plenipotentiary of the Congress did not allow his inner man to go under, nor did Lord Irwin, the Viceroy, get the upperhand over Lord Irwin, the man. Man in both has triumphed and we have got the truce. And it is now for us to add our human touch to the truce and make the best use of it.

True it is that Mahatma Gandhi has completely surrendered his method of war and disbanded his forces ; because he has obtained assurance from Lord Irwin, I do not know if Mahatma Gandhi has in it the honest gestrue and change of heart for which he was so long anxious. Apparently, it seems Mahatma Gandhi has got it. Let us not spoil the solemnity of the truce by appraising his value in terms of defeat and victory. It promises to create an atmosphere of peace and goodwill between Great Britain and India and we must contribute our mite to further it. To me the truce is neither a victory nor a defeat. It is the embrace of the two representative souls anxious for the

---

* This article was first published in the *East Bengal Times*, Dacca, dated the 18th and 25th April 1931.
Then agin it was printed and published as a booklet by R.K. Bhattacharji at the East Bengal Times Press, Wari, Dacca. The present text is from the booklet.

establishment of a regime that will make both India and Great Britain greater and stronger. In this historic embrace of the human souls Mahatma Gandhi forgot that he was the General of the Army of Civil Disobedience and Lord Irwin forgot that he was the Viceroy. 'This magnificent forgetfulness was the foundation of the of the truce. This should now afford an example to the militant communities scrambling for powers and privileges of the state, without being prepared to pay for their price.

The Gandhi-Irwin Truce is, as a matter of fact, a truce between the Executive and the Extremist section of the Indian population. This is not a truce between the people and the State. That is yet to come. For that we have to bring about the truce between all sections of the people of India. The truce we have arrived at will be of no use unless we the Hindus and Muslims at once enter into a truce in the spirit of Mahatma Gandhi and Lord Irwin. That truce requires the sincere and unconditinal embrace of the heart of the Muslims and the heart of the Hindus. The Hindus must forget that they are Hindus and the Muslims must forget that they are Muslims. In this generous and magnanimous forgetfulness alone lies the true foundation of that truce that will usher in the regime of one solid, strong nationhood of India, replacing the present deplorable regime of a patched up nation of the militant Hindus and the begging Muslims.

I am, however, like many of my friends, not under the delusion that in the Truce the Viceroy recognised the Congress as the only body to be reckoned with, although I wish that he could. The Congress, frankly speaking, has not yet attained that position. It has yet to absorb the Muslims. And I am confident that day is not distant when the Congress will absorb the Muslims, if not by invisible coercion or conversion, in spite of their mediaeval foolishness and adamantine obstinacy. But that task of winning over the Muslims by appeal to their intellect, their faith in Allah and to their reason, the Congress can not avoid in all conscience. The Congress will do unto itself a great injury and also to the Muslim Community itself by humouring the instinct of fear and the mediaeval mentality, of the Muslims. The youth of Islam will not tolerate this concession and the disgrace involved therein. The burning question of the day is said to be the problem of Hindu-Muslim unity and already Mahatma Gandhi is out to tackle it and the people also are urging him to solve it. But I request him to solve it but not at any cost. The present day demand alleged

to be the demand of the Muslim Community is unreal and based on fictitous and imaginary grounds. It has not its genesis in the real necessity of the vast millions of the Muslims of India. Therefore it should not be tickled to its depth.

Indeed the Hindu-Muslim problem is complex and difficult as it has been made to be so. But to my mind this is no problem at all. It is illogical and has no basis either on principle or on precedent. The problem owns its importance to a few individuals ; belonging to the Muslim community, who scent danger at every step of progress.

It is not the problem of the vast millions of Muslims and cannot be so. It is the creation of the few selfish, mediaeval-minded and short-sighted opportunists and place-hunters, who have made politics a hobby and a hunting ground. The psychological basis of this problem is the imaginary fear of injustice, oppression and tyranny of the Hindu majority. But on closer examination it will be clear that the vast mass of humanity whose interest the Muslim leaders pretend to safeguard have no fear of the Hindus and that their interest is not really safe in the hands of these leaders. This problem has its genesis in baser propensities and lower instincts of man and the end it seeks to attain appeals to jealousy, hypocricy, avarice, selfishness, hatred,, meanness and cowardice of the worst kind. It has cost the nation a vast deal of blood and energy but the result so far obtained is not worth the price paid for it. Therefore it should not receive the attention it has hitherto received as such. We should now change the outlook and find out the way of achieving the end. To my mind, we should all cease to talk of the problem as such and begin to do work together straightway, in the mutual embrace of one another for the fulfilment of the common destiny of our suffering motherland. Let us forget the statistics of the Hindus and Muslims. Let the label of 'Muslim and the label of Hindu' be removed and let the label of 'Indian' be fixed on the forehead of all the adult citizens of India, irrespective of caste, creed, colour and sex.

As a detached student of Indian Political History of recent times and as an Indian professing the faith of Prophet Mohamed, I have always been shocked and humiliated at the attitude most of the Muslim political fortune-hunters have taken from time to time. It was just the attitude of beggers, whining at the feet of the indifferent and disgusted giver. Such an attitude has humiliated and disgraced the inner soul of the humanity that professes

Islam in India. Their only programme has so far been separate representation by religion in democratic institutions and in public services. The Muslim youth has been shown the easiest and the cheapest way of looking for backdoor opportunities and their ambition has been stunted, their intellect pruned, heart smothered and energy cooped up. Thus the backbone of the Muslim community has been broken the manhood of Islam, insulted and there is hardly any muslim with soaring intelect and genius in India of to-day.

The programme of separate representation has killed the spirit of competition that adds zest to life and makes life worth living, by bringing out the best, the noblest and the greatest in man. It has arrested the natural and healthy growth of public spirit among the Muslims. It has encouraged the multiplication of educated sneaks, treacherous hirelings, mean hypocrites, jo-hukums. It has shut out the opportunities for organising the Muslims and for producing political consciousness and desire for political rights among the mass Muslim. It has given chances to the worthless drones and brazen faced mediocres to occupy the position they do not deserve and by such occupation they have done irreparable injuries to the Muslim community itself. It has kept the Muslim mass locked up in the backwaters of ignorance, credulity, idolatory and primitive barbarity, of which the communalists have made a great capital by invoking to their mediaeval tradition. As a result, they have proved a great dead-weight not only on those who are struggling for the liberation of our motherland but also on the Muslim Community itself.

The Hindu-Muslim question rests now on the method of election and the quota of representation in democratic institutions that will effectively safeguard the interest of the Muslims as a minority community. The Muslims demand separete electorate and the fixed number of representatives in the democratic bodies and they think thereby their interest will be safeguarded. The Hindus oppose this demand. The Muslim demand is based on fear and the Hindu opposition is based on the sense of security that they are in a majority, and they will be able to carry the day. Both the attitudes are deplorable. Therefore both should be charged. The Muslims must get rid of their fear and the Hindus must also remove their idea of an assured majority dictating terms to the Muslims. Both should realise that one can never grow without or at the cost of the other. Needless to say that the

present cleavage between the two great communities was largely due to the policy of the British administration in India. The Govt. has so far kept them divided into two hostile groups, who have not hitherto been able to work on a common programme. The Muslims have cried for help from the Govt. and the Hindus have grumbled and as a matter of fact, have been more and more determined to frustrate the help promised by the Govt. to the Muslims and thwart the Muslims themselves in their endeavour to take advantage of the concessions secured by circulars and notifications. The result has been that the Muslims have not been able to develop their interest as much as they were promised by the Govt. or they would have done, if they would have worked together with the Hindus.

Let us now see the actual effect of communal representation that has been in operation for about a quarter of a century. In public service the Muhammadans have been promised a certain percentage. But take the statistics and you will find that the percentage has rarely been secured by the Muslims. The reason is not far to seek. The Hindu Heads of Departments have always endeavoured to push down the Muslim candidates. The Government operates through them because they have occupied the machinery, and are now enjoying the advantage of the earliest start and the Muslims are crying in vain. The Govt. can promise, but unless you can occupy by dint of your own effort the machinery of the Govt. can not really help you.

The system of representation by religion is a double-edged weapon. It has its genesis in fear and its end in bitterness and reciprocal hatred. It has made the Muslims weaker and the Hindus more jealous. Under it, the Muslims have suspected the Hindus more and more and the Hindus have been more and more indifferent to the Muslims. The Muslims look to Muslim interest and the Hindus care for the Hindu interest. Thus the common interest or the country's interest has suffered. Unless the common interest is furthered by the joint effort of the Hindus and Muslims, none will gain anything worth having. As the sunshine or the rains cannot be divided into different doses for each community in the country, so the State can not be divided into small compartments and the measures taken by the State are like rains and the sunshine. The State exists because the people want to exist. The measures of the State are required to make the life of the people happy, good and healthy. The Muslims and the Hindus both require them.

Then how is it possible to distinguish the Hindu interest from the Muslim interest? The measure that will make the Hindu good, happy and healthy is bound to make the Muslim good, happy and healthy. But that measure can not be obtained unless both join together to get it. It is not possible to achieve it without the joint effort of both. The last 10 years' history of the Bengal Legislative Council supports this conclusion. There the Muslims have had an undisputed sway and opportunity but they have not been able to make anything out of it. The Bureaucracy has lent a seeming support to them, yet they could not achieve anything worth mentioning which can go to benefit the wretched community they pretend to represent. The reason is clearly that either they are incompetent or nothing is possible to achieve without the help of the Hindus. It is not the interest of the Bureaucracy to help the Muslims in getting the real measures that benefit their community. Communal representation has always made it possible to return many candidates to the Legislature who posses hardly the required training, education, courage imagination, initiative, dispassionate sincerity, public spirit, and honest political conviction. It has made it possible for the candidates to go to the councils without going to the polls. It is much easier to buy the candidates than to woo the voters. We have had the misfortune to see of late some candidates purchasing other candidates and going to the Councils uncontested. This is a very great danger in the way of developing the political consciousness and that eternal vigilance which is the price of liberty. The Muslim electorate has seldom seen the candidates and got an opportunity of being conscious of their rights and responsibilities. Unless that is done through election contests, the rcpresentatives will be of no use to the electorate. The system of separate electorate for the Legislative Councils has failed to achieve this end. The representatives have gone to the councils, scrambled for office, enjoyed entertainments and fat T.A.'s and thus they have performed their duties. During the last ten years of the Reformed Councils, Bengal Muslims have produced nothing that could advance the cause of Education, Health and Economic Welfare of the millions of the poor suffering Muslims who are an unfortunate victims of so many evils that have grown round them. This is the strongest argument against the system of Communal Representation that has began given a fair trial but has been found wanting. It has thoroughly demoralised the people, both Hindus and Muslims alike. It has made the Muslims self-complacent and the Hindus narrow-minded. It has reduced public offices to articles of

merchandise and public morality to an object of speculation. It has sown the seeds of discord, dissensions and distrust between the two communities all over the country and has checked the healthy and natural growth of the Muslim youth and for that matter of the whole Muslim Community. It has narrowed the out-look and vision of the community and debased its aspirations. It has diverted its leaders to a narrow groove and made them loss sight of the broader interests of the country as a whole. They have cried for Muslim interest but they have seldom formulated it. In what respects the Muslim interest will differ from the Hindu interest so far as Education, Health, Economic Welfare of the Muslims are concerned, no body has yet cared to catalogue. Because it is absurd to do that. So far as I have been able to gather what the Muslim leaders meant by 'Muslim interest' is their interest to see some Muslims in public service and in public bodies. Little do they realise that in the task of developing a nation it is not the quantity but the quality that matters. We have the number but for want of the quality we have failed to achieve anything. The communal representation has had a baneful and insidious effect on the growth of the required quality of our representatives. It cannot grow unless it comes into clash with the strong and the brave. Our representatives have avoided the clash and conflict and thus helped the stagnation of the current of vigorous life of our community. The programme they have placed before the youth of the community is the programme of the weak, the incapable and the worthless, seeking the byeways and corners of darkness, and avoiding the high-road of light, that invigorates life, strengthens the social organism, fosters courage, originality, sensc of self-respect and public duty. The result is that the system has divided the Muslims themselves and prevented the Muslim Community from getting an opportunity of being turned into a powerful political minority that can attract the homage of the Majority. It is impossible to get anything from the majority unless the minority knows how and what to get from them. The minority will be weakened all the more by safeguards because the demand of their life will never grow out of the felt necessities of their very existence. They will never feel nor learn. The safeguards will keep them vegetate on their weak existence. They will hardly get the opportunities of tasting higher life and attaining bigger self. The effect will be disastrous. The vast mass of humanity, professing Islam will be an object of exploitation by their own representatives. We have had tasted the result already.

Our representatives have been divided into hostile camps, following the 'Dog in the manger' policy, mutually jealous of one another, scrambling for office. The communal representation has failed to keep the Muslims themselves united. Unless they remain united it will be impossible to fight against the majority. The division among the Muslim leaders is largely due to this system. In this system the Muslim leaders have nothing to care for the opinion of their electorate, nor have they any incentive to create such opinion. No representation is effective in a democratic institution unless it is backed and checked by a vigilant electorate. No electorate can be vigilant unless it is constantly approached by the representatives with the programme of work promising to further diverse interests of the country that make the people happy, prosperous and contented. So far Muslim representatives have never approached their constituencies with any programme of work in the Councils, excepting with their label of Religion. Often we have found the candidates approaching their constituencies with certificates of their 'Pirs' (spiritual guides) and appealing more to their credulity than to their faculty of understanding the utility of their votes or the duty of the candidates for whom they are commanded to vote by their Pirs and their credulous disciples. The candidates on the other hand do not stand on their intellectual acquisition, that is required in the councils, but on their pretensions necessary to extort the favours of the Pirs. And the moment it is obtained the thought of Muslim interest melts away.

Thus, the candidates have not been able to develop a party of their own. They have competed for the certificate of a Pir or a Nawab, who has yet a hypnotising influence over the Muslim mass, instead of competing for the best programme of work that can serve the interest of the people as a whole and that can reduce the number of Muslim beggars, Muslim prisoners, Muslim debtors and Muslim criminals. The disgrace of such an appeal was once experienced by some of my co-religionists who were approached by two candidates one being certificated by a Nawab and the other by a Pir. The man of the Nawab had no beard and the man of the Pir had beard and moustache well trimmed according to Shariat. The voters were in a fix. Both appealed as Khademul Islam, (servant of Islam) not as Khademul Constituency. The Nawab could not override the Pir. The beardless candidate was denounced by the disciples of the Pir as Khilafi-Shariat (transgressor). But ultimately the compromise was inevitable. When the appeal to religion failed, the appeal to purse was resorted to. The Pir supported the Nawab and

the beardless candidate was returned. No comment is necessary. The system that has made this possible has disgraced the God of Islam, who has clearly ordained in the Quran that 'Kanannasu unmataan wakidatan'—All people are a Nation and that it is they who believe in Allah and do good to Humanity are entitled to salvation. Is there any room then for the true Muslims to distinguish the Hindus from the Muslims so far as the State of India is concerned?

We have further experienced that the members representing the Muslim community have seldom combined to stand together in the Councils to support a programme of work that would have made the Muslims happy and prosperous. The Bengal Muslims, as for instance, need various legislative measures to make them economically self-sufficient, to educate them, to improve their moral and physical health and to rais them in the estimation of other nations of the world. But how many such measures have so far been contemplated and prossed by their special representatives? It is a shame to say that there is practically none so far. I feel miserably ashamed when I take the stock of the contributions made by the Muslim representatives to the Bengal Legislative Council for the last 21 years. The period is practically blank. On the other hand they created an atmosphere there in which nothing could possibly be done. Having failed to make up a united front they could not think out anything to press. They displayed also inherent weakness in maintaining their individuality for which they are anxious and for which communal representation is justified and insisted on. We have, however, seen how they were divided and played into the hands of others ; not of the Bureaucracy, now of the Hindu Whips. They have been found so often sailing with the Hindu and submit to their programme, only to serve their sordid selfishness.

The effect of communal representation in public service has been no less demoralising. The Muslim officers entering service with the help of the Bureacratic Authority have seldom with the exception of a very few, attained that stamina and courage that would enable them to do good to their wretched community, carrying on its wretched existence as though at the mercy of others and having no stake in the soil. Many of them are afraid of the Hindu criticism and cannot even dare do the bare justice to the Muslims, whenever occasion arises. They work to secure favour of the Hindus and recognition of the Govt. Thus they rise in service and obtain praise as

tactful officers. But these so-called tactful officers have done more harm than good to the community.

Besides, this allurement of special consideration for Muslims has had a very sinister influencs on the youth of Islam. The youth has been cabinned, cribbed and confined. The aspiration of the community has been lowered. They have lost their confidence in themselves and faith in the efficacy of human effort. They have all run after the same steroetyped education to qualify themselves for service. The desire for independent profession and other honourable occupation has not been very keen. They imitate the Hindus but they do not realise that they being too late the process by which the Hindus seem to have risen is not be followed now for their regeneration.

The worst thing that has been introduced into the community is the system of special educational institutions which have been fostering a deplorable communal outlook. To my mind they are digging the graves of Islam which these institutions pretend to save. Islam, as I have understood it to be in my humble way, is an ideal of humanity that requires open air and free light to flourish. If it is confined it tends to decline and die. Hisotory of Islam shows that since the day Islam was confined, it has lost its force. Bagdad and Cordova Universities were open to all nationalities. Scholarships and Jaigirs were open to non-Muslims. There is, therefore, neither the principle nor the precedent to support communal institutions and communal curriculum, which seeks to create a type in form, absolutely out of date. These institutions are practically mediaeval schools with modern faces. They maintained an environment in which love of knowledge, patriotism, self-confidence, courage, self-respect, spirit of independence are not and can hardly be cultivated. Thus the moral fibre of Islam is gradually withering away. The environment which is not confunctive to the cultivation of those moral virtues and the curriculum that does not create an incentive to acquire those indispensable virtues, are sure to kill Islam outright. Islam wants freedom and the youth of Islam need wider field to create new values to make it possible for humanity to approach God. Communalism is a bane and a snare for the healthy growth of Islam. It has penetrated every nook and corner of our life.

The only irresistible conclusion about the system of communalism in politics, education and public service is by experience that it has defeated its own end. It is a depraved choice of political safeguards. It wanted to save

Islam, protect the youth and develop the community by affording its opportunities for growth. But as a result it has dishonoured Islam, shut out its possibilities, disgraced the youth and obstructed the natural development of the community itself. It has only pampered its own exploiters, who have only the pretentions, not the love for Islam and who have run with the hare and hunt with the hound, in order to suit their own selfish ends. It is therefore necessary for the very existence of Islam that the system of communalism should be abolished, and at any cost. The Muslim representatives have always appealed and cried in the name of Islam, without crying for the people who profess Islam. Had they moved and cried for the millions professing that faith, they would have done better. The communalism that has hitherto been in operation through out the country has resulted in a tremendous setback to education, political progress and econimic welfare of the Muslims themselves. Under it, they have lost initiative and natural desire for development. They have been taught to wait for the official doses of relief which has always come late and in doses hardly sufficient for the scheme promised by the bureaucratic machinery. The scheme of reformed madrassahs and the Islamia College in Bengal are instances in point. The Government refuse to supply the fund required to develop the scheme. The Muslims are still looking for it and wasting precious time along with the huge quantity of human materials. From the point of view of Muslims as human beings entitled to live first as such then as Muslims, the system of communalism and of safeguards should be discontinued at once.

We have so far examined the effect of commmunal representation in theory as well as in practice. We should now examine the effect of common electorate without any reservation. In theory the most important effect of the common electorate is that the voters will be made conscious of their worth and their political rights. The Hindu as well as the Muslim candidate will approach even the meanest voter for his vote. He will thus be taught per force the meaning and utility of his vote. He will learn to choose one or the other. Thus the voters will be conscious and eventually will be organised. Democratic Govt. we are striving for will be a shame and a farce unless the voters are organised. The communalists will urge here that the Hindus will never allow the Muslim candidates to go to the polls as the former having longer purse will buy off the running Muslim candidates. In the transition period probably the Muslims as they have been weakened and demoralised

under the present system will succumb to the purse and influence of the Hindus, but the time will soon come when the youth of Islam will not sell themselves so easily. They fear that consequence because they think the demoralising propensities that the system of Communal Representation has developed, will also remain in operation in common electorate. Assuming that the Hindus will buy off the Muslims, the Hindu candidates will yet have to go to the polls. That will be enough to rouse the mass voters to a consciousness of their demand of life. This is often impossible in a separate electorate, since the candidate buying off his rivals will not have the least necessity or incentive to go to the polls or care for the power of the voters. The next advantage of a common electorate is that the better type of muslims will come to compete with the Hindu candiates and necessarily they will have to resort to attractive programme of work in the councils. The voters will then be compelled to decide on the most advantageous programme for their ultimate choice. In this way the parties will develop on different interests, not on the label of religion, which has prevented the growth of such interests.

The common electorate will give the Muslins a good opportunity of increasing the number of their representatives in majority provinces and turning them into a majority in minorty provinces also by combining with other common interests. The reservation limits the scope of such growth and possibility.

We have already got a precedent in Bengal local Board elections: There the electorate is common and there is no reservation. The result has been the Muslims have been awakaned to their potentiality and captured almost all the seat in the majority Districts. The Muslims had to go to the polls because the Hindus were in the field. The life of a society lies in the power of resisting the hostile forces. But that power can not develop. nay dies unless it comes into conflict with its opposing elements. The more you avoid them, the more you throw yourself into the abysmal deep of weakness and stagnation. The precedent is therefore clearly established in the local Board Electorates that the common electorate has done a great good to the Muslims in developing them into a conscious organism.

The common electorate will draw out the best and the noblest that is in the Muslim society. It will kill the germs that are eating into the vitals of the community and open out the back-waters into the main-current of life. It

will consolidate the Muslims even as a minority community. It will compel the Hindus to woo the Muslim voters and thus they will have to realise that the Muslims are indispensable for their very existence. They will always have to remember that they will never have peace unless their neighbours let them have it. The common electorate will change the whole outlook of both the communities. It will enable them to think out larger programme a success. The result that requires the will and determination of both, can never expected to achieve with the effort of a single community. As for instance, if the free compulsory primary education is introduced, it will benefit the Hindus and Muslims equally. But the introduction of that system of education cannot be had without the collective and Joint effort of both the communities. Similarly many things are to be achieved, but are not being achieved owing to the cleavage between the two communities.

The common electorate will develop common outlook and add strength to the union of all the forces, of all the communities, inhabiting our motherland. It will give opportunity to each and all of making the best use of their energy and intellect. It will remove distrust, dissension and mutual suspicion and usher in an atmosphere of freedom and goodwill to all. It will make the Muslim stronger, and the Hindus more loving towards the Muslims.

The common electorate will make the Responsible Govt. a reality. Separate electorate will, in fact, keep the Executive divided. It will be difficult to develop joint responsibility of the Executive, which will be composed of members elected by two different sets of electorate. The Hindu member will be anxious for his community, and the Muslim member for his. One will be indifferent to the other. At every suggestion of the one, the other will scent danger for his community. Thus they will fail often to stand by a common programme of work. This is a great danger in the way of attaining full responsible Govt. This is the reason why I can not understand the leaders of my community, who cry for the separate electorate and in the same breath want responsible Govt. Responsible Govt. with separate electorate is a sham and a farce and is graught with dangerous consequences, since the weak member of the executive elected by a section of the people will always sail with the members representing the majority community or with the officials. It will them be easy for him to pooh-pooh his special electorate. He will not have the least hesitaion in retaining the office when his colleague will resign and thus the Respobsible Govt. will fail.

The benefits of the common electorats are too numerous to enumerate.

It is therefore for our leaders to make up their mind now, before it is too late, when they will lose the goodwill of the Hindus and will be compelled to submit to their forced programme. The youth of Islam also will not execuse them for their shortsighted policy based on their pychology of fear, weakness and self-aggrandisement ; because in the Dictionary of Young, creative Islam the words fear, distrust and slavery are deleted. The young Muslims want to live as true sons of the soil of India. To them communal representation is the method of perpetuating slavery in India which they can not tolerate. They feel they have been misled by the self-seeking leaders of their poor, ignorant and miserable community. They do not like to make themselves an object of pity and concessions of others. They want to earn their freedom and honour worthy of the Indian (man) of the Quran. They feel disgraced and humilated at the attitude of their leaders who have so often sold their community for a mess of pottage. It is their earnest prayer to their leaders not to beg anything nor receive anything that will not involve any risk. Nothing should be obtained or accepted that will not demand the utmost price from the community of Islam. Islam has never existed at the mercy of others, not should it like to exist as an object of gratuitous favour or charity of another.

It is reported that Mahatma Gandhi is out to make up the Hindu-Mullim Unity. The young Muslims will rather welcome him in fulfilling that task. But they should like to request him earnestly not to placate the Muslims by making capital of the instinct of fear and selfishness of their leaders. Mahatma Gandhi has once done a great injury to India and to Islam as well by backing the shadow of Khilafat, after which the Muslims were led, rather misled. He ought to have denounced the shadow and ought not to have lent support to that at all. But he wanted to placate the Muslims by patting the false shadow. It is therefore necessary to warn him this anxisty to placate the Muslims, give too much premium to their mediaeval mentality and instinct of fear.

THE PROBLEM OF RIVERS IN BENGAL

CONTENTS

PREFACE

This little book is based on the Paper read to the Dacca University Students' Union held in February 1925. It is the Product of my humble efforts to approach, from the stand point of the Student of Commerce and Economics, the Problem of Rivers in Bengal, which I call the *key Problem* of the province. Because all other Problems, Economic and Sanitary, are indissolubly bound up with this problem, and on its satisfactory solution depends the restoration of Bengal to her historic position of eminence, prosperity, plenty, health and peace. All sorts of sanitary evils, economic ills, poverty and death that have been slowly leading her to decline and decay day by day, are largely due to the deterioration of her rivers.

I think that the true remedy of all these ills lies in the resuscitation and perpetual conservàtion of the rivers of the province. I have herein made endeavours, very moderate indeed, to show how that conservation may be possible and in doing so I have also given a brief history of the conditions of Bengal rivers of the days that are no more and also a short sketch of the methods adopted in the West for the conservation of rivers.

I have in the last chapter made some suggestions with a view to indicate the line of work and investigation that should be taken by the Engineers of the Province and also by the Authorities concerned. I hereby intend drawing the attention of the general public and particularly the persons who are anxious to see Bengal fully resuscitated to this most important Problem. Nothing will be of any avail if the water-courses of the province are not improved early.

My chief obligation is to L. F. Vernon Harcourt and L. S. S. O' Malley. Their writings which were of special use to me are cited in the notes.

I hope the following pages will help, to some extent, to lay the foundation of a systematic and tenacious movement for the regeneration of the rivers in Bengal and public opinion will ere long gather round it.

Abul Hussin

THE PROBLEM OF RIVERS IN BENGAL

"Almau Malun wa Sihhatun"—The Prophet.
"Water is wealth and health."

I

Bengal—a Delta

Bengal is typically a continent of rivers in Asia as France in Europe, as all her rivers originate from abundant rainfall on the hills of Rajmahal, Darjeeling and Assam. Of these, Assam hills cause by far the heaviest recorded rainfall in the world. At Cherapunji in Assam is recorded the average annual rainfall, that falls on the Khasi Hills, to be 474 inches. It is well known the formation of the landmass stretching 300 miles north from the sea has been the product of the full and free play of the creative as well as destructive energies of the two great delta producing rivers viz. the Ganges and the Brahmaputra that flow across Bengal to the sea. "The whole of the country lying between the Hooghly on the west and the Meghna on the east is only the delta caused by the deposition of the debris carried down by the rivers Ganges and Brahmaputra and their tributaries."* The greater part of Bengal is a delta in various stages of formation. The process is connected with great changes in the lower course of the Ganges.† Thus the deltaic continent is slowly broadening into the Bay of Bengal that guards her southern coast.

A land of Rivers and Islands

In the 17th century, the limits of the Bay were much more restricted than now. Captain Bowrey, about 1670, held that the whole extent of the Bay from the Palmyra point to the Aracan shore 'was nearly 300 English miles over' and 'for above 100 miles the land there was divided by Rivers and

---

* R. S. Oldham : *Manual of Geology of India*, 1893.

† L. S. S. O'Malley : *Bengal, Bihar and Orissa, Sikkim*. 1917.

Rivulets into Islands and thereby became invincible.'‡ He described Bengal as 'one of the largest and most potent kingdoms of Hindustan, blessed with many fine Rivers that issue out into the sea, some of which were navigable both for great and small ships.' 'On the great river Ganges and many large and fair arms thereof', he said, 'are seated many fairy villages, delicate groves and fruitful lands affording great plenty of sugars, cottons, lacca, honey, bees-wax, butter, oils, rice, grain with many other beneficial commodities to satisfy this and many other kingdoms. Many ships of the Dutch, the English, the Portugese do annually resort to lade and transport sundry commodities hence and great commerce goes on into most parts of account in India, Persia, Arabia, China and South seas.'*

There were numerous islands at the mouth of the Ganges. 'There were no inhabitants in those islands', for they were so pestered with tigers that there could be no security for human creatures.† In 1664, the shores of the Ganges in the neighbourhood of these islands were found to have been 'covered with bushes, thickets and little woods which extend some distance inland and in which there were many serpents, rhinoceroses, wild buffaloes and especially tigers.'‡ The woods mentioned here are now identified with the Sundarbans, largely inhabited by those creatures. History tells us that it is these woods, the scattered and uninhabited islands surrounded by great and dangerous rivers that frightened Alexander the great. He sailed back up the Ganges and returned to Macedonia.+ A remark in Dutch says, "The bush Sanderis, where Alexander was pushed back (gestuyt)."

In course of time, the channels that separated these islands have silted up and the islands continuously have formed part of the continent. This process of Nature in 'increasing the Delta' is always at work. The new outlets of the 'large and wounderful Ganges' to the sea rise and sink and the materials 'carried down by the stream and deposited at the mouth are formed into the islands that are subsequently added to the continent. The actual river channels are liable to change, the river cutting through its friable banks in floods and reappearing miles away. All these are ordinary incidents of deltaic

‡ T. Bowrey : *Countires round the Bay of Bengala.*
* T. Bowrey : *Countries round the Bay of Bengala.*, pp. 129-33.
† A. Hamilton : *East Indies,* Vol. II, p. 4 f.
‡ Schouten : Vol, II p. 143.
\+ Schouten : Vol, II p. 145.

formation. Within historic times, the Ganges has undergone enormous changes. Formerly the main body of its waters flowed southwards to the sea through the Bhagirathi but as this channel silted up, the main stream made its way into other distributaries, moving further and further eastward until it found outlets in the Padma and Madhumati. Recently the larger body of its waters united with those of the Brahmaputra together proceeded to the sea as the Meghna. The Bhagirathi is now nearly a 'spill channel' of the Ganges. It is known to have been silting up at least since 1666, when Tavernier wrote that "Bernier was forced to go overland to Cossimbazar from near Rajmahal because a sandbank at its mouth made the river unnavigable."*

The Sundarbans

The area of the Sundarbans is about 6500 square miles, in extent about half the size of Holland. Captain Bowrey and other travellers and merchants of the 17th century depicted the "area as a desolate region, half land, half water, a labyrinth of intermiuable forest and swamp, devoid of human habitation." Bowrery entered the Ganges through a small rivulet called Dobra or Door Agra as traced by Mr. Rennell in 1781 to be a "passage through to the Sundarbans," and found many islands at the mouth of the Ganges, 'not inhabited more than by wild beasts.'+ The morasses of the northern portion have now been converted into fertile rice fields. The jungle is being steadily reclaimed and margin of cultivation pushed southwards with the gradually increasing colonisation. Many of the islands at the mouth of the Ganges and Meghna estuaries and off the Chittagong coast, however, have largelv been populated. Of these, Sandip has a place by itself in historical interest. According to Caesar Federici, a Venetian traveller, who wrote in 1565, it was a populous and thriving centre of commerce. Two hundred ships were laden with salt there every year and such was the abundance of timber for shipping that the Sultan of Constantinople found it cheaper to have his ships built there than at Alexandria.† The southern portion is still 'a network of tidal waters, sluggish rivers creeping through the solitudes of dense forests, inosculating creeks and forest-clad islands.' It is a sort of 'drowned land, covered with jungle, smitten by malaria and infested by wild

---

* S. Ball : *Tavernier's travels in India.*

\+ Major Rennell : *Atlas of Bengal,* 1783.

† S. Ball : *Tavernier's travels in India.*

beasts, broken up by swamps. intersected by a thousand river channels and maritime backwaters.'*

II

Pre-British Bengal

Bengal was found by foreign travellers of the 16th and 17th centuries to be the most 'famous and flourishing kingdom' of extensive agriculture, excellent pasturage and prosperous maritime commerce. The kingdom owed its greatness to many 'fair and pleasant rivers' which afforded safe and convenient roadsteads for vessels of foreign as well as native merchants. Most fertile districts were situated along their banks. Many populous and sumptuous cities grew up on their sides adorned with many structures dotted with beautiful groves, fine gardens and crowded with large market places.†

The 'much admired' Ganges was, as is now, the mother of many other 'brave and navigable' rivers. One of the most admirable arms of it was the Hooghly. Up and down its course a very considerable merchandise was carried. It was very beneficial to the English, the Dutch and the Portugese merchants as it could afford them excellent conveniences for carrying their European commodities up into the inland towns and cities and the like for bringing the commodities purchased in this or some other adjacent kingdoms.'‡ On this river various European nations planted their early settlements at Hooghly, Chinsura, Baranagar, Chandannagar, Serampur, Bankibazar. The great town Hooghly owed its fame to this river. The hinterland of the town was extremely fertile and well drained, now the hotbed of malaria. That the town had one of the finest *choultries* (free rest-houses for all travellers) indicates that it was a busy resort for many merchants and travellers of those days. Near this town was the royal port of Satgaon, referred to by Ralph Fitch in 1588, as 'a fair city for a city of the Moors and very beautiful of all things.'+ Some mounds of ruins, a mosque and some tombs are all that is now left of what was once a 'flourishing emporium with a considerable seaborne trade.'

---

* L. S. S. O' Malley : *Bengal.* P. 12.
† T. Bowrey : *Bengala.* p. 165.
‡ T. Bowrey : *Bengala*, p. 167.
\+ *Tavernier's Travels.*

Tavernier has left a brilliant account of the economic and commercial prosperity of Bengal of his times. He wrote : "As to commodities of great value, which draw the commerce of strangers to Bengal, I know not, where be a country in the world that affords more and greater variety. For, besides sugar, there is such store of cottons and silks (raw) that it may be said that Bengal is, as it were, the general magazine there of, not only for Indostan or the Empire of the Great Mughal, but also for all the circumjacent kingdoms and for Europe itself. It bears rice in that abundance that it not only furnishes its neighbours but many very remote parts. It is carried up the river Ganges, and transported by sea to Masalipatam and thence to foreign kingdoms. In a word, Bengal is a country abounding in all things."* We read elsewhere that 'the country (Bengal) which is one of the most beautiful in the world, is extremely fertile ; there is a number of woods and forests of orange and lemon trees ... Sugar is very common......the pasturage is excellent and it produces such an abundance of milk that an enormous quantity of butter and cheese is exported into all adjacent and maritime towns and even into the most distant countries, especially Batavia.'‡

River Traffic

Rivers were the only means of communication all over Bengal from the Sundarbans to Jalpaiguri and from Satgaon to Chatgaon. Inter-district trade was carried on chiefly by means of boats of large sige, their capacity varying from 100 maunds to over 1000 maunds. Excepting the main channels of the Ganges and the Brahmaputra, there were 'rivers of first class size' such as the Karatoya, the old Brahmaputra, in Bogra and Rangpur, the Atrai, the old course of the Tista in Rajshahi that ordinarily admitted 'boats of 1000 maunds burthen.'† In olden times, the whole trade of Bengal districts went by rivers. One could travel by a boat throughout the province. Commodities of one district were carried by boats to another district for exchange. Large river marts sprang up on the banks of the rivers. The East India company and other merchants on the west established many large factories on the banks of rivers many of which have now disappeared. The ruins of the

---

* Tavernier : Vol. II. p. 140 ff (Hakluyt publication).

‡ Delestre : p. 189 ff (Hakluyt publication)
Schouten Vol. II, p. 154 (Do.)

† W. W. Hunter : *Statistical Account of Bogra and Rajshahi,* p. 142

factories only mark their beds. In Rajshahi, Bogra, Rangpur various factories for the production of silk, indigo and sugar were built on the rivers, the Karatoya, the Bangali, the Atrai and the Phuljhur. The Karatoya was so large and deep that it used to drain all waters of Rangpur and the neighboring districts without causing floods. The north Bengal was therefore less subject to occasional floods than now. Trade of this part of the Province was carried on by fixed markets in the towns and larger villages, assisted also by periodical fairs and religions festivals which formed temporary centers of trade, where numerous boats from four corners of Bengal used to frequent. The Karatoya soon silted up and waters were diverted in all directions causing floods here and there. In 1860, however, the river was rendered navigable and tolls were levied on boats passing on it. In 1861 the total number of boats that passed was 22, 171. From this it is evident how important the Karatoya was to North Bengal and what commercial facilities it afforded to the people. The great export trade was effected from the marts on the Karatoya and the Nagar and the Jamuna. Boats from Jessore, Bakarganj, Calcutta used to go up these rivers into interior river ports. When Hunter wrote, he also found river traffic in all parts of Bengal was as active as Major Rennell reported. The Nadiya Rivers were the distributing channels and the Atrai-Karatoya-Tista were collecting streams. The river traffic was also a source of income to the Zeminders and the Government. The mooring-dues were fixed and collected regularly and traders never grudged such taxes. Every district of Bengal was engaged in export and import trade. The Collector reported that in Rajshahi nearly half the people lived by river trading. The commodities dealt were generally cotton, silk, salt, rice, jute, indigo, cloth, sugar, molasses, long pepper, pulses, oils and many others that satisfied not only the needs of Bengal but those of many other countries. Every district had a balance of trade. The Collector of Jessore reported in 1794 : "Exports greatly exceed the imports in value and the balance of trade is in favour of the district." The Collector of Rajshahi reported about hundred years after in 1870 : "The local manufactures as well as the crops are in excess of the local demand, and are largely exported to neighbouring districts. The exports are considerably in excess of the imports and an accumulation of coin is going on in the district, in consequence of the balance of trade being in its favour."

It is to be noted here that fisheries of Bengal were much more valuable than now. In 1870 the Collector of Rajshahi estimated the value of the

fisheries of the district to be about 2 lakhs or £ 20,000 annually. In the same year the Collector of Bogra also gave elaborate figures from which he concluded that the annual income of the professional fishing classes was about £ 30,000 after deducting the cost of boats and nets and the rent of the fisheries and making allowance for the amount of fish caught by the consumers themselves.* Fisheries of the Nadiya and Jessore rivers were also very important. But in large part of Jessore and some part of Nadiya now, fisheries have considerably decayed and the inhabitants can hardly get sufficient fish for their own consumption.

There were excellent pasture lands and jungles on the banks of the rivers. They afforded good opportunity for rearing cattle. Deara char in Khulna, Goalabatan on the Madhumati, Madukhali on the Kapotakshi, older sandy banks or chars of the Brahmaputra in Bogra still provide extensive pasture grounds. But with the increase of grain prices and disappearance of supplementary local industries, the pasture lands are gradually being encroached upon by agriculture and consequently cattle-raising as an occupation, of late, has considerably decayed. During the hot and rainy season, however, Bogra cow keepers still drive their cattle to the southern slopes of the Himalayas on the borders of Nepal. Within the district, large pasture lands are available because for fear of floods they are not brought into cultivation. In Nadiya and Jessore, large swamps afforded good ground for cattle-rearing. Major Rennell's map shows that there were extensive bils in the south and east of Jessore and the south of Nadiya. Those bils are now reclaimed. Jessore and Nadiya lack sufficient milk and ghee. Bogra. Dacca and Brahmaputra valley traders export ghee and other preparations from milk to those districts and derive good profits every year. In a word, with the gradual disappearance of rivers, various sources of income in Bengal are also being closed.

III

Bengal—older and Modern

The brief account set forth above of older Bengal, as a land of fertile soil, vigorous rivers, rich forests, splendid cities, populous villages, crowded marts, abundant products, extensive pastures, healthy citizens, busy

---

* W. W. Hunter : *Statistical Account of Rajsahi and Bogha*

manufactories, adventurous merchants, brisk commerce and prosperous trade appears to be absurdly exaggerated and untrue when we look to the economic position of modern Bengal, which is reduced to-day to a mere shell, as it were, without the kernel as husk without the grain in it. Her rivers are no longer vigorous. Many have been rendered unfit for navigation. Many again are dead and others dying. Those that are navigable are often the sources of unmitigated ruin and terrible devastations. Those again that are strong and highly navigable to-day will soon meet the fate of their dead sisters if they are allowed to have their own course without lot or hindrance. The West and Central Bengal have lost the blessings of the rivers. The East Bengal is still happy and enjoying the rivers but time is not distant when she will have to suffer from the same ills as West Bengal. The signs are already manifest. On the Dhalleswari, the Buriganga and the Gorai, deterioration has taken place to such an extent that navigation has become impossible during dry months except for steamers and boats of very shallow draft.* This deterioration is a matter of grave concern.

The offshoots of East Bengal rivers have already been sluggish and slow. They are now covered with water hyacinth and various other weeds causing pollution and insanitation. The large rivers are not free from them but because of restless and struggling streams the pests cannot take root in them. The small channels will soon be filled up with the increasing growth of these pests. The consequence is imaginable. Rivers will be renderd unfit for navigation and irrigation, with the increasing silting up of their beds and the lands will be victims to violent floods during the rainy season every year. East Bengal has, of late, been subject to more frequent floods. Agriculture in Bengal is fast approaching the point of breakdown for want of improvements in methods of tilling and manuring fields. Pasturage is brought under the plough and consequently milk has now been an article of luxury for the few. Manufactories have been shattered, cities ruined, villages depopulated, population diseased, marts silenced, merchants cowed down and commerce crucified. There are causes manifold, that have wrought these tremendous changes and thereby impoverished Bengal in many ways. Of these causes, I believe, many can be traced to the changing condition of her rivers.

---

* *Irrigation in India*. Review of 1917-18, p. 29

Present condition of Rivers

Rivers of Bengal, unlike those of France, have always remained in their natural condition. Some were never suitable for navigation but no attempts have ever been made to render them navigable ; others were navigable but owing to continual changes taking place in their channels and at their outlets, they have deteriorated, left to themselves. Some again serve as the main arteries for the drainage of some districts and prove most valuable for irrigating lands during the dry season and as a source of water-power, though little utilised, devastate their valleys by extensive floods during periods of excessive rainfall. Some others flow along their generally mad, capricious and constantly altering courses, uncontrolled and unregulated, level down prosperous cities and eating away the banks turn the settled inhabitants into homeless nomads floating and struggling down the roaring currents. "The rivers are destructive as well as beneficent being apt to overflow their banks and to flood the adjoining country." The inundations sometimes cause widespread misery by washing away smiling corn fields and silting up river beds. "All stages of river life are seen in Bengal—the hill torrent, the great navigable waterway, the sluggish stream creeping to the sea through the solitudes of the Sundarbans."

The dead rivers also cannot be omitted. The distributaries and tributaries of the Ganges and the Brahmaputra have silted up at the mouths, for they no longer receive supply from active streams. "There are various degrees of decay and decrepitude—weedy streams, choked with vegetation, that have scarcely any flow of water, channels in which only a few pools remain to mark the deeper portions of the river bed, and finally a dry bed brought under cultivation."* Since Major Rennell surveyed the rivers in 1781 many rivers have changed their courses and many again have died of inanition. For example, the Damodar is said to have changed several times its course. The Bhagirathi is one of the most shifting distributaries of the Ganges.

In the early 19th century when improvement schemes were launched on the Nadiya Rivers, no scheme succeeded on the Bhagirathi as the entrance to it from the Ganges shifted every year sometimes eight miles down and sometimes five miles up. Changes in the river courses in Bogra are most evident in the cases of the Daokoba (as the Brahmaputra is so called) and the

---

* L. S. S. O'Malley. *Bengal*.......pp. 42-43.

Karatoya. Hunter wrote in 1876 : "The Daokoba has so completely changed its direction and bed during the last eighty years that it may be considered an entirely new branch of the river system of Eastern Bengal. ......The most interesting change undergone by the Karatoya is not so much in its course, though that also is a part of the change, as in its volume." "At present it is a narrow, extremely shallow and almost stagnant stream."

It is evident from Major Rennell's Altas that it was a large river. Buchanan Hamilton in his account of Rangpur and Dinajpur about 1810 speaks of it "as a very considerable river of the greatest celebrity in Hindu fable." The Karatoya, in fact, was of such large size that it gained a reputation for holiness, as we learn from the Puranas, scarcely second to the Ganges. It is now called by the people the old Brahmaputra. The waters that now pass down the Tista used to be carried by the Karatoya. The old channel of the Tista is traceable. People of that part still maintain that the Brahmaputra formerly flowed through the channel of the Karatoya. The high banks of the Karatoya distinctly substantiate this general belief of the locality. The causes of its subsequent falling off, however, date only 100 years earlier. The diminution of its current must have been very sudden. The sands were brought down its channel and closed it up completely, having rendered it below very shallow.

The Brahmaputra shifted its course towards the east. "The floods of 1787 seem to have totally changed the appearance of this part of the country and to have covered it to such an extent with beds of sands that few of the old channels can be traced for any distance."* The floods directed the Brahmaputra waters eastward and the Atrai waters south-east down the modern Tista channel. It is believed that originally it was the Atrai that used to carry a large body of waters that now find way down the Tista. The changes of the river courses in North Bengal have partly been responsible for the occasional floods there, and ill-adapted navigation. In East Bengal, the Padma and Meghna are also changing their courses. Mr. Fergusson, in his 'Gangetic Delta' remarked that the Ganges and its distributaries are liable to change. They run in their courses elevating their beds. When the bed of a river is thus practically levelled up and completed "the river is gradually choked up by its own sediment and dies and a new river is opened up in

---

* Bogra *Distirict Gazetteer.*

some other part of the delta where the land is lower and requires raising." But as a matter of fact, upper distributaries having been choked up, the Ganges is flowing down too fast through the plains of Eastern Bengal to the sea. The local rainfall is not sufficient to cause current enough to carry down the sands that have deposited in the channels of the distributaries such as the Nadiya Rivers. The Nadiya Rivers were in the past main routes of navigation during the monsoon, but owing to their rapid deterioration they have been partially abandoned.*

The tributaries of the Hooghly watering West Bengal districts are also constantly shifting. Some of the large tributaries have been choked up. The Saraswati and the Rusulpur are instances in point. It was owing to the Saraswati that Satgaon grew up as a prosperous city. The Saraswati was then the main stream of the Bhagirathi. It is now reduced to an insignificant khal. The importance of Satgaon as a place of trade and shipping is well-attested. Abul Fazle called it a Bandar.† The decay of the town is no doubt due to the silting up of the river.

IV

Deterioration of Rivers

A. Its causes

It is here desirable that some attempts should be made to determine some causes that have brought about the deterioration of rivers in Bengal and also some effects that have resulted therefrom. It has been indicated above that the rivers are generally choked up by their own sediments and die. The sediments are nothing but the detritus carried down from the mountains by the rivers and the sandy tracts through which they pass.

(a) Disintegration of mountains :

Excessive rainfall on the hills leads to their gradual disintegration which can largely be protected by forests and vegetation on them. Of late, rapid disintragration has taken place on the mountains of Bengal Tea plantations, settlements and deforestation wedded to heavy rainfall have brought about quick disintegration of mountains and the discharge of detritus has been enormous in recent years.

---

* *Irrigation in India* : Review of 1917—18 : p. 59

† *Ainai Akbari.*

(b) Deforestation :

In the plains also deforestation has been going on since Jute cultivation was first introduced. The aim of such works of ruthless deforestation

in the plains is to increase the cultivable area so that exports may be increased to meet the ever-growing overseas demands. Extensive cultivation has been the result in western and central Bengal. In Eastern Bengal people generally fear to bring under the plough the lands, liable to constant floods. Western and Central districts of Bengal have been subject to continued continued deforestation.

(c) Deficient Rainfall :

The effect of such deforestation is the acceleration of the evaporation of rivers under the tropical sun. Its ultimate effect is also deficient rainfall.

In Italy deforestation has led to the deterioration of the Po. The Italian government has taken to afforestation recently to arrest the total obliteration of the tributaries of the Po, which such slow and steady deterioration will inevitably lead to. The following table shows that in certain districts of Bengal rainfall has appreciably diminished.

Districts	Average between 1862 to 1872	Average between 1911 to 1921
Bogra	66.16 inches	63.05 inches
Midnapur	72.02 "	60.21 "
Hooghly	65.23 "	57.15 "
Murshidabad	65.62 "	55.37 "
Pabna	69.20 "	59.67 "
Jessore	72.15 "	62.37 "
Nadiya	64.91 "	54.69 "
Burdwan	60.31 "	55.93 "
Tippera	93.50 "	82.01 "

From these figures, it is, of course, not safe yet to establish that the normal rainfall has really diminished. But they tend to show that probably because of the country being denuded of forests and trees, rainfall has been low. Mr. Harcourt says, "The clearing of forests tends to reduce the rainfall of a district." When the Mathabhanga was improved during the first half of the 19th. century all trees on the banks of the river were cut down for the

protection of the channel, Mr. May alone during 1831 to 1834 cut down 1731 trees. Similar process was adopted on the Jalangi, the Bhagirathi and the Kumar or Pangasi. Nadiya Jungles have been removed by successinve administrators of the District to secure lives of the inhabitants against wild beasts. Every district has the same story to tell. At any rate, the utility of forests and vegetation as means of protection lands from rapid erosion can not be too strongly emphasised. Mr. O'Malley has said : "Last but by no means least, forests are of primary importance, in preventing erosion and in conserving and regulating the water supply. The latter function has led to their being described as the head-works of Natrue's irrigation scheme. Where the sources of a rive are protected from the sun's rays by forests, they are obviously far less liable to dry up than where the country has been denuded. Where the slopes are protected by forests, the trees and undergrowth's act like a sponge, the rain percolating through the ground gradually. On bare treeless slopes, however, the rain ploughs through the exposed soil and washes it away. The water, instead of reaching the streams and rivers gradually, swells them suddenly, with the result that there are abrupt and violent rises in their level, which cause floods or even changes in the river courses, in the plains below."* It is therefore clear that forests and trees can check abrupt floods. Recent deforestation in the mountains and the slopes goes to account for floods that are taking place oftener than before.

(d) Railways :

Besides, the railroads have played an enormous part in choking up the rivers and obstructing the rapid streams. The Khulna branch of the East Bengal Railway has crossed various rivers and channels flowing north to south. They have been bridged over. The pillars have obstructed the streams. Of these rivers the Jamuna of Dinabandhu Mitra, the Ichhamati, the tortuous Betna, the 'immortalised' Kapotaksha* and the Mukteswari which once used to carry to the sea the waters of the Ganges in addition to the accumulation from local rainfall, have been seriously affected to the detriment of navigation, nay life and property of thousands of people on their banks. The North Bengal section of the same Railway has prevented the rivers from flowing easily to the Ganges and the Brahmaputra. In tracing the causes of the last great flood of North Bengal, the experts were of

---

* L. S. S. O. Malley : *Bengal,* pp. 101-2.

* Michael Madhusudan Dutt's Works

opinion that the Railway embankments and insufficient arrangement for passing rain waters had largely been responsible for that disastrous flood. Atrai and its various tributaries have been bridged over in many places and consequently free flow of the hill torrents has been abundantly impeded. The high levels raised for railways have created many backwaters which ultimately lead to insufficient drainage and imperfect irrigation. In the same way, the Railway passing through Bankura and Midnapur has also checked the tributaries of the Hooghly.

Railways are undoubtedly a source of blessings to Bengal but at the cost of a natural source of blessings viz Rivers. In America, France, Germany and even in England Railways only supplement waterways. In those countries the State is spending freely on the regulation and improvement of rivers. But in Bengal Railways were constructed but nothing practically has been done to counteract their adverse effect on the rivers over which they have passed and to arrest the consequent deterioration which has been hastened thereby. So I am tempted to put down that the blessings of Railways have been more than counterbalanced by the deterioration of our Rivers.

The general effect of Railways may be put in a nut-shell in the words of an old servant of my grandfather, who used to say so often, "It is the Railways that have made our rice and fishes so dear, milk so rare, litigation so cheap, murder so easy and life so short." Indeed, fishes have been rare because the flowing streams have been obstructed and rendered shallow by railway embankments and bridges and fishes have migrated to deeper waters. The pasture lands and silted up beds have increasingly been brought under cultivation, with the result of large outturn of crops only to be quickly carried to distant markets. In this way, the truth of the statement can be tested by a critical study of the present day economic conditions of rural Bengal.

B. Its effects

It is, however, needless to repeat that the increasing deterioration of the rivers of Bengal, has dangerously affected the economic and sanitary conditions of her people. In hot months, people suffer from scarcity of water. Cattle perish for want of it. Agriculture is injured. Trade is suspended. Pools and other backwaters become productive of various

diseases. One instance, which has happened within recent years, will suffice. The Betna, running though Jessore and Khulna was noted for its clear water. It was navigable throughout the year. Country boats from Satkhira and other places in the South used to come up and collect things like cocoanut, tamarind, long pepper, gur (molasses), bamboo, and various other seasonal fruits such as mango, jack-fruit, bael. They were loaded with rice and paddy from the *abad* (cultivated colonised area of the Sundarbans). Jute was also exported to Calcutta by boats from Kushadanga, Kalaroa, Jhaudanga and other small trade centres on its bank. Unfortunately, the river has been very recently choked up with water hyacinth. Hundreds of villages used to derive their water supply from this river. It is easily imagined what has been the condition of the inhabitants of those villages who were never prepared for this eventuality. It has now been a source of considerable insanitation. Malaria and epidemics have run mad in the villages on its bank. The same conditions prevail in parts where rivers and creeks have been choked up. Blocked drainage, closed navigation and insanitation are the products of the deterioration of rivers.

With the increasing colonisation and reclamation of lowlying areas in the Sundarbans by protective embankments, the tidal offshoots have been deteriorating. The effect of this deterioration is the blocking of the drainage of the country to the North where lands are shut off from normal flood of salt water and there by rendered fit for cultivation. But the interior low lands are thus never flushed with water nor are they drained ; the result is water logged and Malaria-ridden regions. Such conditions prevail over a large area in the delta and investigations have been carried out to ascertain how this question of blocked drainage can best be dealt with and how the establishment of similar conditions in other districts can be guarded against.

Its Remedy

"The remedy is a double one, firstly, to flush the areas with silt-laden water from the rivers and secondly to prevent undue flooding by means of regulating works which, while draining away the surplus, will submerge as large an area as possible without causing damage to crops, thus destroying the breeding grounds of the Anopheles."* An example of a project of this

---

* *Irrigation in India* : Review of1917—18 : p. 30.

nature is the Magrahat drainage scheme. It has therefore been rightly said that the question of sanitary drainage is of vital importance to the well-being of Bengal.

It is now well-known that the embanking of tidal spill areas has caused a large rise in the tidal levels in the last 60 years, while where such reclamation or protective embankments has not been carried out the levels rule much lower. "A direct connection between reclamation and deterioration of the rivers, leading to insanitary conditions, has been clearly established"; and it will shortly be possible to forecast the effect of an extension of reclamation operations upon other parts of the delta. The tidal system is complicated. It needs a close study. Already as a direct outcome of such study, certain important works have been put in hand such as the Bidyadhari spill operations, Semi-Canalisation of Tolly's Nala and the Kankrabunia cut in the western Sundarbans. The object in view is to bring nature to the aid of man so that such works may, as far as possible, be self maintaining. "The tidal problem affects drainage and sanitation as well as navigation."†

The problem Stated

Rivers of Bengal can now be divided into three main groups viz. : (a) Torrential (b) Slow and sluggish and (c) dead rivers. They are to be classified again regionally into four principal systems : viz, (1) the Ganges (2) the Hooghly (3) the Brahmaputra and (4) the Padma-Meghna system. The Ganges and its dying distributaries serve central Bengal, the Hooghly and its tributaries supply water to west Bengal, the Brahmaputra and its western tributaries drain North Bengal and the Padma-Meghna East Bengal. The East tributaries of the Brahmaputra and the Meghna wash the Eastern districts of Bengal. Of these systems, the torrential rivers need control and regulation, slow and sluggish ones require thorough and constant dredging and the dead ones need excavation and canalisation. Accordingly the problem of Bengal Rivers is nothing but their regulation, control and improvement, and the regulation works must constitute one of most important and permanent departments of Bengal administration. Happily, the government has leen convinced of the practical efficacy of dredging as a means of retarding the deterioration of rivers. The problem is of national importance. With it are

† *Irrigation in India* : Review of 1918—19 : p. 13.

indissolubly bound up the problems of health and wealth of Bengal. The resuscitation of her rivers must precede all economic and hygienic transformations.

V

Efforts of the Government

To give the devil its due, I must not omit to mention that Bengal government has not been altogether indifferent to the baffling problem of rivers under its jurisdiction. Works of improvements have from time to time been undertaken since 1813. Experts like Mr. May (1820), captain Lang. (1848) were appointed for the regulation of the Mathabhanga and men like captain Haig and Rundall (1873) for the canalisation of Midnapur, Burdwan and Hooghly Channels. In 1860, the Karatoya was improved and deepened for navigation. The improvement of the Madaripur Bill Canal was taken in hand in 1895.

Drainage Projects

Besides, the drainage schemes of the District of Hoogly, of Hijili in Midnapur (681 sq. mile), of Magrahat in 24 Parganas and of Jhinkargacha in Jessore ; dredging operations on the Hooghly and Karnafuli and flood embankments on the Feni in Noakhali and the Damodar deserve special mention.

There were other drainage projects under investigation or awaiting sanction in 1918-19 ; viz, the Baitgachi gang ; the Betna Kodla (300 sq. m.) ; the Harihar Mukteswari (160 sq. m.) ; the Jaboona (362 sq. m) ; Nowi-Sunthi (146 sq. m.) ; Gangakhali Soadighi (82 sq. m.) ; Bulbe Bil (90 sq. m.) ; Anojna (74 sq. m.) ; Dhunia (51 sq. m.) ; Ampta (128. sq. m.). The Magrahat drainage scheme has recently reclaimed a swampy area of 290 sq. miles at a cost of 21 lakhs of rupees, where formerly the inhabitants were to be "inured to a semi-amphibious life by a long course of preparation resulting in the survival of the fittest." Several similar schemes have been investigated or are under investigation, of which sixteen have been estimated in more or less detail ; an expenditure of a crore and a half of rupees is anticipated and some 3,100 sq. m. are involved. The largest project estimated is one for dealing with 681 sq. m. in the southern portion of the Midnapore District. This is called the Hijili Drainage project. It will follow the lines of the Magrahat scheme and is estimate to cost Rs. $46\frac{1}{2}$ lakhs. The

project comprises a large tidal sluice discharging into Hooghly estuary near the mouth of the Rusulpur river, the closing of this river and the excavation of the silted drainage arteries. Another large project under investigation is that for the Bhairab in Jessore, where, levels permitting it is intended to distribute the present spill of the Ganges over the western portion of the district which at the present day receives no flushing and is a country of dead spill rivers where malaria finds a congenial home ; it is expected that about 800 sq. m. will be benefited by this project.

Canalisation

The Bhairab scheme has been under consideration for several years past, but nothing is yet settled. From the Governor's speech at Jessore in winter 1924, it appeared that the scheme would need further consideration. But I have to say that in the matter of canalising a river, delay is dangerous, because the more you wait the more you make room for further expenditure.

A project of a different type is that of the resuscitation of the Bidyadhari river which discharges the drainage and storm water of the town of Calcutta. This river is a Sunderbans tidal creek which was kept alive by spill into the salt lakes to the east of the town ; owing to reclamation by embankments, the spill has been almost entirely cut off and the deterioration of the river which set in about 20 years ago had reached the point at which the Municipal drains became surcharged and the lower portions of the town flooded after every heavy fall of rain. It was decided to restore the spill into the lakes in-order to scour the river. Operations were commenced in June 1917 and by the end of March 1918 had resulted in a decided improvement to the river. ... In the wider reaches of the river a cheap type of spur has been made to encourage silt berms to from so as to concentrate the current and create a central scour in the bed.*

Dredging

The dredging operations have made the channels of the Hooghly and the Karnafuli safer and navigable by larger vessels. "That the Hooghly is navigable by sea-going steamers is one of the many triumphs of human

---

* *Irrigation in India* : Review—1917-18 p. 31.
† L. S. S. O'Malley : *Bengal* : p. 58.

skill over the obstacles imposed by nature, for its passage is rendered difficult not by rapid currents and the rise and fall of the tides but also by shoals and shifting sand banks. The most notorious of these are the James and Mary Sands (Jàlmari or deadly waters) which owe their formation to the intrusion of the waters of the Damodar and the Rupnarayan,"†

Nadiya Rivers

In 1781, Major Rennell recorded that the Jalangi, Mathabhanga and Bhagirathi, the distributaries of the Ganges, together called the Nadiya rivers, were usually unnavigable in the dry season. In 1797 Captain Colebrook was also of opinion that none of these rivers was to be depended on. In 1813, measure were taken to improve the Mathabhanga but with little result. In 1818, "the obstructions had been so many and dangerous as to cause the wreck of innumerable boats and to entail heavy losses on account of demurrage paid for detention of ships waiting expected cargoes. The merchants of Calcutta in that year urgently petitioned the Government that steps should be taken for remedying an evil which the commercial interests suffered so severely."‡

In 1819, Mr. C. K. Robinson succeeded aprtly in clearing the mouth of the Mathabhanga from the sandbanks which had formed over sunken boats, timbers and rafts. The river was rendered navigable up to the point where the Kumar branches off to the East.

In 1820, Mr. May tried to improve the navigation of the Mathabhanga by means of (a) *Bandhals* (wattle rocks) and (b) *Jhamps* (screens) and to train and concentrate thereby the current into a narrow channel. The current so regulated cut and bore downstream the sand in its course and deepened the channel. In 1821, the river, again fell to its usual dry season level. Next year the question of rendering the Nadiya rivers permanently navigable was taken up by the Government. Mr. May held that the changes in the great river Ganges rendered permanent navigation difficult, if not impossible, in its Nadiya distributaries. He supported his view by the annual shifting of the Mathabhanga and the Bhagirathi heads which in no two seasons in his experience had remained the same. He thought, with two steam dredgers of 2 H. P. each, he would be able to keep one of the three rivers open throughout

‡ W. W. Hunter : *Statistical Account of Nadiya.*

the year for boats of 500 mds, or 18 tons. Accordingly a dredger worked by oxen was sent to him but could not be utilised. In 1825, he again recorded his conviction that with the aid of powerful steam machinery, one of these direct routes from the Ganges to Calcutta could be kept open for the largest boats throughout the year.

The shifting nature of Bhagirathi, however, baffled all engineering skill. The Jalangi was in a much more favourable state, but it was much more tortuous in its course and hence inferior to the Bhagirathi and the Mathabhanga as a channel for expeditious transit and that the narrow and long windings were injurious to navigation. Besides the fall or general slope of the surface of the Jalangi was so much diminished by the windings of its channel and the velocity of the current in consequence was abated so as to lose the force required to carry off the alluvial substances with which it was loaded in the rainy season. Mr. May advocated a plan for the improvement of the general navigation of this river by a series of cuts through the necks of the larger bends, there by greatly shortening its course and by an increaesd current obtaining a greater depth. He estimated the expense of effecting the cut above the station of Krishnanagar at £ 7000. But the proposed cut was never made for reasous best known to the Government.

Mr. May's further plans for the dredging and excavation of the Mathabhanga and the Pangasi were not executed. The report on the work done by him during 1831-34 showed that 395 *bandhals* had been constructed on the different rivers, 118 sunken boats, 219 trees and timbers worth £10,000 were removed, 1731 trees cut down on the banks to prevent them from falling into the streams. He explained that the extraordniary deviations, annually occurring in the course of the Ganges, affecting as they did all the streams that flowed from it, rendered it impossible to lay down one fixed rule of guidance or plan of operations by which the navigation of the Nadiya Rivers could be permanently maintained.

In 1848, 14th July, captain Lang sent his report to the Government in which he said, "The Jalangi and the Mathabhanga require dredging, spurs of stakes, and *bandhals* to keep them always navigable. If left to themselves, they form sandy shoals and navigation becomes impossible soon after the commencement of the cold weather."*

---

* W. W. Hunter : *Statistical Account of Nadiya.*

The cost of these few operations was recovered from the collection of tolls. In 1861-62, the net toll amounted to £14,212-19-0 and in 1870-71 to £15,548-18-0. It was therefore a productive expenditure that the government of Bengal had to incur for these works.

The condition of these rivers varies from year to year and all attempts to permanently control the changes in their channels have failed again and again. The distributaries running though a soft alluvial soil, are subject to impossible floods, enormous deposits of silt and to sudden variations or divergences of their course from the erosion of their banks and the opening of new channels. Nevertheless, the government Engineers have never ceased to maintain the rivers as effective highways of commerce. The government of Bengal are now considering whether it is not possible to improve these rivers and restore their former navigable conditions, especially as their deterioration has probably led to a considerable decrease in the fresh water supply to the Hooghly......The deterioration which has taken place in these direct river connections between Calcutta and the Ganges is a matter of grave concern, not only from the point of view of navigation but from that of sanitation also.†

Control of the Ganges

To my mind, no operation, however expensive, on any of the Nadiya rivers will be successful unless the Ganges is thoroughly regulated and trained. Therefore the regulation and control of the Ganges must precede all improvements on these distributaries. No body seems to have ever ventured to make any plan for controlling and training the Ganges. We also think that against the mad course of the Padma, the Meghna all human skill is of no avail. But in the West science being applied to rivers has achieved the impossible. If the mighty Mississipi, the violent Rhone, the overflowing Nile and the surprising Elbe could be trained and regulated, it is not at all impossible to control and concentrate the treacherous Ganges, the deadly Damodar, the evershifting Brahmapura and the torrential Tista. We are only to remember that larger problems need larger schemes and still larger means to put them into execution and above all the community of will. The large rivers of North America have been regulated in many places, where deficient

† L. S. S. O'Malley : *Bengal* : p. 58.

in depth, with successful results and some of the large rivers of Germany and also the Danube have been improved for navigation by systematic regulation works. Uniformity in depth, slope and width of the Rhone has been secured by the regulation of its sides as well as bed.

Effects of local work

It is however to be noted in passing that the *bandhals* regulating the Nadiya rivers have proved indirectly injurious to the rivers of Jessore, Khulna and 24 Parganas. The numerous *bandhals* constructed on the former caused the sands to be driven to the lower channels and deposited there. Thus the points where the Bhairab, Ichhamati, Betna, Nabagnaga, Kapotakshi and others have branched off have been choked with large collections of sand carried by the concentrated currents. Evidently Mr. May did not rialise that any partial regulation of the channel only shifts the position of the shoals and obstructions. The dying rivers of Jessore would not have been brought to the present state, if dredgers were employed on them simultaneously with the improvement works on the Nadiya rivers. Mr. Harcourt warns and rightly, "Any regulation works in rivers carrying down considerable quantities of detritus must not aim at local isolated improvement in depth, but must be carried out as a complete scheme,"* The Mathabhanga scheme only aimed at local uniformitiy in velocity but the effect on the streams futher down has been disastrous. The rivers of Jessore have ceased to receive the supply of water from the Ganges and the fertilising floods from active streams. Now the land lying between the Bhagriathi and the Madhumati is a typical delta in which the process of land formation has nearly entirely ceased. "The rivers no longer distribute the silt-laden waters of the Ganges, being locked into their channels by the high banks of silt which they have deposited."† Thus the experimental but unsuccessful regulation works on the Nadiya rivers alone have proved as unmitigated curse to Central as well as East Bengal in disguise of a blessing to the foreign merchants of the 19th century.

The Mathabhanga scheme was taken up in earnest only when the merchants pressed the Government. Central Bengal distributaries having been choked up, East Bengal has been Subject to more frequent floods. The

* L. S. S. O'Malley : *Bengal* p. 6.

currents carrying down the rain water from the hills force their way towards the east seeking lower channels and cause in their course enormous devastations to Eastern Bengal plains. The Central Bengal distributaries, if active, would have checked to a great extent inundations that are now happening from year to year in Eastern in Bengal.

Canal projects

In 1865, Mr. Leonard submitted his report on the Hooghly in which he remarked, "The channels of the Hooghly and its tributaries are constantly shifting. The cause of the formation of bars in the channels is more complicated. The river widens or a sudden bend occurs and the consequence is a tomporary diminution of velocity."* Major Rennell found many of the Hooghly tributaries since silted up, actively draining the whole of Burdwan Division. But having been allowed to run in their natural course, these rivers in less than 100 years deteriorated and by the year 1865, the navigation and irrigation; health and sanitation, of Midnapore and Hooghly became matters of anxious considoration for the Government. Accordingly in 1873, Colonel Haig was appointed to effect the high level project of Midnapur for the progress of irrigation and navigation and about the year 1880 several drainage schemes for Hooghly were proposed on the Report of the Sanitary Comissioner for improvement of general health agriculture and for the eradication of the 'New fever' now called Malaria. The works of the main canal of Midnapur as originally designed consisted of two regulating weirs and three navigable canals. It intended to afford a continuous navigable channel of 53 miles from Midnapur to Uluberia.

It takes off from the Cossye river near Midnapur and runs eastward to Uluberia on the Hooghly below Calcutta ; it is divided into four main sections by the rivers Cossye, Rupnarayn and Damodar. Its construction was originally commenced by a private company, the East India irrigation and canal company in 1860, and it was to have formed part of the projected Orissa canals, one of the links in the great series of canals designed to connect Calcutta with southern India. The work proved a failure and it was taken over by government in 1868. The Midnapur canal is divided into eight reaches and has two sets of head works, one at Midnapur and the other at

---

* † L. F. Vernon-Harcourt : *Rivers and cannls* : Vol I ; p. 58.

Panskura both on the Cossye river. The first six reaches are utilised for both navigation and irrigation purposses, the lower two reaches which are low level or tidal canals, being used for navigation only, the supply being maintained by the Rupnarayn, Hooghly and Damodar rivers. The capital cost of the canal up to date is 85 lakhs of rupess. The system, which now consists of 324 miles of irrigation and 70 miles of navigable channels, irrigated 86,786 acres is 1917—18 ; the maximum area irrigated in any one year was 104,000 acres in 1881—82.

The Eden Canal is a small work primarily to flush some of the natural channels and old river beds in the Burdwan and Hooghly districts with water from the Damodar and thus to provide a good supply of drinking water. A severe epidemic of fever in 1861—62, which was attributed to the stagnant and insanitary condition of the natural water-courses, brought about by the exclusion of the flood spill of the Damodar river by embankments, led to measures being proposed to improve their supply, and in 1873 work was commenced. The system was opened in 1881 and the value of the canal for irrigation purposes was immediately realised. Regular irrigation commenced in 1889 and in 1892-93 the maximum area irrigated in any one year, 71000 acres, was obtained. Owing to the uncertainty of the supply from the Damodar the average area annually irrigated is only about 24000 acres, but a new channel, with a sluice and stop dam, is now under construction with a view to improving these conditions. It is also anticipated that the proposed Damodar canal, now under considearation, will, if constructed, materially improve the financial prospect of the Eden canal*

Causes of Malaria

The improvement of drainage in Hooghly district was strongly urged on the ground of widespread fever and epidemics. The sanitary commissioner wrote in 1870 : "The most important of causes of Malaria are insufficient drainage, partial or complete obliteration of rivers and the pernicious state of soil, air, water which is thereby produced. All the other cauese stand for little as compared with this."

Mr. James Fergussion in his *Gangetic Delta* observed :

---

* *Irrigation in India* : Reveiw of 1917—18 p. 24-25.

"On the regime and varying phenomena of Indian rivers, particularly on their drying up and disappearance, depends largely the health of the people of Bengal. Given a stagnant, foul, shallow—it may be half-dried—waterway one may generally expect to find in the persons of those residing near it the distinctive *cachexia loci* implying debility, sickness, spleen disease and short life. Hooghly fever is due to such conditions. The origin of the evil is obstruction to drainage, the drying up of an impure, moist, unaerated surface soil and the defilement of drinking water caused generally by half-burnt dead bodies and undestroyed rags. When such conditions obtain, air can not be pure."

Remedy for Malaria

"The most important fact to remember is that the remedy lies in effectual drainage and in the opening out either of dead rivers or new channels of overflow. The experience of many countries has established this beyond all dispute ; and it has frequently been observed that diminution of malarious disease has kept pace with the improvement of wet land ... It can not be reasonably disputed that there does, in very many instances, exist a general relation between the extreme unhealthiness of places and the proximity of old river channels in a half dry, filthy state. It is a commonly accepted belief that the immediate vicinity of obliterated water ways coincides with the severest manifestations of disease, whilst at the distance of two or three miles from such half-dried channels the rates of sickness and mortality manifestly decrease."*

Many Cities disappeared

It is a matter of History that the ravages of fever which occurred at Cossimbazar some 90 years ago, were coincident with an alteration in the course of the river Hooghly. A similar fact has often been noted with reference to ancient Gaur. † Sree Nagar, the capital of Raja Krishna Chandra of Nadiya, was deserted on the outbreak of a terrible epidemic which owed its origin to the disappearance of the offshoot of the Ichhamati that used to drain the capital. The channel was gradually silting up and with it the

---

* J. Fergusson : *Quart. Jour. of Geol. Society,* Vol. XIX.

† W. W. Hunter : *Statistical Account of Nadiya and Hooghly.*

sanitation of the locality was also slowly growing worse but the Rajah did not take any notice of it nor could he think that it was easy for him to render the channel active and improve thereby the sanitation of his capital.

The Fever commission of 1864 noted that sickness and mortality were observed to occur in the low, ill-ventilated villages lying along part *nalas* such as the Bangnadi, upper Nabaganga, Bhairab and Chitra in Jessore. In European countries the same thing has often been observed.

A study of the ruins of the Indigo factories, the deserted, now jungle clad, villages and dried up beds of the rivers that once washed the walls of those factories and the buildings of notable families of old will thoroughly convince one that with the obliteration of those creeks and channels, streams and rivers, the Nature's source of water supply and means of drainage, many prosperous centres of economic activity and numerous villages of fame and wealth, have disappeared and now lie shattered together only to remind one of the days that are no more.

Schemes and Results

The Government on the report of the sanitary Commissioner took action and sought expert advice. Accordingly four important drainage schemes were proposed for the District of Hooghly : viz.

	Area	Estimated cost	Number of acres drained.
Ampta Scheme	84 sq. m.	£67,000	
Rajapur ,,	90 ,,	£72,000	
Howrah ,,	48 ,,	£38,000	
Dhankuni ,,	69 ,,	£48,000	
			67,800

But they were not completed. These original schemes were abandoned. Recently new projects have been under consideration. Of these the Ampta project will cover 128 sq, miles. In 1918-19, it was awaiting sanction.

Of the examples of canalisation for navigation the foremost are the Calcutta and Eastern Canal system and the Madaripur Bil Canal which are already accomplished. Of the projects under consideration, the largest navigation project is for the construction of the Grand Trunk Canal to connect Calcutta with the main River system of Eastern Bengal for the

purposes of inland steamer traffic. The Calcutta and Eastern Canal system provides for steamer and boat communication between Calcutta and Eastern Bengal through Sundarbans. The system comprises a total length of channel of 1,184 miles. The Madaripur Bil Canal which connects the Madhumati and the Kumar rivers in Faridpur was originally a part of the Calcutta and Eastern Canal system. In 1895—96 its improvement by deepening and widening was taken in hand with a view to shorten the distance for inland steamer traffic. The canal is 21 miles long and passes through the centre of the great Madaripur Bil in a north-easternly direction. When the Ganges and Brahmaputra rise in flood, a general spill takes place into the bil from the Madhumati and Kumar rivers. The water entering the bil from the former river caused a heavy deposit of silt in the mouth due to the velocity being checked and large sums have been spent in an endeavour to keep open a navigable channel with powerful suction dredgers. The result was not satisfactory. After closer investigation, it was decided to control the water levels in the bil by means of an embankment and regulators on the south bank, so that a through westerly current would be induced which would prevent the Madhumati water entering the canal. These works were completed in the year 1916—17 and have proved a complete success. These works paid a return of 7 percent, in 1916—17 and $6\frac{1}{2}$ percent in 1917—18.

The canal forms a short route to Eastern Bengal and Assam, the distance being 115 miles less than by the Barisal route to the south ; in 1917—18, 5634 steamers and flats used this route transporting 390 lakhs maunds of cargo.

On the Calcutta and Eastern canal system the Gabkhana-Bharani khal was improved by widening and deepening its channel for shortening the route from Khulna to Barisal. The channel is expected to be self-maintaining. It is now used by the Khulna-Barisal mail steamers.

In addition to the maintenance of these canals considerable amount of work is done by the Bengal P. W. D. in connection with the improvement of inland waterways to provide better facilities for inland steamer and boat traffic and two suction dredgers are kept constantly at work. These dredgers are engaged in removing shoals and spits on the steamer route, widening and deepening existing channels and providing shorter route to river connections. The amount of work offering for this class of dredger is more than the present plant can cope with, and the want of a larger fleet is much felt.

Between Rajmahal and Gualando, the Ganges presents many difficulaties to navigation. Very careful watching and immediate action are necessary, as, unless shoal formation is rapidly checked, the subsequent difficulties are considerably increased.*

One more instance of canalisation for navigation is worth mentioning. The rapid silting up of the Karatoya and the diversion of at least half of its waters seem to have drawn attention specially about 1850. In 1854 an Engineer was sent to devise means of improving the bed of the river. In 1856, Act XII enacted provisions for "establishing a toll on boats and timber passing through the Karatoya river in the District of Bogra." This measure was so framed as to cover the proposal made by the Hon'ble Prasanna Kumer Thakur C. S. I. to undertake the scheme at his own risk. The river was rendered navigable by the work completed in 1860. The improved river increased traffic and the number of merchadise boats. But the river was again left to itself and the depth of water decreased. The toll was at last withdrawn.†

A further instance of training the currents of a river is furnished by the Damodar flood embankments. Colonel Gastrell discussed, at length the problem of the Damodar in the Bankura Revenue Report of 1863. He wrote, "The flood waters of the Damodar have long been a source of terror to Zemindars and cultivators of land on its banks and of trouble and expense to Government. Embankments have been erected, originally from Bara Indigo Factory in Bankura, along the whole length of the stream southwards. But accidents were constantly happening ; and when an embankment did give way, the consequences were most disastrous. Among other projects for improvement, that of allowing the surplus waters of the Damodar to find their way into the Hooghly above their present entrance and through some of the khals supposed to be old beds of the Damodar was proposed and though many natives were anxious to have a scheme of the kind carried out that they might benefit by surplus waters and so convert that, which was a curse, into a blessing, the project was set aside, seemingly because it was apprehended that it might prove injurious to the navigation of the Hooghly if the waters were admitted above or below Calcutta or at any other than the present entrance."

---

* *Irrigation in India* : Review 1917-18 : p. 27.

† W. W. Hunter : *Statistical Account of Bogra.*

A careful study of the old charts of Rennell, De Barro and Van den Brouche will show that no such danger need have been apprehended, could the old entrance into the Hooghly have been reopened for here we see the main channel of the Damodar opening into the Hooghly 14 miles above the present entrance, then but a small stream, and a better channel than now exsiting in the Hooghly. If then, the surplus waters of the Damodar could again be thrown into the Kanson Khal or Kana Damodar and thence into the Hooghly it would simply be a reopening of a course once followed by nature and which the soundings show to have been beneficial rather than otherwise to the navigation of the river Hooghly.*

"Nothing could be more unhappy than the angles at which the two rivers, the Damodar and the Rupnarayan now pour their waters into the Hooghly whereby both create extensive backwaters and form large sand banks ; whereas could the Damodar be trained back into and held in its old channel, the combined force of its stream and of the Hooghly acting as they then must do, in concert, would probably prove too strong for the opposition met with at the Rupnarayan. The navigation will be greatly improved." Indeed a glance at the general run or direction of the Khals, old river beds and jhils, between Salimpur on the Damodar at the mouth of the old Kana Nadi and Uluberia, would show very clearly that a connection between the Damodar and the Hooghly had once existed through them.

The effect of the embankments has been in many ways more injurious than beneficial, because the floods, have not been controlled at the source or at upper level. Excessive rainfall still causes floods that often defy the embankments and bring about immense ruin to the life and property of the people on the Damodar. The embankments themselves have been a perpetual source of insanitation. They are now covered with dense jungles which provide hiding places for wild animals. The ultimate effect of the embankments also has been exceedingly serious upon the drainage of the Damodar basin. In 1870, the Sanitary Commissioner reported : "In consequence of the embankments on the Damodar, the rivers and khals throughout the district have been steadily silting up. They have also been further obstructed by weirs or dams thrown across them for local irrigation, fisheries or the like, converting the old reaches of the river into a series of

---

* W. W. Hunter : *Statistical Account of Hooghly.*

pools. The bed of all the water courses are thus being gradually elevated or 'honey combed'; even rainwater is unable to flow any distance."

The question of the floods in the Damodor river was prominently brought to notice by the flood of 1913 when the embankments were seriously breached, causing severe distress and damage. The river is wholly embanked on the left bank ; on the right the embankments were cut down in the middle of the last century for a length of about 35 miles in the Burdwan district to afford an escape for the water to the Rupnarayan. On account of the deposition of silt on that bank the river has virtually restored the old embankment, portions of the land having been raised 12 ft in the last 60 years. Flood levels have in consequence risen and left embankment is now held with difficulty. In addition, the erection of the Zeminderi embankments at the exit into the Rupnarayan has obstructed the free discharge of flood water into that river. The remedy which is being applied is two fold ; firstly to open up the exit channels to the Rupnarayan so as to release the floods and secondly to regulate the floods near their source in the Chota-Nagpur hills. The first remedy is being given effect to by the indenting of the Buxi and Hoorhoora khals by throwing back the main Buxi khal embankment ; the Ghesapatty khal is also under excavation which will discharge a portion of the spill water back into the lower reaches of the Damodar.*

The preliminary work in connection with the enquiry by a special officer into regulation of the Damodar and Barakar rivers has been completed ; suitable sites for two regulating reservoirs have been found in the upper reaches of the Barakar valley and a third in the Damodar river catchment.

The Adjai flood question is also receiving attention.†

The embankments would have proved immensely beneficial if along with them the natural beds of the rivers that issued from and flowed into the Damodar would have been kept active by continuous dredging and excavation. The evil consequences of the Damodar embankments reminding us of the evil effect of the perennial irrigation system introduced in the Nile Valley that replaced the natural or basin irrigation through the construction of level embankments and transverse walls. It has led to the illdistribution of the fertilising mud, the most valuable gift of the Nile floods to the

---

* *The Irrigation in India* : Review 1917-18, p. 31.

† Do 1918-19, p. 13

Egyptian Fellaheens. The consequence has been the deterioration of Egyptian cotton both in quality and quantity. Yet the Nile has been thoroughly navigable throughout. That is a splendid achievement of Engineering in a region where modern conveyances have not yet been widely available.* By embankments the Damodar basin has similarly been deprived of the benefits of natural manuring. The soil has recently deteriorated in fertility. It once used to yield cotton, mulberry and wheat.

The improved Karatoya would have still acted as a valuable means of transportation in North Bengal if the perennial dredging scheme had been in operation ever since the canalisation was completed. After the improvement the river was again let alone and it naturally reverted to its old condition.

Results of the Govt efforts

From what I have said so far about the part played by the Government of Bengal in the improvement, regulation and control of the rivers, it is abundantly clear that efforts were made to meet some local conditions only. The Bandhals and Canals, Bamboo-screening and dredging, regulating weirs and embankments are the few means that the P. W. D. resorted to from time to time. They produced only temporary results but could not effect any permanent improvements, because all those regulation works were temporary and isolated. No training works can succeed unless they aim at a complete scheme covering the rivers from their source to the sea. Accordingly, before any scheme is adopted the physical conditions of the rivers must be scientifically studied.

Here lies the work for the Engineers of Bengal.

VI

Efforts in the West

For the training of our rivers we have to follow the example of France, Germany and America. It is therefore necessary that before I suggest means as to improve our river systems I should enumerate in some details the various methods employed in Western countries where the *regulation,*

---

* J. Mc Farlane : Economic Geography.

improvement and control of rivers constitute one of the most difficult and at the same time one of the most important branches of civil engineering. Rivers are with the people of the west a living problem for which money is spent freely and brains are always at work in discovering newer and newer schemes to meet the everchanging conditions of their rivers.

The rivers are regulated so that they may be well-adapted for navigation. Straight rivers with a fairly uniform depth and width and consequent regular flow with neither scarcity of water in dry weather, nor too full and rapid a flow in flood time are seldom found. There are torrential rivers with great variations in their discharge and depth. There are others with their shifting beds. To render these rivers suitable for navigation, their depth and flow should be made fairly uniform by removing the shoals and regulating the rapids. Therefore in the west, the regulation of rivers includes various methods, some of which are discussed here.

a. Removal of Shoals and Obstructions

The detritus carried down by the current forms the shoals which are dredged away and the obstructions forming rapids are removed. But this simple expedient is liable to prove nugatory if supplementary works are not carried out. Because shoals are soon formed again by fresh detritus, owing to the enlargement of the sectional area of the channel by the dredging and the consequent slackening of the current. Similarly the removal of obstructions forming rapids lowers the water level above and causes the shallowest parts of the upper channel to become fresh impediments to navigation.

b. Contraction of Channels

The permanent method of removing the shoals formed by the accumulation of detritus is by reducing the width of the channel and there by increasing the scouring capacity of the current, which being reinforced secures the maintenance of the increased depth by natural means. But unnecessary contraction must be avoided.

c. Cross Jetties

In wide shallow reaches depth of a river is generally increased by the erection of jetties or groynes projecting at right angles from the banks into the channel at regular intervals. The jetties must not be placed far enough apart

o

for the sake of economy. Then they will not deepen and regulate the channel satisfactorily. The channel tends to take a circuitous course between the cross jetties and encourages shoals to settle in the intermediate spaces.

d. Longitudinal training Banks

The channel of a constantly shifting river can be effectually trained by longitudinal embankments along its course. The natural banks subject to erosion are replaced by stable artificial banks affording a suitable width of the channel, "These banks are ordinarily made of continuous mounds of rubble stone or chalk, protected if necessary on the face by pitching or concrete and secured sometimes at the toe from undermining by stakes of piles."*

For want of solid materials, mattresses weighted with stones or clay are used with advantage. In cases where the alluvial matter is fairly light, floating bundles of brushwood or fascines attached to a pole or cord, resembling large weeds growing from the bed of the river have been successfully employed for training the Missouri and Isar.†

When the accumulated detritus divides the channel into two branches, two of them do not afford the same capabilities for navigation as the undivided channel. In that case one of them is barred to secure a better depth in the other. The barred one passes the floods and the open one is rendered thoroughly navigable.

e. Protecting & Easing bends

The concave bank of a river is always subject to erosion and its sinuosity through alluvial plains tends to increase to the detriment of navigation. Often the river in flood time opens out for itself a more direct channel if it gets a flat land. To protect the river from growing unduly tortuous, the concave bank is protected by fascines, stakes or stones ; or the current is kept off from the bank by short projecting spurs of stone or brush wood at a low level. This method straigthens the low water channel and reduces the excessive depth near the concave bank.

---

* L. F. V. Harcourt : *River*, Vol 1, p. 54

† *Report of the chief Engineers,* U. S. A., 1879, part 2., p. 1051.

A flatter training bank is often erected in front of the concave bank where the curvature is already excessive. But in any case the width of the channel must not be narrowed at a bend without a corresponding modification of the channel between the bends. The curvature of the Rhone has been eased and its current regulated by these methods.

f. Straight Cuts

By cutting a straight channel at the necks of tortuous bends a river may be rendered more convenient for navigation. The length is reduced and the depth of the new cut is ensured by the increased fall. The cut must be made where the current is gentle and the banks of the cut at its upper end should be protected from erosion and also the banks of the river just below the cut or fresh sinuosities will begin to develop eventually. Such straight cuts were proposed by Mr. May for regulating the Jalangi.

g. Submerged Cross Dykes

A river can not be fully trained and regulated without securing a uniform depth by protecting the bed from undue erosion. The bottom of the river exhibits variations in depth due to the changes of the scouring current differences in the constitution of the bed and irregularities in fall. Uniformity of width is accomplished by training banks. And uniformity of depth can be secured by depositing dykes of rubble or mattress sills across the channel in deeper places but kept below navigable depth in the main channel. These dykes will also prevent the river from flowing down too fast. The eroded hollow at the foot of a rapid is thus regulated.

This method of regulating the bed as well as banks of a river has been adopted for many years on rivers in Germany and has been more recently applied to the Rhone below Lyons. The Elbe has been trained by a combined system of longitudinal banks and dipping cross jetties with submerged dykes at the end of some of the cross jetties to protect them and also in front of the longitudinal banks in some places to reduce the excessive depth at their toe. It has thereby constituted an important waterway for inland navigation second only to the Rhine. The Rhine has been improved by extensive regulation works. It has increased inland trade, reaching ten million tons annually in Germany alone. It has led to the

growth of Mannheim, 352 miles from the sea, as a flourishing port, with a traffic of nearly two million tons annually.*

h. Checking the descent of the detritus

The detritus descends with increasing disintegration of mountains and causes immense injury to rivers. Its descent can be arrested near its source by placing a dam at a suitable place across the valley of a mountain stream, behind which the descending detritus accumulates, another dam being erected at a fresh spot as soon as the space behind the previous one has been filled up. This system, which has been occasionally resorted to in Europe, has also been employed in California to arrest the devastation of alluvial plains caused by the mountain torrents carrying down the debris left by the extraction of gold from the mines in the hills. Similar method can be applied to check at the source the descent of detritus down the Damodar, the Adjai and the Ganges. But the sources of rivers being often under a separate jurisdiction or in different country, this expedient can not be adopted with advantage. So the expedient of reducing the supply of detritus is resorted to. The object is accomplished by preventing the denudation of mountain slopes from reckless clearing and by encouraging the growth of trees and vegetation in exposed parts. This course diminishes the supply of detritus and equalises the flow of currents.

All these regulation works must aim at three things at the same time : viz ; uniformity in (a) depth (b) slope, and (c) width, otherwise the results will not be satisfactory and permanent.

i. Protection from Inundations

In Bengal floods are confined to the rainy season but in the temperate zones floods occur in the cold season and often in the warm half of the year, especially where the river basin is mainly composed of impermeable strata. At any rate, the raifall is the index of the advent of floods. In the west, at every season the causes of floods are systematically studied beforehand and floods are prdicted at different stations on the rivers so that people in the plains may get aware. Floods occur first in the upper portion of the main river and the several tributaries and next they pass off to the plains. Floods

---

* L. F. Vernon Harcourt : *Rivers*, vol I p. 60

affect the plains more than the hills because the agricultural value of the hilly districts is comparatively small. The time the floods take to reach the plains depends on various factors such as the steepness of the regions through which they pass, the time they take to reach the maximum on the main river and its tributaries, the distance they have to traverse, the rate of their propagation and the permeability or impermeability of the strata over which they flow.

Predicting floods

"By erecting gauges at suitable places on each tributary of a large river, noting the heights attained by floods and telegraphing the results to stations on the main river and by observing the periods occupied by the floods on the various tributaries in reaching the several points on the main river, it is possible to predict with considerable accuracy the time of the arrival of the top of the floods at a given place on the main river and the height likely to be reached by the river some two, three or more days before the advent of the flood."* This system of prediction of floods was established in the Seine basin by Mr. Belgrand in 1854 and has also been adopted in the Loire, the Garonne and the Saone basins and arranged for the Ohio ; whilst the floods of the Elbe are predicted at Tetschen and Dresden. It has been brought to such a state of perfection on the Seine that during the great flood of March 1876, the maximum height was predicted three days beforehand and owing to timely warning given of its approach, it did little injury. The great value of such predictions, if possible in Bengal, can not be too strongly emphasised. This system of warning, if practicable, should at once be established on the Damodar, Tista, Padma and Brahmaputra, which are so often liable in flood time to inundate considerable tracts of cultivated lands. In the west not only predication of floods but works for protection from floods are also undertaken. Protection may be sought by

a. reducing the volume of flood water

b. facilitating the discharge by the improvement of the channel

c. works for excluding the river from the low lying lands.

---

* L. F. V. Harcout : *Rivers*, Vol. I, p. 151.

Afforestation

The first object may be attained by afforestation on the mountain slopes which retards the descent of the flood waters. In some mountainous regions excessive pasturage and deforestation have led to the denudation of the steep slopes and consequent increase in the floods along the valley. Extension of vegetation or the growth of trees diminish inundations. Hence in some countries in the west, afforestation has been encouraged by special legislation.

Regulation of torrents

The rapid descent and erosive influence of torrents are arrested by erecting barriers across their channels. The velocity of the flow is thus diminished and the erosion of the bed is reduced. Besides often in the neighborhood of the sources reservoirs are provided for the storage of detritus by erecting embankments. This expedient is just in contemplation of the government of Bengal to control the Damodar flood.

Catchwater drains

The rainfall of the higher grounds can be collected by forming catchwater drains, before it reaches the flat plains bordering the river and by conveying this water through a smaller channel to a lower point of the main river the plains can be relieved of the danger of inundations.

Reservoirs for impounding floods

In order to protect the riparian lands on the river of too narrow a channel to discharge flood waters, reservoirs are formed in the valleys by erecting dams and the height of the floods is kept down in the valley below by impounding the waters in the valleys above. Such dams were erected in the valley of the upper Loire, early in the 18th century. The establishment of a regular system of reservoirs along the valleys of the Loire and of the Yonne has been suggested for the purpose of mitigating the floods in these rivers. Similar projects may be undertaken with advantage in north Bengal in the Tista and Atrai valleys, also in west Bengal to mitigate the Adjai and Damodar floods. The Padma and the Meghna valleys will not permit the establishment of reservoirs as the Seine, the Thames and the Missisisppi valleys are not suitable for the formation of storage reservoirs. Indeed reservoirs cannot be applicable for dealing with floods unless the local conditions are favorable and the stored up water is utilised for irrigation or

watersupply to a town or as a source of water power for lighting or other industrial purposes ; or the expedient will involve an unproductive expenditure.

Natural reservoirs in Bengal

The marshy districts serve often as natural reservoirs. But reclamation of these districts has led to the rise of floods in the adjacent valleys. These natural reservoirs form valuable outlets for the flood waters. Lowlying districts of Bengal suffer from tidal floods and floods due to rainfall. These floods cannot get outlets because of protective embankments erected for the reclamation and colonisation of the Sundarbans.

Removal of obstructions

Obstructions, such as fallen trees, rocky shoals, ruins of buildings and temples, piers of a bridge check the flow and intensify the height of floods above. They must be removed. But the river must be taken as a whole or the removal of obstructions in one part will only aggravate the floods below. The improvement works on the Severn have achieved very satisfactory results. So Mr. Harcourt observes : "The removal of obstructions from the channel of a river is one of the primary duties of river conservancy ; for a river can not efficiently drain a district if the maintenance of its channel is neglected ; care must be taken to prevent riparian land owners from restricting the channel for their private interests ;" as for instance by the erection of bathing ghat, or by placing fish traps in the channel.

In Bengal we take very little care for our rivers. Every leaf that falls and the refuse that we throw into the river accumulate some where and obstruct its course. We pollute and encroach upon the rivers in many ways in reckless disregard for the consequence of our encroachments. In the circumstances it is extremely desirable that every river with its tributaries should be protected against such encroachments and injuries by powers granted to the conservators of the river representing the agricultural navigation and sanitary interest of the locality.

Enlargement of the channel

An obvious and very efficient method of mitigating floods in the enlargement of the channel of a river, thereby increasing its discharging capacity and lowering the flood level. It has been pointed out before that the

Karatoya used to pass off waters without flooding the region but ever since its falling off the valleys have been subject to inundations. The north Bengal floods may be considerably prevented by enlarging the Karatoya channel.

Cuts and Embankments

Straight cuts and embankments are also resorted to for the prevention of inundations. Cut-offs, as they are called in America, have been tried on the Mississippi but they are less favoured. The longitudinal embankments have long been resorted to along it, between its junction with the Missouri and its outlet in the gulf of Mexico. The total length of the embankments now amounts to about 1300 miles, their prolongation, consolidation and maintenance having been taken over by the Government. The river Po has been embanked for centuries below Cremona and the embankments have been gradually extended to its outlet. The Loire has been embanked. The embankment on the Theiss is about 740 miles in length.

But the inevitable effect of the embankments is the raising of river-bed, by concentrating the current. The concentrated current deposits in the river-bed the sediment which it used to strew over the plains. The rising of the beds of some of the Japan rivers and of the Yellow river in China is clearly due to this cause. The raising of the embankment with the corresponding rise of the bed is a dangerous expedient, because sooner or later it leads to the rupture of the banks. The remedy lies in dredging away the sediment as soon as the floods pass off.

It is to be remembered, however, that the embankments and regulation works should not generally be undertaken in the upper part of the river valleys for they hasten the descent of floods and promote the carrying down of detritus and consequently intensify the floods in the lower parts of the valleys and thus protect the less valuable lands above at the expense of the alluvial plains below.*

Improvement of the delta

The sediment carried down by the rivers settles, the moment it comes in contact with salt water. The deposition is promoted much more rapidly in salt water than in fresh, owing probably to the aggregation of particles

---

* L. F. V. Harcourt : *Rivers*, Vol I., p. 169

produced by saline solutions. The continually accumulating mound of sediment reduces the fall of the river. The enfeebled current then finds its way to the sea, through the mass of sediments, in several shallow, diverging channels which form bars with the denser material ; so that these tideless rivers offer serious obstacles to navigation at their mouths. These bars progress seaward with the advance of the delta and the large rivers are cut off from proper access to the sea and thereby debarred from external communications. The removal of these barriers to ocean going trade is, therefore, of the highest importance to the extensive districts served by such rivers.

Three methods have been adopted for securing improved navigable communication between these rivers and the sea, viz :

a. Dredging or harrowing on the bar

b. Prolongation of outlet channels by parallel jetties

c. Construction of ship canals.

The first method stirs up the material so that it may not settle but be carried away by the outgoing current. The second system increases the scouring capacity of the current by deepening the channel. The ship canal only avoids the difficulties. Outlets of the Danube, the Mississippi and the Volga are regularly dredged and harrowed. Jetty woks have been in operation at the mouth of the Rhone since 1852, also at Sulina mouth of the Danube since, 1858. A ship canal was proposed for affording an outlet for the trade of the Danube and also of the Mississippi beyond the zone of the deposit of the delta but the jetty system prevailed with better results. Ship canals have been made for connecting the Rhone and the Nile with the sea beyond the limits of their deltas. The great advantages for navigation that may be secured by Jetty works at the mouth of a river have been amply demonstrated by the results achieved at the mouths of numerous rivers in Germany, Italy, Russia, U. K., France and America. Russian river outlets into the Baltic Sea have been improved by jetties. Rivers flowing into the North-American Lakes have been trained and deepened by parallel jetties.

Training of Tidal Rivers

The tidal influence must not be restricted. Experience has demonstrated that obstructions to the tidal flow are injurious to the depth of a river. In England the tides are of great help to inland commerce. Ocean-going vessels

can enter interior river ports direct. But the tidal rivers are liable to deterioration owing to the deposition of the alluvium derived partly from inland and partly from the sea. The alluvium of the Ganges comes wholly from inland ; and the fresh water discharge in this case is so large and is so densely charged with alluvium that inspite of the rise of tide of about 12 feet at the mouths of the Ganges in the Bay of Bengal, the river has formed a delta like sediment bearing rivers flowing into tideless seas.

The primary objects in all schemes of tidal river improvement, should be the admission of the flood tide as freely as possible into a river, and the removal of all obstructions to its progress up to the furthest practicable limit. Many tidal rivers, in their natural condition, are impeded by hard shoals of clay, gravel, boulders or rock, which the scour of the current is unable to remove. The improvement of most tidal rivers involves regulation and training works as well as dredging ; but in some cases the increase in depth has been principally effected by dredging alone, of which the Tyne, the Tees and the Clyde are instances ; whilst in other rivers training works have been supplemented by large dredging operations, examples of which are furnished by the Ribble and the Weser. The reduction in cost of dredging, effected within recent years. by great improvements in dredging appliances, has led to a large extension of the system ; and the certainty of its effects and the facility with which the depth of river can be increased by dredging in proportion to the development of a port to which the river gives access, render dredgers almost indispensable machines for the improvement of rivers.

Canalisation

Canalisation is another means of rendering a river thoroughly navigable when other improvement works prove inadequate to achieve the desired result. Canals are excavated to make it casy for the vessels from the sea to go into the river and also from river into the town. To take an example, the *Shaista Khan* canal of Dacca, now neglected, was once so busy. Boats from the Burigana uesd to enter into the town with merchandise. It is now only in the rainy season that we can still have a slight idea of how people made use of the canal. Ordinarily, however, canalisation is resorted to, to render shallow rivers fit for navigation and also to make the up stream traffic as easy as the down-stream. The canalisation of the upper Seine was

commenced in 1860 and that of the lower Seine was undertaken in 1838 and completed in 1866. Supplementary works followed. These works now enable vessels of 800 to 1000 tons to navigate the Seine between Paris and Rouen at all times. The canalised Seine between Montereau and Martot at the limit of the tidal river, a distance of 197 miles, has an inland navigation trade. The Thames and some other English rivers were gradually canalised much earlier than the Seine, whilst as large work of canalisation was carried out on the Main from its junction with the Rhine upto Frankfort. Powerful excavators are used in the construction of large canals.

Canals are cut not only for navigation but also for drainage and irrigation of a country. They provide inland waterways which serve to improve the drainage for low lying lands, when the natural water courses are insufficient and the available fall is small. In Bengal the beds of dead rivers can be canalised with great advantage by giving definite fall ensuring the flow of water along them.

The drainage canals are in reality artificial rivers made straight in order to utilise the small fall as much as possible to discharge the rainfall from the adjacent lands.

The irrigation canals generally draw off a portion of the discharge of a river and convey the water to the land to be irrigated, where it is distributed over the land by numerous small branch canals controlled by sluices ; and moveable dams are provided at the head of the main canal to arrest the influx from the river. The commercial value of these canals can not be too strongly repeated. Such canals have been cut on the Ganges and other big rivers of India. In Bengal more canals are necessary to divert the water of the overflowing rivers to dry areas.

The navigation canals are quite distinct from the drainage and irrigation canals, although the latter are sometimes utilised for navigation. Before the advent of Railways numerous inland canals were constructed in France, Italy, Holland, Belgium, Great Britain, North America, China and even in India under the Mughals, for facilitating the transportation of goods. Numerous examples exist in all industrially and commercially leading countries of the world where navigation canal works carried out during the latter half of the 18th and the earlier part of the 19th century. They established water communication between inland towns of England and the chief sea ports.

VII

REMEDIES

I have tried herein before to give just an idea of what is actually done in western countries for rivers. It is now desirable that I should endeavour to make some suggestions as to how we can improve our *'punya toas'*. They are as follows :

1. Study of Hydrology of rivers

The physical conditions of our rivers, tidal and non-tidal, torrential and slow, dead and dying, all are to be studied scientifically as the Seine has been studied in France. The natural state of any river depends upon a variety of physical conditions, viz :

a. *River Basin* : The basin of a river in the whole area drained by the river or the area over which the rainfall tends to flow into the river or its tributaries. Each particular river basin should be studied independently because from the experience gained on a few, no generalisation is possible.

b. *Differences in rainfall* : In studying the regime of any river, observations concerning the rainfall over the basin of a river are very valuable. Rainfall differs at different places in a river basin, as being subject to very different meteorological influences, affecting the flood of the tributaries draining them. The main river is also affected. A plan, therefore of a river basin, showing the main river and its tributaries and also indicating the different average amounts of rainfall over this area, enables us to know the comparative influence of rainfall on the river and its tributaries.

c. *Variations in rainfall* : Rainfall varies from year to year in the same locality. From observations extending over several years, a reliable average can be obtained.

d. *Evaporation and percolation* : They vary with the locality, the season of the year, the state of the weather and the wind and the nature of the soil on which the rain falls.

e. *Influences of forests and vegetation* : "A covering of trees and grass is very beneficial in increasing the average discharge of a river by reducing evaporation and in equalising its flow during the rainy season, especially in the steeper parts of the basin, by retarding the arrival of the rain to the water

courses," Forests and vegetation are especially valuable on impermeable strata and on mountain sides, where by regulating the downward flow of the rain and by binding together the loose soil, they diminish the rapid rise of torrential streams, arrest the washing away of the soil and prevent the formation of gullets which facilitate the descent of the water.

f. *Permeable and impermeable strata* : The nature of the strata forming the basin of a river and its tributaries exerts a very marked influence on its flow. Over the impermeable starta the rains flow down quickly into the main stream makes the river torrential. The opposite is the effect of the permeable strata.

g. *Available rainfall* : In order to determine the actual discharge of a river, the relation between the local amount of rainfall over an area and the amount that finds its way into the river is to be established. Owing to the difference in permeability all water does not flow into the river. The proportion differs in different localities.

h. *Forms of river valleys* : The nature of the river bed depends on the geological strata. The valleys generally vary according to difference in strata. The bed also follows the valley.

i. *Fall of rivers* : The current diminishes with the fall of the river-bed which corresponds to the general fall of the land over which it flows.

j. *Transportation of Materials* : Rivers convey rainfall as well as alluvium to the sea. The velocity of the current that carries along the detritus from the hills and cuts away the soft valleys depends on the fall of the land, the specific gravity of the material, the nature of the river bed, the tidal or non-tidal character of the sea. Each kind of material needs a particular velocity of the current. Experiments in the west have shown that silt and clay can be carried along with a velocity of 3 to 6 inches per second, sand 8 inches, gravel about 1 to $2\frac{1}{2}$ feet, stones 6 ft. As the current slackens, the materials are sorted, the heaviest particles being deposited first.

k. *Divergence of Current* : A river rarely flows in a straight and uniform channel, especially across a flat alluvial plain. A slight impediment such as a fallen tree or a hard projection at one bank or any irregularity in the bed, will direct the main current against the opposite bank, which, if composed of soft materials, is gradually eroded, The Ganges affords an example to illustrate this character of the rivers. The Padma in East Bengal is

dangerous. The current of the Padma promotes erosion of the bank and destroys beautiful achievements of man. The 'Kirtinasha' is just the suitable name given to to the Padma.

1. *River outlets* : "The mouths of rivers exhibit considerable diversities, depending on the form, size and general physical conditions of the estuary which connects them with the sea and the rise of the tide in the sea into which they flow". Tidal and tideless rivers present two different phenomena and necessarily need different treatment. Tideless rivers form deltas and tidal ones carry along the sediment into the sea. But the Ganges discharges large floods which over power tidal flow at the mouth and form deltas.

These diversified physical conditions of rivers form the subject matter of hydrology of rivers. Engineers haye experienced different characteristics of different rivers and suggested different methods to cope with them. The close scientific study of the behaviour rather the knowledge of the hydrology of our rivers will enable us to suggest permanent means to control and improve them. Of course this is not possible in our University laboratories. As the physicians have to go to the patient for the knowledge of the history and the nature of the disease, so we have to go to our rivers and investigate their various physical characteristics as indicated above. Again as the physician fails to radically cure a disease if he aims at temporary relief, without going to the root of the disease, so we will fail to improve our rivers permanently if we aim at merely local and isolated improvements as our Government have hitherto done.

2. Foreign Experience

The detailed knowledge of our rivers must be supplemented by the knowledge of some of the most important foreign rivers and of the improvement works adopted on them. Without this two fold knowledge, it is not possible to suggest off-hand that such and such methods will apply to such and such rivers of ours. For this some expert Engineers having acquaintance with our rivers and their day-to-day behaviour should be specially denoted to study the physical conditions of our rivers and to those of the foriegn rivers such as the Rhone, the Rhine, the Seine, the Clyde, the Elbe, the Po, the Mississippi, the Missouri, the Tyne, the Tees, the Mersey. The capital invested for this purpose, will, I am confident, earn ample return, not only in shape of actual money dividend but in shape of real national wealth. It will lead to the stimulation of industrial and

commercial energies of Bengal, the improvement of health and sanitation and the solution of the *'Bekar'* problem. Irrigation for agriculture, navigation for commerce and sanitation for industry will be greatly improved. Money spent on isolated campaigns against malaria will not be fully successful unless the rivers are restored and improved. Attempts should be concentrated on this problem of rivers. On the satisfactory solution of this problem, depends the resuscitation of Bengal. People from four corners of the world have poured into Bengal as she was reported to be *'Sonar Bangla'*. She had been explioted but the task of refashioning her has come upon us. And the restoration of her rivers will go a great way to hasten the regeneration that has been the day-dream of our patriots, poets, statesmen, scholars and scientists ever since the *Swadeshi* movement.

3. The study of river Engineering

In Bengal rivers are a great problem undoubtedly. It is therefore reasonable to demand a special branch of river engineering to be opened forthwith in the Shibpore Engineering College or at Dacca. In the West the regulation and control of rivers is one of the most important and at the same time most difficult branches of civil engineering. It is high time that our students should be furnished with opportunities for studying this branch of engineering at their own home. If the conservation of rivers be a permanent feature of our provincial administration, we will need Engineers with knowledge of river engineering. In view of that prospect, the society of Engineers in Bengal ought to approach the authorities with the request of adding this branch to the Sibpore College or at Dacca at an early date.

In France and Germany students get both theoretical and practical training in the river engineering. Large schemes are in operation on the continental rivers. Students get abundant opportunities for getting a full knowledge of ins and outs of those operations. In India we have yet to launch such schemes. In the mean time efforts should be made to send our students from time to time to study the practical aspects of this branch of engineering in continental countries. Equipped with practical training abroad our Engineers will be of immense service to Bengal. They will be in a position to suggest practical means to remove local difficulties on our rivers.

At any rate, the importance of the study of this branch of engineering can not be too strongly exaggerated, especially at this stage, when our rivers are

almost on the point of complete obliteration to the enormous misery and ruin of Bengal.

4. Public opinion and National Regard for rivers

Both the communities of Bengal emphasise on the purity of water but in practice they have little regard or care for the maintenance of that purity. To take one instance, the decomposition of half-burnt dead bodies, thrown into the sluggish streams or the swamps, lead to the serious pollution of water. Besides, the refuse, the ashes, the bamboos and various other auxiliaries brought along with the corpse are also thrown recklessly into the rivers and cause obstructions to the free flow of currents. With the gradual silting up of rivers and the consequent slackening of their current, these materials accumulate day after day in their beds and favour the growth of various weeds which in turn obstruct navigation and impair sanitation. For all this we can understand *why burial system is better than the burning system.*

It is now highly desirable that some sort of propaganda work should be started and special arrangements made for crematories on the currentless rivers. No law can achieve the end unless the people organise themselves to create public opinion urging the necessity for the resuscitation of rivers as well as their careful maintenance. The District Boards and Municipalities can do a good deal in this direction.

5. A Board

For the conservation of our rivers, a permanent Board should be organised as a branch of Bengal land administration. The Board may have four Subordinate branches, each for one range of rivers, consisting of several Inspectors and Sub-inspectors. These men should be recruited from the Graduates of Medicine and Engineering. The central Board may consist of four Engineers having experience of foriegn rivers and two medical officers, permanently paid and two non-officials elected by the Bengal legislative council. The local union Boards, municipalities should be asked to report from time to time to the nearest branch Board, the actual condition of navigation, irrigation and sanitation as affected by the rivers in their jurisdiction. The central Board will be responsible for the maintenance, improvement and control of rivers.

The details may be worked out on expert advice. The Board may be formed roughly thus : Each system of rivers will be managed by a branch

Board which may have 10 to 20 Inspectors and 50 to 100 Sub-inspectors. Their duties will be to be ever vigilant on the condition of rivers and to suggest remedies promptly whenever they will be needed. On the Railways, they have permanent way Inspectors and Supervisors. Similarly on the rivers, the high ways of commerce, we have got to appoint vigilant officers to keep watch over their courses and behaviour. During the wet season they will observe the conduct of the currents both in tidal and non-tidal rivers and record its injurious effect on the life and property of the people on their banks. During dry season the reconstruction, if necessary, will be completed under their supervision. Thus the rivers of Bengal will be conserved. For the perpetual maintenance of the staff of river conservators we have to look for permanent finance which will be available with the improved fisheries and waterway tolls.

6. Maintenance of waterways

The rivers, as distinct from railroads, form by themselves, a special subject deserving special treatment and administration. The department for the conservation of rivers can in many ways be justified. It is a well known fact that Railway rates are much higher than steamer fares. The reason is obvious. The Railway company has to lay out huge capital on the construction of the railroad and a considerable sum annually for their maintenance. The interest on this amount has to be realised from the rates and fares. But the steamer company uses the natural highways for which nobody has to incurany expenditure. Hence the rivers are left neglected and uncared for.

Nothing in nature is inexhaustible. Every object of nature gets deteriorated on constant use. And it is human nature to misuse or over use things that involve no sacrifice on the part of man. The rivers are the object for which no body has to sacrifice any thing. Hence they are utilised, overutilised and often misutilised. The result is, they are soon rendered unfit for any use whatsoever.

Applying this truth to the Bengal rivers we find people have in many ways injured them. The steamer companies are also largely responsible for their deterioration. People throw all kinds of refuse in them. They throw dead bodies and along with them the materials that go to choke the currents. The *khalasis* throw ashes from the steamer indiscriminately into the river

and thereby obstruct the currents. The villagers also do many thoughtless works that also injure the rivers. Prevention of this conduct on the part of the people in general and the steamer companies will, however, be one of the duties of the waterway Inspectors. The people and the navigators must be taught to conceive a due regard for the rivers. The only way to induce them to value the rivers is to compell them to sacrifice something for the use they make of them.

Therefore, I venture to suggest that perpetual Navigation Tax and a casual water tax should be introduced. For the collection of such tax, a special class of officers may be appointed at different centres. They will be under the direct control of the central Board for the conservation of rivers. Navigation tax may be fixed on the quantitative basis graduated on progressive principle. From small country boats of 100 mds to the largest steamers, all will be subject to this tax which will go to pay the maintenance charges on the rivers. Of course, the incidence of such tax will fall on the merchants, travellers and passengers. The fares and rates will be increased by a certain percentage, which will indirectly serve to produce a national regard for the rivers in the minds of the public.

The *water tax* may be imposed on those who use river water for all purposes. During dry season scarcity of water stares the villagers in their faces. If the rivers and canals are kept clear, they will be too glad to pay for the water they will use from them. For the collection of this tax, the help of the village union boards may be secured at times. The tax may be enforced for four months, from March to June. It may be made permanent on those who will be-constantly using the rivers for irrigation and bathing purposes. Thus a permanent finance may be secured.

7. Joint stock Companies : paying concerns

Private companies can be started for improving and canal cutting projects. The government should be requested to enact a regulation authorising the companies to levy tolls on the boats and flats and the people who will use the improved rivers or canals. The board may under-take to frame tolls table periodically, which may be notified and circulated to the general public.

The Zemindars may do well to take initiative in this direction as late Prasanna Kumar Thakur C. S. I. took in 1856. Many of them generally spend huge sums over matters that immortalise them only in "official

quotations." This expenditure is purely unproductive. But if they could be induced to direct such sur plus to the project of which I have spoken above, their capital will bring back good round net revenue every year. Besides, the improvement of rivers will lead to the increased production which means enhanced rent. Therefore it is abundantly clear that the Zemindars of Bengal will doubly gain. The capital will earn in its normal course and the increased rent will add to their surplus at an increasing rate. Therefore, the reclamation of lowlying lands by canalisation and other improvement works will be amply paying. It will eradicate malaria, kala-azar and increase economic wealth.

Duties of the Government

Of late, when the demand for various national projects has been insistent, the government has taken shelter under a convenient plea that there is no money. Lord Lytton's 'pious wish' could not satisfy the people of Jessore. The Bhairab scheme is far off yet. In the meantime the Bhairab will undergo further changes and the scheme will need revision. The revised scheme will await sanction and confirmation for several years more and again it will have to be revised. At last, the people of Jessore will bring the Bhairab under the plough. Cultivation of jute will make them wealthy, happy and contented ! Indeed, augmentation of land is out an unwelcome gain !

The government can ill afford to wait for favourable finance if they will to improve the rivers. By loan or taxation money has got to be found, or delay will be fatal. The rivers can not wait and deterioration does not stop. It increases and thus the need for more money is intensified. More waiting therefore means more burden on the Finance. In foreign countries, Government impose special taxes and utilise other resources. Will the Government of this country devise means? Let public opinion start agitation. Let our Zemindars come out with their purses. The unearned increment which amounted 11$\frac{1}{1}$ crores in 1922-23 and which has increased by now can be tapped by a development duty, as the Finance Act of 1910 in England had levied development duty on the Zemindars.*

Let me only hope, there will be no communal quarrel over this national problem. To the national wealth of our waterways, every one has equal right.

---

* Pl. see Appendix B

CONCLUSION

The problem of rivers in Bengal has been stated from an academic point of view. I had not the opportunity nor the means to study its practical aspects which I hope the Engineers will supply. In a word, I have tried to indicate the problem, so vast in its scope and importance, especially in its economic aspects. Suggestions have also been made herein before and elsewhere* so that it may be grasped and studied in all its practical bearing. My efforts have been directed more or less to draw the attention of the more competent persons who can suggest actual remedies. I have tried and most imperfectly and under peculiar disadvantages to catalogue the symptoms of the disease. I now submit them to the professionals to examine them and advise necessary cure.

Bengal is in the throes of her political emancipation. But political emancipation must be preceded by her economic resurrection. Her agriculture, sanitation and economic problem, are all indissolubly bound up with the problem of her rivers which I regard as the key-problem of this province. If this problem is solved, Bengal will again emerge as a very prosperous land in Asia. Her health will be regained. Her wealth will be increased.

This enormous problem of waterways can not be solved easily without systematically, not spasmodically, adopting western methods of regulation, control and improvement of rivers. Steam dredgers and steam navvies ought to be freelv used and with a will, to revive our 'dead and dying' rivers.

Therefore, before all inquiry, the inquiry into this problem is immediately necessary.

---

* Pl. see Appendix

APPENDIX A

WEST BENGAL RIVERS

Prosperous Cities Disappeared

(Published in *The Forward* of 3rd Jan. 1925)

It was gratifying to read, in *Forward* of the 17th Dec., the appeal for the improvement of Presidency Division rather West Bengal rivers. Whover has studied the economic conditions of West Bengal with some care and interest can not but welcome such idea of saving the rivers from utter extinction. There can be no nobler project. Had Bengal a government of the people by the people for the people, this project would have long been an accomplished fact. But it is not yet too late.

With the gradual formation and development of the Deltaic Continent, Natural rivers and canals are fast silting and many have already dried up—their beds having been converted into corn fields. The old beds of many minor rivers are so levelled up that they can not now be traced, except through the discovery of clayey soil, tortoise shells, sea pebbles and carcases of sea animals so often unearthed by plough-shares.

Had such a project been launched some 40 years ago, probably many of the natural water courses could have been saved from being for ever lost without the least strain on the finance of the Province. It is undoubtedly too late to recover many of them. The rest that are 'flowing down too fast' will also meet the fate of their dead sisters sooner or later, if no project is forthwith undertaken and put into immediate execution. Then W. Bengal will further lose her economic position.

The last census of 1921 has clearly shown that E. Bengal is richer and wealthier than W. Bengal because of her enormous economic wealth in flowing rivers. W. Bengal was rich in trade and industry when her rivers were vigorous. She is just losing her immense economic wealth of natural transport agencies. Poverty and death have now been the twin products of

her decaying rivers. As for instance, Jessore once the prince of all West Bengal disticts—the richset in agriculture and industry, manufacture and trade, is now impoverished, despised and even dreaded as the abode of pestilence. The Government of Bengal often find it hard to transfer an official to Jessore. I have found many officials transferred to Jessore having applied for long leave just to avoid it. The district was once the most populous of all Bengal districts. It was the land of beautuiful navigable rivers—immense sources of wealth for its huge population.

W. Hunter in his Statistiacal Account has enumerated the names of 36 rivers of Jessore, forming part of the same river system irrigating about 871 miles. The Indigo planters had built their factories on these rivers. The ruins of the factories still lead one to recall the days of the planters, but there is seldom any trace of the rivers that once washed the walls of so many of these factories. Hunter says, "In olden times the whole of the District trade went by water. In 1794, there were not more than 100 carts in the entire District and in 1810 only 6 were procurable in its capital town."* It had brisk commerce in Sugar, Salt, Indigo, Rice, Pulses, Oil, Timber, always having had a balance of trade over imports from Calcutta. Kotchandpur on the Kapotakshi (then called Kabadak) was the largest of the Sugar marts of Bengal. But Kotchandpur to-day is nothing. The river has been useless to it and the town has decayed. This is one of the many instances which only go to prove that the decay of the rivers has led to the economic and commercial downfall of W. Bengal. Jessore was prosperous in the manufactures of Salt, cloth, Sugar, Indigo and Cocoanut Oil. She used to import cotton and yarn from Calcutta. She also used to cultivate cotton. In 1789, 2400 mds. of cotton were raised and 3600 mds. imported for local manufactures. Where are these manufctures now? In 1872, Jessor had 20,75,021 souls but in 1921 only 17,22,219. Hunter says, "All the high banks of the rivers were dotted with date groves" which once led the flourishing manufacture of sugar of Jessore to yield annually 20,000 mds. All these were due to well navigable rivers.

All other distircts of west Bengal have gotr the same story to tell. All are now impoverished. The economic regeneration of West Bengal will depend largely on the revival of the rivers. The rivers, if restored, will

---

* Hunter : Statistical Account of Jessore, p. 304

a. improve health of many villages on them,
b. provide drinking water to men and cattle,
c. facilitate inland trade and commerce and distribution of products,
d. set in motion the productive energies of the people towards the revival of ancient industries,
e. fertilise the soil and improve agriculture,
f. open up opportunities for greater employment,
g. provide abundant source of power for industry.

I take the opportunity of throwing some suggestions as to how to proceed. They are as follows :

i. To send an Engineer, having acquaintance with W. Bengal rivers and river systems on deputation to study for a year or so the river dredging and canal cutting methods in France and Germany.
ii. To have a conference of West Bengal Zemindars for their cooperation and contributions to the execution of the plan. This will add to the wealth and prosperity of the zemindars themselves.
iii. To have a conference of West Bengal District Boards and Municipalities for similar purpose as indicated in (ii).
iv. To introduce an annual "canal rate" of one anna per Rupee of the actual gross rental of West Bengal from the tenants and three annas per Rupee from the Zemindars to be in force temporarily for 5 or 10 years.
v. To appoint local committees for realising a rate on the exports and imports of many trading towns on these moribund rivers which are daily affecting the life and proprety of thousands. Certain temporary rates, say, one pice per bale of jute and one pice per bag of rice may be imposed. These rates may be collected by the local committees on which men like local Sub-Registrars, Sub-Inspectors of Police, Railway Station masters, Local Representatives of people and other men of light and leading may be elected to serve.
f. To call a conference or conferences of prominent local representatives from all important towns and villages on the rivers.

The importance of the scheme of recovering the dead and dying rivers of West Bengal can not be too strongly emphasised. Germany and France have supplemented their Rivers by Railways and canals. Huge capital has been spent freely on canal cutting and river dredging schemes in those countries. The value of the rivers for the econimic regeneration of a country can not be exaggerated.

I am a believer in "Where there is a will there is a way." But I must not forget to tell that, "Before we make any movement succeed we must first organise public opinion in its favour."

Abul Hossain

APPENDIX B

ROBBERY LEGALISED

(Published in *The Mussulman* of 12th Nov. 1924)

All institutions, social, economic or political, are the products of circumstances. They change in process of time with the change of circumstances. But the permanent settlement in Bengal is an institution which can not change although, to all intents and purposes, it has outgrown the circumstances that necessitated it. It has once for all been settled as an unchangeable institution for the everchanging humanity of Bengal. The Government seem to have pledged themselves not to alter it, no matter how morally wrong and unjust and economically ruinous it may be.

All lands, developed and undeveloped in 1793, were settled *en masse* permanently with the Zemindars who were recognised as the direct proprietors of all soil. The right of ownership was vested in them, ultimate proprietorship having been vested in the Crown of England. The rent was fixed. All claims to future increment were thus waived by the Government for all time in favour of the landlords. The system was in operation. It was formally besed on a 'perpetual contract', entered into between the Government and the Zemindars, which imposed practically no legal obligations upon the Zemindars to do any positive good to the tenants among whom the lands were ultimately distributed on a retail basis. In course of time the system has been instrumental to the cruel expropriation of the tenants with the increasing pressure on the soil. It is now nothing but a masterpiece of cruelty, iniustice and oppression, It has only been successful in perpetuating a 'class robbery'.

In 1921, the number of landlords, actual dealers in rent and land, having had to spend materially nothing for the increment of rent that resulted, went up to 1308067 and that of the agents, managers, collectors and callers *i.e.* Naibs, Dewans, Gomastas and Paiks, the most shameless parasites rose up

to 132935. Thus the total number of those who deal in rents but do not labour on the soil, stood to be 1441002, whereas the cultivators numbered 35022056 tilling 24,496,80 acres. According to the P. S. contract the revenue on these acres actually amounted to Rs. 2,91,60,373 which entered the Geovernment Exchequer along with the road cesses amounting to Rs. 77,74,548. The gross rental on which the cess was collected amounted to Rs. 14,41,13,282. This means that the balance of Rs. 11,49,52,909 found its way to the pockets of the landlords direct. Besides, there are other charges exacted from the cultivators, actual workers on the land, which are very difficult to calculate accurately. Making all possible allowances, I have attempted to calculate the various charges realised from the tenants. Here are the figures which by all means show the minimum exactions :

Rs.	11,49,52,909	Unearned increment
Rs.	1,80,14,160	Extra remuneration (Hisabana)
Rs.	90,07,080	Penalty (Interest) on nonpayment
Rs.	38,87,274	Profits over legal cesses
Rs.	22,51,770	Callers' (paiks') allowances and receipt fees
Rs.	14,81,13,193	

This huge sum is anuually enjoyed by only handful of souls which number 14,41,002. This class entirely rob the product of the labour of so many God's creatures as 3,50,22,056. All these extra charges have been legalised by the permanent system. The systhem has legalised this process of expropriation. *Has this class any moral right to take for its exclusive use that which is the natural heritage and means of support for all the peolpe and which is entirely due to the automatic rise in land values, perhaps independent of any labour spent upon the rural districts of Bengal?* The labour that is spent is of the expropriated and certainly not of the expropriators. Hence the unearned increment is robbed by the few while it should be distributed among many. This is because P. S. has anyhow come to legalise such robbery. It has in a large way put a heavy premium upon the inactivity of the land dealing class.

To-day, however, this question is raising its head everywhere in the world, especially in England and Germany where a duty has just been laid upon the unearned increment of land. Some such device should forthwith be

resorted to here in Bengal, if the people like to put a stop to the perpetually legalised robbery without leading the Government to break their so-called sacred pledge embodied in the P. S.

In England, the Finance Act of 1910 provides by Article I for the establishment of a tax called a "increment value duty" : "Subject to the provisions of this Part of this Act, there shall be charged, levied and paid on the increment value of any land a duty, called increment value duly, at the rate of one pound for every complete five pounds of that value accruing after the 30th day of April 1909." By Article 13 ; it is provided that "upon the expiration of every lease, a duty is charged upon the value of the benefit accruing to the lessor. It is called revision duty, and amounts to one pound for every complete ten pounds of that value." But this is not all. The same English Act attacks the inactive landowners and levies a special duty upon the site value of undeveloped lands. It provides in Art. 16 : "Subject to the provision of this Part of the Act......there shall be charged, levied..........a duty called undeveloped land duty at the rate of $\frac{1}{2}$d. for every 20s. of that site value.

It is, however, to be incidentally noted that in Bengal, of the expropriated and robbed many the Muslims number 2,19,59,338 i. e.63 percent and of the expropriator few they number 4,74,507 *i. e.* 32.9 percent of the total ; and the number of the expropriated muslims is increasing by leaps and bounds every year.

Abul Hussain

THE END

পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজি রচনা

Saracenic Commerce and Industry[1]

In dealing with this subject every student of Saracenic history is struck with the paucity of materials, in a remarkable degree. The Arab historians failed to have noticed the growth and decline of material conditions of the people whose politics only had for them a strange fascination. Greater emphasis on the importance of the life hereafter may probably have been the reason for this deficiency of Arabic History. This is further evidenced by the fact that many of those historians were theologians as well, who necessarily hopelessly mixed up the historical issues with theological interpretations. Hence the human side of history was lost sight of. We have been disappointed even by a historian like Ibn Khaldun, who may be said to be the first founder of historical philosophy or philosophy of history which he himself characterised as a 'New Science' and thus he anticipated Vico,—the author of *'Nouva Scienza'*—three centuries before. But Khaldun has not systematically dealt with the material conditions of the races, although he attributed economic causes to the rise and fall of nations and to racial differences prevalent in different regions of the world. That does not serve our purpose in building up a consistent economic history of the Saracens whose industrial and commercial success was as glorious as it was brief.

The field of my survey extends from Mecca, the emporium of pre-Islamic Economic activity, to Cordova, the Queen of Mediaeval cities, through Damascus, the flower of fine arts and delicate manufactures of the Ommiads and Baghdad, the mother of Abbasid luxuries. Indeed the centre of economic activity of the Saracens shifted with the constant shifting of the centre of political gravity which culminated soon in the utter extinction of the Saracenic power and in the fiual break-up of the Islamic Commonwealth for which the Prophet fought so hard, worked so untiringly, thought so intensively, warned his *Ummats* (Followers) so severely and framed so rigid a constitution as a safeguard against future disorder. But the future has falsified the hope of the Prophet as we will find following the course of the spread of Islam from Mecca to Cordova.

---

1. Read to the Historical Association of Dacca University, February 1926, and was published in two issue of the *Calcutta Review*, August and September 1926. The present text is from the *Calcutta Review*.

Before I set forth the achievements of the Arabs under the banner of Islam in the domain of commerce and industry it is necessary for me to see what had been the achievements of their pre-Islamic forefathers. History tells us that the part the ancient Arabs of pre-Islamic period played in commerce and industry was splendid. "That they had made very considerable progress in agriculture and their chief occupation was commerce is certain,"[2] so says, Dr. Crichton. The Arabs were the first navigators of their own seas and first carriers of oriental produce. Sabaea, Oman and Hadramaut were the residence of merchants from the very dawn of civilisation. They had frequented the ports of the Red sea, crossed the Persian Gulf, and with the aid of the monsoons visited the coasts of India long before these regions were known to the nations of Europe. Moses speaks of cinnamon, cassia, myrrh and other aromatics appropriated to religious uses.[3] Even in his time the communication was opened between India and Arabia. It was to this source that ancient Egypt owed its wealth and splendour. Thebes and Memphis traded with the Arabs and were celebrated as mercantile cities more than 1,000 years before the foundation of Cairo or Alexandria. In the hands of Solomon the traffic of the Red Sea produced a revenue equivalent to £ $3\frac{1}{2}$ millions[4] ; and at the period when the Romans invaded the East, this lucrative monopoly was exercised by the Sabaeans, whose marts they found richly stored with all the precious commodities of India. The extensive trade of Saba or Yemen is well spoken of by many writers. The portrait of Tyre drawn by Ezekiel[5] indicates the mercantile activity which the universal intercourse of nations must have created in the seas and harbours of Arabia in those days.

Job alludes to the pearls and rubies, the precious onyx, the sapphire, the coral and the topaz. Diodorus considered the happy Arabians so immensely opulent that all the treasures of the world seemed to centre there as in one universal mart. Agatharcides has given a singular picture of oriental trade as it stood in the reign of Ptolemy Philomater before 200 B.C. At that time Arabia was the medium of communication between India and Egypt and it was in her ports that the Greeks were wont to purchase their cargoes. Saba abounded with such production as could make life happy and gay in the extreme. The land yielded not merely the usual commodities, balm and cassia, incense, myrrh and cinnamon were of common growth. The trees

---

2. Crichton : *History of the Arabian People,* p. 126. (1856)
3. Exodus XXX, 22-25.
4. Kings X, 14.
5. Chapter XXVII (Ezekiel).

wept odorous gums. They cooked their victuals with scented woods. In their expensive habits they rivalled the magnificence of princes. Their houses were decorated with pillars glistening with gold and silver. Their doors were of ivory, crowned with vases and studded with jewles. In furniture, beds and various household embellishments they far surpassed anything that Europeans ever beheld. Strabo and Diodorus both have spoken of abundance of gold and silver—silver being ten times more valuable than gold.

With regard to the exports of the Ancient Arabs, these consisted chiefly of the productions of their own soil, their mines and their forests and those articles carried by their vessels from India and the Far East. The list of exports is simply overwhelming. They were gold, silver, iron, lead, tin, brass, ivory, tortoise shell, flint glass, carved images, javelins, hatchets, adzes, knives, awls or bodkins, cloths of various kinds, military cloaks, tartans, dyed mantles for the Berberine markets in the African ports of the Red Sea : fine muslins, silks, linens, quilts or coverlids, manufactured at *Moosa* : coarse cottons, girdles, long sashes, dyed rings made at *Arsinöe* (Suez) ; Chinese furs and female dresses of every description. Of gums, spices and gems, the varieties were numerous : cinnamon, ginger, cassia of which ten sorts are specified in the Perilous ; honey, spikenard, sugar, pepper, stibium for tinging the eyelids black and storax, one of the most agreeable of the odoriferous resins. The apes and peacocks mentioned in Scriptures, as well as many other spices and precious stones, included in the list, were undoubtedly the produce of India. Among the principal articles of native growth must be ranked the incense so famous in all antiquity. The Arabs had monopoly of this article. The terror of serpents and of the offended divinities was probably the invention of the Arabs to protect their commerce from foreign intrusion and to frighten away the strangers from the places where the balm trees grew.

This list of exports indicates clearly that Arabia was the natural centre of all the traffic between India, Far East, Africa and the Mediterranean countries of Europe. Mecca was the great centre for collecting exportable products of Yemen. On the western shore of the Red Sea the chief marts were *Arsinöe, Myos Hormus, Berenice, Ptolemais, Theron* and *Adulis*. It was in the two latter ports that the hunters of Ptolemy procured elephants for his army. On the Arabian coast, the harbours most frequented were Aelana or Eliongaber ; *Leukekome,* where the Romans in the time of Augustus had a garrison ; *Moosa,* which was the great entrepot for the native products of Arabia ; *Ocelis* in the time of Pliny was the most celebrated for the merchandise of India. Aden was the ancient centre of traffic between India and the Red Sea.

The ships from the East being too large to pass through the straits, landed their cargoes here. *Gherra* was the most celebrated mart on the Persian Gulf.

But the commerce of the Arabs was not wholly confined to these maritime ports only. It was diverted to various other directions overland across the Arabian peninsula, which had been traversed by numerous caravans connecting distant countries with Arabia and her ports. The caravan conductors known as the Gherreans crossed the desert to Bosra, Damascas and Petra and furnished various articles to the Tyrians and the Phoenicians who commanded the trade of Egypt and the Mediterranean. Of these caravan traders of Arabia the Quraish were early distinguished for their mercantile enterprise. It is believed they used to undertake journeys of about 70 days from Elana to the region of incense. Their camels traveled to Sanaa and returned with the precious cargoes of *Moosa* and *Aden* which they exchanged for grains and provisions in the Syrian markets. The central position of their home was advantageous to their enterprising spirit. Foreign merchants also appear to have brought their native products to Mecca during the annual festivals. This has been referred to by Agatharcides and Diodorus as an annual fair frequented by foreign nations for trade.

It is in this commercial environment of Mecca that the Prophet of Arabia was born and naturally with all the instinct, enterprising spirit and love for commerce. He came only to remind the Arabs of their past glory and achievements which were almost forgotten, by the time he was born. Because for several centuries preceding his birth, Mecca, rather the whole of Arabia, was lulled to silence and inactivity which degraded the Arabs and their degradation called for the advent of a Prophet. Political circumstances of the time, the gradual decline and fall of the nations with whom the Arabs had traded, the change of climate,[6] the vanity and complacency of luxuries, had all contributed to the fall of Mecca and the centre of commercial activity shifted from the Red Sea to the Mediterranean Sea. The Phoenicians declined and Egypt rose. Alexandria became the entrepot of oriental trade. The Romans conquered it and hankered after its luxuries that used, Pliny says, to drain annually £ 400,000 of Rome. Rome also fell and the eastern trade reverted to the Saracens, now under the banner of Islam and with them it might have still remained had not Gama arisen to double the cape of storms and effect a total revolution in the whole commercial system of the world. The total eclipse of the Roman power almost synchronised with the ascendancy of the Saracens ; while on the other hand the "fall of Rome" in

---

6. Huntington ; *Pulse of Asia.*

476 A.D. marked the beginning of the so-called darkness of the mediaeval Europe, the monotony of which was only dispelled by the great movement of the crusades in the two centuries following 1100 A.D. The motives to commerce grew weaker as Roman culture disappeared—roads and bridges deteriorated ; the course of rivers was obstructed. Brigandage and piracy were the order of the day. Even a great ruler like Charlemagne—"Karl the great" (800 A.D.) could do little to stay the progress of this decline, although he encouraged education, agriculture and manufacture. At such a time there arose the voice of the Desert to break the lull and slumber of the darkened world of commerce and industry. Designed for a mercantile career, the orphan boy of Abdullah, was given such instructions as were likely to be suitable to his career. At the age of 13, he made a commercial journey to Syria in the caravan of his uncle, Abu Talib. Soon after, his probity and talents for business, much of which he inherited, introduced him to the acquaintance of Khadija who appointed him as a factor to superintend her business. In that capacity he went to Syria again and effected large sales. He never regarded it reproachful, servile or dishonourable to prosecute commerce. He considered it as a lucrative profession in which the noblest and the bravest were engaged. So we find him in the Quran emphasising on commerce as of God. The Quran says : *"Rabbakumul lazi lakumul fulka fill bahre latabtagu fadhlihi innahu kana bikum Baheema."* "Your Lord is He who speeds the Ships for you in the Sea that you may seek His Grace ; surely He is merciful to you" (Sura XVII, 66-67).

Thoroughly experienced in commercial affairs and fully convinced of the benefits of commerce as he was, Muhammad could inspire his followers and his countrymen as well with the blazing enthusiasm that sent them forth upon an unparalleled career of commercial conquest, until most of western Asia, all of northern Africa, Spain and even a part of Gaul were brought under the sway of political supremacy, in allan empire more than 4,000 miles in length.[7] As most of the modern nations had been traders before they assumed the role of actual rulers, so the Saracens, in the guise of commerce, were transformed into a conquering nation and their cities and ports soon became the greatest centres of civilisation in the mediaeval world and remained so for several centuries.

"The Quran bearing the stamp of its merchant author, far from discouraging and proscribing commerce as did the leaders of the Christian Church, declared that it was agreeable to God. In this fact we find one important explanation of

7. Webster : *General History of Commerce,* pp. 43 ff.

the marvellous rapidity and extent of Mahomedan conquest, for Mahomedanism conquered by commerce as well as by sword. Muhammad certainly displayed remarkable sagacity in appealing to the commercial instinct, for he thus held out one of the most attractive inducements to converts."[8]

Muhammad encouraged commerce with a view to remove the economic and consequent social degradation of his people. He began his operations against social evils that pervaded throughout Mecca and in the neighbourhood. But the opposition was too strong for him and he went to Medina. His activity now centred at Medina. His flight shifted the political centre of Arabia from the older commercial city of Mecca to Yathrib (Medina) which rose to be the capital of Islam and a centre of commercial intercourse as well. It played an enormous part in having transformed in a few year's time the whole of Arabia into one nation. But during the lifetime of the Prophet, Medina was too much engaged in the political struggle and any constructive programme of commerce could not be effected excepting change of articles between the people who were brought into the throes of the struggles that the Prophet had to carry on against the Jews, the Christians and the Polytheists from all sides with the slenderest human backing. Amidst this stress and strain, no commerce could be attended to. Commerce needs peace. But the struggle brought together the scattered tribes and they could know better their mutual needs and means to satisfy those needs. It was for the first time in the history of the whole of Arabia that the tribes learnt the value of large-scale co-operation with one another and the mutual economic dependence. This lesson stood the Arabs later on in good stead in the development of economic pursuits in various directions.

So we see soon after the death of the Prophet, the Arabs moved about. Damascus suddenly became the metropolis of the commander of the faithful—the first Caliph of the House of Ommayyah residing there. Damascus became the capital of the Ommiads who were still involved in wars and struggles. But their heart was for commerce. That is why we see that inspite of the ferment and widespread unrest, the Arabs of Damascus could develop arts and crafts so much that Muslim Damascus has passed into history as the city famous for her manufactures of rich fabrics, brocades, tapestries, tent-curtains, silks and tempered blades and as an inland mart, the greatest in its kind in western Asia, although she had no situational advantages for commerce. That Damascus did not stand on a navigable river was of little disadvantage during the infancy of Muslim

---

8. Webster : *General History of Commerce,* p. 45.

commerce when all the carrying trade followed the old caravan routes over the desert and was of such small amount as could still be borne on the backs of camels.

It is to be noted in passing that before the Prophet began to preach his doctrines of Islam most of the Bedawins of Arabian Desert had nothing but scorn for handicrafts—rather manufactures. Cattle-raising, trading in natural products such as date-fruits, coffee, perfumes of forests, hunting and robbery were to them the only natural occupations worthy of mankind. Agriculture and navigation also were beneath their notice. They had taken part in commerce on a large scale only to the extent of providing camels for the caravans to distant markets and guarding them against attacks of hostile nomads whose number was overwhelming in those days, having no settled home or permanent occupation nor tied to any territory. For this protection the Bedawins received *Khifara,* i.e. blackmail. This idea of the Bedawins about commerce we can explain now better. The desert environment, the bleak wilderness and want of abundant rains could not but produce in them the scorn for agriculture or productive manufacture which can flourish only when there is a large supply of raw materials ; but the Arabs did not produce raw materials. The geographical factors controlled their commercial activity and they had to adapt themselves to such occupations as were favoured by the physical factors of the Arabian territory. The Prophet realised the disadvantages of the Arabian environment and he attempted to move towards more advantageous sites. In Abyssinia Islam gained entrance by following commerce, for in order to enter Abyssinia it was necessary to cross the Muslim territory. This circumstance made the Muslims almost sole masters of the Abyssinian commerce which gradualy increased their number in that territory and procured them wealth and influence. The Prophet took the earliest opportunity of changing the desert outlook of the Bedawins by stimulating them to self sufficing commerce and active production. The prohibition of usury was the first economic reform he accomplished. The Bedawins and the pagan Arabs were bled white by the Jews of Arabia. The poor traveling Bedawins used to borrow for consumption and consumption alone and could not pay off their debts, as they had little idea of production by actually exploiting natural resources. Muhammad urged them to commerce for the formation of capital, which they lacked but which alone could make them self-sufficient and independent. This was the right kind of remedy that he applied to the Arabs for their economic emancipation and release from the grip of the Jews and Christians. The prohibition of *Riba* soon had its good results. It changed the commercial outlook of the Arabs. They were transformed from the mere suppliers of caravan camels into the

actual employers of camels for their own benefit. They ceased to carry for others and in pursuit of commerce they travelled from place to place and attended to the production of raw materials and manufacture of those materials. Thus the subsequent achievement of commercial success was made easy.

Damascus under the Ommiads was on the high road to industrial and commercial development ; but soon after the political conflict and the wars for the throne of the Caliph—the eternal apple of discord in Islam—checked and impeded the progress. At last Saffah—the first Abbasid Caliph of Damascus known as the 'Shedder of blood'—killed all Ommiads save one who fled to Spain and founded the Caliphate of Cordova. Saffah died in 754 A.D. and was succeeded by Mansur. Reminiscences of the bloody battles which were too vivid still were too staggering for Mansur to stand and he changed the centre of the Caliphate from Damascus to Baghdad on the western bank of the Tigris. During the last period of the Sassanian dynasty, Persian Baghdad had been a thriving place and at the period of Muslim conquest a monthly market was held there. But Mansur founded the city anew and made it his capital. From the standpoint of commerce, Baghdad possessed beautiful situational advantages. The site was carefully chosen and the plan of the 'Round city' was well thought out. It is reported by Baladhuri, Tabari, and Makaddasi that the Muslim geographers gave advice to the Caliph thus :

"We are of opinion that thou shouldst found the city here between the four districts of Buk and Kalwadha on the eastern bank and of Katrabbul and Baduraya on the western bank of the Tigris : thereby shalt thou live among palms and near water ; and also thy city being on the Sarat canal, provisions will be brought there by the boats of the Euphrates and by the caravans through the plains even from Egypt and Syria. Hither up from the Sea will come the wares of China, while down the Tigris from Mosul will be brought goods from the Byzantine lands."

From this it is clear that the early Muslims realised the importance of the geographic factors that go to favour the growth of towns. Proximity to the sea, and rich hinterland behind are the two important essentials for the growth of a town or a port. The founder of New Baghdad was well advised and the subsequent development of Baghdad was remarkable. Its area was computed by Khatib to be 25 sq. miles. Le Strange says :

"This computation seems to be accurate because the Arabs were skillful land surveyors, practising the art for fiscal assessment and for the laying down of the irrigation canals."

The round city of Mansur was completed by 100,000 craftsmen by the year 766 A.D. (149 A. H.).[9] The industrial and commercial activities of the Muslims under the Abbasid Caliphate were centred in this city. Hence it may be considered as the epitome and climax of the Islamic territories to the East of the Mediterranean. It replaced Damascus as the capital of the Empire and for about three centuries was the richest and most magnificent city in the world. It extended its commerce to all parts of the world—to India, China, the East Indies, northern and even the central regions of Africa, Armenia, Russia, Spain and the Baltic countries. Its commerce was fed by numerous manufacturing cities within the Empire as well as by those of other cities such as Mosul, Shiraz, Balkh, Kabul, Ghazni, Bokhara, Samarkand, Basora, Alexandria, Cairo, Kairowan, Fez and the Spanish cities. In Cairo agriculture and industry prospered and furnished a good basis for its commerce. Through Cairo were shipped to the East large quantities of grain, textiles, embroideries, saddlery, harness, leather, mantels, and slaves.[10]

Of the Abbasid Baghdad no traces are now left. It cost the Government of Mansur about £9,000,000. After the city was found, the next attempt of the Caliphs was to improve irrigation and extend waterways into the interior by diverting surplus waters of the Euphrates and the Tigris. Canalisation rapidly advanced. Numerous canals were excavated and made navigable for large boats. These canals were meant both for irrigation of the lands between the two rivers and for communication. Large markets were established on the banks of the canals ; each market specialised in having localised one particular kind of product and the canals were called after the name of the products localised thereon. As for instance, *Nahrul Kallayeen* was so called from the shops of fried meats ; *Nahr Assawwakin,* so named from the shops of parched pea broth—*Nahr Dajaj* from the woven reeds. Khatib relates that this broth "Sawikul Himmas" was about 970 A. D. sold in great quantities throughout Baghdad and it was the food of the poor about three months of the year when fruits were not available. A certain cook used to import chicken-peas called *Himmas* for the demands of his business. The immense quantity sometimes went up to 280 kurrs—1 kurr being six ass-loads.

Again the city was divided into various quarters—each quarter having been named after the industry that was localised therein. As for instance, *Darul Battikh,* i. e., the melon house was so named after the fruits sold in

---

9. Ibn Qutaybah, p. 192.
10. Webster : *General History of Commerce.*

the quarter situated at the confluence of *Nahr Tabik* and *Nahr Isa*. The actual point of this junction was marked by a place known as *Mashraat-al As,* i.e., the Myrtle wharf. This was the port of *Karkh* where the ships from the Euphrates were moored to discharge their cargoes and all along the harbour-side stood many warehouses maintained by merchants dealing in various kinds of products for many different markets. *Darul Jawz,* i.e., the Nut house was at the exit of the Bazzazin canal to the Tigris. Besides, there were numerous localised and specialised markets for various kinds of commodities which indicate clearly the standard of living the Abbasides attained. As for instance, *Sukud Dawwab,* i.e., the horse market ; *Sukul ghajl.* i.e., thread market ; *Sukus Sarf,* i.e., the market of money changers ; Darur Bayhaniyin, i.e., the market of sweet flowers and perfumers ; *Darul* Kazz, i.e., the silk market ; Darul Attariyin, i.e., the quarter of perfume distillers ; *Dar us Safatiyin,* i.e., the quarter of the weavers of palm baskets ; Sukul warrakin, i.e., the book market. Of these markets, *Sukul warrakin* is well worth noticing. Amidst the abundance and exuberance of luxuries the Abbasides cultivated the use of books. Theirs was the day when there was no printing press ; book-writing consequently became a profession which developed into the historic art of caligraphy in which the Saracens of Baghdad and Spain excelled. In the *Sukul warrakin* there were more than 100 big booksellers' shops. For these books the manufacture of paper excellently flourished. The factories of paper manufactures were established in the Nasriyah quarter. The *Attabiyah* quarter was famous for the manufacture of the *Attabi* stuffs woven of mixed silk and cotton in variegated colours which were celebrated throughout all Muslim countries. Idrisi (1153) describes Almeriah in southern Spain as in his time possessing 800 looms for silk weaving and the Attabi stuffs are particularly mentioned among those that were manufactured there. The name passed into Spanish and thence into Italian and French as Tabis. The name Toby for a rich kind of silk is now obsolete in English but in the 17th and 18th centuries the word was in common use. In February 1603, Elizabeth received the Venetian Envoy Scaramelli when she wore a 'dress of silver and white taby.' Johnson spelled it '*tabby*' adding 'the tabby cat is so named from the brindled markings of the fur.' Taby comes from Attab who was the great grandson of Omayyah and Governor of Mecca. Paper manufacture at *Darul Kazz* continued to be famous throughout the East and in 1226 A.D. it was still a very busy quarter. Abbasiyah island, another famous quarter, was noted for its flourishing agriculture and gardening. There were many water mills (Ruhul Batrik) as well ; of these the great mill which stood at the junction of the great and little carats is originally said to have possessed 100

millstones and produced in yearly rents the fabulous sum of 100 million dirhams, i.e., £4,000,000. Tabari, however, holds that this mill was the work of Nestorian Christians.

Along with canalisation, there gradually developed the boatmaking and shipbuilding industry. Khatib relates that during the Caliphate of Muwaffak who died in 891 A.D. there were about 30,000 boats called *Sumayriah* then in use. The tolls, i.e., mooring dues collected at the rate of 3 dirhams per every trip of a boat amounted to £3,000 to £4,000 every day.

So far we have had just a bird's eye view of Baghdad's industrial and commercial activities in localised factories and organised markets. We have also got an idea of how these products were carried and distributed far and wide by boats and camels. Baghdad attained its maximum magnificence during the Caliphate of Haroon-al Rashid who had friendship with Karl the Great. He by his liberal policy of free trade entertained many merchants of many different parts of the known world.

Let us now pass on to Cordova, the epitome and climax of the Moorish dominions as Baghdad was of the Abbasids. I wish to tarry a little longer here especially for the purpose of examining the fact that the Spanish Moor is the pioneer of modern progress in industry and commerce. Scot says in his History of the Moorish Empire—"In every department of scientific labour, in every practical operation of life demanding a high degree of mechanical skill, the Spanish Moor exhibited on all occasions a precocious and remarkable ingenuity. There was no field too extensive, no detail too insignificant, to be investigated by his enterprising genius. The marvellous scope of his powers was the greatest factor of his success. His intellectual faculties grasped and utilised in an instant conceptions that individuals of other nations would have, and in fact, often did, cast aside with contempt. The permanent traces he has left upon civilisation and his salutary customs, adopted by posterity in defiance of popular odium and traditional prejudice, are unwilling tributes of national and ecclesiastical hostility to the talents and greatness of an accomplished people to whom history is indebted for the sole bright spot on the dark map of mediaeval Europe." It is certain that Columbus was the product of the spirit of maritime adventure that the Spaniards inherited from the persecuted Moors and Columbus' discovery of America is a landmark in the history of oceanic navigation. The Spaniards and the Dutch ruled on the ocean for more than two centuries without any rival. Their monopoly stimulated the British to shipbuilding and ocean exploration chiefly for the purpose of finding an alternative route (other than Gama's route) to India of 'fabulous wealth.' The state also encouraged this

and as a result England adopted mercantilistic policy and passed a series of Navigation Acts to further British shipbuilding. Thus the history of modern ocean communications may be said to be only the continuous development of the beginnings of the oceanic navigation by the Moors.

Soon after the conquest of Spain by the Muslims, she experienced triple revolution in agriculture, manufacture and commerce and became quickly one of the wealthiest and most thickly populated countries in Europe. Cordova expanded and was greatly embellished in the reigns of Abdur Rahman II and III who erected the palace of Az Zahra and under Almanzor who built the palace of Zahira. Cordova with $\frac{1}{2}$ million inhabitants, 3,000 mosques, splendid palaces, 113,000 houses, 300 public baths, yielded only in size and magnitude to Baghdad. Its fame penetrated even distant Germany. The Saxon Nun Horswitha, famous in the last half of the 10th century for her Latin poems and dramas, called it the 'jewel of the world.'

In 936 A.D. Abdur Rahman III laid the foundations of a town destined to perpetuate the name of Zahra. Nothing was spared to make it as magnificent as possible. For 25 years, 10,000 workmen provided with 1,500 beasts of burden laboured at its construction, yet it was unfinished at its founder's death. The royal palace was of immense size—as indeed, is evidenced by the fact that the female inmates of the harem numbered 6,000.

Nearly every city founded by the Muslims in Spain was noted for a speciality in the manufacture of which it excelled. Ports were also built at suitable harbours on the Mediterranean as well as on the Atlantic seaboard for the purpose of foreign trade.

The calcutta Review, Aug.1926

II

Specialisation in industries and their localisation in cities became the special features of the Moorish industrial Revolution. The processes were almost akin to those of modern industry excepting the application of coal and iron on a large scale. Concentration of population was also effected and labourers were employed in large numbers for large-scale production. Cordova, for instance specialised in woollen and silk weaving and had engaged 13,000 weavers in several factories.[11] It is, of course, yet to be determined how far division of labour was carried into effect. It seems generally that the Moors

11. Dr. Crichton, *History of the People of Arabia*, p. 433.

aimed more at specialisation by industry than by process. But it is also likely that the Moors who could export immense quantities of finished products had also resorted to some sort of division of labour—rather distribution of different processes among different hands.

Of the specialised industries some may be briefly noted here. Metallurgy was prominent among industries. With it was also associated mining of gold, silver and other metals for providing raw materials. Dr. Crichton says :

"The moors had arrived at considerable perfection in the manufacture of various kinds of hardware. Their skill was known to every civilised nation in the world."

The blades of Mushraf, Damascus, were not more renowned in the East than the swords of Granada and Toledo in the West. The temper of the Spanish arms was held in the highest repute ; that country being 'the arsenal which supplied Europe and Africa with cuirasses, bucklers, casques, scimitars and daggers.'[12] The celebrated Alkendi among his numerous works, produced a treatise on the different kinds of swords, in which the perfections of the metal are particularly discussed ; and another on the art of preparing steel in such a manner that the edge of the weapon could neither be broken nor blunted. The superb vases in the Alhambra are the exquisite proof of their skill in the manufacture of porcelain. Armourers of Seville were famous for their coats of mail and armours inlaid and embossed with gold. Swords of Toledo were considered unapproachable for the elegance of their chasing, the keenness of their edge and the fineness of their temper. The founders' art, particularly exemplified in the casting of ponderous pieces of metal, was practised with a surprising degree of skill. Cordova had at least one establishment of this description—the results of which appear, from museums of Europe, to have been as complete and satisfactory as in the perfected processes of the present day.[13]

The treatment of metals was chief among the branches of mechanical industry in which the Moors excelled. The casting of bronze, especially in large pieces—an art requiring the greatest skill even in our day—they understood to perfection. Not only statuary but utensils for worship as well

12. *Cambridge Modern History*, Vol, III, p. 432.
13. Scot, *History of the Moorish Empire*.

as for domestic use—lamps, censers, vases, knives, cups and hundreds of other articles were produced by this convenient process. An exquisite Arab vase was for several centuries used in the baptismal ceremony of the infant princes of France. Arabic lamps, none of which has survived to-day were of various metals, gold, silver, copper or bronze.

In addition to metals, glass of different colours was manufactured. At Almeria were manufactured articles of gilded and decorated glass ; the method of its production which was carried by the Moors to Sicily–their colony—and thence to Italy, is now possessed in its perfection by the Venetians alone. Ibn Firnas of Cordova according to Al-Makkari in 9th century, invented a method for manufacturing looking glasses, various kinds of chronometers and a flying machine. There were also manufactured exquisite enamels and vases of rock crystal. The Moorish Jewellers of Granada were the most celebrated in Europe. Among the specimens of their handi-work is mentioned a necklace containing 400 pearls each worth 150 Dinars (1 Dinar = Rs. 55). *Malaga* specialised in pottery and ceramic manufactures—most of which was disposed of in Syria and Constantinople. *Paterna* in Valencia carried the ceramic art to great perfection and Almeria produced glass as well as many kinds of bronze and iron vessels.[14]

Another manufacture in which also they pre-eminently excelled was that of tanning, currying and dyeing leather, which, though lost almost by the expulsion of the Moors, was transferred to Fez. The skins were stained with green, blue or scarlet, of the liveliest tints, for which a peculiar sort of wood (a herb formerly cultivated for the blue dye derived from its leaves) was used and finished with such a degree of brilliancy as to resemble varnish. The art was afterwards carried to England, where the terms Morocco and Cordovan are still applied to leather prepared after their mode. Cordova was the home of all kinds of leather industry. It is from here that the enamelled leather was exported to Europe and Africa and to the East.

Most important of all was textile industry. The various kinds of textile fabrics manufactured by the Moors embraced every species of stuffs and every style of pattern. Silk goods were more in demand as articles of export. The culture and manufacture of silk was regarded by the Caliphs of Spain with peculiar favour. It was, by special provision of the law, exempted from

---

14. *Cambridge Modern History*, Vol. III

taxation and the cultivation of mulberry trees was further encouraged by bounties. The city of Jaen, besides the valleys of Granada, Valencia and Almeria, was the centre of 3,000 hamlets exclusively devoted to the lucrative industry of sericulture and silk manufacture. As a result, silk was a common material in Spain while it was elsewhere in Europe one of the rarest commodities and a commercial curiosity. It is to be noted here that Spain was not the natural home of silk, nor was any other part of Europe. It is said that Rome cultivated it after having brought it from the Persians who obtained it from China. At any rate, silk was acclimatised by the Moors in Spain. They seem to have been well accomplished in the art of acclimatisation. Water power was used to drive machinery in all the textile manufacturing centres of Andalusia province. In the time of Ferdinand and Isabella looms were still operated by means of water power at Cordova. Rapid streams of Spain were utilised by the Moors for irrigating cotton and mulberry fields. The woollen and silk weaving was centred in Cordova, Malaga and Almeria. The superiority of woollens of *Cuenca* and the cottons of *Beja* was undisputed. The irregular mountain slopes of Spain were made use of for sheep-raising. Raw wool was abundantly available. It was the policy of the Moors to solve the problem of raw materials and food-stuffs first. For every industry they found a source of raw materials within their own empire and consequently they transformed it economically into a self-sufficient whole. The River Valleys were subjected to the cultivation of wheat and by a State Policy wheat could not be exported to foreign countries ; rather it was stored in stone granaries underneath the earth to avert future shortage of supply. Scot says, "As the Quran explicitly forbade the exportation of grain, the surplus of harvests was deposited in subterranean granaries hewn in the rock. Wheat in perfect condition was found near Granada after two centuries."[15] In modern times many countries have often restricted the export of food-stuffs by prohibitory laws of taxation.

Bocayrente produced a linen fabric of gossamer lightness which resembled the meshes of a spider's web in strength and in delicacy. The silken gauzes and sumptuous caparisons of Granada were sent as presents to kings. In its *Acaiceria* or silk market, were 200 shops for the exclusive sale of that staple. Edifices built for the transactions of business in Granada resembled palaces in their splendour. Its tapestries and brocades were

15. Scot, *Moorish Empire*, 608.

wonderful specimens of the weavers' skill and their designs were subsequently used as models by the artisans of Italy and France. In the perfection of their textile fabrics they demonstrated their infinite superiority to all contemporaneous nations. Modern science with all its improvements has never been able to equal in strength and delicacy of texture, the products of the Moorish looms of the Peninsula. The industry of dye manufacture flourished as an associative industry along with textile industries. The dye manufacturers attained an extraordinary skill in ensuring splendid permanence of the dyes. The manuscripts the Moors have left bear clear testimony to the fact. The ink of various colours, as the writers needed for the perfection of the art of calligraphy, has not yet faded and has well stood the vicissitudes of climate of centuries. "The art of dyeing black with indigo" was the invention of the Moors.[16] Andalusia an *Valencia* produced raw cotton and in Salamanca also was localised cotton-weaving industry. *Salamanca* was generally noted for her linens as *Segovia* for her woollens, *Granada* for her silks and *Almeria* for her damasks. It is of course to be observed that no one industry was particularly localised in a single city ; rather every city was devoted to the specialisation in as many different articles as there were advantages for their manufactures ; so that every city might be largely self-sufficient.

Of the notable manufactures, paper was by no means the least important. Paper mills were established at *Xativa*. The product of those mills was famous throughout the East. It was annually exported in large quantities. It was manufactured out of thread. Books were greatly loved by the Moors. The art of calligraphy was regarded by them as the "golden professoion." Large-scale manufacture of varieties of paper made the production of books in large numbers easy. The trade in books held a high rank in the commercial world. Its profits corresponded with its mercantile importance and in the time of Al Hakem II the book-sellers in Cordova alone numbered more than 20,000. Amirs, Sultans and Caliphs were the great purchasers of books. They had splendid Libraries all over the Moorish Empire. The evidence is clear from the contents of several Libraries such as that of Mostandir, the Sultan of Egypt, contained 80,000 volumes : that of the Fatimites of Cairo contained one million volumes ; that of Tripoli 200,000 volumes ; that of the Caliph, Al Hakem II had 600,000 volumes. In Spain

---

16. Dr. Crichton, *Arabian People,* p. 433 ff.

there were 70 very big public libraries and private libraries were numerous. The contrast becomes shocking when we find four centuries afterwards only few books in Christian Europe excepting those in the monasteries ; the Royal library of France contained only 900 volumes. In the 13th century when Baghdad was sacked by the Mongols, the books cast into the Tigris completely covered its surface and their ink dyed its water black, while a far greater number was committed to the flames.

The Caliphs of Spain introduced a good system of education. Every mosque had a school and a library attached to it. Every city had hundreds of mosques. Under Abdur Rahman III Cordova alone had 3,000 mosques. In consequence, during the Hispano-Arab dominion it was difficult to encounter a Moorish peasant who could not read and write. From this it is clear that there was a great demand for books and there was a large reading public. Book-making therefore was stimulated to be a flurishing industry in spain as it was in Baghdad. For these books paper mills were ready with an enormous supply of paper, needed at home and abroad.

There were various other industries carried on and organised on co-operative lines. As for instance, manufactures of mats, baskets of Esparto, the tough African grass ; manufacture of flour and medicines at *Saragossa* and *Lorca* respectively are noteworthy. The flour mills of Saragossa and *Murcia*, built upon boats moored over the rapid currents of the Ebro and the Guadalavier, were noted for their excellent flour. Granada and her suburbs had about 250,000 inhabitants, for whose consumption 130 water mills to manufacture flour were constantly at work. In Seville and her suburbs were established farm houses and presses for the production of olive and olive oil respectively. Their number was about 100,000. The drug market of Lorca was universally resorted to by physicians for the excellence and genuineness of the medicine guaranteed by the official supervision of the Government. Tinctures, essences, syrups they manufactured out of various herbs and vegetables, and flowers cultivated in their gardens were much finer than those made in any other part of the world.

Now let us turn to agriculture. It seems the Saracens came to rescue industry and agriculture from the dismal ruin of mediaeval violence and extravagance. The barbarian invasions obliterated the old civilisation, old commerce, industry and agriculture. Everywhere they scattered chaos and disorder. Hardly the troubled times were over when the Saracens came as it

were to restore ancient culture and practically they began to build the superstructure on the ashes of Roman achievements that were overrun by the invaders. They also were not given a moment's rest throughout the period they ruled in Spain. Within two centuries they were given 3,500 battles.

With the Visigothic invasion and domination of Spain in the early decades of the 5th century, commerce and industry generally received a serious check. Agriculture was ruined to a greater extent. Shortly after, there were founded the *latifunda,* worked by slaves or serfs. The first effect of the Muslim ascendancy in Spain was to break up the *latifunda* into small holdings and to distribute them among soldiers and allies. The Arabs in a short while proved to be efficient yeomen. They were by far the most successful agriculturists. They successfully cultivated the Vine on a large scale despite the prohibition of wine. They introduced the cultivation of rice, pomegranates, cane sugar and other oriental products. They completed a system of canals for the irrigation of gardens especially in the province of Murcia, Valencia and Granada. They were devoted to cattle-breeding as well. They were acquainted with the most minute details of farm life—as for instance, care of bees, poultry, and dairy farming.[17]

Under the wise administration of the Caliphs, agriculture received the same fresh impetus as industry and commerce. The gradual emergence of a small proprietary class in society, as a result of the new system of land tenure, tended to bring about a degree of security and stability of business not enjoyed upon the peninsula since the days of the Roman rule.

That the Moors were up-to-date scientific farmers is not doubted. They had excellent systems of irrigation, understood the values of various fertilisers, practised rotation of crops and knew how to graft and produce new varieties of fruits and flowers. In agriculture and horticulture modern nations had learnt valuable lessons from them. They made the greatest progress in agricultural science. No civilised nation of their times possessed a code of husbandry more judicious or more perfect. Many of their learned men turned their attention to this subject. *Kutsami,* author of the Nabathean agriculture, *Abu Omar, Abu Abdullah, Abu Zachariah* and others afforded to their countrymen valuable instruction in the different branches of rural economy. During the Caliphate of Almanzar agriculture far advanced and notable books

---

17. Gibins, *History of Commerce.*

on *Kalb* and *Tazbil* (Husbandry and Manure) were written under his patronage. Of these writers *Mabraman ibn Yazid* had the greatest reputation. His book is known as *Alkawalib wazzawalib*. From these treatises it appears that the Saracens were well acquainted with the nature and properties of soils and manures and their proper application to every particular species of crops, trees and plants.[18] They were familiar with the rearing and management of cattle ; and the European horse was greatly improved by a mixture with the Arabian breed. The horses of this Hispano-Arab breed were transported in great numbers even as far as Persia. In the kingdom of Granada 100,000 horses were regularly maintained for the use of the crown.

They had a thorough knowledge of climate and possessed the happy art of appropriating the different soils to that kind of culture best adapted to them. Agriculture flourished so much that the traveller's eyes were gladdened by well cultivated fields on all sides, irrigated upon scientific principles, so that what seemed the most sterile soil was rendered fertile. He was struck by the perfect order and marvelled at the cheapness of commodities, specially at a universal standard of living which permitted every one to ride a mule instead of journeying on foot and at the prevalent spruceness of attire.

Great care and skill were also bestowed on the formation of gardens and the choice and arrangement of plants and by this means many valuable-exotics were naturalised. Besides rice, olives, oranges and the sugarcane which the Moors acclimatised in the Mediterranean provinces of Spain, Europe is indebted to them for the introduction of cotton tree—the word "cotton" being itself derived from the Arabic word "Qutun",—the pistaches, ginger, myrrh, henna, sesanu, saffron, spinach and a variety of fine fruits and vegetables now considered as indigenous. In ornamental gardening they took great delight, studying the gratification of the eye as well as of the palate. Flowers and fountains of water they had in the richest abundance. A monument of their horticultural taste still remains in the garden of the Alcazar at Seville, which is preserved in its original state.

Now I should like to indicate the commercial aspect of the Moorish achievements in the middle ages. The industrial as well as agrarian movements that we have just noticed had necessarily far-reaching commercial results. Trade was mainly carried on by sea and under Abdur

---

18. Dr. A. Crichton, *Arabia and its People*, p. 432.

Rahman III the most important sources of revenue were the duties on imports and exports. The exports from *Seville* which was one of the greatest river ports in Spain were cotton, oil, olives and other local produce. During the Emirate of Abdullah when Ibn Hajjaj held the sovereignty in Seville the port was filled with vessels laden with Egyptian cloth, slaves and singing girls from every part of Europe and Asia. For the commodities of European convenience and oriental luxury were bartered innumerable products of Morrish agriculture, mining enterprise and manufacturing skill—oils, fruits, sugar, rice, cotton of Andalusia and Valencia ; cochineal, which abounded in many parts of the Peninsula ; the antimony and quicksilver of *Estremadura* ; the rubies, amethysts, and pearls of *Alicante* and *Carthegena* ; the linens of *Salamanca* ; the woollens of Segovia ; the silks of Granada ; the damasks of Almeria ; papers of Jativa and so on. The most important exports from Jaen and Malaga were saffron, figs, wine, marble, precious stones, gold, silver, copper and sugar. Spanish exports went to Africa, Egypt and Constantinople and thence they were forwarded to India and Central Asia, to Mecca, Baghdad and Damascus.

In Morrish Foreign Trade the Jews had a great share. They had been more or less disturbed by the Romans in the pursuit of their vocation. They now became the foremost financiers and merchants of Moorish Spain. The Caliphs repaired and enlarged the ports of Cadiz, Seville, Barcelona for them to make room for the increasing volume of commerce, most of which was financed by them. The number of shops indicated the immensity of the traffic and Cordova alone had 80,000 shops. Ships from Pisa, Genoa came from the Levant laden with merchandise. The return cargo of these ships consisted of numerous articles of Moorish fields, mines and factories. From Constantinople these goods often entered the Euxine Sea and the Don, then passed down the Volga through Transcaspia.

For the development of foreign trade as well as for colonisation.the Moors paid considerable attention to navigation and often undertook long and perilous voyages. The magnetic needle was invented by them. It had threefold value ; (i) it guided the vessels across the trackless waters independently of the stars especially in clouded weather and in mist ; (ii) it indicated unerringly the course of the Caravan ; and (iii) it enabled the worshipper to ascertain the point to which he should direct his face.

The trading expeditions of the adventurous Arabs had long before familiarised him with the relative positions, areas and natural productions of

the principal countries of the globe. In consequence of these extensive voyages, no science was better understood than that of treating of the earth's surface. They had an immense mercantile marine and magnificent Navy. The woods and forests of Spain furnished them with timber and they are said to have possessed a fleet of more than 1,000 merchant vessels. From an Arabian writer on commerce of the 10th century, it appears that the balance of trade was decidedly in favour of the Moors, whom Casiri, from their maritime traffic and the distant voyages they undertook by sea, compares to the ancient Phoenicians and Carthaginians. Commerce was the foundation of their greatness. It was the secret spring that filled the treasuries of Spain and fed the wealth and industry of her inhabitants.

This magnificence of the Moorish maritime commerce was due to the liberal fiscal policy of the Caliphs. Webster says :

"The Legal basis of Arabic commerce was on the whole comparatively liberal. Customs duties and carefully scheduled taxes on merchants were levied in all the Mahammadan countries but commerce could scarcely have attained such vast proportions as it did in those countries, had it been restrained by really vexatious regulations and restrictions."

He goes on,

"The Mahammadans also exerted a permanent influence upon the commercial development by their scientific and geographical knowledge, by their development of commercial routes which are not even yet worn out, by their extension of international relations, by their use of a medium of international exchange, by their maintenance of roads, construction of bridges, digging of wells along their caravan routes and other practical public works."[19]

The rules that governed the transactions of commercial intercourse in the markets of the Penisula were so simple, convenient and equitable that they were subsequently adopted by many other nations. The learned French writer, Sedillot, is authority for the statement that "Europe has borrowed from the Arabs some of its most important principles of finance as well as its present code of maritime law.[20]

As already indicated, according to the report of the Inspector-General of Customs under Caliph Abdur Rahman III, the import and export duties called 'Taareef' (in English Tariffs), as well as excise duties on all kinds of

19. Webster, *General History of Commerce.*
20. Scot, *Moorish Empire.*

native products provided the larger part of the national revenue. He imposed a duty of $12\frac{1}{2}$% *ad valorem* on every article exported or imported. There was no restrictions placed on foreign articles. The Caliphs were all free traders. Their policy was mainly guided by the principle of self-sufficiency and surplus production. Naturally they had to depend little on other countries for their necessaries. They used to exchange for their articles rare commodities, luxuries and curiosities of the Orient of India. They sold their surplus. The aim of the Caliphs' administration also affected the policy of foreign trade of Spain. It was to enable every citizen to attain a normally high standard of living and to enjoy the commodity he produced or helped to produce. Labourers were sure of their share in produce. They had their wages in kind generally. The numerous slaves that the Jews sold to the Caliphs as State labourers every year were set free and given the liberty of settling down in Spain. The salves were given education, civil and military functions as well. Caliph Abdur Rahman III gave them liberty and equalised their position in life with Aristocracy. This probably explains why the Caliphs' dominions were free from any acute labour unrest. There was specialisation and concentration of labourers in factories but the human tie between the labourers and their employers was not put as under.

Before we conclude, it is necessary to indicate the financial aspect of the Moorish industry. The Jews were the great financiers in the Moorish dominions. They financed indigenous industries as well as foreign trade. In the city of Cordova their quarter was known as the financial quarter "Darut Tajarat." To facilitate financing, the Caliphs introduced a system of currency which had largely the form of bimetallism. It was composed of the dinar, of gold, equal to two dollars, i.e., 8s. 4d.—Rs. $6\frac{1}{4}$, the dirhem of silver, equal to 12 cents—6d. and various small pieces of copper the *feels* (Lat. follis) of fluctuating value. There were also half dinars and $\frac{1}{3}$ dinars in use. Dinars were largely used for paying off international commercial obligations. It is yet to be discovered, however, how far credit facilities, banking operations and foreign exchange methods developed under the Moors.

The Moors also spread out their commercial activities into Sicily where they colonised. Sicily under their guidance flourished splendidly. Her natural resources coupled with her fortunate geographical position enriched her people. The harbours of Palermo and Syracuse were constantly crowded with shipping. Sicilian merchantmen were to be encountered in every European port ; they brought cargoes of slaves, ivory and gold dust from the coast of

Guinea ; they traversed the canal of Suez reopened by the Egyptian Caliphs—and braving the tempests of the Red Sea and the Indian ocean, penetrated into the Spice Islands of the far distant East. Her merchants could reach every article of popular research and commercial value, in exchange for which they exported the vegetable and mineral productions of the Island–cotton, hemp, grapes, oranges, sugar, wine, oil, copper, lead, iron, mercury, rock-salt, salt ammoniac ; cattle and horses ; the shell fish, from which was extracted the tyrian purple. The warehouses of the Sicilian cities were crowded with valuable merchandise of every conceivable description.[21]

To conclude, from this brief survey of the achievements of the Arabs in Damascus, Baghdad and Spain in the domain of commerce and industry, it appears that they laid the foundation of the gigantic edifice of modern commerce. But unfortunately they could not be suffered to perpetuate their achievements, nor could they be given time to give a finishing touch to the programme with which they started so splendidly. It is nothing short of a tragedy in history that the Arabs have not been pictured what they really had been. Scot has, however, after 20 years' hard study came to this conclusion :

"Modern progress is due to the emancipation of human intellect, which cannot be attributed to ecclesiastical inspiration. It was not a product of the Crusades. It was not the effect of the Reformation. It was not the work of Christianity, whose policy has indeed been constantly inimical to its toleration or encouragement. It is a legitimate consequence of the liberal policy adopted and perpetuated by the Ommeyide Caliphs throughout their magnificent empire whose civilisation was the wonder, as its power was the dread, of mediaeval Europe."[22]

---

21. Scot, *Moorish Empire in Europe.*
22. Scot, *Moorish Empire,* Vol. III, p. 532.